বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

BUDDHISM IN BENGAL

ALL INDIA FEDERATION OF BENGALI BUDDHISTS

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

BUDDHISM IN BENGAL

EDITOR

Brahmanda Pratap Barua

All India Federation of Bengali Buddhists

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

50T/1A Pottery Road, Kolkata- 700 015

বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

Buddhism in Bengal

Published by :
General Secretary
All India Federation of Bengali Buddhists
50T/1A, Pottery Road, Kolkata- 700 015

First Published : 2007

Cover : Manas Datta

Printed by :
Barun Kundu
New Gita Printers
51A, Jhama Pukur Lane, Kolkata- 700 009

Availability :
Maha Bodhi Book Agency
4A, Bankim Chatterjee Street
Kolkata-700 073

Price : 150.00

ISBN : 81-87032-65-0

উৎসর্গ

All India Federation of Bengali Buddhists

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন-এর

প্রয়াত সভাপতি

ড: অরবিন্দ বড়ুয়া

সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া

ও

প্রয়াত সাধারণ সম্পাদক

রামেন্দু মুৎসুদ্দী

প্রমথেশ বড়ুয়ার

পুণ্য স্মৃতির উদ্দেশে উৎসর্গ করা হল

শুভেচ্ছা বার্তা

নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন ২৫৫০তম বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে "বাংলায় বৌদ্ধধর্ম" বিষয়ে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র এবং পুস্তক প্রকাশনা করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। এটি একটি মহতী প্রয়াস। উক্ত বিষয়ে আমাদের কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক নেই। পুস্তকটি প্রকাশিত হলে আমাদের জাতির তথা দেশের বহুদিনের সাংস্কৃতিক অভাব পূর্ণ হবে। বিশেষ করে পুস্তকটি সমৃদ্ধ হয়েছে এপার-ওপার বাংলার বিশিষ্ট লেখকদের প্রবন্ধ সংযোজনায়। এই মহতী উদ্যোগকে আমি ব্যক্তিগতভাবে এবং সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মিশনের পক্ষে স্বাগত জানাই।

অনেকেই অবগত আছেন যে নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন বিভিন্ন প্রকার সমাজ উন্নয়ন কাজে লিপ্ত আছে। বাঙালী বৌদ্ধদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে এই প্রতিষ্ঠান একটি অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করেছে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের সংরক্ষণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করার পর বাংলায় বৌদ্ধধর্ম গ্রন্থ রচনা সংগঠনের দ্বিতীয় বিশিষ্ট অবদান।

এই গ্রন্থ প্রকাশনার সঙ্গে যুক্ত হতে পেরে আমি সবিশেষ আনন্দিত হয়েছি। এই মহতী প্রয়াসের জন্য আমি উদ্যোক্তাদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাই। আমার দৃঢ় বিশ্বাস "বাংলায় বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থটি বৌদ্ধধর্ম-প্রেমী মানুষের ঘরে ঘরে পঠিত হবে।

বুদ্ধপ্রিয় মহাথের
সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন
চিনার পার্ক, তেঘরিয়া, কলকাতা-৭০০ ০৫৯

প্রাক্-কথন

"মাতা যথা নিয়ং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্খে এবম্পি সব্ব ভূতেসু মানসং ভাবয়ে অপরিমানং।" তথাগতের এই অমূল্য বাণী প্রচারার্থে পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই ২৫৫০তম বুদ্ধজয়ন্তী পালিত হচ্ছে। এই বাণীর মর্মার্থ সন্ত্রাসবাদীদের বোধগম্য হলেই নিরপরাধ মানব সমাজ সন্ত্রাসের বিভীষিকা থেকে মুক্তি পাবে।

এই রকম চিন্তা ভাবনায় উদ্দীপিত হয়ে নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন (All India Federation of Bengali Buddhists) ২৫৫০ তম বুদ্ধজয়ন্তী উদযাপনে মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা এবং কলকাতাস্থ ৩২টি বৌদ্ধ সংগঠনের সাথে বিভিন্ন কর্মসূচীতে যোগদান করে এই ঐতিহাসিক মহোৎসব উদযাপনে ব্রতী হয়েছে।

এই উপলক্ষে আমাদের কর্মসূচীতে একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্রের (International Seminar) পরিকল্পনা ইতিপূর্বেই গ্রহণ করা হয়েছিল। কিন্তু নানা প্রকার প্রতিবন্ধকতার জন্য তার রূপায়ণ বিলম্বিত হয়।

অবশেষে আমাদের সকল সদস্যের সহায়তায়, বিশেষ করে আমাদের আজীবন সদস্য শ্রীমৎ বুদ্ধপ্রিয় মহাথেরর বিশেষ অনুপ্রেরণায় এবং কার্যকরী কমিটির সদস্যদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে ২৫৫০তম বুদ্ধজয়ন্তীকে সাফল্যের অগ্রভাগে পৌঁছাতে "বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম" শীর্ষক একটি আন্তর্জাতিক আলোচনা চক্র (International Seminar on Buddhism in Bengal) এবং পুস্তক প্রকাশনা সম্ভব হতে চলেছে।

মাননীয় সভাপতি, উদ্বোধক, প্রধান অতিথি, বিশিষ্ট অতিথি ও শ্রোতৃবৃন্দরা তাঁদের মূল্যবান সময় দিয়ে মহাবোধি সোসাইটি হলে ২রা ডিসেম্বর ২০০৬ তারিখে অনুষ্ঠিত সেমিনারে অংশ গ্রহণ করেছেন, এই জন্য নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের পক্ষে জ্ঞাপন করি আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। আর যে সমস্ত প্রবন্ধকার ও লেখক-লেখিকা লেখা দিয়ে আমাদের প্রকাশনাকে সমৃদ্ধ করেছেন তাঁদের প্রত্যেককে জানাই সংগঠনের পক্ষে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা। আশা করি এই পুস্তক উভয় বাংলার পাঠক-পাঠিকাদের মধ্যে জনপ্রিয়তা লাভ করবে।

ক্যাপ্টেন ক্ষিতীশ রঞ্জন বড়ুয়া
সাধারণ সম্পাদক
নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন

মুখবন্ধ

"বাংলায় বৌদ্ধধর্ম" অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব বেঙ্গলী বুদ্ধিষ্টস তথা নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠনের ২৫৫০ তম বুদ্ধজয়ন্তী নিবেদন। গুরুত্বপূর্ণ প্রকাশনার ক্ষেত্রে এটি আমাদের প্রথম প্রয়াস।

যেহেতু আমাদের সংস্থা বিহার ভিত্তিক সংগঠন নয় আমরা সিদ্ধান্ত নিই একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার এবং প্রকাশনার মাধ্যমে ২৫৫০ তম বুদ্ধজয়ন্তী উদযাপন করা হবে। অতঃপর আমার উপর তার পরিকল্পনা ও রূপায়ণের দায়িত্ব পড়ে।

আমাদের সংগঠনের নাম ও উদ্দেশ্যের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বিষয় নির্বাচন করা হয়। ইতিপূর্বে ২০০২ সালে কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটি এবং দিল্লীর "সেন্টার ফর ষ্টাডিজ ইন সিভিলাইজেশানস"-এর যৌথ উদ্যোগে একটি আলোচনাচক্র অনুষ্ঠিত হয় যার বিষয়বস্তু ছিল Contribution of the Bengalis to Philosophy, Religion, Science, Technology and Culture as Found in Their Language and Literature (c. 1200–2000 A. D)। সেখানে ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করার জন্য একটি প্রবন্ধ পাঠ করি। তারই পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত রূপ হল আমার এই গ্রন্থে সংযোজিত বিষয় নির্দেশক প্রবন্ধ "বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের বিবর্তন"। প্রবন্ধের ইংরেজী রূপ হল Buddhism in Bengal যেটি স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে। প্রবন্ধটি লিখতে গিয়ে অনুধাবন করলাম বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বা Buddhism in Bengal একটি সুগভীর বিষয় যার উপর একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনা করা বাঞ্ছনীয়।

বাংলা সাহিত্যে এই বিষয়ে কোন পূর্ণাঙ্গ পুস্তক নেই। স্বর্গীয় নলিনী নাথ দাশগুপ্তের গ্রন্থ "বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম" ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ বা ১৯৪৮ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল। তার দ্বিতীয় শৈব্যা সংস্করণ ১৪০৭ বঙ্গাব্দ বা ২০০১ সালে প্রকাশিত হয়। বইটিতে মূলত: বাংলার প্রাচীন যুগের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। উপসংহারে আছে মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্মের অবক্ষয়ের ইঙ্গিত এবং বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে তথাকথিত শিক্ষিত সম্প্রদায়ের নিস্পৃহতায় ক্ষোভ প্রকাশ। গায়ত্রী সেন মজুমদারের অপর এক গ্রন্থ Buddhism in Ancient Bengal ১৯৮৫ সালে কলকাতা থেকে প্রকাশিত হয়। সেটিও বাংলার প্রাচীন যুগে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস আলোচনায় সীমাবদ্ধ। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগ নিয়ে ইতিপূর্বে কোন সামগ্রিক আলোচনা হয়নি। এই গ্রন্থে আমরা সেই অপূর্ণতা দূরীকরণের চেষ্টা করেছি। মধ্যযুগ ও আধুনিক যুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সবিস্তারে আলোচনা করার প্রচেষ্টা হয়েছে। যদিও স্বীকার করতে দ্বিধা নেই সামান্য কিছু অপূর্ণতা এই গ্রন্থেও রয়ে গেছে।

নির্দ্ধারিত সময়ে প্রবন্ধ না পাওয়া এই অপূর্ণতার অন্যতম কারণ। সেগুলো আমরা পরবর্তী সংস্করণে সংযোজনের ইচ্ছা পোষণ করি।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের একটি পূর্ণাঙ্গ পুস্তক রচনার বাসনা নিয়ে আমরা ২৫৫০ তম বুদ্ধজয়ন্তী বৎসরে অর্থাৎ ২০০৬ সালে এটি প্রকাশ করার উদ্দেশ্যে একটি গবেষণা প্রকল্প হাতে নিই। কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে এই মর্মে অর্থ সাহায্যের আবেদন করার জন্য প্রকল্পের রূপদান করা হয় ২০05 সালে। প্রস্তাবিত পুস্তকের বিষয়বস্তু নির্দ্ধারণ করি। অনুধাবন করি বিষয়বস্তুর উপর সুবিচার করতে হলে প্রয়োজন প্রচুর সময় ও অর্থ। একার পক্ষে তা সম্ভব নয়। স্থির হয় এই বিষয়ে ভারত বাংলাদেশের বিভিন্ন বৌদ্ধ শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিদের নিয়ে একটি আন্তর্জাতিক সেমিনার করা হবে। পূর্ব নির্দ্ধারিত বিষয়ের উপর প্রবন্ধ সংগ্রহ করে পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের রূপ দেওয়া হবে। ভারত এবং বাংলাদেশে নির্দ্ধারিত বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখকের নাম ও ঠিকানা সংগ্রহ করি বন্ধুবর সুপণ্ডিত অধ্যাপক সুকোমল চৌধুরী এবং জগজ্জ্যোতি পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রী হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরীর সুপরামর্শে এবং সহায়তায়। সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক শ্রী ক্ষিতীশরঞ্জন বড়ুয়া, সম্পাদক সর্বশ্রী সুজিত কুমার বড়ুয়া, আশিস বড়ুয়া ও অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়ার উৎসাহে ও উদ্দীপনায় প্রকল্প প্রস্তুতির কাজ সমাপ্ত করা হয় এবং সরকারী দপ্তরে জমা দেওয়া হয়। বলা বাহুল্য বিগত বৎসরে সরকারী অনুদান পেতে আমরা ব্যর্থ হই। কিন্তু আমরা আমাদের উদ্দেশ্যে অবিচল থাকি।

অতঃপর শুরু হয় প্রবন্ধ সংগ্রহের অভিযান। আমাদের ইচ্ছা ছিল বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞ এবং স্বীকৃত গ্রন্থকার ও প্রাবন্ধিক এবং নূতন গবেষকদের কাছ থেকে প্রবন্ধ সংগ্রহ করে পুস্তকের রচনাকার্য সম্পাদন করা। সঙ্গে সঙ্গে সন্ধান করতে থাকি নির্দ্ধারিত বিষয়ে কোন বিশেষ পুস্তক বা প্রবন্ধ ইতিপূর্বে কোথাও প্রকাশিত হয়েছে কিনা। যে সমস্ত বিষয়ে নূতন লেখা সংগ্রহ করতে পারিনি সে সমস্ত বিষয় পুনর্মুদ্রিত প্রবন্ধের মাধ্যমে সংযোজন করে বিষয়বস্তুর ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে প্রয়াসী হয়েছি। তাই 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থটি হচ্ছে অনেকগুলো নূতন এবং কিছু পুরাতন লেখার সংকলন। লেখকদের সুবিধার কথা বিবেচনা করে পুস্তকটি দ্বি-ভাষিক (বাংলা ও ইংরেজী) করা হয়েছে। ৩৬টি লেখার মধ্যে ২৭টি বাংলা এবং ৯টি ইংরেজী; অর্থাৎ তিন চতুর্থাংশ বাংলা এবং এক চতুর্থাংশ ইংরেজী। তদনুযায়ী বইটির দ্বি-ভাষায় নামকরণ করা হয়েছে। বিষয়গুলো কালানুযায়ী ক্রমান্বয়ে গ্রথিত হয়েছে।

বইটির আকার সীমাবদ্ধ রাখার জন্য কিছু মূল্যবান প্রবন্ধ সংক্ষিপ্তাকারে প্রকাশ করতে হয়েছে। যেমন, নলিনী নাথ দাশগুপ্তের 'পালযুগে বৌদ্ধধর্ম', সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার "রবীন্দ্র দৃষ্টিতে বুদ্ধ", সুকোমল চৌধুরীর "মধ্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম", আশিস গঙ্গোপাধ্যায়ের "বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ", চিত্তরঞ্জন পাত্রের "বাংলার তথা ভারতীয় সংগ্রহশালায় রক্ষিত বৌদ্ধ ভাস্কর্য" এবং বেলা ভট্টাচার্য্যের "পালি ত্রিপিটক"। সম্পাদক হিসাবে তার দায়িত্ব

আমি স্বীকার করে নিচ্ছি। অন্যান্য সম্পাদনার কাজ সম্পাদক পরিষদের সদস্যরা সমষ্টিগত ভাবে পালন করেছেন।

"বাংলায় বৌদ্ধর্ম" গ্রন্থটির পরিকল্পনায় তিনটি পর্বের কথা প্রথমত: ভাবা হয়েছিল— প্রাচীন যুগ, মধ্য যুগ এবং আধুনিক যুগ। সামগ্রিকভাবে তা হল বাংলায় বৌদ্ধধর্মের উত্থান, পতন ও পুনরুত্থানের কাহিনী। কিন্তু শেষ পর্যন্ত পুস্তকটি পাঁচটি পর্বে বিভক্ত করা হল। প্রথম দুটি প্রবন্ধের বিষয় তিনটি যুগেই ব্যাপৃত হয়েছে। বলতে গেলে সেমিনারের বিষয়বস্তুর উপর এক বিহঙ্গম পরিচারনা। তাই উক্ত প্রবন্ধ দুটি নিয়ে একটি বিষয় নির্দেশক পর্ব করা হয়েছে। গ্রন্থের শেষ দুটি প্রবন্ধ এপার-ওপার বাংলার বাঙালী বৌদ্ধদের সমকালীন অবস্থার উপর আলোকপাত করেছে। তাই শেষ প্রবন্ধ দুটি "বর্তমান যুগ"-এর পর্বে সন্নিবেশিত হয়েছে। বিংশ শতাব্দী পর্যন্ত আধুনিক যুগ এবং তৎপর বর্তমান যুগ। ইংরেজী প্রবন্ধগুলো পৃথকভাবে সন্নিবেশিত হয়েছে। তাদের মধ্যে পাঁচটি প্রাচীন যুগ, একটি মধ্যযুগ এবং তিনটি আধুনিক যুগ সংক্রান্ত।

বইটি সম্পাদনা করতে গিয়ে তিনটি সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। প্রথমটি হল বাংলা শব্দের বানান বিভ্রাট। বিভিন্ন লেখক বিভিন্ন রকম বানান প্রয়োগ করেছেন, যথা— বাংলা, বাঙলা ও বাঙ্গালা এবং বাঙালি, বাঙালী ও বাঙ্গালী। আমরা এ বিষয়ে লেখকের প্রকাশ ভঙ্গিমায় হস্তক্ষেপ করিনি। দ্বিতীয়ত : কোন কোন প্রবন্ধে লেখকের অভিমত বিতর্কিত মনে হলেও তা বাদ দেওয়া হয়নি। এ জাতীয় ক্ষেত্রে লেখকের অভিমত নিজস্ব, ফেডারেশনের নয়। পাঠকরা তাঁদের বিচার-বুদ্ধি দিয়ে সিদ্ধান্তে পৌঁছাবেন। তৃতীয়ত: এরকম সংকলন গ্রন্থে কোন কোন বিশেষ ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধ করা সম্ভব হয়নি।

এই গ্রন্থে সন্নিবিষ্ট কয়েকটি বিশিষ্ট দিকের প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। মধ্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের অবনতি হলেও অবলুপ্তি ঘটেনি। আরাকান-চট্টগ্রাম-পার্বত্য চট্টগ্রাম এলাকায় বৌদ্ধ নৃপতিদের প্রভাব প্রতিপত্তি অক্ষুণ্ণ ছিল। সে সম্বন্ধে একাধিক প্রবন্ধে আলোকপাত করা হয়েছে।

বাংলার শিল্পকলা নিয়ে তিনটি প্রবন্ধ সংযোজিত হয়েছে। তা থেকে এটা স্পষ্ট যে প্রাচীন যুগের বাংলায় কোন স্থাপত্যের নিদর্শন পাওয়া যায়নি, কিন্তু কোন কোন স্থানে প্রাচীন সৌধের ভগ্নাবশেষ-এর সন্ধান মিলেছে। তাদের মধ্যে মালদহের জগজ্জীবনপুরের প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ঐতিহাসিক গুরুত্ব অনেক বেশী। তা থেকে জানা যায় পালবংশের রাজা দেবপালের পুত্র মহেন্দ্রপাল একজন শক্তিশালী নৃপতি ছিলেন। তাছাড়া প্রত্নতাত্ত্বিক আবিষ্কারের ফলে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন এলাকায় প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্যের প্রমাণ মিলেছে। ভাস্কর্যের অপূর্ব নিদর্শন ভারতীয় সংগ্রহশালায় এবং পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন যাদুঘরে সংরক্ষিত আছে। ভারতীয় সংগ্রহশালায় অনেকগুলো মূর্তি সংরক্ষিত আছে যেগুলোর প্রাপ্তিস্থান ঝাউড়ি, চট্টগ্রাম। প্রশ্ন জাগে মনে ঝাউড়িতেই কি অবস্থিত ছিল প্রসিদ্ধ পণ্ডিত বিহার?

জানতে পারি প্রাচীন এবং মধ্যযুগের বাঙালী বৌদ্ধদের ধ্যান ধারণার কথা। মহাযানী এবং তান্ত্রিক বৌদ্ধ মতের প্রাবল্য ছিল সেই সময়। বুদ্ধ ছাড়াও বিভিন্ন বৌদ্ধ দেব দেবীর পূজা অর্চনার প্রচলন হয় সমাজে। বৌদ্ধ বিষয় নিয়ে চিত্রকলা রচিত হয় আধুনিক যুগে। প্রখ্যাত শিল্পীরা চিত্রাঙ্কন করেছেন বুদ্ধভাবনাকে রূপ দিতে।

সাহিত্য সম্পর্কিত তিনটি প্রবন্ধ আছে। একটিতে আলোচিত হয়েছে চর্য্যাপদের রূপরেখা ইংরেজীতে, দ্বিতীয়টিতে পালি ত্রিপিটকের বঙ্গানুবাদ এবং তৃতীয়টিতে এপার ওপার বাংলার বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকা। তাছাড়া অন্যান্য প্রবন্ধেও সাহিত্যিক অবদানের কথা উল্লেখিত হয়েছে। বস্তুত: পক্ষে বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চা ও সাহিত্য সৃষ্টি আধুনিক যুগের অধিকাংশ প্রবন্ধের মূল আলোচ্য বিষয়।

ঊনবিংশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধে চট্টগ্রাম অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরন সূচীত হয় সংঘরাজ সারমেধ মহাথের এবং আচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবিরের নেতৃত্বে। এ প্রসঙ্গে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের অনবদ্য রচনা "সদ্ধর্মের পুনরুত্থান" গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত করা হয়েছে। সেই থেকে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের আধুনিক যুগের সূত্রপাত।

বিভিন্ন যুগে বাঙালী বৌদ্ধদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস আলোচনা করেছেন রাষ্ট্রপাল মহাথের, সুকোমল চৌধুরী, সাধন কমল চৌধুরী এবং সম্পাদক স্বয়ং।

ঐতিহাসিক ঘটনা ও পরিবেশ যেমন ব্যক্তিত্বের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তেমনি কোন কোন ব্যক্তিও ইতিহাস সৃষ্টি করেন। বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসকে সমৃদ্ধ করেছেন এমন যুগান্তকারী মনীষীদের জীবনী এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হয়েছে। মহামতি অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান, সঙ্ঘরাজ সারমেধ মহাথের, আচার্য পূর্ণাচার মহাস্থবির, অনাগারিক ধর্মপাল, কর্মযোগী কৃপাশরন মহাস্থবির, তিব্বতী ভাষায় বিশেষজ্ঞ শরৎ চন্দ্র দাস, মনীষী হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, ডক্টর বেনীমাধব বড়ুয়া এবং পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির-এর জীবনী এই গ্রন্থের একটি বিশেষ অঙ্গ।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় রেনেশাঁস বা নবজাগরণ ঘটে, শেষ হয় বিংশ শতকের প্রথমার্ধে। সেই সময় বাংলায় বহু মনীষীর জন্ম হয়। সাহিত্য, দর্শন, ধর্ম, রাজনীতি, বিজ্ঞান এবং সৃষ্টিশীল চিন্তায় ও প্রকাশে তাঁরা অসামান্য অবদান রেখে গেছেন। সেই যুগের দুই যুগান্তকারী ব্যক্তিত্ব হলেন বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং স্বামী বিবেকানন্দ। এই গ্রন্থে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে তাঁদের মূল্যায়ন একটি বিশেষ স্থান পেয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চার তিনটি প্রধান কেন্দ্র হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়। এই গ্রন্থে আমরা এশিয়াটিক সোসাইটি এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সম্পর্কিত দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ সংযুক্ত করতে সক্ষম হয়েছি।

এই পুস্তক প্রকাশে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় আমাদের সংগঠনের সহকর্মীদের কথা

যাঁদের কাছ থেকে সহায়তা লাভ করেছি। তাঁদের অকুণ্ঠ সহযোগিতা না পেলে এরকম একটি প্রাতিষ্ঠানিক গ্রন্থ প্রকাশ করা সম্ভব হতনা। পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে সম্পাদকীয় সহকর্মীদের মূল্যবান পরামর্শ এবং সক্রিয় সহযোগিতার কথা। ইংরেজী প্রুফ দেখার মূল দায়িত্ব গ্রহণ করেন বন্ধুবর মন্মথ কুমার বড়ুয়া। তাঁদের সকলের কাছে আমি ব্যক্তিগত ভাবে ঋণী।

আমাদের মত সংগঠনের পক্ষে পুস্তক প্রকাশনার মূল অন্তরায় হল আর্থিক অসংগতি। ভদন্ত বুদ্ধপ্রিয় মহাথের-এর সহায়তায় আমাদের সেই অভাব দূরীভূত হয়েছে। তিনি আমাদের আজীবন সদস্য হলেও তাঁকে আমরা পৃষ্ঠপোষক রূপে এই পুস্তকে সম্মানিত করেছি। সাধারণ সম্পাদকের মত আমিও তাঁর প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

কৃতজ্ঞতা জানাই বিশিষ্ট লেখক, গ্রন্থকার এবং সংস্থাদের প্রতি যাঁরা তাঁদের মূল্যবান প্রবন্ধ দিয়ে এবং পুনর্মুদ্রনের অনুমতি দিয়ে গ্রন্থটি সম্পূর্ণ করতে সহায়তা করেছেন।

গ্রন্থটি যথাসময়ে প্রকাশ করা সম্ভব হত না যদিনা মুদ্রাকর নিউ গীতা প্রিন্টার্সের শ্রী বরুণ কুণ্ডু, প্রচ্ছদ শিল্পী শ্রী মানস দত্ত এবং বিশেষজ্ঞ "প্রুফ-রীডার" শ্রীমতী অর্পিতা সেন-এর সহযোগিতা পেতাম। তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাই।

একটি নির্দিষ্ট সময়সীমার মধ্যে পুস্তক প্রকাশের বাধ্যবাধকতার জন্য আমাদের আশঙ্কা কিছু অনিচ্ছাকৃত মুদ্রন ত্রুটি থেকে যেতে পারে। ভুল ত্রুটি নজরে এলে আমরা পরবর্তী সংস্করনে সংশোধন করে নেব। আশা রাখি আমরা এ-ব্যাপারে পাঠকদের সহানুভুতি লাভ করতে সমর্থ হব।

বলা বাহুল্য অনেক প্রতিবন্ধকতা এবং পরিশ্রমের মাধ্যমে এই সংকলিত গ্রন্থটির সম্পূর্ণ রূপ দিতে সমর্থ হয়েছি। পুস্তকটি পাঠকের কাছে জনপ্রিয় হলে আমাদের এই প্রচেষ্টা এবং পরিশ্রম সার্থক হবে।

ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া

সূচীপত্র

নাম পৃষ্ঠা

বর্তমান যুগ

Second Part

বিষয় নির্দেশক প্রবন্ধ

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের বিবর্তন

ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া*

ভূমিকা

প্রাচীনকালে বৌদ্ধধর্ম ছিল পূর্ব ভারতের একটি প্রচলিত ধর্ম। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতমবুদ্ধ যখন তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন তখন মগধ বা দক্ষিণ বিহার ছিল তার কেন্দ্রস্থল; বঙ্গ এবং কলিঙ্গের নাম তখন শোনা যায়নি। মৌর্যযুগে অশোকের সাম্রাজ্যের বিস্তৃতি উত্তরপূর্ব ভারতের পুণ্ড্রবর্ধন বা উত্তরবঙ্গ পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল। নিঃসন্দেহে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে অশোকের রাজত্বকালে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রবেশ করেছিল। চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতট, কর্ণসুবর্ণ, পুণ্ড্রবর্ধন ও তাম্রলিপ্তিতে সম্রাট অশোক নির্মিত কিছু স্তূপ দেখতে পেয়েছিলেন।[১]

গুপ্ত এবং গুপ্তোত্তর যুগে অর্থাৎ ৪র্থ থেকে ৭ম শতকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের বিশেষ প্রভাব এবং প্রতিপত্তি ছিল। ফা হিয়েন, হিউয়েন সাঙ, ইৎসিঙ, সেঙচি প্রমুখ চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণ থেকে সেই যুগে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের একটি সামগ্রিক চিত্র পাওয়া যায়। তখন বাংলাদেশে অনেক বৌদ্ধবিহার ছিল এবং সেখানে বিভিন্ন গোষ্ঠীর হাজার হাজার ভিক্ষুশ্রমণ বাস করতেন। বিহারগুলি জ্ঞানচর্চার কেন্দ্র ছিল এবং ভিক্ষুশ্রমনদের নৈতিক জীবনযাত্রার মান উন্নত ছিল। সপ্তম শতকের একজন বিশিষ্ট বাঙালী পণ্ডিত ভিক্ষু ছিলেন শীলভদ্র। তিনি নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের আচার্য্য ছিলেন এবং ৬৩৭ খ্রীষ্টাব্দে হিউয়েন সাঙ তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশে সত্তরটির মত বিহার-সংঘারাম এবং তিনশত-এর মত দেবমন্দির দেখতে পেয়েছিলেন। জনসাধারণের মধ্যে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি অক্ষুণ্ণ ছিল।[২]

প্রাচীন যুগ

অষ্টম শতকের মধ্যভাগে পাল রাজবংশের অভ্যুদয়ে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম বিশেষ প্রভাবশালী হয়ে উঠে। পাল রাজগণের চারিশত বর্ষব্যাপী (৭৫০-১১৫০) রাজ্যকাল বাংলাদেশের ইতিহাসে সুবর্ণযুগ নামে খ্যাত। ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ক্ষীয়মান দীপশিখা বাংলা ও বিহারকে আশ্রয় করে উজ্জ্বলতর দীপ্তিতে প্রকাশ পায়। পালরাজগণ প্রতিষ্ঠিত

---

* ডঃ ব্রহ্মাণ্ড প্রতাপ বড়ুয়া রাজা রামমোহন রায় লাইব্রেরী ফাউণ্ডেশনের প্রাক্তন অধিকর্তা, বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ এবং এই গ্রন্থের সম্পাদক।

ওদন্তপুরী, সোমপুরী, বিক্রমশীলা, জগদ্দল প্রমুখ বিহার ধর্ম, দর্শন ও বিদ্যাচর্চার বিশিষ্ট কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হয়। সেখানে ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত ও বিদেশ থেকে ছাত্ররা অধ্যয়ন করতে আসত। বিশিষ্ট পণ্ডিতদের মধ্যে প্রসিদ্ধি লাভ করেছে বোধিভদ্র, শন্তিরক্ষিত, ধর্মকীর্তি, বিমলমিত্র, শান্তিগর্ভ, পদ্মসম্ভব, কমলশীল এবং অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। সংস্কৃত সাহিত্য এবং প্রাকৃত ও অপভ্রংশ ভাষা বিকাশ লাভ করে। পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক নেপাল থেকে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ দোঁহা ও চর্য্যাপদ দশম শতাব্দীতে সৃষ্ট বাংলাভাষার আদি নিদর্শনরূপে স্বীকৃতি লাভ করেছে।

পালবংশ ছাড়াও পূর্ববঙ্গের বা সমতটের চন্দ্রবংশ এবং গৌড়ের কম্বোজ বংশের রাজারাও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। পাল-চন্দ্র-কম্বোজ রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৃহত্তর বা মহাযানী বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে এবং তার প্রভাব তিব্বত ও দক্ষিণপূর্ব এশিয়ায় বিস্তার লাভ করে। পালযুগে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন উল্লেখনীয়। শূন্যবাদ ও বিজ্ঞানবাদ, যোগাচার, মাধ্যমিকবাদের পরিবর্তে এল মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান, তন্ত্রযান এবং সহজযান। এল নানা দেবদেবী—ধ্যানী বুদ্ধ, বোধিসত্ত্ব, মঞ্জুশ্রী, অবলোকিতেশ্বর এবং আরও অনেকে। মহাযানীমতের বিবর্তনে যাঁরা বিশেষ ভূমিকা নিয়েছিলেন তাঁদের বলা হত সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্য। সরহপাদ, লুইপাদ, তিল্লোপাদ, কাহ্নপাদ প্রমুখ চুরাশিজন সিদ্ধের নাম পাওয়া যায় তিব্বতী গ্রন্থে। এই সিদ্ধদের দোঁহায় বা গানে রচিত হয়েছিল চর্য্যাপদ।

দ্বাদশ শতাব্দীতে পালরাজবংশের পতনের পর বাংলায় সেনবংশের আধিপত্য স্থাপিত হয়। এই পরিবর্তনের যুগে পূর্ববঙ্গে বর্মনবংশ এবং দেববংশ স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা করেন। দেববংশের রাজা দামোদর দেব ও দশরথ দেব ত্রিপুরা—নোয়াখালি—চট্টগ্রাম অঞ্চলে ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগ পর্য্যন্ত স্বাধীনভাবে রাজত্ব করেছেন। ১২০৫ সালে ইখতিয়ার উদ্দীন মহম্মদ বিন বখতিয়ার খিলজী কর্ত্তৃক নদীয়া থেকে বিতাড়িত হয়ে লক্ষ্মণ সেন পূর্ববঙ্গে পলায়ন করেন। সেখানে তাঁর দুই পুত্র বিশ্বরূপ সেন এবং কেশব সেন ১২৬০ সাল পর্য্যন্ত স্বাধীন নরপতিরূপে বিরাজ করেছেন।[৪] সেন-বর্মন-দেব বংশের রাজারা ছিলেন ব্রাহ্মণ্যধর্মাশ্রয়ী। এই তিন বংশের রাজাদের সচেতন প্রচেষ্টা ছিল বাংলাদেশে ব্রাহ্মণ্যধর্মের প্রসার সাধন করা। রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতার অপসারণে বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজের পতন শুরু হল। বৌদ্ধ দেবদেবী ক্রমে বিরল হল, বৌদ্ধ-বিহারের সংখ্যা দ্রুত কমতে থাকল এবং বৌদ্ধ ধর্মাচার্য্যের প্রভাব সমাজে ক্ষীণতর হল। অন্যদিকে লক্ষ্মণসেনের সভাকবি জয়দেব গীতগোবিন্দ কাব্যের দশাবতার স্তোত্রে বুদ্ধদেবকে বিষ্ণুর অন্যতম অবতাররূপে বন্দনা করেছেন। ইহার পর লোকায়ত সমাজে বৌদ্ধধর্ম ধীরে ধীরে ব্রাহ্মণ্যধর্মের কুক্ষিগত হল।[৫]

দ্বাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বখতিয়ার খিলজী পালরাজ হতে মগধ বা বিহার দখল করেন। তিনি একের পর এক প্রখ্যাত বিহার—নালন্দা, বিক্রমশীলা, ওদন্তপুরী সমূহ ধ্বংস

করেন, বুদ্ধমূর্তি বিনষ্ট করেন, ভিক্ষুদের নির্বিচারে হত্যা করেন, সমৃদ্ধ পাঠাগারগুলি পুড়িয়ে ফেলেন এবং বহু বৌদ্ধদের বলপূর্বক ধর্মান্তরিত করেন। এই ব্যাপক ধ্বংসলীলায় বৌদ্ধধর্ম তার জন্মস্থান বিহার থেকে বিলুপ্ত হল। অতঃপর বখতিয়ার খিলজী ১২০৫ সালে বাংলাদেশ দখল করেন এবং গৌড়ে রাজধানী স্থাপন করেন। অনুমান করা যায় বাংলার বৌদ্ধবিহারগুলিও একই ধারায় সুলতানী আমলে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়। ফলে বহু বৌদ্ধভিক্ষু পুঁথিপত্র সঙ্গে নিয়ে নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেখানে পরবর্তীকালে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত কিছু ভারতীয় গ্রন্থের পুঁথি কিংবা তিব্বতী ভাষায় অনূদিত গ্রন্থ আবিষ্কৃত হয়েছে যেগুলো ভারতে পাওয়া যায়নি। বৌদ্ধধর্ম হচ্ছে বিহার এবং ভিক্ষুকেন্দ্রিক। স্বভাবতই জ্ঞানীগুণী ভিক্ষুর অভাবে বৌদ্ধজনসাধারণ দিশেহারা হয়ে পড়ে। আত্মরক্ষার তাগিদে অনেকে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট বৌদ্ধরা ব্রাহ্মণ্য সমাজব্যবস্থার নিম্নবর্ণে স্থান লাভ করে বৃহত্তর হিন্দুধর্মের মধ্যে মিশে যায়। অল্প সংখ্যক বৌদ্ধ দার্জিলিং, চট্টগ্রাম এবং পার্বত্য চট্টগ্রাম অঞ্চলে বসবাস করতে থাকে।

এইভাবে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের দ্রুত পতন সংঘটিত হয়। ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ছয়শত বৎসর বাংলায় বৌদ্ধদের কথা বিশেষ শোনা যায়নি। বাংলা তথা ভারতে বৌদ্ধধর্মের পতনের অনেকগুলো কারণ ছিল। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল—পাল-চন্দ্র আমলের পর রাজকীয় বা রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা প্রত্যাহার, সেন-বর্মন পর্ব থেকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম নেতাদের প্রবল বিদ্বেষ এবং বিরোধিতা এবং মুসলমান আক্রমণের ফলে ব্যাপক হারে বৌদ্ধবিহার ধ্বংস, ভিক্ষুদের হত্যা এবং পুঁথির বিনষ্টসাধন। মহাযানী বজ্রযান, মন্ত্রযান, তন্ত্রযান, সহজিয়া যোগসাধন ইত্যাদি প্রবর্তনের ফলে বৌদ্ধধর্মে যে আভ্যন্তরীণ বিভেদ, বিকৃতি এবং অধঃপতন দেখা দিয়েছিল তাতে সে পতন ত্বরান্বিত হয়।

মধ্যযুগে বৌদ্ধধর্ম ও সমাজ

ত্রয়োদশ থেকে পঞ্চদশ শতকে তিনজন বৌদ্ধ নৃপতির নাম শোনা যায়। পূর্ববঙ্গের পট্টিকেরা রাজ্যে রণবঙ্কমল শ্রীহরিকালদেব ১২০৪ থেকে ১২২০ পর্য্যন্ত রাজত্ব করেছেন। সম্ভবত ময়নামতী পাহাড়াঞ্চলে তাঁর রাজধানী ছিল। /"পঞ্চরক্ষা" নামক একখানি মহাযান গ্রন্থ থেকে জানা যায়, পরমসৌগত গৌড়েশ্বর মধুসেনের বিজয় রাজ্যে ১২৮৯ সালে এই পুঁথি লিখিত হয়েছে। লামা তারনাথের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গ্রন্থে উল্লেখ আছে ১৪৪৮ সালে ছগল বা চঙ্গলরাজ নামে জনৈক বাঙালী নরপতি রানীর প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বুদ্ধগয়ার জীর্ণ মঠগুলি সংস্কার করেন। পঞ্চদশ শতকে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের কিছু লোক নবদ্বীপ অঞ্চলে বাস করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় বৃন্দাবন দাসের /"চৈতন্য ভাগবতে"। তদানীন্তন বৈষ্ণব সাহিত্যে বৌদ্ধদের সম্পর্কে যে বিক্ষিপ্ত উক্তি পাওয়া যায় তাতে তাদের "পাষণ্ডী" রূপে আখ্যায়িত করা হয়। বলতে গেলে, পঞ্চদশ শতকে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম

ও সম্প্রদায় প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু "বজ্রযান-মন্ত্রযান-কালচক্রযান-সহজযান বৌদ্ধধর্ম যথার্থত বহুদিন বাঁচিয়া ছিল সহজিয়া বৈষ্ণব ধর্মে, নাথপন্থী ধর্মে, অবধূতমার্গীদের ধ্যান ধারণায় ও অভ্যাসে, কৌলমার্গীদের ধর্মে ও ধ্যানধারণায় এবং আজও বহুলাংশে বাঁচিয়া আছে আউল-বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে।"[৭]

বৃহৎবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের অবসান ঘটলেও ত্রিপুরা-চট্টগ্রাম অঞ্চলে কিছু কিছু বৌদ্ধ অবশিষ্ট ছিল। প্রাচীনকাল থেকে পূর্ববঙ্গের সমতট অঞ্চল বৌদ্ধ প্রভাবান্বিত ছিল। মহাযানপন্থী চন্দ্রবংশীয় রাজারা সেখানে রাজত্ব করতেন। আনুমানিক দশম শতাব্দীতে পালরাজারা চট্টগ্রামে "পণ্ডিত বিহার" এবং পট্টিকেরায় "কণকস্তুপ বিহার" স্থাপন করেছিলেন। সেগুলি মহাযানী শাস্ত্রচর্চার অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল। বৌদ্ধরাজা হরিকেলদেব পট্টিকেরায় ত্রয়োদশ শতকের প্রথমে প্রায় দুই দশক রাজত্ব করেছিলেন। লোকায়ত সমাজে হিন্দু বৌদ্ধ ভেদাভেদ ঘুচে গিয়েছিল। বৌদ্ধেরা ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর পূজায় অংশগ্রহণ করত এবং হিন্দুরা বৌদ্ধ তীর্থ ও মেলায় যোগদান করত। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ড প্রথমে ছিল বৌদ্ধতীর্থ, পরবর্তীকালে হিন্দুতীর্থরূপে পরিগণিত হয়। সমতটের চন্দ্র ও দেববংশের রাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় চন্দ্রনাথ তীর্থের উন্নতি ঘটে। পর্বতের নিম্নে সমতলভূমিতে স্বয়ম্ভুনাথ চৈত্য ও সঙ্ঘারাম নির্মিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীতে চট্টগ্রাম আরাকানের বৌদ্ধ রাজাদের হস্তচ্যুত হলে (১৬৬৬) কালক্রমে চন্দ্রনাথ হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়। কোন কোন পণ্ডিতের মতে চন্দ্রনাথ তীর্থেই 'পণ্ডিত বিহার' বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত ছিল। চন্দ্রনাথ তীর্থভিত্তিক হিন্দু-বৌদ্ধ সমন্বয়ের প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে অজ্ঞাত পরিচয় লেখক দ্বারা রচিত "মঘা খমুজা" নামক একটি বাংলা বৌদ্ধ গ্রন্থ থেকে। গ্রন্থটি ১৮৫০ সালে লিখিত এবং বিষয়বস্তু মধ্যযুগের মহাযানপন্থী সাধারণ বাঙালী বৌদ্ধদের মিশ্র ধর্মবিশ্বাসের চিত্র প্রতিফলিত করে। বেণীমাধব বড়ুয়া "বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান" শীর্ষক প্রবন্ধে লিখেছেন, 'ইহার গভীর জ্ঞানের কথা কিছুই নাই। ইহার ভণিতা অংশ হইতে প্রমাণিত হয় যে, ঐ সময়ে স্থানীয় বৌদ্ধগণের বিশ্বাস ছিল যে, বাড়বকুণ্ডের সান্নিধ্যে পবিত্র চন্দ্রনাথ পাহাড়ে নাগরাজ বাসুকি ভগবান বুদ্ধের এক কেশধাতু আনিয়া উহার উপর এক চৈত্য নির্মাণ করিয়াছিলেন। প্রচলিত পদ্ধতি অনুসারে ওঁ নমঃ গণেশায়, নমঃ সরস্বতী, অথ মঘা খমুজা পুস্তক লীখ্যতে' বলিয়া গ্রন্থকার তাঁহার গ্রন্থারম্ভ করিয়াছিলেন।"

সাধারণ হিন্দু ও বৌদ্ধদের মধ্যে মতাদর্শজনিত পার্থক্য ঘুচে গিয়েছিল। একমাত্র পার্থক্য ছিল পৌরোহিত্যে। হিন্দুদের পূজাপার্বণ শাস্ত্রমতে পরিচালনা করত ব্রাহ্মণ পুরোহিত ; অন্যদিকে বৌদ্ধদের ক্রিয়াকর্ম "রাউলী" কিংবা "ফুঙ্গি" নামক বিবাহিত পুরোহিতের দ্বারা বৌদ্ধমতে সম্পন্ন করা হত। সেই সময়কার বৌদ্ধভিক্ষু সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী লিখেছেন "বৌদ্ধধর্মের প্রাদুর্ভাবকালে যাহারা অনাচরণীয় ছিল এবং মুসলমানাধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা

অনাচরণীয় হইল—বৌদ্ধধর্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল। শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল, দর্শন ভুলিয়া গেল। তখন রহিল জনকতক মূর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষুনামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মতো করিয়া বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া লইল''।[১০]

ত্রিপুরা ও চট্টগ্রামের আদি বৌদ্ধ জনগোষ্ঠীর সঙ্গে পরে মিলিত হয়েছে আরাকান প্রভাবিত ''মঘ'' ও ''চাকমা'' বৌদ্ধ সম্প্রদায়। চট্টগ্রাম ও ব্রহ্মদেশ বা মায়ানমারের মধ্যে বঙ্গোপসাগরের তটবর্তী অঞ্চলে ছিল স্বাধীন আরাকান রাজ্য। দশম শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে সপ্তদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময় পর্য্যন্ত (৯৫৩-১৬৬৬) চট্টগ্রামে আরাকান আধিপত্য অনেকাংশে বজায় ছিল। শাসনকর্তা বা সামন্তরাজাদের মাধ্যমে চট্টগ্রামের বিভিন্ন অঞ্চল শাসিত হত। বস্তুতঃপক্ষে চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চল, বিশেষ করে শঙ্খনদীর দক্ষিণের এলাকা, দীর্ঘদিন (১৭৫৬ পর্য্যন্ত) আরাকান রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস ''রাজোয়াং'' থেকে জানা যায়, খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে মগধের চন্দ্র-সূর্য নামক এক সামন্ত আরাকান ও চট্টগ্রাম জয় করে সেখানকার রাজা হন। মগধ থেকে যারা গেল এবং স্থানীয় যারা বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করল তারা সবাই মগ বা মঘ নামে খ্যাত হয়। ''চট্টগ্রামে সাধারণভাবে আজো বৌদ্ধ অর্থে মঘ এবং মঘ অর্থে বৌদ্ধ নির্দেশিত হয়।''[১১] রিসলে মঘদের তিনশ্রেণীতে বিভক্ত করেছেন ঃ (ক) মারমাগ্রী, রাজবংশী অথবা বড়ুয়া মঘ, (খ) জুমিয়া মঘ এবং (গ) রোয়াং বা রাখিয়াং মঘ। মগধাগত রাজা ও তাঁর সঙ্গীদের সঙ্গে স্থানীয় আরাকানী মহিলাদের বৈবাহিক সম্পর্কের ফলে উদ্ভূত এবং পরবর্তীকালে আরাকানী সৈন্য সামন্তদের সঙ্গে চট্টগ্রামের বাঙালী রমণীর রক্তের সংমিশ্রণে জাত বর্ণসঙ্কর জনগোষ্ঠী রাজবংশী বা বড়ুয়া মঘ শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। জুমিয়া মঘ হল পার্বত্য চট্টগ্রামের দক্ষিণাঞ্চলে বসবাসকারী মারমা বা আরাকানী সম্প্রদায়। মধ্যযুগের প্রারম্ভে আনুমানিক চতুর্দশ-পঞ্চদশ শতকে তারা সেখানে বসবাস করতে শুরু করে। জুম চাষ করে জীবিকা নির্বাহ করে বলে তাদের জুমিয়া মঘ বলা হয়। রোয়াং বা রাখিয়াং মঘ হচ্ছে সে সব মঘ যারা ১৭৮৫ সালে বার্মা কর্ত্তৃক আরাকান অধিকৃত হলে পালিয়ে এসে চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম এবং পটুয়াখালি অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করে। জুমিয়া মঘ ও রোয়াং মঘরা আরাকানী ভাষায় কথা বলে এবং বর্মি বা আরাকানী সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু রাজবংশী ও বড়ুয়া মঘদের মাতৃভাষা বাংলা এবং তারা বাঙালী সংস্কৃতির দ্বারা পরিপুষ্ট।[১২]

চাকমা সম্প্রদায়ের লোকেরা উত্তর বার্মা থেকে আরাকান রাজ কর্ত্তৃক বিতাড়িত হয়ে পঞ্চদশ শতকের প্রারম্ভে চট্টগ্রামে প্রবেশ করে। চট্টগ্রামে এসে মাতামুহুড়ি নদীর তীরে অলিকদমে বসতি স্থাপন করে। কিন্তু আরাকানী মঘদের চাপ বাড়তে থাকায় তারা ক্রমে উত্তরদিকে সরে যেতে বাধ্য হয় এবং কর্ণফুলি নদীর তীরে প্রথমে রাজানগরে ও পরে

রাঙামাটিতে তাদের রাজকেন্দ্র স্থাপিত হয়। চাকমারাও ধর্মে বৌদ্ধ।[১৩] জুমিয়া মঘ ও রোয়াং মঘরা মায়ানমারী সংস্কৃতিতে অনুরক্ত, কিন্তু চাকমারা বাঙালী সংস্কৃতির দ্বারা প্রভাবিত। চাকমাদের নিজস্ব উপভাষা থাকলেও তাদের মাতৃভাষা বাংলা। অবিভক্ত বাংলায় পার্বত্য চট্টগ্রাম একমাত্র জেলা যেখানে বৌদ্ধরা ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ।

আধুনিক যুগে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ

ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের সংস্কার ও পুনর্জাগরণ ঘটে। দেশের রাজনৈতিক পরিস্থিতি বৌদ্ধদের পক্ষে অনুকূল ছিল। ১৮২৬ সালে আরাকান ভারত সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। সিংহলে এবং ব্রহ্মদেশে বৃটিশ শাসন প্রবর্তিত হওয়ায় এতদ্অঞ্চলে যাতায়াত সহজ হল। ব্রহ্মদেশ ও সিংহলে প্রচলিত থেরবাদী বৌদ্ধ মতবাদ এবং পালিভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রতি বাঙালী বৌদ্ধরা আকৃষ্ট হল। ইংরেজী শিক্ষার প্রসার, বাংলা ভাষার প্রগতি এবং পালিভাষার চর্চা বাঙালী বৌদ্ধদের নূতনভাবে উজ্জীবিত করল। তাদের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন কতিপয় বৌদ্ধভিক্ষু।

তাঁদের মধ্যে অগ্রণী ছিলেন আরাকানী ভিক্ষু সারমেধ মহাথের (১৮০১-১৮৮২)। প্রথম পর্য্যায়ে ১৮৫৮ সালে তিনি চট্টগ্রামের বৌদ্ধতীর্থসমূহ ভ্রমণ করেন, বড়ুয়া ও চাকমা ভিক্ষুদের প্রকৃত ধর্ম ও বিনয় সম্বন্ধে অবগত করান এবং বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের মধ্যে তান্ত্রিকমতের অসারতা, নানা দেবদেবীর পূজা, পশুবলির বিরুদ্ধে চেতনা সঞ্চার করেন। ১৮৬৪ সালে মহামুনি পাহাড়তলীতে সাতজন রাউলি বৌদ্ধ ভিক্ষুকে থেরবাদী মতে উপসম্পদা প্রদান করেন বা ভিক্ষুত্বে বরণ করেন। এইভাবে চট্টগ্রামে সংঘরাজ নিকায় বা থেরবাদী বৌদ্ধসংঘ স্থাপিত হল এবং সারমেধ মহাথের হলেন প্রথম সংঘরাজ। তখন থেকে চট্টগ্রাম তথা বাংলায় থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠিত হল। এই সময় থেকে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের নবজাগরণ সূচিত হয়।

১৮৮২ সালে পূর্ণাচার মহাস্থবির (১৮৩৭-১৯০৯) দ্বিতীয় সংঘরাজরূপে অভিষিক্ত হলেন। তিনি বার্মায় (মায়ানমার) ও সিংহলে (শ্রীলঙ্কায়) বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে বিশেষ ব্যুৎপত্তি লাভ করেন। স্বদেশে ফিরে তিনি থেরবাদী বৌদ্ধধর্ম প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। আচার্য্য পূর্ণাচার মহাস্থবির হলেন প্রথম বাঙালী ভিক্ষু যিনি থেরবাদী সংঘনায়করূপে চট্টগ্রামে তথা বঙ্গে বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে গেছেন। তাঁর নেতৃত্ব গ্রহণের পর, গুরু-শিষ্যের মধ্যে ভাষার ব্যবধান দূরীভূত হল। ফলে ভিক্ষু-গৃহী নির্বিশেষে বাঙালী বৌদ্ধসমাজে নবজাগরণের প্লাবন বয়ে গেল। তিনি অনেক গুণগ্রাহী ভিক্ষু শিষ্য তৈরী করে গেছেন। তাঁদের মধ্যে ছিলেন সঙ্ঘনায়ক জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির, সাধক ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ গুণালঙ্কার মহাস্থবির, অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, অগ্রমহাপণ্ডিত

ধর্মবংশ মহাস্থবির, কর্মবীর কৃপাশরন মহাস্থবির প্রমুখ বিশিষ্ট ভিক্ষুগণ। "বর্তমান ভিক্ষুগণ পুন্নাচারেরেই শিষ্য প্রশিষ্য পরম্পরা মাত্র"।[১৪]

চট্টগ্রামের বাইরে যে কয়জন বৌদ্ধভিক্ষু থেরবাদী বৌদ্ধমত প্রচারে ও প্রসারে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তাঁদের মধ্যে অন্যতম কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬)। ভারতের বৌদ্ধতীর্থ দর্শন করার পর তিনি কলকাতা নগরীতে তাঁর কর্মকেন্দ্র স্থাপন করার সংকল্প করেন। তিনি ১৮৮৫ সালে কলকাতায় আসেন এবং ১৮৯২ সালে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা বা "বেঙ্গল বুড্ডিষ্ট এসোসিয়েশান" গঠন করেন। ১৯০৩ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মাঙ্কুর বিহার। বৌদ্ধসংস্কৃতি প্রসারে তাঁর বিশেষ অবদান হল ১৯০৮ সালে গুণালঙ্কার মহাস্থবির ও পুন্নানন্দ সামীর যৌথ সম্পাদনায় "জগজ্জ্যোতি" পত্রিকার প্রকাশ এবং ১৯০৯ সালে বৌদ্ধগ্রন্থ সমৃদ্ধ "গুণালঙ্কার লাইব্রেরী" প্রতিষ্ঠা। সেই সময় স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর ঘনিষ্ঠ পরিচয় হয় এবং তাঁর সহায়তায় বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তারের জন্য বহু পদক্ষেপ গ্রহণ করেন। যথা— বৌদ্ধপল্লীতে প্রতিষ্ঠিত স্কুলের স্বীকৃতি আদায়, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক বুড্ডিষ্ট হোষ্টেল প্রতিষ্ঠা এবং স্কুল কলেজে পালিভাষা শিক্ষার প্রবর্তন। কলকাতা ব্যতীত লক্ষ্ণৌ, শিলং, ডিব্রুগড়, জামসেদপুর, সিমলা, দার্জিলিং প্রভৃতি স্থানে ধর্মাঙ্কুরের শাখাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করা হয়। ১৯২৪ সালের ডিসেম্বর মাসে ধর্মাঙ্কুর বিহার সংলগ্ন নালন্দা পার্কে একটি আন্তর্জাতিক ধর্মসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।[১৫] এক কথায়, কৃপাশরণ মহাস্থবির নব্য বাঙালী বৌদ্ধ সংস্কৃতিকে চট্টগ্রামের গণ্ডীর বাইরে এনে বৃহত্তর বঙ্গে তথা ভারতে পরিচয় করিয়ে দেন।

অনাগারিক ধর্মপাল ও মহাবোধি সোসাইটি

বাংলার বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণের অন্যতম নায়ক হলেন শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধপণ্ডিত অনাগারিক ধর্মপাল (১৮৬৪-১৯৩৩)। তিনি ভারতের প্রধান বৌদ্ধ তীর্থস্থানের মন্দিরগুলো, বিশেষ করে বুদ্ধগয়ার বুদ্ধমন্দির বৌদ্ধদের জন্য পুনরুদ্ধানের মানসে ১৮৯১ সালে মহাবোধি সোসাইটি প্রতিষ্ঠা করেন। উক্ত বৎসর ১৭ই জুলাই বুদ্ধগয়ায় স্থায়ীভাবে বসবাস করার জন্য শ্রীলঙ্কা থেকে চারজন ভিক্ষু প্রেরণ করেন। ১৮৯২ সালে ইংরেজী জার্নাল "দি মহাবোধি" প্রকাশিত হয়। ১৮৯৩ সালে তিনি শিকাগোর বিশ্ব ধর্ম মহাসম্মেলনে যোগদান করেন এবং "The World's Debt to Buddha" শীর্ষক বিষয়ে ভাষণ দিয়ে সুখ্যাতি অর্জন করেন। ১৯০৪ সালে মহাবোধি সোসাইটির প্রধান কার্যালয় কলকাতায় স্থানান্তরিত হয়। এবং ১৯১৫ সালে স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে সোসাইটি রেজিষ্ট্রিকৃত হয়। কলকাতায় ধর্মরাজিক বিহার এবং সারনাথে মুলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা তাঁর অন্যতম কীর্তি। কালক্রমে দিল্লী, মুম্বাই, চেন্নাই, বুদ্ধগয়া, সারনাথ, সাঁচী, লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানে মহাবোধির শাখা প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীলঙ্কা উদ্ভূত হলেও অনাগারিক ধর্মপালের প্রধান কর্মক্ষেত্র ছিল

কলকাতা। বাংলা তথা ভারতে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণে তাঁর অবদান ছিল অতুলনীয়।[১১]

বৌদ্ধশাস্ত্র ও পালিভাষা চর্চা

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় রেনেশাঁস বা নবজাগরণের সাথে সাথে বৌদ্ধ সাহিত্যচর্চার নূতন আগ্রহ ও উদ্যম দেখা দিল। পাশ্চাত্য পণ্ডিতরা আগেই তার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলেন। মাইকেল জন ফ্রাঁসোঁয়া ওজরে (Michael John Francois Ozray) ১৮১৭ সালে পেরিস থেকে রিসার্চেস জুর বুদ্ধো (Researches Zur Buddhou) প্রকাশ করলেন। নেপালের তদানীন্তন বৃটিশ রেসিডেণ্ট বি. এইচ. হজসন (B. H. Hodgson) ১৮২১-১৮৪৫ সালের মধ্যে নেপাল থেকে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রচুর পুঁথি সংগ্রহ করে লণ্ডন, পেরিস এবং কলকাতার এশিয়াটিক সোসাইটিতে দান করলেন। তদনুরূপ হাঙ্গেরীর পণ্ডিত আলেক্সাণ্ডার সোমা ডা কোরোস (Alexander Psoma de Koros, 1782-1842) সংগ্রহ করলেন তিব্বতী পুঁথি। জেমস প্রিন্সেপ (James Princep) অশোকের শিলালিপির ভাষার অর্থ নির্ণয় করলেন। এইভাবে এশিয়াটিক সোসাইটি বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার বিশেষ কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হল।[১৭]

একই সাথে শ্রীলঙ্কা থেকে আবিষ্কৃত পালি গ্রন্থসমূহ বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চার এক নূতন দিগন্ত উন্মোচন করল। জর্জ টার্নার-এর (George Tourner) মহাবংশের অনুবাদ, ফাউসবল-এর (Fousexoll) ল্যাটিন ভাষায় ধর্মপদের অনুবাদ এবং চাইল্ডার্স-এর (R. C. Childers) পালি অভিধান বৌদ্ধশাস্ত্র গবেষণায় বিপ্লব সূচিত করল। তারপর একের পর এক প্রকাশিত হল ম্যাক্সমূলার (F. Max Muller)-এর Sacred Books of the East, ওল্ডেনবার্গ-এর (H. Oldenberg) : Buddha : his life, his doctrine, his order, বীল-এর (S. Beal) : Buddhist Records of the Western World, রীস-ডেভিডস-এর (T. W. Rhys Davids) : Buddhist India ও অন্যান্য গ্রন্থ, এডউইন আর্নোল্ড-এর (Edwin Arnold) : The Light of Asia এবং অন্যান্য পাশ্চাত্য পণ্ডিতবর্গের বৌদ্ধধর্মমূলক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থগুলি। তাঁদের প্রভাব বাঙালী তথা ভারতীয় মনীষায় নিঃসন্দেহে রেখাপাত করেছিল।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বেশ কিছু বাঙালী চিন্তানায়ক বুদ্ধের জীবন, ধর্ম ও দর্শন বিষয়ে লেখনী ধারণ করেছেন। তাঁদের মধ্যে পথিকৃৎ ছিলেন রাজেন্দ্র লাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)। এশিয়াটিক সোসাইটিকে কেন্দ্র করে তিনি রচনা করেছিলেন An introduction to the Lalitavistara, Buddha Gaya—the Hermitage of Sakyamuni এবং The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal। ঐ সময়ের আর একজন বিশিষ্ট বৌদ্ধবেত্তা ছিলেন পুরাতত্ত্ববিদ রামদাস সেন (১৮৪৫-১৮৮৭)। তাঁর রচিত Modern Buddhistic

Researches গ্রন্থে বৌদ্ধশাস্ত্রে গবেষণার অগ্রগতি সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে। তাঁর "ঐতিহাসিক রহস্য" গ্রন্থে আলোচিত হয়েছে বৌদ্ধধর্ম, শাক্যসিংহের দিগ্বিজয়, বৌদ্ধমত ও তৎসমালোচন, পালিভাষা ও তৎসমালোচন, বুদ্ধদেবের দন্তধাতু ও বৌদ্ধজাতক প্রসঙ্গ। তাঁর শেষ গ্রন্থ 'বুদ্ধদেব' তাঁর মৃত্যুর পর ১৮৯১ সালে প্রকাশিত হয়। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪) তাঁর "সাম্য" গ্রন্থে বুদ্ধদেবকে জগতের শ্রেষ্ঠ সাম্যবাদী বলে অভিহিত করেছেন। 'বঙ্গদর্শন' সাময়িক পত্রে বুদ্ধ প্রসঙ্গে অনেকগুলো প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছিল।

বাংলায় বৌদ্ধ সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনে ব্রাহ্মসমাজ নেতৃত্বের একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। কথিত আছে রাজা রামমোহন রায় কোন এক সময় তিব্বতে গিয়ে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে অবহিত হন। ১৮৫৯ সালে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর ও পুত্রবৎ কেশবচন্দ্র সেনকে সঙ্গে নিয়ে সিংহল বা শ্রীলঙ্কা ভ্রমণ করেন। তবে বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে রাজা রামমোহন রায় ও দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-এর কোন বক্তব্য বা মন্তব্য জানা যায়নি। কেশব চন্দ্র সেন (১৮৩৮-৮৪) ১৮৮০ সালে 'নববিধান' আন্দোলন শুরু করেন। সর্বধর্ম সমন্বয়ের মধ্য দিয়ে বিশ্বমানবের ঐক্য প্রতিষ্ঠা ছিল নববিধানের মূল আদর্শ। কেশব সেনের নির্দেশে সাধু অঘোরনাথ বৌদ্ধধর্ম অনুশীলন করে 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' গ্রন্থটি রচনা করেন। কেশবচন্দ্রের কনিষ্ঠ সহোদর কৃষ্ণবিহারী সেন 'সাধনা' পত্রিকায় ১৮৯১-১৮৯২ সালে বুদ্ধের জীবন ও বাণী সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন এবং ১৮৯২ সালে 'অশোকচরিত' প্রকাশ করেন। অন্যদিকে দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের দুই পুত্র দ্বিজেন্দ্রনাথ ও সত্যেন্দ্রনাথ বৌদ্ধধর্মের উপর লেখনী ধারণ করেছেন। দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের নিবন্ধ "আর্য্যধর্ম এবং বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত" এবং সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের মননশীল গ্রন্থ "বৌদ্ধধর্ম" যথাক্রমে ১৮৯৯ ও ১৯০১ সালে প্রকাশিত হয়।[১৯]

সেই যুগের আর একজন প্রখ্যাত বৌদ্ধ শাস্ত্রবিদ ছিলেন তিব্বত অভিযাত্রী শরৎচন্দ্র দাশ (১৮৪৯-১৯১৭)। তিনি তিব্বতী ভাষায় অনূদিত এবং লিখিত বহু মহাযানী পুঁথি সংগ্রহ করেছিলেন। সেগুলোর ভিত্তিতে তিনি তিব্বত, চীন, মধ্য এশিয়া এবং মঙ্গোলিয়ায় বৌদ্ধধর্ম প্রসারের ইতিহাস বিবৃত করে গেছেন। সে সম্পর্কে ১৮৮১-১৯০৫ সালের মধ্যে জার্নাল অব এশিয়াটিক সোসাইটিতে তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তাঁর রচিত পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল "Journey to Lhasa and Central Tibet", "India Pandits in the Land of Snow" এবং "বোধিসত্ত্বাদান কল্পলতা"। ১৮৯২ সালে তিনি Buddhist Text Society স্থাপন করেন এবং তার জার্নাল-এর সম্পাদনার দায়িত্ব গ্রহণ করেন।

বাংলার সৃজনশীল সাহিত্যেও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রতিফলন ঘটেছিল। প্রখ্যাত নাট্যকার গিরীশচন্দ্র ঘোষ (১৮৪৪-১৯১২) রচনা করেছিলেন 'বুদ্ধদেবচরিত' এবং 'অশোক' নাটক। কবি নবীনচন্দ্র সেন প্রকাশ করেন 'অমিতাভ' কাব্যগ্রন্থ। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র দত্ত (১৮৪৮-

১৯০০) তাঁর Civilisation of India গ্রন্থে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে বিশদ আলোচনা করেছেন।

বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার অন্যতম বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব ছিলেন হরপ্রসাদ শাস্ত্রী (১৮৫৩-১৯৩১)। ১৮৮৫ সাল থেকেই তিনি এশিয়াটিক সোসাইটিতে রাজেন্দ্রলাল মিত্রের সহকারী হিসাবে কর্মরত থেকে সংস্কৃত ভাষায় রচিত বৌদ্ধপুঁথির অধ্যয়ন ও সম্পাদনা করেন। Catalogue of Sanskrit Manuscripts এর ১ম খণ্ড বৌদ্ধবিষয় সংক্রান্ত। তাঁর রচিত পুস্তকের মধ্যে রয়েছে 'বৌদ্ধধর্ম', ' সৌন্দরানন্দ কাব্য', 'কাঞ্চনমালা', "Discovery of Living Buddhism in Bengal" ইত্যাদি। তাছাড়া বুদ্ধবিষয়ক বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে বিভিন্ন পত্র পত্রিকায়। তাঁর গবেষণার ফলশ্রুতিস্বরূপ নেপাল রাজদরবারের পুঁথিশালা থেকে আবিষ্কৃত হয় "চর্য্যাচর্য-বিনিশ্চয়" বা বৌদ্ধগান ও দোঁহা যা ১৯১৬ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ থেকে প্রকাশিত হয়। পণ্ডিতদের মতে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের জনক এই দোঁহাগুলো ৮ম-১০ম শতাব্দীর মধ্যে রচিত। হরপ্রসাদের সৎ চেষ্টায় বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম চর্চার একটা স্রোত বয়ে এসেছিল। ডঃ মহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) চর্য্যাপদ নিয়ে ইংরেজী, ফরাসী ও বাংলাভাষায় একাধিক পুস্তক রচনা করেছেন। ঐ সময়কার অন্যান্য বৌদ্ধ বিষয়ক লেখকদের মধ্যে নাম করা যায় কৃষ্ণ কুমার মিত্র (১৮৫১-১৯৩৫), মহেশ চন্দ্র ঘোষ (১৮৬৮-১৯৩০), বিনয়েন্দ্র নাথ সেন (১৮৬৮-১৯১৩) প্রমুখ ব্যক্তিগণ।

বাংলার বৌদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে স্বামী বিবেকানন্দের (১৮৬৩-১৯০২) ঐকান্তিক অনুরাগ পরিলক্ষিত হয়। পত্রাবলী, কর্মযোগ প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধ প্রসঙ্গে তিনি যে মতামত ব্যক্ত করেছেন তাতে উপলব্ধি হয় বুদ্ধের সীমাহীন মহত্ত্ব, অপার করুণা ও অতুলনীয় সহানুভূতি তাঁকে বুদ্ধের প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট করেছিল। নিশীথরঞ্জন রায়ের মতে, 'বুদ্ধের ব্যক্তিসত্ত্বার প্রতি একনিষ্ঠ অবিমিশ্র শ্রদ্ধা, অপরদিকে বুদ্ধ প্রচারিত ধর্ম, দর্শন, শিক্ষা এবং প্রভাব নিয়ে যতো বিস্তৃত এবং সমৃদ্ধ আলোচনা স্বামীজী করেছেন, সমকালীন যুগে "রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কেউ করেননি।"

বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে কয়েকটি ত্রিপিটক গ্রন্থ বাংলায় অনূদিত হয়। তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চারুচন্দ্র বসুর 'ধর্মপদ' (১৯০৪), ঈশান চন্দ্র ঘোষের (১৮৬০-১৯৩৫) ৬ খণ্ড 'জাতক' এবং বিধু শেখর শাস্ত্রীর "ভিক্ষু ও ভিক্ষুনী পাতিমোক্ষ"।[১৯]

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর (১৮৬১-১৯৪১) প্রবন্ধে, নাটকে, কবিতায়, গানে, বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চায় ব্যাপক অবদান রেখে গেছেন। বিশ্বভারতী কর্তৃক প্রকাশিত 'রবীন্দ্রনাথ, বুদ্ধদেব ও বৌদ্ধসংস্কৃতি' গ্রন্থে রবীন্দ্রনাথের বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কীয় আলোচনাসমূহ উল্লিখিত হয়েছে। সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার গবেষণা গ্রন্থ "রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি" এবং আশা দাসের "বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি" এ বিষয়ে যথেষ্ট আলোকপাত করেছে।

রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে মহামানব রূপে অভিহিত করে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেছেন। প্রবোধ চন্দ্র সেনের ভাষায় "অহিংসা, করুণা, ত্যাগ, বিশ্বমৈত্রী, ঐক্য, সংহতি এবং সর্বমানবের সমতা প্রধানতঃ এই কটি নীতিই বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও রবীন্দ্রসংস্কৃতির মধ্যে যোগসূত্ররূপে কাজ করেছে।"[২০]

১৯০৪ সালে চারুচন্দ্র বসু কর্তৃক 'ধর্মপদ' প্রথম বাংলা তথা ভারতীয় ভাষায় অনূদিত হলে রবীন্দ্রনাথ 'বঙ্গদর্শন' পত্রিকায় 'ধর্ম্মপদং' নামে একটি মননশীল প্রবন্ধ লেখেন। তাতে রবীন্দ্রনাথের ভারতীয় দর্শন ও ইতিহাস চিন্তার রূপরেখা পাওয়া যায়। রবীন্দ্রনাথ অনুভব করেছিলেন প্রাচীন ভারতের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাসের বহু উপাদান বৌদ্ধ সাহিত্যে আবদ্ধ আছে এবং তার পরিচয়ের অভাবে আমাদের ইতিহাসজ্ঞান অসমাপ্ত রয়েছে। সেই অভাব কিছুটা পূরণের জন্য তিনি বিশ্বভারতীতে বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চার কেন্দ্র স্থাপন করেন। ১৯০৬ সালে রবীন্দ্রনাথের প্রেরণায় সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয় পালিভাষা ও বৌদ্ধশাস্ত্র আয়ত্ত্ব করে অধ্যাপনায় ব্রতী হন। কালক্রমে দেশ-বিদেশের বৌদ্ধশাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতগণের আগমনে বিশ্বভারতী ভারতে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার একটি প্রধান কেন্দ্রে পরিণত হয়। তাঁদের মধ্যে অন্যতম হলেন এম. উইন্টারনিজ, কে. আরাই, গুডরিক, ট্রেভর লিঙ, তান য়ুয়ান শান, নিতাই বিনোদ গোস্বামী, প্রবোধ চন্দ্র বাগচী, প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ।[২১]

বাংলায় বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার প্রসারে পুরোধা ব্যক্তিত্ব ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় (১৮৬৪-১৯২৪)। তিনি পালি ভাষা ও বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুরাগী ছিলেন। বিংশ শতাব্দীর প্রথম দশকের মধ্যে তিনি বিশ্ববিদ্যালয় স্তরে পালিশিক্ষা প্রবর্তন করেন। তদানীন্তন পালি অধ্যাপকদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন বেণীমাধব বড়ুয়া, সমন পুন্নানন্দ সামী, নলিনাক্ষ দত্ত প্রমুখ পণ্ডিতবর্গ। বাংলা তথা ভারতে পালি ও বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বিংশ শতকে বিশেষ ভূমিকা নির্বাহ করেছে।

স্যার আশুতোষের প্রতিভা অন্বেষণের ফলস্বরূপ উদয় হলেন ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া (১৮৮৮-১৯৪৮)। ভারতীয় দর্শন বিষয়ে মৌলিক গবেষনার জন্য তিনি লণ্ডন ইউনিভার্সিটি থেকে এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রথম ডি. লিট. উপাধি প্রাপ্ত হন। পালি ভাষার অধ্যাপকরূপে নিযুক্ত হয়ে তিনি পালি, সংস্কৃত, দর্শন, প্রত্নতত্ত্ব ও প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে গবেষণায় লিপ্ত হন। তাঁর রচিত গ্রন্থগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy', 'A prolegomena to a History of Buddhist Philosophy' এবং 'Asoka and His Inscriptions'। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন বিষয়ে পাঁচটি বক্তৃতামালার সংকলন "Ceylon Lectures" নামে প্রকাশিত হয়। বাংলা ভাষায়, "বৌদ্ধকোষ গ্রন্থ" ও "মধ্যমনিকায়"-এর বঙ্গানুবাদ নামক দুখানি গ্রন্থ রচনা করেন। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত বহু মননশীল প্রবন্ধ।

বাংলায় নবজাগরণের যুগে কয়েকজন বাঙালী বৌদ্ধ লেখকের অবদান উল্লেখনীয়। আবদুল করিম সাহিত্য বিশারদের মতে "মঘা খমুজা" (১২৫৬ ব/১৮৫০ ইং) বাংলা ভাষায় রচিত প্রথম বৌদ্ধগ্রন্থ। অজ্ঞাত পরিচয় লেখকের দ্বারা রচিত গ্রন্থটি মঘী কিংবা ব্রহ্মদেশীয় ভাষা থেকে বাংলায় অনূদিত বৌদ্ধশাস্ত্র কাব্যগ্রন্থ। লোকসমাজকে পুণ্যকাজে উৎসাহিত করাই ইহার উদ্দেশ্য। অনুরূপভাবে চাকমাপ্রধান কালিন্দী রানী সতেরোটি পালি সূত্র চাকমা অক্ষরে 'আগরতারা' নাম দিয়ে প্রকাশ করলেন ১২৭৬ বা / ১৮৭০ সালে। অতঃপর তাঁরই উদ্যোগে বাংলাভাষায় রচিত হল বুদ্ধচরিত গ্রন্থ 'থাধুয়াং পুঁথি' বা "বৌদ্ধরঞ্জিকা" ১৮৭৩ সালে। ইহা কবি ফুলচন্দ্র বড়ুয়া ও নীলকমল দাস কৃত পালি ধাতুবংসের সরল পদ্যানুবাদ। ফুলচন্দ্রের অপর একটি গ্রন্থের নাম "পাদিমুখ"। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ লেখকগণ হলেন পণ্ডিত ধর্মরাজ বড়ুয়া (১৮৬০-১৮৯৪), পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া (১৮৬৬-১৮৯৬), ডাঃ রামচন্দ্র বড়ুয়া (১৮৪৭-১৯২২) এবং কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮৭০-১৯০৮)। তাঁরা প্রত্যেকেই একাধিক গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। জনপ্রিয় গ্রন্থদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ধর্মরাজের 'হস্তসার', নবরাজের 'উবুকশীল', রামচন্দ্রের 'অভিধর্মার্থ সংগ্রহ' এবং সর্বানন্দের 'শ্রী শ্রী বুদ্ধচরিতামৃত'। বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে, "ধর্মরাজ প্রণীত গ্রন্থগুলি পালি সুত্তপিটকের ধারায় বিরচিত হয়। 'মঘা খমুজা'র ধারা পালি অপাদান সাহিত্যের। বংসজাতীয় ধারায় ফুলচন্দ্রের 'বৌদ্ধরঞ্জিকা' এবং বিনয়পিটকের ধারায় 'পাদিমুখ' গ্রন্থের উৎপত্তি। অভিধর্ম পিটকের ধারায় এদেশে গ্রন্থ প্রণয়নের পক্ষে রামচন্দ্র ডাক্তারই পথপ্রদর্শক"।[২২]

এ প্রসঙ্গে কয়েকজন বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুর অবদানও উল্লেখনীয়। অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির (১৮৭২-১৯৩৯) ছিলেন চট্টগ্রাম বৌদ্ধবিহারের অধ্যক্ষ। ১৯০৩ সালে তিনি চট্টগ্রাম কলেজিয়েট স্কুলের প্রথম পালিশিক্ষক এবং ১৯০৮ সালে চট্টগ্রাম সরকারী কলেজে প্রথম অবৈতনিক পালি লেকচারার নিযুক্ত হন। গৃহী বৌদ্ধদের ধর্মশিক্ষা দেওয়ার জন্য অগ্রসার মহাস্থবির রচনা করেছিলেন 'গাথা সংগ্রহ', 'পালি সংগ্রহ' ও 'পূজাবলী' নামক তিনটি গ্রন্থ।

অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির (১৮৭৯-১৯৭১) ছিলেন একাধারে শাস্ত্রবিশারদ, দক্ষ সংগঠক, সমাজ সংস্কারক এবং সদ্ধর্মের প্রচারক। ১৯২৮ সালে তিনি রেঙ্গুনে বৌদ্ধ মিশন ও বৌদ্ধ মিশন প্রেস স্থাপন করেন এবং 'সংঘশক্তি' সাময়িক পত্র প্রকাশ করেন। তাঁর রচিত পুস্তকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল ভিক্ষু কর্তব্য, গৃহী কর্তব্য, পালি প্রথম শিক্ষা, ধর্ম সংহিতা, চার আর্য্যসত্য, আর্য্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ, ধর্মপদং, সতিপট্ঠান, পটিচ্চ সমুপ্পাদ ইত্যাদি। রেঙ্গুনে অনুষ্ঠিত ৬ষ্ঠ সংগীতিতে (১৯৫৪-৫৬) তাঁর অবদান এবং পালি ও বৌদ্ধ সাহিত্যে পাণ্ডিত্যের জন্য ব্রহ্ম সরকার তাঁকে 'অগ্রমহাপণ্ডিত' উপাধি প্রদান করেন।[২৩]

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডারগ্রাজুয়েট পালি বিভাগের প্রথম অধ্যাপক এবং পোষ্ট গ্রাজুয়েট বিভাগের লেকচারার সমন পুন্নানন্দ সামীর (১৮৭৮-১৯২৮) কথা আগেই উল্লিখিত হয়েছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ও সংস্কৃত পরীক্ষা বোর্ডের বিভিন্ন স্তরে পালিশিক্ষার জন্য পাঠ্যসূচী রচনায় তাঁর বিশেষ অবদান ছিল।[২৪]

বাংলায় বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে অন্যতম বিশিষ্ট ভিক্ষু ব্যক্তিত্ব হলেন পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির (১৯০১-২০০০)। তিনি ছিলেন ধর্মাঙ্কুর বৌদ্ধবিহার এবং নালন্দা বিদ্যাভবন-এর (পালি টোল) অধ্যক্ষ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের আংশিক সময়ের অধ্যাপক, সংগীতিকারক, ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষুমহাসভার প্রথম সংঘরাজ এবং নালন্দা সাময়িক পত্রের প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক। তাঁর অনবদ্য অনুবাদ গ্রন্থগুলি হল ধর্মপদ, মধ্যমনিকায় (২য় খণ্ড), বৌদ্ধ দর্শন, মিলিন্দ প্রশ্ন ও শাসনবংস। অন্যান্য তথ্যসমৃদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে আছে সদ্ধর্মের পুনরুত্থান, অধিমাস বিনিশ্চয় এবং বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন। তাছাড়া রয়েছে বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় লিখিত বহু মননশীল প্রবন্ধ। পাণ্ডিত্যের জন্য তিনি রাষ্ট্রপতি কর্ত্তৃক "সার্টিফিকেট অব অনার" (১৯৯১) প্রাপ্ত হন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি কর্ত্তৃক বি. সি. লাহা স্বর্ণপদক (১৯৯৮) লাভ করেন। স্বাধীনতাত্তোর ভারতে বাংলাভাষায় বৌদ্ধসাহিত্য চর্চার মাধ্যমে তিনি বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ তথা বৃহত্তর সুধীসমাজকে আলোকিত করে গেছেন।[২৫]

বৌদ্ধ সাহিত্য চর্চায় কয়েকটি সাময়িক পত্রের অবদান অনস্বীকার্য। চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী কর্ত্তৃক স্থাপিত 'বিশ্ববন্ধু' (১৮৯২), বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা প্রতিষ্ঠিত 'জগজ্জ্যোতি' (১৯০৮), মহাবোধি সোসাইটির 'দি মহাবোধি' (১৮৯২), শরৎচন্দ্র দাশের 'জার্নাল অব দি বুদ্ধিষ্ট টেক্সট সোসাইটি' (১৮৯২), বেণীমাধব বড়ুয়া পরিচালিত "বুড্ডিষ্ট ইণ্ডিয়া", প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির স্থাপিত বুড্ডিষ্ট মিশনের মুখপত্র "সঙ্ঘশক্তি" এবং নালন্দা বিদ্যাভবনের মুখপত্র "নালন্দা" (১৯৬৬) প্রভৃতি সাময়িক পত্র বিভিন্ন সময়ে বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার মাধ্যমরূপে কাজ করেছে। সাময়িকপত্রের মধ্যে মহাবোধি ও জগজ্জ্যোতি আজো অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

সমাজ বিবর্তন

বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজ বিহারকেন্দ্রিক এবং ভিক্ষুনির্ভর। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে চট্টগ্রামের বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে যে নবজাগরণের সূত্রপাত হয় তার ফলে শুধু ভিক্ষু সমাজের কল্যাণ সাধন হয়নি, বৌদ্ধ গৃহীদেরও প্রভূত উন্নতি হয়েছে। তাদের মঙ্গলার্থে পণ্ডিত ভিক্ষুগণ পুস্তক রচনা করেছেন, বিহার স্থাপন করেছেন, যথার্থ ধর্মালোচনা করে সমাজকে কুসংস্কারমুক্ত করার প্রয়াসী হয়েছেন এবং দান-শীল-ভাবনাযুক্ত সরল বৌদ্ধধর্ম চর্চায় জনগণকে উদ্বুদ্ধ করেছেন।

অর্থনৈতিকভাবে বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে উচ্চবিত্তের সংখ্যা ছিল নগণ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা রাজা, বোমং রাজা ও মান রাজা ব্যতীত বাঙালী বৌদ্ধদের মধ্যে দু-চার জন দ্বিতীয় শ্রেণীর জমিদার ছিলেন। অধিকাংশ লোক ছিল মধ্যবিত্ত ও নিম্নবিত্ত শ্রেণীর। মধ্যবিত্তদের মধ্যে ছিল তালুকদার, চৌধুরী, মুৎসুদ্দী প্রমুখ ছোট জোতদার, কিছু সংখ্যক ব্যবসায়ী, উকিল, ডাক্তার, সরকারী কর্মচারী, শিক্ষক প্রভৃতি বিভিন্ন পেশায় নিযুক্ত ব্যক্তি। নিম্নবিত্ত বৌদ্ধরা কৃষিকার্যে নিযুক্ত ছিল। তার জন্য একসময় তাদের ভুঁইয়া মঘ বলা হত। একটি বড় অংশের পেশা ছিল হোটেল, রেস্তোঁরা, ক্লাব, ইউরোপীয়ান সাহেবদের বাড়ীতে বাবুর্চিগিরি। 'মঘ কুক' নামে তাদের খ্যাতি ছিল। সেই উদ্দেশ্যে কলকাতা এবং ভারতের বিভিন্ন শহরে তারা ছড়িয়ে পড়ে। স্বাধীনতা বা দেশবিভাগের পূর্বে তারা চট্টগ্রামের বাইরে চাকুরী করত কিন্তু অবসরান্তে স্বগ্রামে ফিরে যেতো। ১৯৪৭-এর পর তারা পশ্চিমবঙ্গে, ত্রিপুরায়, আসামে, দিল্লীতে এবং অন্যত্র স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করে। বর্তমানে 'মঘকুক'দের বংশধররা শিক্ষিত হয়ে চাকুরীজীবিরূপে দিন-যাপন করছে। তাদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অন্যান্য মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী। মূলতঃ দারিদ্র্যের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে বাঙালী বৌদ্ধরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে।[২৬]

দার্জিলিং জেলায় বেশ কিছু নেপালী বৌদ্ধ আছে। তাদের অধিকাংশ লামাপন্থী এবং মহাযানী মতে বিশ্বাসী ; অল্পসংখ্যক থেরবাদের অনুসারী। বাংলায় বৌদ্ধধর্মের নবজাগরণে তাদের বিশেষ কোন ভূমিকা ছিলনা।

পার্বত্য চট্টগ্রাম মুসলমান প্রধান জেলা না-হওয়া সত্ত্বেও ১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের সময় মূলতঃ ভৌগোলিক কারণে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৯৭১ সালে তা স্বাধীন বাংলাদেশের আওতায় আসে। শাসকগোষ্ঠীর দ্বারা রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উৎপীড়ন হলে তাদের সঙ্গে চাকমাদের শান্তিবাহিনীর সংঘর্ষ বাধে। অবশেষে ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির সঙ্গে পার্বত্য চট্টগ্রাম শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। উপজাতি অধ্যুষিত অঞ্চল হিসাবে স্বায়ত্বশাসিত জেলার স্বীকৃতির মাধ্যমে সমস্যার সমাধান করা হয়। বাঙ্গলাদেশের চাকমা ও বড়ুয়া বৌদ্ধরা নবজাগরণের ধারা অব্যাহত রেখে এগিয়ে চলেছে। ভারতে চাকমা জনগোষ্ঠী মূলতঃ ত্রিপুরা, মিজোরাম ও অরুণাচল প্রদেশে অবস্থান করছে। পশ্চিমবঙ্গে তাদের সংখ্যা বেশী নয়। রাজারহাট অঞ্চলে চাকমাদের একটি উৎকৃষ্টমানের উচ্চমাধ্যমিক স্কুল আছে। আগেই উক্ত হয়েছে চাকমারা বাংলাভাষা এবং থেরবাদ বৌদ্ধমতের অনুসারী।

বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে প্রায় বিশ হাজার বাঙালী বৌদ্ধ বৃহত্তর কলকাতায় এবং অন্যান্য জেলায় ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। বৌদ্ধপল্লীতে বিহার বা বুদ্ধমন্দির স্থাপিত হয়েছে এবং বিহারে থেরবাদী সন্ন্যাসী ভিক্ষু অবস্থান করেন। তাঁরা বৌদ্ধদের ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠান

পরিচালনা করেন। নবজাগরিত বাঙালী বৌদ্ধদের ধর্ম ও সংস্কৃতির রূপরেখা সুকোমল চৌধুরী তাঁর Contemporary Buddhism in Bangladesh গ্রন্থে বিবৃত করেছেন।

স্বাধীনতাত্তোর ভারতে অনেক বৌদ্ধ যুবক যুবতী হিন্দু যুবক-যুবতীর সঙ্গে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হয়েছে। পরিবেশের প্রভাবে অনেক বৌদ্ধরা দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, কালীপূজা এবং সরস্বতীপূজায় অংশগ্রহণ করছে। অন্যদিকে অনেক হিন্দু বুদ্ধকে বিষ্ণুর অন্যতম অবতাররূপে ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করে। বৌদ্ধদর্শনের মূলতত্ত্বে বিশ্বাসী না হয়েও বুদ্ধের অহিংসা, মৈত্রী, করুণা ও সাম্যের আদর্শে আকৃষ্ট হয়ে তারা মহামানব বুদ্ধকে বন্দনা জানায়। বস্তুতঃপক্ষে মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়ার অধিকাংশ সদস্য অবৌদ্ধ। এই পরিস্থিতিতে পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতের বাঙালী বৌদ্ধরা এক উদার পরিবেশের মধ্যে লালিত পালিত হচ্ছে। কিন্তু স্বীকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায় হিসাবে বৌদ্ধরা তাদের সাংবিধানিক অধিকার ও কর্তব্য সম্বন্ধে সচেতন। নিশীথরঞ্জন রায়ের মতে, সাম্প্রদায়িক পরিচয়ে বুদ্ধের ধর্মে শরণাগতের সংখ্যা আজকের ভারতবর্ষে যাই হোক না কেন বুদ্ধের অনুগত এবং বুদ্ধভাবনা সম্পর্কে আন্তরিক আগ্রহী নরনারীর সংখ্যা তার তুলনায় অনেক বেশী।

REFERENCES

১. Watters, Thomas, On Yuan Chwang's Travels in India. 2 Vols., London, 1904-05.

২. নীহার রঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস', পৃঃ ৩১২ - ৩১৬

৩. ঐ ঐ পৃঃ ৩২৭ - ৩৪০

৪. ঐ ঐ পৃঃ ২৫৯ - ২৬৮

৫. ঐ ঐ পৃঃ ৩৪২ - ৩৫৩

৬. Sinha, N. K. & Roy, N. R. A History of India, P. 162.

৭. নীহার রঞ্জন রায়, 'বাঙালীর ইতিহাস', পৃ. ৩৫২ - ৩৫৩।

৮. আবদুল হক চৌধুরী, 'চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা', বাংলা একাডেমি, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ৩৬৫-৩৬৬।

৯. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ৫২ বর্ষ, ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা।

১০. হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, 'বিষয় : বৌদ্ধধর্ম', ২০০২ সংস্করণ, পৃ. ১৩২।

১১. আবদুল হক চৌধুরী, উক্ত পুস্তক, পৃ. ১১৬-১১৭।

১২. Risley, H. H. The Tribes and Castes of Bengal, Ethnographic Glossary, Bengal Secretariat Press, Reprint 1981, Vol. II, P. 29.

১৩. সতীষ চন্দ্র ঘোষ, "চাকমা জাতি", ১৯১৬।

১৪. ধর্মাধার মহাস্থবির, 'বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন', ১৯৭৪, পৃ. ১৫-২৯।

১৫. Hundred Years of the Bauddha Dharmankur Sabha, 1992, P. 2-4.

১৬. Ibid. Barua, S. B. Two Massive Pillars of the Century : Anagarika Dharmapala and Kripasaran Mahasthavir, P. 34-36.
১৭. Ibid. Pathak, S. K. A Century of Buddhist studies in India (1991 - 1990), P. 44 - 54.
১৮. Ibid, বারিদ বরন ঘোষ, 'বাংলা ভাষায় বুদ্ধচর্চা', পৃ. ৯৫-৯৭।
১৯. সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধসংস্কৃতি', পৃ. ১৪-২৩।
২০. প্রবোধ চন্দ্র সেন, 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৬৬।
২১. Hundred Years of Bauddha Dharmankur Sabha, Pathak, S. K. A Century of Buddhist Studies in India, P. 48.
২২. Ibid, বেণী মাধব বড়ুয়া, 'বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার ৫২তম বর্ষের ৩য় ও ৪র্থ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।
২৩. ধর্মাধার মহাস্থবির, 'বুদ্ধের ধর্ম দর্শন', পৃ. ৪৬-৫১।
২৪. জিনবোধি ভিক্ষু, 'জ্ঞানতাপস সমণ পুন্নানন্দ সামী', ১৯৯৫।
২৫. নালন্দা, ধর্মাধার মহাস্থবির জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা, ১৪৩৮ বঙ্গাব্দ।
২৬. সাধন কমল চৌধুরী, 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও বাঙ্গালী বৌদ্ধদের ক্রমবিবর্তন', ২০০২।
২৭. Hundred Years of Bauddha Dharmankur Sabha, Ray, Nishith Ranjan, "স্বামী বিবেকানন্দের বুদ্ধভাবনা"।

বাঙ্গালী বৌদ্ধদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস

রাষ্ট্রপাল মহাথের*

ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় যে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম বুদ্ধের জীবদ্দশায় প্রচারিত হয়েছিল এবং বুদ্ধ নিজেও বঙ্গে ভ্রমণ করেছিলেন। ত্রিপিটকের অন্যতম গ্রন্থ অঙ্গুত্তর নিকায়ে বর্ণিত হয়েছে যে "বঙ্গান্ত পুত্র" নামে এক যুবক বুদ্ধের কাছে এসে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেছিলেন। এ বঙ্গান্ত পুত্র যে বঙ্গ বা বাংলাদেশ থেকে বুদ্ধের কাছে এসেছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। অঙ্গুত্তর নিকায়, থেরগাথা এবং অপদানে বঙ্গীশ নামে আরো এক বাঙ্গালী ভিক্ষুর পরিচয় পেয়ে থাকি। বঙ্গীশ ছিলেন একজন স্বনামধন্য কবি। তিনি নিজে কবিতা রচনা করে বুদ্ধকেও শুনিয়েছিলেন। তিনি বাঙ্গালী সন্তান বলে গর্ব করে পরিচয় দিতে রচনা করেছিলেন,

"বঙ্গে জাতো'তি বঙ্গীয়ো বচনে ইস্সারোতি।
বঙ্গীসো ইতি মে নামং অবত্তো লোক সম্মাতো।"

অর্থাৎ বঙ্গে জন্ম গ্রহণ করেছেন বলে তিনি বঙ্গীয় নাম গ্রহণ করেছেন। তাঁর খ্যাতি সর্বত্র বিদিত। তিনি একজন প্রখ্যাত কথা শিল্পী এবং উচ্চ শিক্ষিত।

তিনি রাজগৃহ থেকে বিদ্যাশিক্ষা করেছেন। তথায় তিনি বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র স্থবিরের সাক্ষাত পান। তাঁর কাছ থেকে তিনি বুদ্ধের সম্পর্কে জানতে পেরে বুদ্ধের সান্নিধ্যে গিয়ে ভিক্ষুত্ব গ্রহণ করেন।

ভেলপত্ত জাতক এবং ধর্মপদ অর্থকথায় উল্লিখিত হয়েছে বুদ্ধের জীবদ্দশায় তিনি সুম্‌হ রাজ্যের সেতক নগরে গিয়েছিলেন। এ সুম্‌হ রাজ্য ছিল বৃহৎ বঙ্গের অন্তর্ভুক্ত। এ ভ্রমণের কথা ১৯৪৭ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বতী লেখক সুম্পা লিখিত পাগ-সাম-জোন-জ্যাং গ্রন্থেও বর্ণনা পাওয়া যায়, যা ধর্মপদ অর্থকথার বর্ণনার সাথে একেবারে মিলে যায়। বর্ণনাটি নিম্নরূপ:

অনাথপিণ্ডিক শ্রেষ্ঠীর এক মেয়ের বিয়ে হয়েছিল পুণ্ড্রবর্ধনের এক -ধনাঢ্য পরিবারের ছেলের সাথে। মেয়েটির নাম ছিল চুলসুভদ্রা। পুণ্ড্রবর্ধন হচ্ছে বর্ত্তমান বাংলাদেশের বগুড়া রংপুর ও দিনাজপুর অঞ্চল। যদিও শ্রেষ্ঠী কন্যার শ্বশুরালয়ের সকলে অবৌদ্ধ, চুলসুভদ্রা তাঁদেরকে নানাভাবে বুদ্ধের গুণকীর্তন করে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাভাব গড়ে তুলেছিলেন। তিনি শ্বশুরালয় থেকে একটি পুষ্পমাল্য প্রেরণ করে পুণ্ড্রবর্ধনে গিয়ে পরদিনের ভোজন

---

* ভদন্ত ড: রাষ্ট্রপাল মহাথের, ত্রিপিটক বিশারদ, প্রেসিডেন্ট, ইন্টারন্যাশনাল মেডিটেশন সেন্টার, বুদ্ধগয়া, প্রাক্তন সভাপতি, মহাবোধি সোসাইটি অব ইণ্ডিয়া, বহু গ্রন্থ প্রণেতা।

গ্রহণ করতে বুদ্ধকে নিমন্ত্রন করেছিলেন। বুদ্ধ তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে পুণ্ড্রবর্ধন ভ্রমণ করেন। এ প্রসঙ্গে বুদ্ধ যে পালি গাথাটি ভাষণ করেছিলেন তা হল ঃ—

"দূরে সন্তো পকাসেন্তি হিমবন্তো'ব পববতো,
অসন্তে'খ ন দিসসন্তি রত্তি খিতা যথা সরা।"

শীলবান সৎপুরুষ হিমালয় পর্বতের ন্যায় দূর হতে প্রকাশিত হন। কিন্তু অসৎপুরুষ রাত্রে নিক্ষিপ্ত শরের ন্যায় দৃশ্য হয় না।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাং এর বর্ণনাতেও বুদ্ধ বাংলাদেশে এসেছিলেন বলে উল্লেখ করা হয়েছে। তাঁর বর্ণনাতে আছে বুদ্ধ পুণ্ড্রবর্ধন, সমতট (কুমিল্লা) প্রভৃতি স্থানে এসে সাতদিন যাবৎ ধর্মদেশনা করেছিলেন। আসার পথে কর্ণসুবর্ণ (বহরমপুর) হয়ে মগধে ফিরে আসেন। উপরোক্ত কয়েকটি উদাহরণ থেকে স্পষ্টই প্রতীয়মান হয় যে বুদ্ধের জীবৎকালে বঙ্গে বৌদ্ধধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল।

সম্রাট অশোকের শাসনকালেও বাংলায় বৌদ্ধধর্ম বিদ্যামান ছিল এবং সম্রাট বাংলার বিভিন্ন স্থানে যে স্মৃতি স্তম্ভ তৈরী করেছিলেন হিউয়েন সাং সেগুলি দর্শন করেছেন বলে তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে লিপিবদ্ধ করেছিলেন। রামুর রামকোটে এখনও একটি অশোক স্তম্ভের ভগ্নাবশেষ দেখা যায়। সম্রাট অশোক সাঁচীতে তোরণ সহ যে ঐতিহাসিক স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন তাতে অনেকেই মুক্ত হয়ে অর্থ দান করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে পুণ্ড্রবর্ধনের ধর্মদত্তা এবং ঋষিনন্দন নামে দুজন উপাসকের নাম উৎকীর্ণ করা হয়েছে। এভাবে খ্রীষ্টীয় প্রথম থেকে তৃতীয় শতাব্দী পর্যন্ত সময়ে বঙ্গে বৌদ্ধ তথা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের যথেষ্ট কৃতিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়।

চতুর্থ শতকে বাংলায় গুপ্ত রাজত্বের সূচনা হয়। গুপ্তরা বৈষ্ণব ধর্মাবলম্বী হলেও তাঁদের মধ্যে কোন ধর্মীয় গোঁড়ামি ছিল না। এসময় বাংলার বিভিন্ন দেবদেবীর পাশাপাশি বুদ্ধ মূর্তির সংমিশ্রণ উল্লেখ করেছেন আর এক চীনা পরিব্রাজক ইৎ-সিং তাঁর ভ্রমণ কাহিনীতে ।

খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে থানেশ্বরের রাজা হর্ষবর্ধনের সময়ে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের ব্যাপক প্রসার লাভ করেছিল। সে সময় মানুষের মধ্যে মমত্ববোধ, ভ্রাতৃত্ববোধ, একতা বোধের ভাবধারা বেশী পরিমাণে প্রচারিত হয়েছিল। ঠিক একই সময়ে কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ বিদ্বেষী রাজা শশাঙ্কের রাজত্ব শুরু হয়। বৌদ্ধ রাজা হর্ষবর্ধনের সাথে শশাঙ্কের বিরোধ চরমে পৌঁছে। গৌড়রাজ শশাংকের সময়ে দেশব্যাপী যুদ্ধবিগ্রহ ছড়িয়ে পড়ে। তিনি বৌদ্ধ ধর্মকে ধ্বংস করার জন্য উঠে পড়ে লেগেছিলেন। তাঁর রাজত্বকালে বাংলার ৭০টিরও বেশী সংঘারাম এবং এ সমস্ত সংঘারামে ৮০০০ হাজারেরও বেশী ভিক্ষু বাস করতেন বলে হিউয়েন-সাং এর বর্ণনাতে পাওয়া যায়।

সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীতে বাংলায় রাজত্ব করেন পালবংশীয় রাজাগণ। তাঁদের রাজত্বকালে বৌদ্ধ ধর্ম ব্যাপক পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে। মগধে প্রতিষ্ঠিত নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় পাল

রাজাদের বদান্যতায় অতীব সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠে। হিউয়েন সাং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ে আচার্য শীলভদ্রের পদতলে বসে অধ্যয়ন করেছিলেন। আচার্য শীলভদ্র ছিলেন বাংলার কৃতী সন্তান। তিনি ছিলেন একজন অসাধারণ পণ্ডিত এবং নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান আচার্য। তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্বের জন্য কেউ তাঁকে নাম ধরে সম্বোধন না করে "ধর্মনিধি" বলে পরিচয় প্রদান করতেন।

এ সময়ের আরেকজন বাঙ্গালী বৌদ্ধ আচার্য বিশেষ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তিনি ছিলেন আচার্য চন্দ্রগামী। ব্যাকরণ শাস্ত্রে তাঁর প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁর রচিত ব্যাকরণ শাস্ত্রের নাম হল "চান্দ্র ব্যাকরণ।" তিনি ব্যাকরণ শাস্ত্র ছাড়াও অনেক কাব্য গ্রন্থের রচয়িতা। একাধারে তিনি নাট্যকার, কবি, নৈয়ানিক, বৌদ্ধ তন্ত্রের লেখক, জ্যোতিষ, আর্য়ুবেদ ও সংগীত শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করেছিলেন। তিব্বতের তেংগুরের জ্ঞান ভাণ্ডারে তাঁর অনেক গ্রন্থ সংরক্ষিত আছে। আচার্য চন্দ্রগামী বরেন্দ্রের অধিবাসী এবং তিনি যোগাচার মতের অনুসারী ছিলেন।

দশম একাদশ শতাব্দীর আরেক বাঙ্গালী কৃতী সন্তানের নাম আমরা জানতে পারি। এ সময়ের উজ্জ্বলতম নক্ষত্র সদৃশ পণ্ডিত ও দার্শনিকের নাম হচ্ছে, আচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। তিনি ছিলেন বিক্রমশীলা মহাবিহারের প্রধান আচার্য। তিব্বত রাজের আমন্ত্রণে তিনি দুর্গম হিমালয় অতিক্রম করে তিব্বতে পৌঁছে তের বছর ব্যাপী অবস্থান করে বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেন। তাঁর অসাধারণ কর্ম কৃতিত্বের কথা কবির ভাষায় বলা যায়—

বাঙ্গালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙ্গালী দীপঙ্কর।

অতীশ দীপংকর বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ করেন। তিনি ১৭৫টি দার্শনিক গ্রন্থ রচনা করে বৌদ্ধ দর্শনের এক নতুন মানবতাবাদী ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিব্বত ও চীনের বৌদ্ধেরা অতীশকে এখনও দ্বিতীয় বুদ্ধের ন্যায় পূজা করে থাকেন।

অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বঙ্গে যথাক্রমে চন্দ্র ও পাল রাজারা রাজত্ব করার সময় বাংলায় মহাযান বৌদ্ধ ধর্মের সুবর্ণযুগে পরিণত হয়েছিল। তাঁরা বাংলার বগুড়া মহাস্থান গড়ে প্রতিষ্ঠিত করেন বাসু বিহার, রাজশাহীর পাহাড়পুরে প্রতিষ্ঠিত করেন জগদ্দল ও সোমপুর বিহার, দিনাজপুরে সিতাকোট বিহার, কুমিল্লায় কণকস্তূপ ও শালবন বিহার, ঢাকার ধামরাই বিক্রমপুরে বিক্রমপুরী ও ধর্মরাজিক বিহার এবং চট্টগ্রামে পণ্ডিত বিহার। এ সমস্ত বৌদ্ধ বিহারসমূহে বৌদ্ধ শিল্প, সাহিত্য, ধর্ম-দর্শন এবং সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ে জ্ঞান চর্চা হত। এক একটি বিহার এক একটি বিশ্ববিদ্যালয় সদৃশ।

উপরোক্ত বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই বাংলায় অনেক দার্শনিকের উদ্ভব হয়েছে। তাঁরা সিদ্ধাচার্য নামেই সমধিক পরিচিত। তাঁদের রচিত রচনাবলী দোঁহা বা চর্যাপদ নামে খ্যাত। সে-সময়ের উল্লেখযোগ্য সিদ্ধাচার্যেরা হলেন—সরহপাদ, লুইপাদ, তিলোপাদ, নাড়োপাদ,

শবুরপাদ, অদ্বয়পাদ, ভুসুক, কুক্করিপাদ প্রভৃতি। তাঁদের রচিত দোঁহার মধ্যে বৌদ্ধ দার্শনিক চিন্তাধারা পরিস্ফুট হয়েছে। এমনকি দোঁহার ভাষাও ছিল বাংলার আদিরূপ। সে ভাষা থেকেই আধুনিক বাংলাভাষার উৎপত্তি হয়েছে। কাজেই বাংলা ভাষার সৃষ্টিকর্তা হলেন সিদ্ধাচার্য তথা বৌদ্ধ ভিক্ষুরা। এখানে সিদ্ধাচার্যদের রচিত একটি দোঁহা উদাহরণ স্বরূপ উল্লেখ করা গেল।

চী অ থির করি ধ্বহুরে নাহী
অন্য উপায়ে পার না জাই।

অর্থাৎ মনকে বা চিত্তকে স্থির করে নৌকা ধর, অন্য কিছু দ্বারা কেউ পারাপারে যেতে পারে না। অর্থাৎ সাধনাপদ্ধতির প্রক্রিয়ার একাগ্র সাধনায় মনকে নিবিষ্ট কর। সুস্থির মনে নৌকা বাইতে পারলেই ভবসমুদ্র অতিক্রম করা সম্ভব। এ ছাড়া অন্যপথ বা উপায় নাই।

পালযুগকে বঙ্গের শিক্ষা, সংস্কৃতি ও সভ্যতার ক্ষেত্রে সুবর্ণযুগ বলা হয়ে থাকে। ঐতিহাসিক নীহাররঞ্জন রায়ের মতে, বাঙালী জাতির গোড়াপত্তন হয়েছে বৌদ্ধযুগে।

এখন প্রসঙ্গে আসা যাক চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের সম্পর্কে। চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা মগধাগত বলে জনশ্রুতি রয়েছে। দ্বাদশ শতাব্দীতে বক্তিয়ার খিলজী যখন মগধ আক্রমণ করেন তখন নালন্দাদি মহাবিহারসমূহ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়। একদিক থেকে মুসলমানদের আক্রমণ এবং অন্যদিকে গোঁড়া ব্রাহ্মণদের অত্যাচারে মগধের বৌদ্ধেরা মাতৃভূমি পরিত্যাগে বাধ্য হয়। তাঁরা মগধ হতে উত্তর পূর্বাঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন বলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরও সমর্থন করেন। আসামে তাঁরা কিছু সময় অতিবাহিত করার পর তথায় ব্রাহ্মণ্যবাদের প্রতিপত্তি বৃদ্ধি হলে অনেকেই তখন ধর্মান্তরিত হয়ে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে দীক্ষিত হলেও তাঁদের বড়ুয়া উপাধি অক্ষুন্ন রেখেছেন।

অবশিষ্ট বৌদ্ধেরা স্বধর্ম রক্ষার জন্য সমতট বা চট্টগ্রামের দিকে ছুটতে শুরু করেন। সে সময়ে সমতটে বৌদ্ধ রাজবংশ বিদ্যমান ছিল। সমতটে মগধাগত বৌদ্ধেরা খুবই সমাদর লাভ করেছিল। বড়ুয়ারা বজ্জী-জাতির বংশধর বলে মনে করা হয়। মগধের বজ্জীরা ক্ষত্রিয় ছিলেন। তাঁরা উন্নত চরিত্রের মার্জিত স্বভাব এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে বিশ্বাসী ছিলেন। বজ্জী শব্দ থেকে বড়ুয়া শব্দ এসেছে বলে ড: বেণীমাধব বড়ুয়া সহ অনেকেই উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন কবি চণ্ডীদাস তাঁর পদাবলীতে শ্রেষ্ঠার্থে বড়ুয়া শব্দটি ব্যবহার করেছেন, প্রাচীন কালে বড়ুয়া পুত্রবধুরা শ্বশুরকে বড়ুয়া বলে সম্বোধন করত। এখানেও বড়ুয়া শ্রেষ্ঠার্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

মগধ থেকে আগত বলে চট্টগ্রামের বড়ুয়াদের পাশ্ববর্তী অন্যান্য সম্প্রদায়ের লোকেরা মগ বলে অভিহিত করেন। মগধাগত বৌদ্ধরা স্থানীয় বৌদ্ধদের সাথে একাত্ম হয়ে যান। সেজন্য চট্টগ্রামী বৌদ্ধরা মহাযানী, তন্ত্রযানী, সহজযানী ও কালচক্রযানী সংমিশ্রিত ছিল বিগত শতাব্দী পর্যন্ত। চট্টগ্রামী বৌদ্ধেরা যেহেতু অনেকেই মগধ দেশ থেকে এসেছেন, সেহেতু তাঁরা মগ বা মগধের অধিবাসী নামে পরিচিত। মগধের অপভ্রংশ মগ।

মগধের বৌদ্ধেরা মগধেশ্বরীর পূজা করতেন। মগধের স্মৃতি রক্ষার্থে তাঁরা চট্টগ্রামেও সেবাখোলা বানিয়ে মগধেশ্বরী পূজার প্রচলন করেছিলেন। তাঁরা চট্টগ্রামে মঘাশাস্ত্রীয় চিকিৎসা পদ্ধতিরও প্রচলন করেন। চট্টগ্রামে অনেকেই মঘাশাস্ত্রীয় পদ্ধতিতে চিকিৎসা করে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। মগধের শ্রেষ্ঠ চিকিৎসক জীবক এই মঘাশাস্ত্রীয় চিকিৎসার উদ্ভাবক। এ চিকিৎসা চট্টগ্রামে বড়ুয়াদের একান্তই নিজস্ব। এখনও মগধের (বিহারের) কিছু কিছু ব্যবহারিক শব্দের সাথে চট্টগ্রামের ভাষার সাদৃশ্য দেখা যায়।

এ প্রসঙ্গে স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, আরাকানী বৌদ্ধেরা মগ নয়। বাঙ্গালী বৌদ্ধেরাই মগ। আরাকানীরা নিজেদেরকে রাখ্যানইচা বলে এবং তারা বড়ুয়াদের মারমাগ্রী বলে সম্বোধন করেন। মারমাগ্রী শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয় বা শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ। বড়ুয়া ও মারমাগ্রী শব্দদ্বয় একার্থবোধক। বিদেশীরা যেমন এককালে সিন্ধু নদীর এ পাড়ের ভারতীয়দের হিন্দু বলে সম্বোধন করতেন, সেরকম মুসলমানেরাও আরাকানী ও বাঙ্গালী বৌদ্ধ উভয়কে মগ বলে অভিহিত করতেন। তাঁরা বড়ুয়া পাড়াকে "মগপাড়া" এবং চট্টগ্রামের ঠেগরপুনির বুড়া গোসাইয়ের মেলাকে "মগখোলা" বলে থাকেন। কিন্তু আরাকানীরা মগ নয়। তাঁরা রাখাইন। আরাকান রাজারা বহুবছর চট্টগ্রাম অঞ্চল শাসন করেছেন বলে ধর্মীয় একাত্মতার কারণে এ অবস্থার সৃষ্টি হয়েছে।

যেহেতু চট্টগ্রামী বৌদ্ধরা ধর্মের বিভিন্ন শাখা প্রশাখার বেড়াজালে নিমজ্জিত সেহেতু তাঁদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ধর্মানুশীলন বলতে কিছু ছিলনা। ধর্ম-সংস্কৃতি যা ছিল সব জগাখিচুরি, অর্থ-বিত্ত কিংবা চাকরি ক্ষেত্রেও তাঁরা বিশেষ অগ্রসর হতে পারেননি। কারণ তাঁরা মগধ ক্ষত্রিয় বলে আভিজাত্য বশে চাকরি করাকে হীন পেশা মনে করতেন। আরাকানীরা মুসলমানদের হাতে পরাজয়ের পর বড়ুয়ারা আরো দুর্বল হতে থাকে। বড়ুয়াদের ধারণা ছিল চাটাই বুন্‌ব, পুকুর পাড়ে শুইব, তবুও চাকরি করিবনা। এ অভিমান বড়ুয়াদের কোন সুফল বয়ে আনেনি। ধীরে ধীরে ধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতি থেকে তারা পিছিয়ে পড়ল।

বুদ্ধ মূলতঃ তাঁর সদ্ধর্ম প্রচার করেছেন লোভ-দ্বেষ-মোহ উত্তীর্ণ হয়ে দুঃখ মুক্তির লক্ষ্যে। মানুষ সামাজিক আচার-বিচারের বেড়াজালে আবদ্ধ থাকুক ইহা বুদ্ধ কোনদিন চাননি। তথাপি বুদ্ধের আদর্শের অনুসারীরা নিজেদের অজান্তেই একটি সম্প্রদায় রূপে পরিচিত হয়ে গিয়েছে, যাকে আমরা বৌদ্ধ সম্প্রদায় বলে থাকি। কিন্তু বৌদ্ধ ধর্ম কখনো সাম্প্রদায়িক ধর্ম নয়, সাম্প্রদায়িক ধ্যান-ধারণাও বৌদ্ধ ধর্মে নেই। সামাজিক আচার আচরণেও বৌদ্ধদের এমন কোন কর্ম সম্পাদন করা উচিত নয়, যদ্দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ এবং অপসংস্কৃতি বর্ধিত হয়। দান-শীল-ভাবনাদি যুক্ত কুশল কর্ম যে কোন সামাজিক অনুষ্ঠানেই সংযোজিত হতে পারে।

জন্মের পর যে উলুধ্বনি প্রদান করত সে স্থলে সাধুবাদ প্রথা চালু হওয়া বাঞ্ছনীয়।

যেহেতু সন্তান সন্ততির জন্মে আনন্দানুভব হয় এবং এ আনন্দানুষ্ঠানেরই আনন্দ ধ্বনি হল বৌদ্ধ মতে 'সাধুবাদ'।

বৌদ্ধদের মধ্যে কন্যা সন্তানের জন্মকে অভি শাপ বলে বিবেচিত নয়। এবং নারীর স্থান পুরুষের চেয়ে হীনও নয়। সেজন্য পণ প্রথা বৌদ্ধদের মধ্যে কোন কালে ছিল না। বরং নারীকে মর্যাদা দানের প্রথাই বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। যেমন ছেলের পক্ষে যথাযথ সম্মানী দানের মাধ্যমে বধূবরণ করা হত। যাকে বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা "দাবা" বলতেন। রাজকুমার সিদ্ধার্থও উপযুক্ত সম্মানী দিয়ে যশোধরাকে বিয়ে করেছিলেন। এখন অন্য সম্প্রদায়ের কাছ থেকে পণপ্রথারূপ "অপসংস্কৃতি" বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে সংক্রামক ব্যাধির ন্যায় পেয়ে বসেছে। এর উচ্ছেদ অতিকর্তব্য বলে আমি মনে করি। এ প্রথার মাধ্যমে নারীকে অবমাননা করা হয় যা সত্যিকার বৌদ্ধ সংস্কৃতি নয়। পূর্বে বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে বাল্যবিবাহ থাকলেও বর্তমানে ইহা একেবারেই উঠে গেছে। তবে নানা পরিস্থিতির কারণে বাঙ্গালী বৌদ্ধেরা ছেলের বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠানের পরিবর্তে মেয়ের বাড়ীতেই বিবাহের মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন করছেন। ছেলের বাড়িতে বিয়ে হলে ইহাকে "নামন্ত" বিয়ে বলত। এবং মেয়ের বাড়ীতে হলে বলা হত "চলন্ত" বিয়ে। এখন চলন্ত বিয়েই সর্বাধিক প্রচলিত হয়েছে।

বিয়ের সময় নব বধূকে বরের চারিদিকে সাত পাক ঘুরানো বৌদ্ধ প্রথা নয়। বিয়ের সময় ভিক্ষু সংঘ আহ্বান করে সাধ্যমত ভোজন দানাদি দিয়ে পঞ্চশীল গ্রহণ, সূত্র শ্রবণ এবং ধর্মোপদেশ প্রদানের প্রথা বৌদ্ধ দেশ সমূহে প্রচলিত আছে। এ প্রথা বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে পূর্বে ব্যাপক প্রচলিত না থাকলেও বর্তমানে সর্বত্র এ রীতি অনুসৃত হয়ে আসছে। বিবাহ অনুষ্ঠানে ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর বাড়ীতে বুদ্ধ দাম্পত্য জীবনে সুখ ও সমৃদ্ধির জন্য যে উপদেশ দিয়েছিলেন এবং ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী ও তাঁর মেয়ে বিশাখাকে প্রদত্ত উপদেশ নব বরকনের জন্য অতীব উপযোগী। বিবাহ বাসরে এ সমস্ত বিষয় বিস্তারিতভাবে ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে দেওয়া উচিত।

মৃত দেহকে দাহ করার প্রথাই বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত। তবে মৃত শিশুদের মাটিতে পুঁতে ফেলা হয়। মৃতকে ঘিরে শোক প্রকাশ, বিলাপ ইত্যাদি বৌদ্ধোচিত নয়। মৃত ব্যক্তির জন্য ব্রতাদি পালনও বৌদ্ধদের মধ্যে নেই। তবে ইচ্ছুক আত্মীয় স্বজনেরা দান-শীল ভাবনাদি অনুশীলন করে মৃতব্যক্তির পারলৌকিক উর্ধ্বগতির জন্য পুণ্যদান করাই বিধেয়। প্রত্যেক বৌদ্ধ দেশের ন্যায় বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে মৃত্যুর এক সপ্তাহের মধ্যে সংঘদান করার প্রথা প্রচলিত রয়েছে।

বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে খাদ্য সম্পর্কে কোন বাছ বিচার নাই। প্রাণী হত্যা বিরতি যেহেতু বৌদ্ধদের শীলের অঙ্গ, সেহেতু কোন প্রাণী হত্যা না করে বৌদ্ধরা আহার গ্রহণ করে থাকেন।

পূর্বে বাঙ্গালী বয়স্ক মহিলারা আরাকানীদের অনুকরণে লুঙ্গির ন্যায় 'থামি' পরিধান করতেন। এখন অবশ্য থামির প্রচলন নেই বললেই চলে। আধুনিক নারী পুরুষের মত বাঙ্গালী বৌদ্ধেরাও প্রচলিত পোষাক-পরিচ্ছদ পরিধানে অভ্যস্ত। তবে বাঙ্গালী বৌদ্ধদের

নিজস্ব কোন পোষাক পরিচ্ছদ নাই। অবশ্য কোন কোন বিধবা মহিলারা শ্বেত শাড়ী পরিধান করে থাকেন। বৌদ্ধ সংস্কৃতি অনুসারে বিবাহের পরে মহিলাদের কপালে সিন্দুর ব্যবহারের রীতি না থাকলেও হিন্দু সংস্কৃতি অনুসরণ করতে গিয়ে বিবাহিত বাঙ্গালী বৌদ্ধ মহিলারা সিন্দুর ব্যবহার করে থাকেন। ইহা কেবল বাঙ্গালী বৌদ্ধ মহিলাদের ছাড়া অন্য কোন বৌদ্ধ মহিলাদের মধ্যে দৃষ্টিগোচর হয়না। কাজেই বৌদ্ধ সংস্কৃতিতে শ্রদ্ধাবোধ রাখতে বাঙ্গালী বৌদ্ধ মহিলাদের বিবাহোত্তর সিন্দুর ও শাঁখাও বর্জন করা উচিত। বর্তমানে অনেক সচেতন বাঙ্গালী বৌদ্ধ মহিলারা অবশ্য শাঁখা-সিন্দুর পরিধানে অভ্যস্ত নয়।

আমি পূর্বেই উল্লেখ করেছি, বৌদ্ধ ধর্ম কোন অনুষ্ঠানের ধর্ম নয়। ইহা অনুশীলনের ধর্ম। তথাপি পাশাপাশি অন্যান্য ধর্মাবলম্বীদের আচার অনুষ্ঠানসর্বস্ব উৎসবাদির প্রভাবে, বিশেষ করে সর্বসাধারণের ধর্মবোধ সমুন্নত রাখার প্রয়োজনে বাঙ্গালী বৌদ্ধদের মধ্যে কিছু ধর্মীয় অনুষ্ঠানও প্রচলিত হয়েছে। প্রাচীন কাল থেকে যে সকল ধর্মানুষ্ঠান প্রচলিত আছে সেগুলোর মধ্যে কঠিন চীবর দানোৎসব সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে এ অনুষ্ঠান বাঙ্গালী বৌদ্ধদের প্রতিটি গ্রামে মাসব্যাপী জাতীয় উৎসবে পরিণত হয়েছে। ইহা ছাড়াও বৈশাখী পূর্ণিমা, মাঘী পূর্ণিমা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, চৈত্র সংক্রান্তি প্রভৃতি পুণ্য স্মৃতি স্মরণ করে বিভিন্ন উৎসব অনুষ্ঠান হয়ে থাকে।

অন্যান্য অনুষ্ঠানের মধ্যে অন্নপ্রাশন, প্রব্রজ্যা অনুষ্ঠান, গৃহ প্রবেশ, জন্মবার্ষিকী, কর্ণছেদন প্রভৃতি সাড়ম্বরে পালিত হওয়ার প্রচলন হয়ে আসছে।

বঙ্গে বৌদ্ধ সংস্কৃতির পুনঃ উত্থান হতে থাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে। ১৮৬৪ থেকে প্রখ্যাত ধর্মাচার্য সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির চট্টগ্রামে এসে তান্ত্রিক আচারে নিমজ্জিত বৌদ্ধ রাউলী পুরোহিতদের থেরবাদী বিনয় সম্মতভাবে উপসম্পদা বা দীক্ষা প্রদান করেন। তখন থেকে ধর্ম-সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে এক নতুন অধ্যায়ের সূচনা হয়। আচার্য পুর্নাচার ধর্মাধারী চন্দ্রমোহন মহাস্থবির লংকা থেকে পালি ভাষা ও বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে প্রগাঢ় জ্ঞান অর্জন করে দেশে প্রত্যাবর্তনের পর সংঘরাজ সারমেধের প্রেরণায় বঙ্গে থেরবাদী আদর্শ প্রচারে নেতৃত্ব দেন। আচার্য পূর্ণাচার নবগঠিত সংঘরাজ নিকায়ের নেতৃত্ব গ্রহণ করে তাঁর পরবর্তী সংঘরাজ জ্ঞানালঙ্কার ওরফে লালমোহন ঠাকুরকে নিয়ে বঙ্গে কুসংস্কার দূর করে প্রকৃত বৌদ্ধ ভাবধারায় সমাজ গঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখেন। বিভিন্ন স্থানে তাঁরা প্রতিষ্ঠা করেন পালি টোল। সে সময়ে পালি পাঠ্য তালিকায় অর্ন্তভূক্ত হয়। সমাজে জন্মগ্রহণ করেন কয়েকজন প্রতিভাবান লেখক ও কবি। তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন হস্তসার লেখক ধর্মরাজ বড়ুয়া (আবুরখীল) , বৌদ্ধ রঞ্জিকার লেখক কুল লোথক (নোয়াপাড়া), জগজ্যোতি লেখক কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া (আবুরখীল), অভিধর্মার্থ সংগ্রহের অনুবাদক দার্শনিক ডাঃ রামচন্দ্র বড়ুয়া (আবুরখীল), ধর্মের বিবিধ গ্রন্থ প্রণেতা পণ্ডিত নবরাজ বড়ুয়া (বৈদ্যপাড়া) প্রভৃতি।

এসময়ে বাঙ্গালি বৌদ্ধদের গর্বিত সন্তান আচার্য ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ১৯১৭ সালে

এশীয়বাসীদের মধ্যে লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সর্বপ্রথম ডি. লিট. ডিগ্রী লাভ করে বঙ্গীয় বৌদ্ধদের মুখোজ্জ্বল করেন। তিনি দর্শন, সংস্কৃতি, ভারততত্ত্ব, বৌদ্ধধর্ম, অশোক বিষয়ে গবেষণা, প্রত্নতত্ত্ব ও শিলালিপি উদ্‌ঘাটনে অসাধারণ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় দিয়েছেন।

বিংশ শতাব্দীর শুরুতে কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির কোলকাতায় প্রতিষ্ঠা করেন ধর্মাঙ্কুর বিহার এবং কোলকাতায় বৌদ্ধদের প্রথম সংগঠন বেঙ্গল বুড্ডিষ্ট এসোসিয়েশন। তিনি ১৯০৮ সালে জগজ্জ্যোতি পত্রিকা প্রকাশ করে ধর্ম-সংস্কৃতি সাধনার এক উদাহরণ সৃষ্টি করেন। সুখের বিষয় জগজ্জ্যোতি এখনও আপন দীপ্তিতে ভাস্বর, তাঁর আন্তরিক প্রচেষ্টায় স্কুল কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি ভাষা পঠন-পাঠনের সুব্যবস্থা হয়। তাঁরই সহায়তায় সমাজের অনেক যুবক দেশ-বিদেশ থেকে কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্বোচ্চ ডিগ্রী অর্জন করতে সক্ষম হন। তাঁদের মধ্যে ভারততত্ত্ববিদ আচার্য ড: বেণীমাধব বড়ুয়া, সমন পুণানন্দ স্বামী প্রমুখ অন্যতম।

স্কুল কলেজের উচ্চতম ডিগ্রী না থাকলেও ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ধর্ম ও সমাজ উন্নয়নে যে অবদান রাখেন তাতে তিনি অন্ধকারে নিমজ্জিত বঙ্গীয় বৌদ্ধদের অনেকদূর এগিয়ে দিয়েছেন। তিনি রেঙ্গুনে বৌদ্ধ মিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করেন এবং ত্রিপিটকের বিভিন্ন গ্রন্থ বাংলা ভাষায় অনুবাদ ও সংকলন করেন। ইহা ছাড়াও সংঘশক্তি নামে এক উন্নততর সাময়িকী প্রকাশ করে বাংলার ঘরে ঘরে সদ্ধর্মের দীপশিখা প্রজ্জ্বলন করতে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি বার্মা সরকার থেকে গৌরবময় অগ্রমহাপণ্ডিত উপাধিও লাভ করেছিলেন।

পশ্চাদপদ বাঙ্গালী বৌদ্ধ সম্প্রদায়কে গতিশীল ও সমাজ-সংস্কৃতির ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধ করার জন্য চট্টগ্রামে ১৮৮৭ সালে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি (অধুনা বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি) প্রতিষ্ঠা একটি যুগান্তরকারী ঘটনা। এ সমিতির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন দূরদর্শী সমাজ নেতা সাতবাড়িয়ার কৃষ্ণ নাজির চৌধুরী। শ্রদ্ধেয় গুণমেজু মহাস্থবির এ সমিতির প্রথম সভাপতি এবং নাজির কৃষ্ণ চন্দ্র চৌধুরী ছিলেন প্রথম সাধারণ সম্পাদক। বঙ্গীয় বৌদ্ধদের ধর্মীয় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার প্রতিষ্ঠায় ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ দশকে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ায় এ সমিতির অবদানকে অসামান্য বলা চলে। সমকালীন সময়ে নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি অনগ্রসর বাঙ্গালী বৌদ্ধদের গ্রাম-গ্রামান্তরে ধর্মীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে সংগঠিত করে। বিংশ শতাব্দীর প্রথমে ১৯০৫ সালে ভারতে বৃটিশ গভর্ণর জেনারেল লর্ড কার্জন চট্টগ্রাম সফরে আসলে বৌদ্ধ সমিতির নেতৃবৃন্দ একটি শোভাযাত্রার মাধ্যমে বৃহত্তর ক্ষেত্রে প্রায় অপরিচিত বৌদ্ধদের দাবি দাওয়া সম্বলিত লর্ড কার্জন সমীপে এক দীর্ঘ স্মারকলিপি পেশ করেন। এ সময় কৃষ্ণনাজির চৌধুরীকে সর্বাত্মক সহযোগিতা প্রদান করেন নিবেদিত সমাজ কর্মী ডাঃ ভগীরথ বড়ুয়া (হোয়ারাপাড়া)।

ভদন্ত উ. গুণমেজু, কৃষ্ণনাজির, ডঃ ভগীরথের পরে যিনি চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির হাল ধরেছিলেন বার্মা প্রত্যাগত, ত্রিপিটক শাস্ত্রকোবিদ অগ্রমহাপণ্ডিত ভদন্ত ধর্মবংশ মহাস্থবির

মহোদয়। তিনি দীর্ঘ ৩০ বছর চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারে অবস্থানকালীন সময়ে পালি ও ধর্ম শিক্ষা প্রসারে সবিশেষ অবদান রাখেন। বঙ্গে সমাজ ও সংস্কৃতি প্রসারে আরো যাঁরা নানাভাবে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন তাঁদের মধ্যে শ্রদ্ধেয় অগ্রসার মহাস্থবির, গুণালংকার মহাস্থবির, ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, প্রজ্ঞালঙ্কার মহাস্থবির, অভয়তিষ্য মহাস্থবির, আভিধার্মিক বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি, উকিল উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি, উকিল ফনীভূষণ মুৎসুদ্দি, উকিল কিরণ মুৎসুদ্দী, সমাজ কর্মী নগেন্দ্রলাল চৌধুরী, ব্যারিস্টার ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া, বিদর্শনাচার্য রাজেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি, বিদর্শনাচার্য সুমনাচার মহাস্থবির, অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া, পালি শাস্ত্রতে পণ্ডিত জন্মেজয় বড়ুয়া, কবিরাজ তারক নাথ বড়ুয়া (নাগলীলা কাব্য গ্রন্থ প্রণেতা), সাধক প্রবর জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, বিনয়াচার্য আর্যবংশ মহাস্থবির, বৈয়াকরণিক বংশদীপ মহাস্থবির, পণ্ডিত প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির, সুসাহিত্যিক শীলালঙ্কার মহাস্থবির, বিনয়াচার্য জিনবংশ মহাস্থবির, বিদর্শনাচার্য ধর্ম বিহারী ভিক্ষু, পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, সংঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, দার্শনিক বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, সাধক প্রবর বিশুদ্ধাচার মহাস্থবির, বিদর্শনাচার্য শান্তপদ মহাস্থবির, ত্রিপিটক-ধর বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির, অধ্যাপক শীলাচার শাস্ত্রী (মহাস্থবির), সংঘরাজ জ্যোতিপাল মহাস্থবির, সাধক আনন্দমিত্র মহাস্থবির, বিদর্শনাচার্য অনাগারিক মুনীন্দ্র, বিদর্শনাচার্যা ননী বালা বড়ুয়া (দীপা মা), আধুনিক শিক্ষায় উচ্চ শিক্ষিত দীপংকর শ্রীজ্ঞান মহাস্থবির, বঙ্গীশ ভিক্ষু, পণ্ডিত গিরিশ চন্দ্র বিদ্যাবিনোদ, পণ্ডিত শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ডঃ রবীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া, অধ্যাপক দ্বিজেন্দ্র লাল বড়ুয়া, অধ্যাপক প্রমোদ রঞ্জন বড়ুয়া, অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া, ডঃ সীতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, পন্ডিত নীলাম্বর বড়ুয়া, কবিয়াল ফণিভূষণ বড়ুয়া, কবিয়াল সারদা প্রসাদ বড়ুয়া, কীর্তনীয়া ব্রজ কিশোর বড়ুয়া, কবিরত্ন প্রিয়দর্শী মহাস্থবির, সাধক প্রবর প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির (পণ্ডিতভন্তে), সমাজ সংস্কারক অভয় শরণ মহাস্থবির, অধ্যাপক গুণালঙ্কার মহাস্থবির, দর্শন সাগর প্রিয়ানন্দ মহাস্থবির, স্বাধীনতা সংগ্রামী রোহিনী বড়ুয়া, ডঃ মুনীন্দ্রপ্রিয় তালুকদার, সমাজ কর্মী নিকুঞ্জ বিহারী বড়ুয়া, কবিরাজ গুরুদাস বড়ুয়া, উদারপ্রাণ যোগেন্দ্র লাল বড়ুয়া, শিক্ষাবিদ লোকেন্দ্র লাল বড়ুয়া, পালি ভাষাবিদ নীরোদ রঞ্জন মুৎসুদ্দী এবং ভূপেন্দ্র নাথ মুৎসুদ্দী, বহুগ্রন্থ প্রকাশক সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া প্রমুখের নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপরোক্ত মনীষীরা ছাড়াও আরো অনেকের নাম প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধির জন্যে উল্লেখ করতে পারলামনা।

একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী হলেও বঙ্গীয় বৌদ্ধেরা সমাজ, সংগঠন, সাহিত্য, সংস্কৃতির উৎকর্ষ সাধনে যে অবদান রেখে আসছেন তা গৌরবময় ইতিহাস সৃষ্টি করেছে। জাতীয় ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও বঙ্গীয় বৌদ্ধদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য এবং এধারা উত্তরোত্তর সমৃদ্ধির মাধ্যমে সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে।

প্রাচীন যুগ

তাম্রলিপ্ত ও কর্ণসুবর্ণে বৌদ্ধ সভ্যতা

অমূল্য রঞ্জন বড়ুয়া*

ব্রিটিশ আমলের রাজপুরুষেরা দেখলেন যে বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের কোন ধারাবাহিক ইতিহাস নেই। অথচ এ অঞ্চলে প্রচুর ইতিহাসের উপাদান রয়েছে। তাঁরা আরও দেখলেন যে এবিষয়ে কিছু করার জন্য নেই কোন নিষ্ঠাবান অনুসন্ধিৎসু কর্মী। এ অসুবিধা বুঝতে পেরে তারা বাংলার বুকে নানা স্থানে নানা সময়ে অনুসন্ধান কার্যে প্রবৃত্ত হন। দীর্ঘ দিন ধরে অনুসন্ধান ও উৎখনন কার্য চালিয়ে তারা বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক মূল্যবান পুরাতাত্ত্বিক নির্দশন আবিষ্কার করেন। এর পর তারা বঙ্গদেশের বৌদ্ধদের একটি ধারাবাহিক ইতিহাসের রূপ রেখাও অঙ্কন করেন নানা তথ্যের ভিত্তিতে।

১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ হল দ্বিখণ্ডিত-এক ভাগের নাম হল পাকিস্তান আর একভাগের নাম ভারতই রইল। সে সঙ্গে বঙ্গভূমিও ভাগ হয়ে গেল। এক ভাগের নাম দেওয়া হল পূর্ব পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ)। অন্য ভাগের নাম পশ্চিমবঙ্গ। এটি ভারতের অন্যতম বৈচিত্র্যপূর্ণ অঙ্গরাজ্য।

সুদূর অতীতে অখন্ড বঙ্গভূমির বিভিন্ন অংশ বিভিন্ন নামে পরিচিত ছিল এবং বিভিন্ন সময়ে এ ভূখণ্ডটিও মৌর্য, শুঙ্গ ও পূষ্যভূতি বংশীয় রাজাদের অধীনে ছিল। তখন ওই সব অংশগুলির নাম ছিল বরেন্দ্রী, রাঢ়, সুহ্ম ও তাম্রলিপ্ত ইত্যাদি। সে সময়ে বরেন্দ্রী, রাঢ় ও তৎসন্নিহিত অঞ্চলে প্রচুর আখের চাষ হত। এ আখ থেকে তৈরি হত গুড়। এ গুড় নানা জায়গায় বিক্রয় করা হত। গুড় উৎপাদনের প্রধান কেন্দ্র বলে লোকে এ অঞ্চলকে গৌড় বলত।

প্রাক ঐতিহাসিক যুগে বরেন্দ্রভূমের করতোয়া নদীর তীরে স্থাপিত হয়েছিল পৌণ্ড্রবর্ধন নগর (বর্তমানে মহাস্থান গড়)। এ নগরীকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠেছিল পৌণ্ড্ররাজ্য। এ পৌণ্ড্ররা এসেছিল দক্ষিণ ভারতের গোদাবরী নদীর তীর থেকে। এ নগরীর ধ্বংসাবশেষ বাংলাদেশের বগুড়া জেলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। 'ভবিষ্য পুরানে' বলা হয়েছে পৌণ্ড্ররাজ্যের সাতটা বিভাগ ছিল। এগুলির নাম হল— গৌড়, বরেন্দ্রভূমি, নীবৃত, বরাহভূমি, বর্ধমান, নারীখন্ড ও বিন্ধ্যাপাশ ইত্যাদি।

ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে, পৌণ্ড্রদের বিকাশ ঘটেছিল সিন্ধু সভ্যতার সমসাময়িক কোন এক সময়ে। এ সভ্যতা ছিল নগরকেন্দ্রিক। এ সভ্যতার একটি নিদর্শন রয়েছে

*প্রাবন্ধিক ও সমাজসেবক। বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় তাঁর বহু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার আউশগ্রামে। এটির নাম পান্ডু রাজার ঢিপি। সে সময়ে পৌণ্ড্ররা ছাড়াও এদেশে বাস করত কিরাত, কলিঙ্গ, বঙ্গ ও অষ্ট্রিক জাতিসমূহ। তাদের ধর্ম ছিল প্রকৃতির সৃজন শক্তি ও টোটেম প্রভৃতির পূজা করা।

এ অঞ্চলে আর্য বা উন্নত ধর্মের প্রবেশ লাভ করে মহাবীর বর্ধমান ও গৌতম বুদ্ধের হাত ধরে। এ সময়ে পুন্ড্র রাজ্যের অন্তর্গত ছিল বর্তমান পশ্চিমবঙ্গের উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর ও মালদহ প্রভৃতি জেলা। বুদ্ধের সময়ে পৌণ্ড্রনগরে বাস করতেন শ্রেষ্ঠী সার্থপতি নামে একজন প্রখ্যাত ব্যবসায়ী। তিনি তার পুত্র বৃষভ দত্তের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছিলেন বুদ্ধের অন্যতম প্রধান শিষ্য শ্রেষ্ঠী অনাথপিন্ডদের কন্যা সুমাগধার সঙ্গে। তিনিও বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। তাঁর আমন্ত্রণে ভগবান বুদ্ধ পৌণ্ড্রনগরে এসে সার্থপতির আতিথ্য গ্রহণ করেন এবং তিন মাস অবস্থান করে সদ্ধর্ম প্রচার করেন। বুদ্ধ ছিলেন প্রখর ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন সুপুরুষ। তিনি সহজ সরল লৌকিক ভাষায় দুঃখময় জগৎ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য শান্তি, মৈত্রী, করুণা ও অহিংসার বাণী যুক্তি সহকারে জনগণকে দেশনা করেন।

বুদ্ধের যখন যৌবন কাল মহাবীর বর্ধমান তখন প্রবীনত্বে পদার্পণ করেছেন। এজন্য তিনি রাঢ়ের রাজধানী অস্থিনগরে (অত্থিনগর) আট বছর অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেন এবং শিষ্যগণকে তিনি দূরদূরান্তরে ধর্ম প্রচারের জন্য প্রেরণ করতেন। দীর্ঘদিন অস্থিনগরে অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেন বলে পরবর্ত্তী কালে এস্থানের নাম তাঁর নামানুসারে বর্ধমান রাখা হয়।

বুদ্ধের পাশাপাশি মহাবীরের দিগম্বর শিষ্য সুধর্মস্বমী এবং প্রশিষ্য জম্বস্বামীও পৌণ্ড্রবর্ধনে অহিংস ধর্ম প্রচার করতেন মাগধীয় প্রাকৃতিক ভাষায়। বুদ্ধ ও মহাবীর দুজনেই ছিলেন ক্ষত্রিয় সন্তান। তাঁরা দু'জনেই প্রতিবাদী ধর্ম অহিংসার ললিত বাণী প্রচার করেন। কিন্তু বুদ্ধ ছিলেন মধ্যপন্থী। আর মহাবীর ছিলেন চরমপন্থী। এইজন্য এ অঞ্চলের জনগণ বুদ্ধের প্রতি বেশী আকৃষ্ট হন এবং বিশাল সংখ্যক মানুষ তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন।

তেলপত্তে জাতকেও দেখা যায় যে, ভগবান বুদ্ধ সুহ্ম (রাঢ়) দেশের দেসক নগরে এসে সদ্ধর্ম প্রচার করেন। একই উদ্দেশে তিনি সমতট এবং কর্ণসুবর্ণেও গিয়েছিলেন। শেষোক্ত দু'জাগায় সাতদিন করে অবস্থান করে ধর্ম প্রচার করেছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য- বৌদ্ধ যুগে বাংলার অধিকাংশ মানুষই বৌদ্ধ ছিলেন। (Discovery of living Buddhism in Bengal- Hara Prasad Shastri) । দিব্যাবদান রচনার পূর্বে পৌণ্ড্রবর্ধন বৌদ্ধধর্মের, কেন্দ্র রূপে পরিচিত ছিল। পৌণ্ড্র ক্ষত্রিয়রাই এদেশের আদিবাসী ছিল। এঁরাই বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে বাঙালী বৌদ্ধ জনগোষ্ঠী সৃষ্টি করেছেন।

এ অঞ্চলের লোকেরা বুদ্ধ ও মহাবীরের অহিংসা ধর্ম গ্রহণ করায় আর্যাবর্তের প্রাচীন ব্রাহ্মণ সমাজ অঙ্গ-বঙ্গের জনগণকে হীন চক্ষে দেখতেন। মৌর্যযুগে পৌণ্ড্ররাজ্য সম্রাট অশোকের শাসনাধীনে ছিল। এজন্য তিনি ভগবান বুদ্ধের পুন্ড্রনগরে আগমন ও ধর্ম

প্রচারের কথা চিরজাগরূপ করে রাখার জন্য একটি স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করান। এ ছাড়া তিনি সারা বাংলাদেশে সত্তরটি বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন। এর মধ্যে বাইশটি বিহার ছিল তাম্রলিপ্তে। চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন এসব বিহার দেখেছিলেন। সপ্তম শতাব্দীতে হিউ-এন-সাঙ এসেও এসব বিহার দেখেছিলেন। সাঁচীর স্তূপের তোরণ গাত্রে দাতা হিসাবে বাংলার ধর্মদত্তা ও ঋষি নন্দনের নাম খোদিত আছে। পন্ডিত বুলারের মতে এ লিপি খ্রীষ্ট পূর্ব দ্বিতীয় শতকের প্রথম দিকের। এসব প্রমাণ থেকে বলা যেতে পারে যে খ্রীঃ পূঃ ৪র্থ শতাব্দী থেকে ৭ম শতাব্দী পর্যন্ত এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের রমরমা ছিল। J. K. Saunder তাঁর গবেষণা গ্রন্থ "The History of Buddhism" গ্রন্থে দেখিয়েছিলেন যে, ওই সময়ে বাংলার বেশীর ভাগ মানুষই বৌদ্ধ ছিলেন। অশোকের সময়ে এ অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক ভাবে প্রচারিত হয়েছিল।

মন্ত্রী পুষ্যমিত্র শুঙ্গ বৃহদ্রথকে হত্যা করে মৌর্য বংশের অবসান ঘটিয়ে নিজেই মগধের সিংহাসন অধিকার করেন। তিনি ১৮৭-১৪৮ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত রাজত্ব করেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং বৌদ্ধদের উপর উৎপীড়ন করেন। কিন্তু পরবর্ত্তী শুঙ্গ নরপতিরা সেরূপ ছিলেন না। তাঁরা বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন। মধ্য প্রদেশের ভারহুতের প্রসিদ্ধ বৌদ্ধস্তূপ, শুঙ্গ যুগের শ্রেষ্ঠ শিল্প কীর্তি। সাঁচী স্তুপের কারুকার্য মন্ডিত প্রাকার ও দ্বারগুলি এ যুগেই নির্মিত হয়েছিল। এই শুঙ্গ যুগের বহু পোড়া মাটির নিদর্শন পাওয়া যায় বাংলার চন্দ্রকেতুগড়ে ও মহাস্থানগড়ে। এ সময়ে বাংলায় শান্তি ও সমৃদ্ধি অব্যাহত ছিল। বৌদ্ধদের অবস্থাও ভাল ছিল এবং বাংলার রাজধানী ছিল 'গঙ্গে'।

সম্রাট অশোকের পর বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন সম্রাট কনিষ্ক। তাঁর রাজত্ব কাল ছিল ৭৮ খ্রীষ্টাব্দ থেকে ১০২ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তাঁর শাসনকালে বৌদ্ধরা হীনযান ও মহাযান এ দু'সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ সময়ে প্রাচীন পন্থীরা হীনযান নামে পরিচিত হন। তা'দের কাছে বুদ্ধের মূর্তি নির্মাণ নিষিদ্ধ ছিল। কারণ প্রাচীন বৌদ্ধ ধর্মে মূর্তি পূজার কোন স্থান ছিল না। কিন্তু মহাযানপন্থীরা বুদ্ধ ও বোধিসত্বদের মূর্তি পূজা প্রবর্তন করেন। তা'দের মতে পূর্ণবুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী যাঁরা তাঁরাই হলেন বোধিসত্ত্ব। সম্রাট কনিষ্ক মহাযান মতের বিশ্বাসী ছিলেন। তিনি সারাজীবন ধরে এমতের পৃষ্ঠপোষকতা করে গেছেন। তাঁর উদ্দ্যোগে ভারতের অভ্যন্তরে, মধ্য এশিয়ায় এবং চীনে মহাযানী ধর্মমত প্রচারিত হয়। হিউ-য়েন সাঙ-এর বিবরণীতেও কনিষ্কের পূর্ব ভারত জয়ে আভাস পাওয়া যায় এবং পরবর্ত্তী কালে তমলুক, মুর্শিদাবাদ, মালদহ এবং বাংলাদেশের বগুড়াতেও কনিষ্কের মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়। এজন্য অনেক ঐতিহাসিক মনে করেন যে, বাংলার একটি অংশ তাঁর সাম্রাজ্য ভুক্ত ছিল। খ্রীষ্টীয় অব্দের আগে বৌদ্ধধর্ম প্রচারে অশোকের অবদান যেমন সর্বাধিক, তেমনি খ্রীষ্টীয় অব্দের পরে অনুরূপ অবদান ছিল কুষাণ সম্রাট কনিষ্কের।

কুষাণ যুগের পতন ঘটে তৃতীয় খ্রীষ্টাব্দের মধ্যভাগে। এ সাম্রাজ্যের ধ্বংসাবশেষের

ওপর আর্বিভাব ঘটে গুপ্ত সাম্রাজ্যের। গুপ্তযুগ ভারতের ইতিহাসের এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়।

অশোক ও কনিষ্কের সময়ে বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্যের ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও জৈন ধর্মের অবনতি ঘটেনি। কারণ তাঁরা উভয়েই পরধর্মের প্রতি বিদ্বেষ ভাব পোষণ করতেন না। কিন্তু গুপ্তযুগে ধর্মীয় ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ভাবে রাজানুগ্রহ না পাওয়ায় বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের ক্রমাবনতি শুরু হয়। সে অবস্থায় প্রতিফলন বাংলাতেও অনুভূত হয়। তবে গুপ্ত সম্রাট সমুদ্রগুপ্ত (৩৩৫-৩৮০ খ্রীঃ) ও নরসিংহ গুপ্ত বৌদ্ধধর্মের অনুরাগী ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত সিংহলরাজ মেঘবর্মনকে বুদ্ধগয়ায় বৌদ্ধ মন্দির নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় জমি ব্যবহারের অনুমতি দেন। তিনি বৌদ্ধ পন্ডিত বসুবন্ধুর পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। অনেকে মনে করে থাকেন যে তিনি সমুদ্রগুপ্তের মন্ত্রীও ছিলেন। নরসিংহ গুপ্তও বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি অনুরাগী ছিলেন। এছাড়া বুধগুপ্ত, তথাগত গুপ্ত ও বালাদিত্য গুপ্ত প্রভৃতি গুপ্ত-নরপতিরাও বৌদ্ধধর্মের প্রতি প্রীতি প্রদর্শন করেন।

ভারতের শিল্প কলা ও ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে গুপ্ত যুগের অনন্য অবদান ছিল। সারনাথের ধ্যানমগ্ন বুদ্ধমূর্তি, মথুরার দন্ডায়মান বুদ্ধ ও সুলতানগঞ্জের দু'মিটারের বেশী উচ্চ ব্রোঞ্জের মূর্তি বাগ ও অজন্তা গুহার চিত্রাবলী সে যুগের শিল্প কলার উৎকৃষ্ট নিদর্শন। অজন্তার চিত্রাবলী খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দী থেকে সপ্তম শতাব্দীর মধ্যে অঙ্কিত হলেও অধিকাংশ চিত্রাবলী কিন্তু গুপ্ত যুগেই অঙ্কিত হয়েছিল। প্রধানত বুদ্ধের জীবনের বিভিন্ন ঘটনা ও তাঁর পূর্ব জন্মের বিভিন্ন ঘটনাবলী এখানে দক্ষশিল্পীরা নিপুণ ভাবে অঙ্কিত করেছেন। এখানে চিত্রিত হয়েছে বাংলার দামাল ছেলে বিজয় সিংহের সিংহল বিজয়ের কাহিনীও। বিজয় সিংহের পিতৃভূমি হুগলী জেলার সিঙ্গুরে। প্রাচীন কালে এস্থানের নাম ছিল সীহপুর (সিংহপুর)। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এখানে রাজত্ব করতেন রাজা সিংহবাহু। তাঁর রাজ্যের সীমানা ছিল উত্তরে দ্বারকা নদী, দক্ষিণে তাম্রলিপ্ত, পূর্বে ভাগীরথী নদী ও পশ্চিমে ময়ুরাক্ষী নদী। সে সময়ে এরাজ্য সুহ্মদেশের অর্ন্তগত ছিল। তারও পরে এ অঞ্চল রাঢ় নামে পরিচিত লাভ করে। রাঢ়কে দু'ভাগে ভাগ করা হয়েছে-উত্তর রাঢ়ও দক্ষিণ রাঢ়। অজয় নদের উত্তরাংশের নাম উত্তররাঢ় এবং দক্ষিণাংশের নাম দক্ষিণ রাঢ়।

রাজধানী সীহপুর ছিল সরস্বতী নদীর অববাহিকায়। রাজা সিংহবাহুর পুত্র যুবরাজ বিজয় সিংহ ছিলেন বড়ই দুরন্ত। তিনি কখনো কারো কথা শুনতেন না। দলবল নিয়ে সারাক্ষণ নানা জায়গায় ইচ্ছামত দুরন্তপনা করতেন। এজন্য রাজ্যবাসীরা অতিষ্ঠ হয়ে রাজার কাছে নালিশ করে। রাজা খোঁজ নিয়ে জানতে পারলেন যে, প্রজাদের অভিযোগ মিথ্যা নয়। এজন্য যুবরাজকে রাজ্য থেকে বহিষ্কার করেন। তারপর বিজয় সিংহও সাতশত অনুচর নিয়ে সপ্তগ্রাম থেকে ৫৪৪ খ্রীষ্টপূর্বে নৌবহর নিয়ে লংকায় গমন করেন এবং লংকা জয় করে পিতৃনাম স্মরণ করার জন্য এ দ্বীপের নামকরণ করেন "সিংহল"। এ

ঘটনা স্মরণ করে ছন্দের যাদুকর কবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত ‘‘আমরা বাঙালী’ কবিতায় লিখেছেন—

একদা যাহার বিজয় সেনানী হেলায় লঙ্কা করিয়া জয়,
সিংহল নাম রেখে গেছে নিজ শৌর্যের পরিচয়।

লঙ্কা বিজয়ের অনতিকাল পরে সেখানে বৌদ্ধ ধর্ম প্রচারিত হয়েছিল। এজন্য ভগবান বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণের দিন বলেছিলেন— ‘‘বাংলার রাজকুমার ৭০০ অনুচর নিয়ে আজ লঙ্কায় উপস্থিত হয়েছেন। ওখানে আমার ধর্ম স্থায়ী হবে’’ (দৈনিক স্টেটসম্যান-১৭ই জুলাই-২০০৬)।

গুপ্তযুগে বৌদ্ধ পীঠস্থান শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, কুশীনগর ও বুদ্ধগয়া শ্রীহীন হয়ে পড়ায় ফা-হিয়েন ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তবে অধিবাসীদের সিংহভাগ সে সময়ে বাংলা ও ভারতের নানা স্থানে বৌদ্ধ ধর্মের নীতি অনুযায়ী জীবন যাপন করতেন এবং হিন্দু-বৌদ্ধরাও পাশাপাশি সুখে শান্তিতে বসবাস করতেন। তিনি ৩৯৯ খ্রীষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং ৪১৪ খ্রীষ্টাব্দে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তাঁর বিবরণী থেকে আরও জানা যায় যে গুপ্ত সম্রাটগণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুরাগী হলেও অন্যধর্মের প্রতি সহনশীল ছিলেন। সে সময়ে বাংলাদেশ ও পাঞ্জাবে বৌদ্ধধর্ম জনপ্রিয় ছিল। ওই সময়ে তাম্রলিপ্ত ছিল প্রসিদ্ধ সামুদ্রিক বন্দর ও বৌদ্ধ শিক্ষা কেন্দ্র। তাম্র যুগ থেকে এ বন্দরের নাম নানা দেশে ছড়িয়ে পড়ে। সে যুগে ধলভূম অঞ্চলের খনি থেকে প্রাপ্ত তামা এ বন্দর দিয়ে ক্রিট দ্বীপ ও ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে রপ্তানী করা হত। আজকের তমলুক হল সেই প্রাচীন তাম্রলিপ্তের স্মৃতিবাহী জেলা শহর।

ফা-হিয়েন এখানে ৪৪টি সংঘরাম দেখেছিলেন। আর দেখেছিলেন বহু সংখ্যক ভিক্ষু। তাঁর মতে এটা বৌদ্ধ প্রধান দেশ ছিল। তিনি এখান থেকে অর্ণবযানে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। মৌর্যযুগ থেকে আরম্ভ করে খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দী পর্যন্ত ছিল তাম্রলিপ্তের সমৃদ্ধির কাল। একাদশ শতাব্দীতে চোলরাজ মেদিনীপুর জয় করার পর থেকে তাম্রলিপ্তের দুর্দিন ঘনিয়ে আসে। অন্যদিকে সাগরও আস্তে আস্তে দক্ষিণদিকে সরে যেতে থাকে। অল্পদিনের মধ্যে পূর্বভারতে এ প্রধান বন্দর নগরী শহরে পরিণত হয়। আজ তার সমস্ত গৌরব অতীতের অন্ধকারে হারিয়ে গেছে।

সপ্তম শতাব্দীতে আসেন ইউয়েন সাঙ। তখন উত্তর ভারতের প্রভাবশালী রাজা ছিলেন হর্ষবর্ধন। তিনিও তাম্রলিপ্তকে একটি রাজ্য হিসাবে উল্লেখ করেছেন। এ রাজ্যের পরিধি ছিল ১৫০০ লি. বা ১২৫ ক্রোশ। এর উত্তর দিকে ছিল বর্ধমান ও কালনা, পূর্বে ভাগীরথী নদী, দক্ষিণে সাগর ও পশ্চিম দিকে ছিল কলিঙ্গ রাজ্য। তিনি এখানে দেখতে পেয়েছিলেন দশটি বৌদ্ধ বিহার ও এক সহস্র ভিক্ষু। এরা সকলে সর্বাস্তিবাদী (মহাযান) ভিক্ষু ছিলেন। আর শহরের একপ্রান্তে দেখতে পেয়েছিলেন একটি অশোক স্তম্ভ। এর পাশে চারটি বুদ্ধ মূর্ত্তি ছিল বলে তিনি উল্লেখ করেছেন।

"মহাবংশ" থেকে জানা যায় যে, সম্রাট অশোক এখান থেকে পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সংঘমিত্রাকে বোধিদ্রুমসহ শ্রীলঙ্কায় (সিংহল) প্রেরণ করেন। সেখান রাজা তিসস্ উপযুক্ত সমাদরের সঙ্গে এই দূতদ্বয়কে গ্রহণ করেছিলেন।

হিউয়েন সাঙ-এর ৪৪ বছর পরে আসেন ইৎ-সিঙ। তিনি এখানে এসে মাত্র ৪/৫টি বৌদ্ধ বিহার দেখতে পান। তাঁর ভ্রমণ কালে এখানকার সর্বাপেক্ষা সমৃদ্ধিশালী বিহার ছিল "পো-লো-হো" বা বরাহ বৌদ্ধ বিহার। এ বিহারের ভিক্ষু-ভিক্ষুনীর আচার-আচরণ ছিল অনুকরণীয়। ভিক্ষু রাহুল মিত্র ছিলেন এখানকার প্রখ্যাত ভিক্ষু। (বাঙালীর ইতিহাস-২য় খন্ড পৃঃ ৬৩৯-ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।)

এই তিন জন চৈনিক পরিব্রাজকের বিবরণী থেকে জানা যায় যে, তাম্রলিপ্তে ক্রমে ক্রমে বৌদ্ধ ধর্মের আধিপত্য হ্রাস পেতে থাকে। এর প্রধান কারণ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের আক্রমণাত্মক নীতি। এ নীতি নাকি বৌদ্ধ অধ্যুষিত স্থানেই সর্বাপেক্ষা বেশী কার্য্যকর করা হয়েছিল। এখানে এক মাত্র দেবী বর্গভীমার মন্দির ছাড়া সেকালের আর কোন পুরাকীর্তি বর্তমান নেই। ঐতিহাসিক রাজেন্দ্র লাল গুপ্তের মতে "বর্গভীমার মন্দির আগে বৌদ্ধ মন্দির ছিল ব্রাহ্মণ কর্তৃক উহা কালী মন্দিরে পরিণত হয়েছিল।" এ মন্দিরের আকৃতি ওড়িশি শৈলীর মন্দিরের মত। দখল করার পরে ইহার পূর্ব দিকের প্রধান দ্বার স্থায়ী ভাবে বন্ধ করে পশ্চিমদ্বারী করা হয়েছে। এর অসাধারণ শিল্প নৈপুণ্য দেখে সাধারণ লোক মনে করে থাকে-এ বুঝি বিশ্বকর্মার হাতেই গড়া।

সম্রাট অশোক কলিঙ্গ বিজয়ের স্মৃতিস্তম্ভ কলিঙ্গ রাজ্যের প্রান্তসীমা তাম্রলিপ্তে নির্মাণ করিয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্তম্ভের সন্ধান আজও মেলেনি। তবে এখানকার রাজবাড়ীর সীমানায় একটি ভগ্ন স্তম্ভ পাওয়া গিয়েছে। বিশেষজ্ঞরা স্তম্ভগাত্রে বৌদ্ধ ভাস্কর্যের নিদর্শন দেখে মনে করেন যে এটি গুপ্ত যুগের অথবা পাল যুগের হবে। বর্তমানে এটা সেখানকার হ্যামিলটন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গনে রক্ষিত আছে।

১৮৮১ সালে রূপনারায়ণ নদের খাত পরিবর্তনের ফলে মাটিতে নিম্ন স্তর থেকে বহু সংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা ও মৃৎমূর্তি (Terracotta) বার হয়ে পড়ে এবং এ সময়ে পুকুর খনন কালেও কিছু মুদ্রা (coin) পাওয়া যায়। এগুলিতে কোন কিছু লেখা ছিল না। শুধু আঁকা ছিল পদ্ম, চক্র ও চৈত্য আবার কোনটাতে অঙ্কিত ছিল হাতী, হরিণ ও সিংহ ইত্যাদি। এসব মুদ্রা এশিয়াটিক সোসাইটির পন্ডিতমন্ডলী পরীক্ষান্তে জানিয়ে দেন যে, এগুলি চন্দ্রগুপ্ত বা বৌদ্ধ রাজাদের। এগুলির মধ্যে একটি ছিল গুপ্তযুগের স্বর্ণমুদ্রা ও আর একটি ছিল মোগল যুগের মুদ্রা। মৃৎমূর্তিগুলির মধ্যে একটি ছিল 'মারের', একটি ছিল মায়াদেবীর জঠরে শ্বেত হস্তী রূপে বোধিসত্ত্বের প্রতিসন্ধি গ্রহণের দৃশ্য। আর একটা ছিল রাজা শুদ্ধোদনের নিকট গৌতমের গৃহ ত্যাগের বাসনা প্রকাশ। এছাড়াও আর একটি পোড়া মাটির ফলকে ছিল ষড়দন্ত জাতকে বর্ণিত হস্তিরাজের আত্ম-বিসর্জনের করুণ দৃশ্য। এদৃশ্যের অনুরূপ একটি চিত্র অঙ্কিত আছে সাঁচী স্তূপে।

১৯৫৪-৫৬ সালে উৎখননের ফলে পাওয়া গেছে শুঙ্গ ও কুষাণ যুগের মৃৎফলক এবং পাল যুগের দেবী মূর্তি যুক্ত একটি 'ছাপ'। ঊনবিংশ শতাব্দীতে তমলুকে প্রাপ্ত কারুকার্য মন্ডিত একটি পোড়া মাটির নারীমূর্তি বর্তমানে অক্সফোর্ডের ইন্ডিয়ান ইনস্টিটিউট সংগ্রহশালায় আছে। এছাড়াও তমলুক ও এর আশেপাশের গ্রামে পাওয়া অন্যান্য পুরাবস্তুগুলি সংগৃহীত আছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায়, দক্ষিণ ২৪ পরগণার ব্রতচারী গ্রামের গুরুসদয় দত্ত সংগ্রহশালায় ও তমলুকের 'তাম্রলিপ্ত মিউজিয়াম এ্যান্ড্‌ রিসার্চ সেন্টারে। অতীতের এসব পুরাবস্তুগুলি দেখলে বিস্ময়ের সীমা থাকে না। সে সঙ্গে মনে হয় প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের এ মিলন নগরী তখন কত উন্নত ছিল।

খ্রীষ্ট্রীয় ষষ্ঠ শতাব্দীর প্রথম ভাগে রাঢ় অঞ্চলের মধ্যভাগ ও উত্তরবঙ্গ (বরেন্দ্রভূমি) থেকে গুপ্ত রাজাদের নিয়ন্ত্রণ শিথিল হয়ে যায় এবং এ সুযোগে শশাঙ্ক অভ্যুত্থান ঘটিয়ে ৬০৬ খ্রীষ্টাব্দে নিজেকে গৌড়অধিপতি বলে ঘোষণা করেন। সে সময়ে তাঁর রাজ্যের অন্তর্গত ছিল সমগ্র রাঢ় অঞ্চল সহ উত্তর বঙ্গের মালদহ, উত্তরদিনাজপুর ও দক্ষিণ দিনাজপুর প্রভৃতি জেলা এবং প্রতিবেশী রাজ্য মগধ। মগধের বৌদ্ধ ভিক্ষুরা তাঁর প্রতিপক্ষ রাজা হর্ষবর্ধন ও তাঁর বুদ্ধানুরাগী ভগ্নী রাজ্যশ্রীর গোঁড়া সমর্থক ছিলেন। এজন্য রাজা শশাঙ্ক তা'দের ওপর নির্যাতন চালিয়ে ছিলেন এবং বুদ্ধগয়ায় বোধিবৃক্ষের মূল উৎপাটন করে দিয়েছিলেন। গৌড়ে কিন্তু তিনি বৌদ্ধদের ওপর তা করেন নি। কারণ সে সময়ে এ অঞ্চলে প্রচুর সংখ্যক বৌদ্ধ বাস করতেন এবং তাঁদের মধ্যে বেশ কিছু সংখ্যক ধনী ব্যবসায়ী ছিলেন যাঁরা দক্ষিণ পূর্ব এশিয়ায় গিয়ে বাণিজ্য করতেন। শশাঙ্ক দক্ষ প্রশাসক ছিলেন। তিনি ছিলেন বাংলা রাজাদের মধ্যে প্রথম সার্বভৌম নরপতি। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি শৈব হলেও পর ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিনি ৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দে লোকান্তরিত হন। তাঁর রাজধানী ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুর শহর থেকে ১৬ কি.মি. দূরে ভাগীরথীর পশ্চিম তীরে অবস্থিত কর্ণসুবর্ণে। সে সময়ে পুন্ড্রবর্ধন, সমতট ও তাম্রলিপ্ত গৌড়রাজ শশাঙ্কের শাসনাধীনে ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারীকে রাজা হর্ষবর্ধন সিংহাসন চ্যুত করেছিলেন। এর পর এ নগরী আস্তে আস্তে গুরুত্ব হারিয়ে ফেলে এবং মধ্য যুগে একেবারে অবলুপ্তির পথে ঢলে পড়ে।

শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ একটি প্রাচীন নগরী। অষ্টম শতাব্দীর একটি জৈন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে রাজা কর্ণ যে স্থানে তাঁর কর্ণকুন্তল নিক্ষেপ করেছিলেন সেই স্থানের নাম হয়েছে কর্ণসুবর্ণ।

শশাঙ্কের মৃত্যুর পর চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ ৬৩৯ খ্রীষ্টাব্দে কর্ণসুবর্ণে আসেন। তাঁর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, ভগবান তথাগত এ নগরীর উপকণ্ঠে সাতদিন অবস্থান করে সদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর বিবরণ থেকে আরও জানা যায় যে এখানে ছিল বহু তল বিশিষ্ট রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার, অশোক নির্মিত স্তূপ ও দশটি বিহার-সেগুলিতে থাকতো

দু'হাজার ভিক্ষু, এছাড়া এখানে বিভিন্ন দেব-দেবীর মন্দিরও ছিল। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে আরও লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তথাগতের পদধূলিধন্য পুন্ড্রবর্ধন, কর্ণসুবর্ণ ও তাম্রলিপ্তে সম্রাট অশোক স্তূপ ও বিহার নির্মাণ করিয়েছিলেন।

১৯৬২ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক (ড.) সুধীর রঞ্জন দাশের তত্ত্বাবধানে কর্ণসুবর্ণ স্টেশনের নিকটবর্ত্তী যদুপুর গ্রামের রাজবাড়ীডাঙ্গার প্রত্নস্থলে উৎখনন কার্য আরম্ভ করা হয়। এই প্রত্নস্থল থেকে প্রথম বছরে পাওয়া যায় মৌর্য যুগের প্রত্নবস্তু ও পোড়া মাটির শীলমোহর। এই শীলমোহরে লেখা ছিল — ''রক্ত মৃত্তিকা মহাবিহার ভিক্ষু সংঘ।'' এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য বুদ্ধগুপ্ত নামে এখানকার একজন বণিক এ মহাবিহারের ভিক্ষুদের শীলমোহর যুক্ত আশিসবাণী নিয়ে জলযানে মালয়েশিয়ায় বাণিজ্য করতে গিয়েছিলেন।

দ্বিতীয় বছরে উৎখনন করে রক্ত মৃত্তিকা মহাবিহারের আরও শীল মোহর পাওয়া যায়। এসব প্রত্নবস্তু পাওয়ার ফলে প্রমাণিত হয় যে, হিউয়েন সাঙ বর্ণিত রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার এখানেই ছিল।

১৯২৮-২৯ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণ এখানকার রাক্ষসডাঙ্গায় উৎখনন কার্য করে পোড়া মাটির লিপি, শীলমোহর ও গুপ্ত যুগের মুদ্রা আবিষ্কার করেন।

গত বছর ৮ই ডিসেম্বর (২০০5) ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বাঞ্চলীয় প্রধান শ্রীবিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় কর্ণসুবর্ণের নীলকুটি ডাঙ্গায় উৎখনন কার্য শুরু হয়। এবার উৎখননের স্থল থেকে মাতৃকারূপী মূর্তি, মুদ্রা, সীল ও মূল্যবান পাথর ইত্যাদি পাওয়া যায়। এসব প্রত্নবস্তুগুলি কলকাতার সদর দপ্তরে পাঠানো হয়েছে।
এ রক্তমৃত্তিকা বিহার সংলগ্ন অঞ্চলটি স্থানীয় লোকেরা রাঙ্গামাটি বলে। এ বিহারের ধ্বংসস্তুপের অধিকাংশই ভাগীরথী নদীর গর্ভে লীন হয়ে গেছে। এমনকী অশোক নির্মিত স্তুপও নেই-সবই ভাগীরথী নদী গ্রাস করেছে। এ স্থানের আশেপাশে রয়েছে রাজডাঙা, রাক্ষসীডাঙ্গা, সন্ন্যাসী ডাঙ্গা ও ঠাকুরডাঙ্গা প্রভৃতি প্রত্নস্থলসমূহ-যা আজও অতীত ইতিহাসের সাক্ষ্য বহন করছে।

আমাদের প্রত্যাশা বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান এবং উৎখনন বুদ্ধচর্চার ক্ষেত্রে এ স্থানের মাহাত্ম্য নূতন আলোয় উদ্ভাসিত হয়ে উঠবে।

তথ্য নির্দেশ

১। কর্ণসুবর্ণ মহানগরী— ডঃ সুধীর রঞ্জন দাশ।

২। তাম্রলিপ্ত—তমলুকের ইতিহাস— ডঃ প্রদ্যোৎ কুমার মাইতি।

৩। প্রাচীন বাংলার তাম্রলিপ্ত— গৌরাঙ্গ গোপাল সেনগুপ্ত।

৪। বাঙালীর ইতিহাস (২-য় খন্ড)— ডঃ নীহার রঞ্জন রায়।

৫। বাংলাদেশের ইতিহাস— ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার।

পাল-যুগে বৌদ্ধধর্ম

নলিনীনাথ দাশগুপ্ত*

অষ্টম হইতে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত উত্তরাপথের ও দক্ষিণাপথের স্থানে স্থানে বৌদ্ধধর্মের সত্তার কিছু কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায় বটে, কিন্তু পূর্বভারতে দীর্ঘজীবী পালবংশের পৃষ্ঠপোষণে উহার ইতিহাস ও সমৃদ্ধি আরও তিন-চারি শতাব্দীর পরমায়ু প্রাপ্ত হইল। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগে প্রথম গোপালদেব (আনুঃ৭৫০ খৃঃ) প্রকৃতিপুঞ্জ কর্তৃক রাজপদে নির্বাচিত হইয়া যে বংশের প্রতিষ্ঠা করিলেন, দ্বাদশ শতকের দ্বিতীয় পাদে বাঙ্গালায় মদনপালের (আনু ঃ ১১৪০ খৃঃ) রাজত্বের সহিত সেই বংশের উচ্ছেদ সাধন হইল। একদিকে প্রবল রাজশক্তির প্রভাবে এবং অপর দিকে আভ্যন্তরীণ শাসনযন্ত্রের সুব্যবস্থা ও উদার ধর্মনীতির কল্যাণে একই বংশের সতের জন নৃপতি প্রায় চারি শত বৎসর ধরিয়া একই রাজ্যে রাজত্ব করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ভারতের ইতিহাসে এমন দৃষ্টান্ত আর নাই। অবশ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয় রাজা ধর্মপালের ও দেবপালের পর এই বংশের রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠা ও গুরুত্ব অনেকটা খর্ব হইয়া গিয়াছিল, পূর্বে বঙ্গ (পূর্ববঙ্গ) পশ্চিমে মগধের ওদিকে সকল স্থানই তাহাদের হস্তচ্যুত হইয়া গিয়াছিল, কিন্তু গৌড় ও মগধের উপর পালদের অধিকার এই সুদীর্ঘ কাল ধরিয়া প্রায় অব্যাহতই রহিল।

হুয়েন সাংয়ের সময় পর্যন্তও বাঙ্গালাদেশে হীনযানের প্রাবল্য ছিল, কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যেই মহাযান আসিয়া হীনযানকে স্থানভ্রষ্ট করিয়া দিল, বাঙ্গালা হইতে হীনযান বুঝি অন্তর্ধানই করিল।

বাঙ্গালার স্থানবিশেষে বা নানাস্থানে দীর্ঘদিন ধরিয়া যে মাৎস্যন্যায় বা অরাজকতা চলিতেছিল, রাজা হইয়া প্রথম গোপালদেব তাহা দূর করিয়াছিলেন, কিছু নূতন রাজ্যও জয় করিয়াছিলেন, এবং তারনাথের উক্তি সত্য হইলে বলিতে হইবে, তিনিই স্বধর্মের ও সধর্মিগণের হিতার্থে মগধে উদ্দগুপুর বা ওদন্তপুরী-মহাবিহার নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, পরে যাহার আদর্শে তিব্বতের সুপ্রসিদ্ধ সম্-ম্যে মহাবিহার নির্মিত হইয়াছিল বলিয়া কথিত আছে। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে ধর্মপাল বাঙ্গালার সিংহাসনে উপবেশন করিয়া একদিকে যেমন হিন্দুর সমাজ-সংস্কারে ব্রতী হইয়াছিলেন অন্যদিকে তেমনই রাজ্যের দুই-তিনটি গুরুত্বপূর্ণ স্থানে দুই-তিনটি মহাবিহার স্থাপন করিয়া বৌদ্ধধর্মেরও উন্নতি বিধানে সচেষ্ট হইয়াছিলেন। ধর্মপালের সময়ে, সম্ভবতঃ তাঁহারই অনুপ্রেরণায় বিস্তর গ্রন্থাদি রচিত হইয়া বাঙ্গালার বৌদ্ধসাহিত্যও পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল। তাঁহারই সময়ে আবার নালন্দার ('নলেন্দ্রে'র)

---

* অধ্যাপক নলিনীনাথ দাশগুপ্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ভূতপূর্ব অধ্যাপক। ১৩৫৫ বঙ্গাব্দে তাঁর রচিত "বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম" গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে পুনর্মুদ্রিত ।

ধীমান্ ও তৎপুত্র বীতপাল নামক প্রখ্যাত শিল্পীদ্বয় গৌড়ীয় ভাস্কর্য-শিল্পে যে নূতন রীতির প্রবর্তন করিলেন, সেই রীতির অনুবর্তী হইয়া চারিশত বৎসর পর্যন্ত বাঙ্গালা ও মগধের বৌদ্ধ ও হিন্দু প্রতিমা সমূহ গঠিত হইয়াছিল।

ধর্মপালের পুত্র দেবপাল পিতার তুল্যই দিগ্বিজয়ী, কীর্তিমান্ ও খ্যাতিমান্ সম্রাট ছিলেন। তাঁহার শাসনকালেই বিক্রমশীল ও সোমপুরী বিহারদ্বয় পূর্ণাঙ্গতা লাভ করে। ধর্মপাল ও দেবপালের রাজত্বকালে জাভা-সুমাত্রার প্রবল পরাক্রান্ত শৈলেন্দ্রবংশীয় নরপতিগণের সহিত তাঁহাদের, অর্থাৎ কিনা জাভা-সুমাত্রার সহিত বাঙ্গালা মগধের, একটি হৃদ্য যোগাযোগ স্থাপিত হয়। জাভার কলসনের নিকটবর্তী কেলুরক নামক স্থানে প্রাপ্ত একটি প্রাচীন লেখে দেখা যায় যে, শৈলেন্দ্ররাজ শ্রীসংগ্রাম-ধনঞ্জয়ের গুরুদেব ছিলেন কুমারঘোষ নামক একজন বাঙ্গালী, গৌড়ের অধিবাসী। এই 'গৌড়ীদ্বীপগুরু' কুমারঘোষ ৭৭৮ খৃষ্টাব্দে তথায় একটি মঞ্জুশ্রী-মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর ঐ সময় ধর্মপাল। পরবর্তী শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে শৈলেন্দ্র-বংশীয় বালপুত্রদেব নালন্দায় একটি বিহার নির্মাণ করিয়াছিলেন এবং তাঁহারই অনুরোধে দেবপাল উহার সংরক্ষণার্থে পাঁচটি গ্রাম দান করিয়াছিলেন। ইহার অনেক পরেও, চতুর্দশ শতাব্দীতে গৌড় হইতে বহু সংখ্যক শ্রমণ ও ব্রাহ্মণ (হিন্দু) জাভার তৎকালীন রাজধানী মজপহিতে গিয়াছিলেন, তাহার প্রমাণ আছে। জালালাবাদ উপত্যকার নগরহার নামক স্থানের অধিবাসী ব্রাহ্মণকুলোদ্ভব ইন্দ্রগুপ্তের পুত্র বীরদেব বেদাদি শাস্ত্রের অধ্যয়ন সমাপ্ত করিয়া বৌদ্ধমতের অনুরাগী হইয়া পেশোয়ারে কণিষ্ক-বিহারে গমন করেন, এবং সর্বজ্ঞশান্তি নামক আচার্যের নিকট হইতে শিক্ষা ও দীক্ষা লাভ করিয়া বোধ্‌গয়ার যশোবর্মপুর-বিহারে আসিয়া যখন দীর্ঘকাল অবস্থিতি করেন, সেই সময়ে তিনি দেবপালের নিকট পূজা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শুধু তাই নয়, দেবপাল তাঁহাকে নালন্দার প্রতিপালন কার্যেও নিযুক্ত করেন। ৮৫১ খৃষ্টাব্দে, অর্থাৎ দেবপালেরই সময়, গোমিন্ অবিঘ্নাকর নামক গৌড়ের একজন বৌদ্ধ রাষ্ট্রকূট-সম্রাট প্রথম অমোঘবর্ষের শিলাহার-বংশীয় কপর্দিনের শাসনকালে দাক্ষিণাত্যের কোঙ্কণ-দেশে গমন করিয়া তথায় প্রসিদ্ধ কৃষ্ণগিরি-মহাবিহারের শ্রমণদের নিমিত্ত বিরাট উপাসনাশালা নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন, এবং উপরন্তু এক শত দ্রম্ম (মোহর) শাশ্বতকালের জন্য দান করিয়াছিলেন, যাহার কুসীদ হইতে তাঁহার মরণান্তে তত্রত্য ভিক্ষুগণ পরিচ্ছদ পাইবেন। দেবপালের রাজত্বকালে নির্মিত কতগুলি বৌদ্ধমূর্তি মগধে ও বাঙ্গালায় আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু বৌদ্ধ সাহিত্যের দিক দিয়া দেবপালের রাজত্বকাল বিশেষ স্মরণীয় নয়।

দেবপালের পর প্রথম বিগ্রহপাল বা শূরপাল, নারায়ণপাল, রাজ্যপাল, দ্বিতীয় গোপাল, দ্বিতীয় বিগ্রহপাল,—এই পাঁচজন রাজা পুরুষানুক্রমে প্রায় একশতচল্লিশ বছর রাজত্ব করেন। ইহারা অপেক্ষাকৃত দুর্বল রাজা ছিলেন, এবং রাজ্যরক্ষার জন্যই এত ব্যস্ত ছিলেন যে অন্য কোনও ব্যাপারে সবিশেষ মনোনিবেশ করিতে পারেন নাই। আনুমানিক ৯৯০ খৃষ্টাব্দে রাজা হইলেন প্রথম মহীপাল এবং প্রায় ১০৪০ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত তিনি রাজত্ব করেন। তাঁহার পুত্র নয়পাল তাহার পরে অন্ততঃ পনের বৎসর কাল রাজত্ব করিয়াছিলেন। একাদশ শতাব্দীর

এই প্রথমার্ধ আবার বাঙ্গালা-মগধের বৌদ্ধ ধর্মের ইতিহাসে এক নবযুগের সূচনা করিল। মহীপাল ও নয়পালের আগ্রহে ও যত্নে বৌদ্ধ ধর্ম নূতন জীবনীশক্তি লাভ করিল। এই যুগেই মগধের বিক্রমশলী ও বাঙ্গালার সোমপুরী যশের সর্বোচ্চ শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। কাশ্মীর ও ভারতের অন্যান্য স্থানের অসংখ্য শ্রমণ, এবং তিব্বতের অগণিত 'লোচাব' আসিয়া এই দুই বিহারে বহু গ্রন্থ রচনা করিলেন, বহু গ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিলেন, এবং বহু পুঁথি নকল করিলেন। এই যুগেই রত্নাকর শান্তি, অতীশ দীপঙ্কর প্রভৃতি ক্ষণজন্মা পুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল। গৌড়ীয় শিল্পরীতি অনুসৃত বহু বৌদ্ধ দেবদেবীর অনবদ্য বিগ্রহ এই যুগেরই শিল্পসাধনার নিদর্শন। এই যুগেই, ১০২৬ খৃষ্টাব্দে, বরেন্দ্র (উত্তরবঙ্গ) হইতে এক বাঙ্গালী শ্রমণ অনেক সংস্কৃত গ্রন্থসহ চীনে গিয়াছিলেন, চীনা ভাষায় তাঁহার নাম পৌ-সি, (P'ou-tsi), এবং বরেন্দ্রর নাম ফো লিন-নৈ (F'o-lin-nai)। জাপানের হোরিয়ুজির (Horiuzi) মন্দিরে রক্ষিত কতগুলি ধর্মপুস্তক একাদশ শতাব্দীর বঙ্গাক্ষরে লিখিত বলিয়া কথিত আছে, উহা সত্য হইলে, সম্ভবতঃ মহীপাল-নয়পালের যুগেই ঐ পুঁথিগুলি বাঙ্গালা হইতে হয় সরাসরি না হয় স্থানান্তর ঘুরিয়া, জাপানে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল। নয়পালের পর তাঁহার পুত্র তৃতীয় বিগ্রহপাল রাজত্ব করেন, এবং তাঁহার পর তাঁহার তিন পুত্র দ্বিতীয় মহীপাল, দ্বিতীয় শূরপাল এবং রামপাল পর পর রাজত্ব করেন। দ্বিতীয় মহীপালের হঠকারিতার ফলে বরেন্দ্রে যে কৈবর্ত-বিদ্রোহ হইয়াছিল, তাহার ফলে বরেন্দ্রী কিছুকালের জন্য পালদের হস্তচ্যুত হইয়া গেল এবং দ্বিতীয় মহীপাল নিহত হইলেন। দ্বিতীয় শূরপাল অতি অল্পদিনই সিংহাসনে উপবেশন করিয়াছিলেন। এক শক্তিশালী সামন্ত-চক্র গঠন করিয়া রামপাল কৈবর্তদের হস্ত হইতে বরেন্দ্রী পুনরুদ্ধার করিলেন এবং এই রামপালই পাল বংশের শেষ পরাক্রান্ত নরপতি। অনবরত যুদ্ধবিগ্রহাদির মধ্যে লিপ্ত থাকিয়াও রামপাল বৌদ্ধধর্মকে ভুলেন নাই। নূতন রাজধানী রামাবতী নগরের জগদ্দল মহাবিহার তাঁহারই কীর্তি। অভয়াকর গুপ্ত প্রভৃতি কয়েকজন প্রসিদ্ধ বৌদ্ধচার্যকে তাঁহার রাজত্বকালেই দেখিতে পাই। রামপালের পর কুমারপাল, তৃতীয় গোপাল ও মদনপাল নামেমাত্র গৌড়েশ্বর ছিলেন। পালদের তাম্রশাসনগুলিতে সংযুক্ত রাজমুদ্রায় রাজার নামের উপরিভাগে বৌদ্ধমত-বিজ্ঞাপক ধর্মচক্র-মুদ্রা, এবং ধর্মচক্রের উভয়পার্শ্বে সমাসীন দুইটি মৃগমূর্তি অঙ্কিত রহিয়াছে।

খৃষ্টীয় অষ্টম হইতে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে দুই তিনটি বৌদ্ধ রাজবংশ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করিয়াছিল। খড়গ-বংশ ঠিক কখন রাজত্ব করিয়াছিল তাহা এখনও সঠিকভাবে নির্ণীতহয় নাই। যাহা হোক্, অসরফ্পুরের তাম্রশাসনদ্বয় হইতে ঐ বংশের চারি পুরুষের নাম জানা যায়, খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ এবং যুবরাজ রাজরাজভট্ট। যে 'কর্মান্তবাসকে' লিপিদ্বয় সম্পাদিত হইয়াছিল, তাহা কুমিল্লার অনতিদূরবর্তী কর্মন্তনগর বা বড়-কাম্তা বলিয়া আপাততঃ নির্ধারিত হইয়াছে। লিপিদ্বয়ে খড়্গগণকে ''সর্বলোকবন্দ্য ত্রৈলোক্যখ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত এবং তাঁহার শান্ত, ভব-বিভব-ভেদকারী যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম এবং অপ্রমেয় বিবিধ গুণসম্পন্ন সত্ত্বের পরম ভক্তিমান উপাসক'' বলিয়া দেখিতে পাই।

ইহার পর এবং সম্ভবতঃ ৯৫০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে কোনও সময় পূর্ববঙ্গে মহারাজাধিরাজ কান্তিদেব বিন্দুমতী নাম্নী জনৈক রাজপুত্রীকে বিবাহ করিয়াছিলেন। দশম শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ববঙ্গে চন্দ্র-বংশ নামে আর একটি বৌদ্ধ রাজবংশ স্থাপিত হইয়াছিল। এই বংশের প্রথম পুরুষ পূর্ণচন্দ্র 'রোহিতগিরি' বা কুমিল্লার লালমাই পাহাড় হইতে হইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ। তাঁহার পুত্র 'পরম সৌগত' ত্রৈলোক্যচন্দ্র দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গে চন্দ্রদ্বীপ নৃপতি হইয়াছিলেন, এবং তাঁহার পুত্র শ্রীচন্দ্র সার্বভৌমিকত্বসূচক 'পরমেশ্বর পরমভট্টারক মহারাজাধিরাজ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন।

শ্রীচন্দ্রের তাম্রশাসনগুলিতে যে রাজমুদ্রা সংযুক্ত আছে তাহাতে পাল-রাজগণের শাসনাবলীর মতই মৃগমূর্তিলাঞ্ছিত ধর্মচক্র-মুদ্রা খোদিত অছে। সম্ভবত ঃ প্রথম মহীপালের সমসাময়িক বঙ্গালদেশের নৃপতি গোবিন্দচন্দ্রও এই চন্দ্রবংশেরই সন্তান ছিলেন। বাঙ্গালার জনশ্রুতিতে তিনিই গোপীচাঁদ বলিয়া পরিচিত, এবং তাঁহারই মাতা সিদ্ধ গোরক্ষনাথের শিষ্যা মদনাবতী বা ময়নামতীর যোগবিভূতি সম্বন্ধে অনেক রোমাঞ্চকর কাহিনী এখনও পূর্ববঙ্গের ঘরে ঘরে প্রচলিত।

পাল-যুগে, সম্ভবতঃ দশম শতাব্দীর তৃতীয় পাদে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়ে ব্রহ্মদেশ ও বাঙ্গালার মধ্যবর্তী লুসাই পর্বত অঞ্চল হইতে আগত, কম্বোজান্বয় এক রাজ-বংশের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল উত্তরবঙ্গে। পাল-বংশের অধিকার সেই সময় শুধু পশ্চিমবঙ্গের কিয়দংশ এবং অঙ্গ ও মগধেই পর্যবসিত হইয়াছিল। এই নুতন বংশের রাজাদেরও 'পাল' উপাধি ছিল, এবং উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ইর্দা গ্রামে আবিষ্কৃত এই বংশীয় নয়পালদেবের এক তাম্রশাসনে দেখা যায়, নয়পালের পিতা 'কাম্বোজ-বংশ তিলক মহারাজাধিরাজ' রাজ্যপাল ছিলেন 'পরম সৌগত' এবং তাম্রফলকে সংযুক্ত রাজমুদ্রায় পাল ও চন্দ্ররাজগণের মতই দুইটি অর্ধ-শায়িত, উন্নতশীর্ষ মৃগমূর্তিলাঞ্ছিত ধর্মচক্র-মুদ্রা মুদ্রিত রহিয়াছে।

এই পাল-যুগই সর্বতোভাবে বাঙ্গালার ইতিহাসের 'গুপ্ত যুগ', সর্বাঙ্গীন উন্নতির যুগ। এই প্লুতগতি উন্নয়নের মূলে রহিয়াছে উরুসত্ত্ব পালদের ঐকান্তিক এষণা ও আগ্রহ এবং অবন্ধ উৎসাহ ও প্রেরণার প্রবর্তনা। অগ্নিকোণের কোন্ সাগরপুরী হইতে পালগণ সোনার কাঠি আহরণ করিয়া আনিয়াছিলেন জানি না, কিন্তু তাহার সম্মোহনস্পর্শে একটা জাতি সহসা এত কর্মনিষ্ঠ হইয়া উঠিল—বিদ্যায়, উপবিদ্যায়, ধর্মে, আচরণে, চিন্তায়, এবৈকক ব্যাপারে এত দ্রুত সমুৎক্রম হইল সে জাতির,— যেন মনে হইল গুপ্তযুগকেও বুঝি পাল-যুগ খ্যাতিতে উপসর্জন করিয়াই যায়। কিন্তু যায় নাই তাহা। বাঙ্গালাদেশের উষর মাটির ও ভাগ্যের দোষে, সে-যুগের যথার্থ স্মৃতি বহন করিয়া আনিতে পারে এমন উপাদান এতই কম অবশিষ্ট রহিয়াছে যে, বলিতেই হইবে গুপ্ত-যুগের ঋদ্ধিকে পাল-যুগ অতিক্রম করিয়া যাইতে পারে নাই। অন্ততঃ একটা বিষয়ে গুপ্ত-যুগকে বা যে-কোনও যুগকেই পালযুগ অতিক্রম করিয়া গিয়াছিল সেটা হইতেছে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নির্মৎসরতা ও ক্ষান্তি। পাল-যুগে বাঙ্গালার নৃপতিগণ ও তাঁহাদের প্রকৃতিপুঞ্জ ধর্মবিষয়ে সঙ্কীর্ণ পরিহার করিয়া

চলিতেন, এইটুকু মাত্র বলিলে ভুল হইবে, ধর্মবিষয়ে তাঁহাদের ঔদার্য ছিল অমিত ও অপ্রতিম।

ধর্মপাল ও রাজ্যপাল রাষ্ট্রকূট-কন্যা বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রথম বিগ্রহপালের পত্নী ছিলেন জাহ্নবীর ন্যায় হৈহয়-বংশভূষণরূপী লজ্জা নাম্নী কন্যা। তৃতীয় বিগ্রহপালের অপরা মহিষী ছিলেন হৈহয়রাজ কর্ণদেবের দুহিতা যৌবনশ্রী। স্বামী বৌদ্ধ, পত্নী হিন্দু-তনয়া।

পালগণ ব্রাহ্মণদের ভূমিদান করিতেন এবং সেই দান যে করিতেন তাহা 'মাতাপিত্রোরাত্মনশ্চ' পুণ্য ও যশ অভিবৃদ্ধির কামনায়। নারায়ণ পাল স্বয়ং এক সহস্র শিব-মন্দির নির্মাণ করিয়াছিলেন।

ভগবান বুদ্ধ-ভট্টারককে উদ্দেশ করিয়া মাতার, পিতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য শ্রীচন্দ্রদেব কোটি-হোম-সম্পাদনকারী, পারিবারিক শ্রীপাতবাস গুপ্তশর্মাকে ধর্মচক্র-মুদ্রা দ্বারা তাম্রশাসনীকৃত করিয়া ভূমিদান করিয়াছিলেন।

পূর্ববঙ্গের খড়্গরা নিষ্ঠাবান বৌদ্ধ হইলেও, দেবখড়্গের রাণী প্রভাবতী ছিলেন দুর্গার উপাসকা, রাজা বৌদ্ধ বলিয়া রাণীর ব্যক্তিগত ধর্মমতকে বলি দিতে বাধ্য করেন নাই। সেইরূপ আবার দেখি, পরমসৌগত কান্তিদেবের জননী ছিলেন শিবের উপাসিকা 'শিবপ্রিয়া'। উত্তরবঙ্গের কাম্বোজান্বয় পাল-বংশের প্রথম জ্ঞাত রাজা রাজ্যপাল 'পরম সৌগত' হইলেও ভাগ্যদেবীর গর্ভোৎপন্ন তাঁহার জ্যেষ্ঠপুত্র নয়পাল তাঁহার বৌদ্ধ পিতার ও মাতার ও নিজের পুণ্য ও যশোবৃদ্ধির জন্য ধর্মচক্র-মুদ্রা দ্বারা তাম্রশাসন করিয়া ব্রাহ্মণকে ভূমিদান করিয়াছেন। পক্ষান্তরে, একাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে পূর্ববঙ্গের বৈষ্ণব নরপতি সামলবর্মার বজ্রযোগিনী-তাম্রশাসনে নাকি দেখা যায়, তিনি নারায়ণের প্রীতিকামনায় বিষ্ণুচক্র-মুদ্রা-মুদ্রিত তাম্রশাসন দ্বারা ভীমদেব-প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ দেবী প্রজ্ঞাপারমিতার মন্দিরে ভূমিদান করিয়াছিলেন।

ধর্মপাল তাঁহার মন্ত্রিত্বে নিযুক্ত করিয়াছিলেন শাণ্ডিল্য বংশীয় ব্রাহ্মণ গর্গকে। গর্গের পুত্র 'দ্বিজেশ' দর্ভপাণি ছিলেন ধর্মপালের পুত্র দেবপালের মন্ত্রী, এবং দর্ভপাণির পরে তাঁহার পৌত্র কেদারমিশ্র দেবপালের ও বিগ্রহপালের উভয়েরই মন্ত্রী হইয়াছিলেন। তৃতীয় বিগ্রহপালের মন্ত্রী ছিলেন 'শাস্ত্রবিত্তম' যোগদেব। তৃতীয় বিগ্রহপাল আবার ধর্মপালের মতই বর্ণাশ্রমের আশ্রয়স্থল (চাতুর্বর্ণ সমাশ্রয়ঃ) বলিয়া গৌরবান্বিত হইয়াছেন। যোগদেবের পুত্র 'তত্ত্ববোধভু' বোধিদেব ছিলেন রামপালের মন্ত্রী এবং রামপালের পুত্র কুমারপালের মন্ত্রী ছিলেন বোধিদেবের পুত্র বৈদ্যদেব, যিনি পরে কামরূপের নরেশ্বর হইয়াছিলেন।

গুপ্তযুগের উদার আবহাওয়ায় বুদ্ধকে হিন্দুগণ বিষ্ণুর অবতার বলিয়া স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু এই স্বীকারোক্তিটা নিতান্তই মৌখিক, কারণ বিষ্ণু-মূর্তির প্রভাবলী বা চালিতে ক্ষোদিত দশাবতার-নিবহে বুদ্ধের জন্য দুই এক অঙ্গুলি স্থান ছাড়িয়া দেওয়া ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে বুদ্ধের বিগ্রহ নির্মাণ করিয়া পূজা করা হিন্দুদের কোষ্ঠীতে লেখে নাই, যদিও 'বৃহৎ সংহিতা', 'মানসার' প্রভৃতি গ্রন্থে বুদ্ধ-মূর্তি রচনার নির্দেশ ও নির্মাণ পদ্ধতি লিপিবদ্ধ রহিয়াছে। কিন্তু পাল-যুগের অসাম্প্রদয়িকতার অনুপ্রেরণায় বাঙ্গালার ও মগধের দেব-দেবী মহলে নানারূপ অঘটন ঘটিতে লাগিল। বৌদ্ধ ও হিন্দু উভয় সম্প্রদায়ই তাঁহাদের

নিজ নিজ দেবতা-গোষ্ঠীতে কয়েকটি করিয়া অপরপক্ষের দেবদেবীকে স্থান দিয়া পূজা-অর্চা আরম্ভ করিয়া দিলেন। তন্মধ্যে সরস্বতীর নামই আগে উল্লেখ করি। অনেকগুলি সাধনে (বৌদ্ধ ধ্যানস্ত্রোতে) স্তুত হইয়া তিনি বৌদ্ধ দেবতাসমাজে রীতিমত কুলদেবীর মধ্যেই গণ্যা হইলেন। ওদিকে ধনকুবের কুবের বৌদ্ধদের প্রতিও সদয় হইয়া উঠিলেন এবং কুবের ও জম্ভল এই দুই নামেই তাঁহাদেরও দেবতা হইতে স্বীকৃত হইলেন। যম প্রেতভর্তারূপেই 'ধর্মপাল' উপাধি গ্রহণ করিয়া বৌদ্ধ দেবতামণ্ডলীভুক্ত হইয়া গেলেন। বজ্রযানের পূর্বদিশাধিপতি বজ্রধরকে হিন্দুর পূর্বদিকের লোকপাল বজ্রপাণি ইন্দ্র বলিয়া চর্মচক্ষুতেই দিব্য চেনা যায়। সেইরূপ, ত্রিমুখ, চতুহর্স্ত, ঘোরদর্শন ত্রৈলোক্যভস্মঙ্কর হিন্দুর ভৈরব ব্যতীত আর কেহই নহেন; এমন কি, অবলোকিতেশ্বরও মাঝে মাঝে পঞ্চশির হইয়া যেন পঞ্চানন শিবঠাকুরটি সাজিয়াছেন। অপরপক্ষে আবার হিন্দু তান্ত্রিকগণ বৌদ্ধদের সর্বাপেক্ষা প্রতিপত্তিশালিনী ও প্রথিতযশা দেবী তারাকে (উগ্রতারা বা একজটাকে) দশমহাবিদ্যার অন্যতমা বিদ্যারূপে তাঁহাদের ভৈরবী-চক্রের মধ্যে টানিয়া আনিলেন। ব্রাহ্মণ্য মঞ্জুঘোষ, যিনি সাধকবর্গের জড়তা বিনাশ করিয়া তাঁহাদিগকে সংসারসাগর হইতে উদ্ধার করেন, বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রীর ভূমিকায় হিন্দু -তন্ত্রমঞ্চে অবতীর্ণ হইলেন। মহাকাল, চামুণ্ডা প্রভৃতি দেব-দেবীও উভয় পক্ষের খাতায়ই নাম উঠাইলেন। প্রথম মহীপালের চতুর্থ রাজ্যাঙ্কে প্রতিষ্ঠাপিত একটি (ব্রাহ্মণ্য) বিনায়ক মূর্তির কথা শুনিয়া মনে হয়, গণেশ ঠাকুরও প্রকাশ্যেই বৌদ্ধদের পূজা গ্রহণ করিতেছিলেন। এ সকল কথা দেবতা লইয়া ঠাট্টা তামাসার কথা নয়, এ সবই পাল যুগে বাঙ্গালার সভ্যতার হৃদ্‌পিণ্ডের স্পন্দন ধ্বনি মাত্র। অর্ধাঙ্গ শিব ও অর্ধাঙ্গ বুদ্ধ, অথবা দেহার্ধ বিষ্ণু ও অপরার্ধ বুদ্ধ, এরূপ অদ্বৈত-মূর্তি আবিষ্কৃত না হইলেও শিব ও বিষ্ণুর শিরাগ্রে ধ্যানীবুদ্ধর অবস্থানে বাঙ্গালাদেশে হিন্দু জনমতের উপর বৌদ্ধধর্মের প্রভাব কিরূপ ক্রিয়া করিতেছিল তাহার আভাস সুস্পষ্ট, এবং এই প্রভাব যে পাল-যুগের 'দুরন্ত বাতাসে' সঞ্জাত, ইহাতে সংশয় নাই। কে বলিতে পারে, হয়ত ধর্মপাল-দেবপাল যুগে শৈলেন্দ্রীয় যবদ্বীপের সহিত বাঙ্গালার যে ঘনিষ্ঠতা স্থাপিত হইয়াছিল, তাহারই প্রবাহে শিব-বুদ্ধ ও বিষ্ণু-বুদ্ধ পরিকল্পনা জাভায় গিয়া উপনীত ও সংবর্ধিত হইয়াছিল। হোক বা না হোক্ পূর্ববঙ্গে প্রাপ্ত ও ঢাকা যাদুঘরে সংরক্ষিত, কমঠের চতুরংশ-খোলায় একাদশ শতাব্দীর অক্ষরে উৎকীর্ণ একটি লিপিতে পাওয়া যায়, ''নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নমো বুদ্ধায়।... সুজিনো জনানাং (বৌদ্ধদিগের শ্রেয়র জন্য)। ....নমো ভগবতে বাসুদেবায়'' একই লিপিতে বুদ্ধ ও বিষ্ণুকে এই নমস্কার জ্ঞাপন ত্রয়োদশ শতাব্দীর দ্বিতীয় পাদে বাঙ্গালী রামচন্দ্র কবি-ভারতীর 'ভক্তিশতকে' র ''বুদ্ধো বা গিরীশোহথবা স ভগবাংস্তস্মৈ নমস্কুমহে'' এই অতি-প্রসিদ্ধ উক্তি স্মরণ করাইয়া দেয়। 'মহাচীনাচারক্রম' তন্ত্রের প্রথম পটলের এক স্থানে আছে, ''ময়ি আরাধনাচারং বুদ্ধরূপী জনার্দনঃ'' দ্বিতীয় পটলে পাই, ''কিমিদং ক্রিয়তে কর্ম বিষ্ণুণা বুদ্ধরূপিণা'', 'জগাম বিষ্ণোঃ সমীপং বুদ্ধরূপস্যা পর্বতী'', ইত্যাদি। এগুলি বিষ্ণুর বুদ্ধাবতারের কথা নয়,—বিষ্ণু-বুদ্ধের অভিন্নতার কথা।

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্ব, বহু পূর্ব হইতেই বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে এক বিরাট ও অভিনব পরিবর্তন সাধিত হইয়াছিল। এবং সেই পরিবর্তিত ধর্মমতই বাঙ্গালাদেশের ও মগধের চারি শতাব্দীর বৌদ্ধধর্মের মুখ্য ইতিহাস রচনার জন্য দায়ী। সোজা ভাষায় ইহার নাম তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম। 'তন্ত্র' শব্দের প্রাথমিক বা আদিম অর্থ যাহাই হোক্ না কেন, তান্ত্রিক সাধনা বলিতে সাধারণতঃ আমরা বুঝিয়া থাকি কোনও সাধকের একাকী বা নারীপ্রকৃতি-সহ-একত্র মন্ত্র, মুদ্রা, মণ্ডল, ন্যাস প্রভৃতি দ্বারা কোনও শক্তি-সহ-দেবতার বা কেবলমাত্র শক্তির বা স্ত্রী-দেবতার পূজাকে; এবং এই পূজার ও সংশ্লিষ্ট অনুষ্ঠানগুলির সবই গুহ্য। এইরূপ পূজার প্রথা কবে এবং কি প্রকারে গৌতম বুদ্ধের প্রবর্তিত ধর্মে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, তাহা নিরূপণ করা আধুনিক জ্ঞানে অসম্ভব। সকলেরই স্মরণ রাখা কর্তব্য, তান্ত্রিকতা মূল বৌদ্ধ ধর্মের (কিংবা মহাযানেরও) কোনও অচ্ছেদ্য বা মৌলিক অঙ্গ নয়, অথবা ইহাদের কোনও শাখাও নয়। হয় ভারতবর্ষের মধ্যেই, না হয় ভারতের বাহিরে, কোথাও তান্ত্রিক ধারণাগুলি পরিপুষ্ট লাভ করিয়া এক পথে হিন্দুধর্মে ও অপর পথে বৌদ্ধধর্মে প্রবিষ্ট হইয়াছিল, এবং এই দুই ধর্মই নিজ নিজ শক্তি, সামর্থ্য ও প্রয়োজন অনুসারে ঐ ধারণাগুলি ক্রমে ক্রমে সংশোধিত, পরিবর্তিত ও রূপান্তরিত করিয়া লইয়াছিল।

তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের চারটি স্তর: মন্ত্রযান, বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান। তাদের রীতি নীতি অন্য প্রবন্ধে আলোচিত হইয়াছে।

বজ্রযান, কালচক্রযান ও সহজযান, এই তিনের উদ্ভব যখনই হইয়া থাকুক না কেন, বাঙ্গালাদেশের পাল যুগীয় বৌদ্ধধর্মে এই তিন যান প্রভূত প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল, এবং বলিতে গেলে এই তিন যানের ইতিহাসই এই যুগের বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্মের বার-তের আনা ইতিহাস। এই যানগুলিকে কেন্দ্র করিয়া বাঙ্গালাদেশে একটা বিরাট সাহিত্যও রচিত হইয়াছিল। এই যানগুলির মতবাদের অনেকাংশ পরস্পর পরস্পরের সহিত এত সংশ্লিষ্ট যে অনেক সময় তাহাদের মধ্যে সূক্ষ্ম সীমারেখা অঙ্কিত করা দুরূহ। আবার এই পাল-যুগেই আর একটা ধর্মমতও কম লোকপ্রিয় হইয়া উঠে নাই, তাহার নাম নাথ-ধর্ম। নাথপন্থিগণের মতের সহিত তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের সাদৃশ্য এত বেশী যে অনেকে মনে করেন যে উহা সম্ভবতঃ বজ্রযান হইতেই উদ্ভূত। ইহা যদি না-ও হয়, নাথ-পন্থিগণের ধর্ম আদিতে বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের মতের দ্বারা যে যথেষ্ট প্রভাবান্বিত হইয়াছিল, সে বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ নাই। সিদ্ধাচার্যগণের ন্যায় নাথগণও বর্ণাশ্রমকে অস্বীকার করিয়াছেন। কোনও কোনও সিদ্ধাচার্যকে নাথগণ নিজেদের আচার্য বলিয়া আত্মসাৎ করিয়া লইয়াছেন। ইঁহাদের কতগুলি ক্রিয়াকল্পাপ আবার কৌলধর্ম অথবা তান্ত্রিক শৈবধর্ম হইতে গৃহীত। নানা প্রকার যোগে, বিশেষতঃ হঠযোগে ইঁহারা খুব সিদ্ধ ছিলেন। সম্ভবতঃ নাথগণ তারারও উপাসনা করিতেন।

মহাযান, বজ্রযান ও কালচক্রযানকে উপাশ্রয় করিয়া বাঙ্গালায় ও মগধে অষ্টম হইতে দ্বাদশ পর্যন্ত চারি-পাঁচ শতাব্দীতে বহুসংখ্যক বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি নানাবিধ প্রস্তরে, ধাতুতে ও দারুতে গঠিত হইয়াছিল। ভাস্কর্য-রীতির দিক দিয়া ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ মূর্তিতে

একই রীতি অনুসৃত, লোকতঃ সে রীতির নাম গৌড়ীয় শিল্প-রীতি, এবং জনশ্রুতিতে সেই রীতির উদ্ভাবয়িতা ধীমান ও বীতপাল নামক ধর্মপালের সমসাময়িক শিল্পীদ্বয়। একই ভাস্করের হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয় মণ্ডলীরই দেবমূর্তি গঠন অধিকারগত ছিল, শিল্প-রীতি ছিল জাতীয়।

বাঙ্গালার এই মূর্তিগুলির একাংশ সংগৃহীত হইয়া রহিয়াছে বাঙ্গালার বিভিন্ন চিত্রশালায়, একাংশ পড়িয়া আছে পল্লীপথের ধারে, প্রান্তরে, বৃক্ষতলে অথবা কোনও গৃহস্থের বা ধনবানের আঙ্গিনায় বা মালঞ্চে, একাংশ চলিয়া গিয়াছে বিদেশী পোতে বিদেশীয় যাদুঘরের শোভাবর্ধনের জন্য, বাকী অংশ অছে মন্দিরস্থান-সংলগ্ন পুরানো দীঘির পচা নিথর জলের তলে অথবা ভূগর্ভে লোকনয়নের অন্তরালে।

মহাযান এবং মন্ত্রযানের তিন ধারার ভিতর দিয়া সারা ভারতবর্ষে যে এক বিরাট ধর্ম-সাহিত্যের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহার মাত্র একাংশ তিব্বতীয়গণের রুচি অনুসারে প্রধানতঃ একাদশ-দ্বাদশ শতাব্দীতে কাশ্মীর, নেপাল, মগধ ও বাঙ্গালার নানা বিহারে এবং তিব্বতে অনুবাদিত হইয়াছিল। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে তিব্বতীয় লামা বু-তোন কর্তৃক সঙ্কলিত তিব্বতীয় জ্ঞানভাণ্ডার 'ত্যেঙ্গুরে' এই সকল অনূদিত গ্রন্থগুলির অধিকাংশই রক্ষিত আছে, মূল সংস্কৃত ভাষায় কিছু পুস্তক নেপালে (এবং খানকয়েক অন্যত্রও) পাওয়া গিয়াছে। আর বাকী সব বিনষ্ট হইয়া গিয়ছে। তিব্বতীয় অনুবাদে 'ত্যেঙ্গুরে' সংরক্ষিত গ্রন্থগুলির মধ্যে আবার এক ভগ্নাংশ মাত্র বাঙ্গালীর রচনা। 'তেঙ্গুরে' অনুবাদিত গ্রন্থগুলিকে দুই সাধারণ ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছে, ' বৌদ্ধতন্ত্র' (Regyud), এবং বৌদ্ধসূত্র' (mdo), এবং ইহাদের অধিকাংশই প্রথম ভাগের অন্তর্ভুক্ত। প্রকারান্তরে বলিতে গেলে, বেশীর ভাগ গ্রন্থই বজ্রযানীয়।

পাল-যুগে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন যানকে কেন্দ্র করিয়া যে বিপুল সাহিত্য গড়িয়া উঠিয়াছিল, তদ্দ্বারা একথা অনুমান করিতে হইবে না যে, বাঙ্গালার তৎকালীন বৌদ্ধগণ কেবল তান্ত্রিকতারই অনুশীলন করিতেন। পরন্তু ইহা এখন বলিতে পারি, সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম হইলেও বিশুদ্ধ মহাযানের এমন কি বিজ্ঞানবাদের উপরেও কতকগুলি গ্রন্থ এই সময়েই রচিত হইয়াছিল। অর্থাৎ তান্ত্রিকতার চাপে পড়িয়া মহাযান ও বিজ্ঞানবাদ এই যুগে বাঙ্গালাদেশ হইতে অন্তর্ধান করে নাই।

Referchces :

(১) Ind. Cult., VI, pp.327 ff.
(২) Suvarnadvipa, R.C. Majmdar, Vol. I. p. 152.
(৩) Ibid, p. 336.
(৪) সা প প, ১৩৩৩, পৃঃ ৫৫।
(৫) মানসী ও মর্মবাণী, ১৩২৯, পৃঃ ৪৮২।
(৬) HBDU, p. 135
(৭) The Gods of Northern Buddhism, Alice Getty, p. 59
(৮) Mahabodhi, Cunningham, p. 55 দ্রষ্টব্য
(৯) ভারতী, ১৩০৮, পৃঃ ১৫১-১৫২, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ।
(১০) Ann Rep. of Cacca Museum for 1939-40p.8

"বাঙ্‌লার বৌদ্ধশিল্প ও ভাস্কর্য কথা"

সাধন চন্দ্র সরকার*

সমগ্র বাঙ্‌লার বৌদ্ধশিল্প ও ভাস্কর্যের সন্ধান ও প্রতিবেদন এক বিশাল ও ব্যাপক বিষয়। তাই বর্তমান নিবন্ধের সীমিত পরিসরে আলোচ্য বিষয়ের পদে পদে অবিচার হওয়ার সম্ভাবনা অতি প্রবল। "বাঙ্‌লা" শব্দটি দ্বারা প্রাচীন অবিভক্ত বঙ্গদেশের কথাই বুঝিয়েছি; কারণ বর্তমান বাংলাদেশের প্রাপ্ত বা আবিষ্কৃত শিল্প ও ভাস্কর্য সামগ্রীর আলোচনা ব্যতীত বাঙ্‌লার বৌদ্ধ শিল্প ও ভাস্কর্য চর্চা ও অনুসন্ধানের কথা বলা নিরর্থক। বাঙ্‌লার বৌদ্ধ শিল্প এর বহু নিদর্শন উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গেই আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্ববঙ্গ অর্থাৎ বর্তমানের বাংলাদেশ-রাজশাহী দিনাজপুর ও বিক্রমপুর বহুল বৌদ্ধশিল্পসম্ভারে পূর্ণ। অধুনা পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে কিছু কিছু শিল্প-ভাস্কর্য নিদর্শন পাওয়া গেলেও বাংলাদেশে ময়নামতী, রাজশাহীর ভাস্কর্য সম্পদ উপক্ষেণীয় নহে বরং পরিপূরক। অত্যন্ত বেদনার সঙ্গে জানাই যে যে-কোন শিল্পসম্বন্ধীয় নিবন্ধ প্লেট বা নক্সা বর্জিত হলে তার মূল্য থাকে না। কিন্তু উপযুক্ত কর্ত্তৃপক্ষের অনুমতি ছাড়া ছবি বা প্লেট সংযোজন আইনানুগ নয় বলে আমার পক্ষে তা দেওয়া সম্ভব হোল না। পাঠকগণের কাছে আমি তার জন্য মার্জনা ও সহানুভূতি প্রার্থনা করি। উৎসুক ও বিদগ্ধ পাঠকবর্গ প্রবন্ধের শেষে পুস্তকাবলীর তালিকা থেকে অনুগ্রহ করে ছবি গুলির (Plate) পরিচয় পেতে পারেন।

বঙ্গদেশে বৌদ্ধশিল্প ও ভাস্কর্যের কথা বলার প্রারম্ভে ভারতবর্ষে বৌদ্ধশিল্পচেতনা কীরূপে উদ্ভূত হয় সে-বিষয়ে অতি সংক্ষিপ্ত আকারে দু'এক কথা প্রাক্‌কথনে আবশ্যিক বলে মনে করি।

ধর্মীয় শিল্প সাধারণত: ধর্মীয় আচার্যদের কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে। এঁদের মূর্তিপূজা ও বন্দনা দিয়ে শুরু হয়ে মন্দির, মঠ, বিহার ও নানাবিধ স্মৃতিস্তম্ভের এবং তদানুসারী দেব-দেবী, ভক্ত, উপাসক ও মূর্তি সৃষ্টির দ্বারা ভিন্ন ভিন্ন শিল্প-সংগঠন উদ্ভূত হয়। বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রে গৌতমবুদ্ধের উপদিষ্ট পালি দীঘনিকায়ের 'মহাপরিনিব্বান সুত্তে' শিষ্যদের প্রতি তাঁর মূর্তি গড়ার নিষেধ ও স্তূপ-পূজার বিকল্প নির্দ্দেশ বৌদ্ধ শিল্প ও ভাস্কর্যের উদ্ভবকে কালক্রমে উৎসাহিত করে। পরবর্তী-সময়ে কালপ্রবাহের স্বাভাবিক নিয়মে মহাযানীয় বৌদ্ধধর্মের চিন্তাধারার প্রভাবে বুদ্ধদেবের মূর্তি-সৃষ্টি এক অপ্রতিরোধ্য বাস্তব সত্যরূপে গৃহীত হয়। ভগবান বুদ্ধের এই মূর্তি-কল্পন গান্ধার রীতি সংস্কৃতির নৈকট্যে হোক অথবা ভারতের নিজস্ব মথুরা শিল্পরীতির আদর্শেই হোক— বুদ্ধমূর্তি সৃষ্টি বা উদ্ভবকে এড়িয়ে

*ড: সাধন চন্দ্র সরকার গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের পালি বিভাগের প্রাক্তন রীডার ও ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ।

যাওয়া সম্ভব ছিল না। অনিবার্য বিষয় হয়েই বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় চারশত বছর পর প্রকাশ হল বুদ্ধদেবের মূর্তি। এ কথা অনস্বীকার্য মহাযানীয় বৌদ্ধধর্মের চিন্তাভাবনা,— বুদ্ধের অলৌকিকতা আরোপন, আদিবুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বতত্ত্বের উদ্ভবে-ই বৌদ্ধ শিল্প চর্চার সূত্রপাত হয় এবং কালক্রমে বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যের ক্রমোত্তর বিকাশ ভারতীয় শিল্পকে এক বিশেষ মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করে। দ্বিধাহীন ভাবেই বলা চলে ভারতীয় শিল্প চর্চার ভিত্তি বৌদ্ধশিল্প-চর্চার মাধ্যমেই গড়ে ওঠে। প্রকৃতপক্ষে ভারতশিল্পের জিজ্ঞাসুর পক্ষে বৌদ্ধ শিল্প ও ভাস্কর্য গঠন ও দর্শন হল 'Gateway of Indian Arts'। ভারত শিল্প ও ভাস্কর্য-চর্চা তাই বৌদ্ধশিল্পচর্চাকে বাদ দিয়ে একান্তই অসম্ভব ও নিরর্থক। ভারতের বৌদ্ধশিল্প চর্চা, ভারহুত, সাঁচী প্রভৃতির স্তূপ-ভাস্কর্য বুদ্ধ- বিমূর্ত উপস্থাপনার দ্বারা সূত্রপাত ঘটে থেরবাদীয় আদর্শের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ। বুদ্ধদেবের অনুপস্থিতি তাই শিল্পে সংরক্ষিত। স্তূপ-ভাস্কর্য শিল্প ক্রমে ক্রমে বিশ্বজনীনতায় স্বীকৃতি লাভ করে তা বর্হিভারতের স্থানে স্থানে-বর্মা, ইন্দোনেশিয়া, জাভা, শ্রীলংকা প্রভৃতি দেশে স্তূপ প্রতিষ্ঠার দ্বারা সূচিত। যদিও স্তূপগুলিতে মূর্তিসংযোজনও হয় কালধর্মের বাস্তবতা স্বীকার করেই। তারই পরিণতি স্বরূপ থেরবাদী ও মহাযানীয় ধর্মের দেশগুলিতেও স্তূপ গড়ার সঙ্গে সঙ্গে বুদ্ধমূর্তি সহ বৌদ্ধ শিল্প সংস্কৃতির ধারা প্রবর্তিত হয়। শুধু পাথরেই নয়, কালের প্রভাবে মৃত্তিকা, ও বিভিন্ন ধাতব পদার্থেই বুদ্ধদেবের মূর্তি নির্মাণ বহুল ভাবেই শুরু হয়।

আলোচ্য নিবন্ধে 'বাঙ্‌লা' বলতে প্রাচীন পুণ্ড্র, সুহ্ম, বঙ্গ ও সমতট অঞ্চলকেই বুঝি। পাথরের অভাব থাকায় এ সব অঞ্চলে মূলতঃ পোড়ামাটি, তামা, ব্রোঞ্জ দ্বারাই বুদ্ধদেব ও বোধিসত্ত্বগণের মূর্তিসমূহ গড়া হত। প্রস্তরনির্মিত মূর্তিসমূহ এ অঞ্চলে আবিষ্কৃত হলেও ভাস্করবিদ্‌গণের ধারণা এই মূর্তিগুলো সম্ভবতঃ অন্যস্থানের থেকে বহন করে আনা হয়েছে। রক্তিম বেলেপাথরের নির্মিত বৌদ্ধ ও বোধিসত্ত্বমূর্তি সমূহ পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে— সেগুলি স্থানীয় শিল্পীদের তৈরী ছিল কিনা তা বেশ সংশয়ের বিষয়। যদিও ভারতের উত্তর চব্বিশপরগণার চন্দ্রকেতুগড় (বেঁড়াচাপা সন্নিকটস্থ) বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের প্রাপ্ত মস্তক এবং স্থাপত্য সংস্থান পশ্চিমবঙ্গেই প্রস্তর নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়। বৌদ্ধ উপাদান ছাড়া প্রাচীন যুগের পোড়ামাটির অন্যান্য আবিষ্কৃত পুরাতাত্ত্বিক দ্রব্যগুলি এখানকার প্রাচীনত্ব-ই প্রকাশ করে। তবে কতিপয় পুরাতত্ত্ববিদের অভিমত এগুলো অন্যস্থান থেকে বিভিন্ন কালে বিভিন্ন নৃপতি ও বণিকদের দ্বারা এস্থানে আনীত হয়। বগুড়ার (বর্তমান বাংলাদেশ) মহাস্থানের স্কন্দ ধাপ থেকে একটি রক্তিম প্রস্তরে নির্মিত মস্তকাবয়বের (torso) ভগ্নমূর্তি বর্তমানে কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ সংগ্রহশালায় রক্ষিত হয়েছে। মালদহ জেলার হান্‌করেইলে প্রাপ্ত বিষ্ণুমূর্তি এবং দিনাজপুরে আবিষ্কৃত একটি বিশালমূর্তির ভগ্নাবশিষ্ট মস্তকগুলি বাংলার প্রস্তরনির্মিত ভাস্কর্যের অস্তিত্বকে স্বীকার করে। এ সকল মূর্তি বা মূর্তির ভগ্নাবশেষসমূহ গুপ্তযুগের ভাস্কর্য ও শিল্পরীতির অনুকৃতি ফলস্বরূপ

বলেই ধারণা। চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত বৃহদাকারের বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বমূর্তিগুলি প্রকৃতপক্ষে কুষাণযুগের ভাস্কর্যের-ই প্রতিচ্ছবি বলে অনুমিত। কারণ এদের পোষাক পরিচ্ছদের বিন্যাস-রীতি ও দেহের অবয়ব সংস্থান কুষাণ রীতিতেই নির্মিত হয়েছিল। তথাপি বাঙ্গালীর চিত্তের কোমল-পেলবতার প্রভাব বিশেষভাবে পরিলক্ষিত। এই Plasticity বা নমনীয়তা বাংলার ভাস্কর্যের এক বিশিষ্টতা দাবী করলেও সম্ভবত: মথুরা বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিগুলিই প্রাথমিকভাবে পেলবতার দাবীদার। এ প্রসঙ্গে দিনাজপুরে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বমূর্তিগুলি এবং মুণ্ডিতমস্তক উন্মুক্ত চক্ষুবিশিষ্ট বুদ্ধমূর্তিতে মথুরা শিল্পের প্রভাবই পরিদৃষ্ট। অপরপক্ষে গুম্ফ, শ্মশ্রূ, মুখাবয়বের স্নায়ুসমূহের দার্ঢ্য গান্ধারশিল্পের অভিব্যক্তিও প্রকাশ করে। অতএব বাংলার এই ভাস্কর্য শিল্পে কুষাণ, মথুরা ও গান্ধার শিল্পের এক সমন্বয় বিশেষভাবে রক্ষিত। এই সব মূর্তি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে রূপায়িত হয়েছিল বলে ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত। গুপ্তযুগের সারনাথ বৌদ্ধ মূর্তিগুলির ভাস্কর্য রীতিও বাঙ্গলা সহ পূর্বভারতের ভাস্কর্যে প্রতিফলিত। প্রাচ্যদেশীয়গণ তাঁদের ভাস্কর্য শিল্পরীতিতে Plasticity বা নমনীয়তা ও ভাবপ্রবণতাকে (emotionalism) বিশেষ প্রাধান্য যে দিয়েছিলেন তা এই মূর্তিগুলির গঠনরীতিতে খুবই স্পষ্ট ও প্রকট। এই শৈলী পরবর্তীকালে রাজশাহী (বাংলাদেশ) এবং অন্যান্য অঞ্চলেও পরিলক্ষিত। বাংলার এই শিল্পশৈলী ভারতের মধ্যদেশীয় শৈলী থেকে ছিল সম্পূর্ণ ভিন্নতর। কেবল মাত্র প্রস্তরভাস্কর্যেই নয় তাম্র বা ব্রোঞ্জ-নির্মিত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তিগুলিতেও এই ভাবটি প্রকটিত।

গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্য প্রভাবজাত বুদ্ধ মূর্তিগুলির মধ্যে এ প্রসঙ্গে প্রথমে উল্লেখ্য বিহারৈলে প্রাপ্ত (বাংলাদেশের রাজশাহী জেলান্তর্গত) বুদ্ধের দণ্ডায়মান মূর্তিটি। বর্তমানে মূর্তিটি বাংলাদেশের রাজশাহীতে বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। মূর্তিটির নির্মাণ শৈলী থেকে ইহা খ্রীষ্টীয় পঞ্চম শতকের বলে অনুমিত। চুণারের বেলে পাথরের নির্মিত এই মূর্তিটি সারনাথ শিল্পকলার শৈলীর নিদর্শন। ধ্যানমগ্ন, দৃঢ়প্রসারিত নয়ন-পাত; চক্ষুদ্বয়, নাসিকারন্ধ্র ওষ্ঠাবয়ব-সংন্যাস, চীবর, উষ্ণীশ, পরিমিত অঙ্গসৌষ্ঠব সমূহ ও সর্বোপরি পেলবতা গুপ্তযুগীয় রীতিকে অতিক্রম করে বাংলার নিজস্ব শিল্পকলার সাবলীলতায় প্রতিষ্ঠিত। পশ্চিমবঙ্গের উঃ চব্বিশপরগণার কাশীপুরের সূর্যদেবের মূর্তিতেও অনুরূপ ভাব ও প্রকাশ বর্তমান।

বরেন্দ্র রিসার্চ ইনস্টিটিউটে সংরক্ষিত ব্রোঞ্জ নির্মিত বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর মূর্তিটিও গুপ্ত যুগের শৈলীরীতিতে বিবর্দ্ধিত। কুষাণ ও গুপ্তযুগীয় শিল্পধারার গ্রহণ ও বিবর্তনের মাধ্যমে বাংলার মূর্তিগুলি এক অপরূপ রীতির সৃষ্টি করে যাকে আমরা গৌড়ীয় রীতি বলে অভিব্যঞ্জিত করি।

গুপ্তযুগের পরেই পালযুগে বৌদ্ধমূর্তি ও ভাস্কর্যের এক পরিণত রূপ লাভ করে। বিশেষ করে ধাতু নির্মিত মূতিগুলিই এক উৎকৃষ্ট শিল্পের সৃজন করে বাংলা বৌদ্ধ শিল্পের এক নবায়ন সূচনা করে। গুপ্তযুগ থেকে পালযুগে উত্তরণে বঙ্গদেশের এই নূতন সৃজন শিল্পজগতের আঙিনায় এক বিশেষ অবদান রূপে চিহ্নিত।

পাহাড়পুরে ভাস্কর্যে অথবা পোড়ামাটির শিল্পে এর প্রকাশ মহত্তম বলে বিবেচিত। পাহাড়পুরের শিল্পসত্তায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম মিলে মিশে একাকার। উভয় ধর্মীয় শিল্পই এখানে অপরিহার্য-তাই বাংলার এই ভাস্কর্য তথা শিল্পরীতি একেবারেই নিজস্ব। পাহাড়পুরে যেমন রয়েছে হিন্দু দেবতা, (শিব, রাধাকৃষ্ণ, যমুনা, বলরাম, কৃষ্ণ, মহাভারতীয় দেব-দেবী) তেমনই বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তিতে ভারাক্রান্ত। পাহাড়পুরেই পূর্বভারতের ভাস্কর্যও শিল্পরীতির প্রকৃষ্ট স্ফুরণ ঘটেছিল। পূর্বেই একে গৌড়ীয় রীতি রূপে বলা হয়েছে। পালরাজ ধর্মপালের সময় বৌদ্ধগ্রন্থসমূহ যেমন অনূদিত, সম্পাদিত ও রচিত হয় তেমন-ই নালন্দার ধীমান ও তৎপুত্র বীতপাল নামে শিল্পীদ্বয় গৌড়ীয় শিল্প ও ভাস্কর্যের এক নূতন ধারা প্রচলন করেন। এঁদেরই শিল্পচর্চায় একই সঙ্গে বহু হিন্দু ও বৌদ্ধ দেবদেবীর মূর্তিও নির্মিত হয়।

একাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে বাঙ্গলা ও মগধে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক নূতন যুগের সূচনা হয়। মহীপাল ও নয়পাল এই পাল নৃপতিদ্বয়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সেই সময় মগধের বিক্রমশীল ও বাঙ্গলার সোমপুরী বিহার (বর্তমান বাংলা দেশে) শিল্পচর্চার সর্বোচ্চ শিখরে আরূঢ় হয়। গৌড়ীয় শিল্পধারাকে অনুসরণ করে বহু বৌদ্ধ দেব-দেবীর সুন্দর সুন্দর বিগ্রহ এই যুগেরই শিল্পসাধনা তথা চর্চার নিদর্শন রেখেছে। আরাধ্য দেবতার কঠোর ধ্যান-যোগী ভাব পাল যুগের বাঙ্গালীর কাছে গ্রহণীয় ছিল না— প্রকৃতিবিরুদ্ধ বলে। দেবতাগণের প্রসন্নতার আভাস, পরিতৃপ্তির চিহ্ন যদি ভক্তের কাছে না আভাসিত হয় তা হলে সেই শিল্পসৃষ্টি নিরর্থক। তাই পালযুগের রূপদক্ষগণ প্রদান করেন বৌদ্ধ ও হিন্দুদেবদেবীর এক কমনীয় রূপ—ড: কল্যাণ গঙ্গোপাধ্যায়ের কথায় ' সেই দেবতাদের মুখ হইবে ধ্যানানন্দে ঢল ঢল, এবং সেই মুখে থাকিবে হয় ধ্যানের আবেশ না হয় ভক্ত-হৃদয়ের উচ্ছল অনুরাগের গভীর তৃপ্তিতে মুদিয়া আসা আঁখি........ টোল খাওয়া দুই গালের মাঝে, ঠোঁটের কোণে কোণে ভাসিবে রহস্যমেদুর মৃদুমন্দ হাসি। মুখের দীপ্তিতে, চোখের ভাষায় ও ঠোঁটের হাসিতে প্রসন্ন দেবতা তাঁহার ভীরুভক্তকে দিবেন পূজার সার্থকতার আশ্বাস পলে, অনুপলে সর্বক্ষণ'।

পালযুগের শিল্পীরা (একাদশ-দ্বাদশ শতকে) মূর্তিতে অরূপ-দেবতাকে জীবন্ত রূপ দিলেন মৃতপাথরের গায়ে অথবা ধাতবমূর্তিতে। এরূপ ছিল বাঙ্গলার ভাস্কর্য শিল্পের এক লাব্যণময় আদর্শ। এই ভাবের প্রয়োগ বিশেষ করে বৌদ্ধ— মহাযানীয় দেবদেবী মারীচী, পর্ণশবরী, জাঙ্গুলী প্রভৃতির মূর্তিতেও প্রকটিত ছিল।

মহাযান ও বজ্রযানীয় মূর্তিগুলি ছাড়াও বাংলাদেশের পূর্ববঙ্গে ও উত্তরবঙ্গে যে সকল গৌতমবুদ্ধের মূর্তি আবিষ্কৃত বা নির্মিত হয়েছে তাও সংখ্যায় অপ্রতুল নয়। এই বুদ্ধমূর্তির অধিকাংশই ছিল ভূমিস্পর্শ মুদ্রায়। মথুরা শিল্পের অভয়মুদ্রা, ধ্যানমুদ্রার বুদ্ধ ও সারনাথ শিল্পের ধর্মচক্র মুদ্রার মূর্তিগুলি থেকে পালযুগের বুদ্ধমূর্তিগুলি রূপকল্পনার পার্থক্য চোখে পড়ার মত। বাঙ্গালী শিল্পীদের কাছে বুদ্ধের বোধিলাভ ঘটনাই সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ ছিল

বলেই বাঙ্গলার অধিকাংশ বুদ্ধমূর্তি ভূমিস্পর্শমুদ্রায় নির্মিত। নালন্দা ও বোধগয়ার ভূমিস্পর্শমুদ্রার বুদ্ধদেবের মূর্তিগুলিকে গৌড়ীয় শিল্প ও রীতিনীতির প্রভাবেই গড়া বলে অনেকের ধারণা। তবে ধ্যানমুদ্রা, ব্যাখ্যানমুদ্রার দুইটি মূর্তিও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহশালায় রক্ষিত। সমাধিমুদ্রার একটি বুদ্ধমূর্তি রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত। পদ্মাসনে উপবিষ্ট ধর্মচক্রমুদ্রার একটি ব্রোঞ্জমূর্তি ও বাংলাদেশের চট্টগ্রাম সংগ্রহশালায় রয়েছে। বজ্রপর্যঙ্ক-লীলায় উপবিষ্ট অন্য একটি বোধিসত্ত্বমূর্তি রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় দেখা যায়। তাই কেবলমাত্র ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বাঙ্গলার শিল্পিগণ বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করেন বললে নিশ্চিত ভ্রান্ত সিদ্ধান্ত।

পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দ্বিপদ্মাসনে উপবিষ্ট একটি বোধিসত্ত্বমূর্তি পাওয়া গিয়েছে। প্রধান মন্দিরের পূবদিকের সম্মুখের প্রাচীরে সারিবদ্ধ মধ্যে ভূমিস্পর্শ ও ব্যাখ্যানমুদ্রায় বুদ্ধমূর্তি দৃষ্ট। চারটি ধ্যানমুদ্রার বুদ্ধমূর্তি ঢাকা সংগ্রহশালায় রক্ষিত। এ-ছাড়া বিক্রমপুর জিলার চুড়াইল গ্রামে দ্বিপদ্মাসনে উপবিষ্ট ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় একটি বিরল দারুমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে এবং এটি এখন চট্টগ্রামের সংগ্রহশালায় সুরক্ষিত।

পাহাড়পুর ধ্বংসাবশেষ থেকে আবিষ্কৃত প্রাচীন একটি পদ্মপাণি বোধিসত্ত্ব-র মূর্তিটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দীর বলে অনুমিত। রাজশাহীর বরেন্দ্র অনুসন্ধান সমিতির সংগ্রহশালায় পদ্মপাণি অবলোকিতেশ্বরের চারটি মূর্তি রয়েছে তার মধ্যে একটি কষ্টিপাথরে তৈরী। বাঙ্গলায় পাথরের অপ্রতুলতা হেতু এই যুগে প্রাপ্ত বৌদ্ধ বা হিন্দুদেবদেবীর মূর্তিগুলি সম্ভবতঃ ভারতবর্ষের পশ্চিমাঞ্চল থেকে আনীত হয় অথবা পাথর নিয়ে এসে মূর্তিগুলি গড়া হয় বাংলার এক নিজস্ব-ধারায়। বজ্রযান মহাযান দর্শন যেমন বাংলার বৌদ্ধ চিন্তাধারাকে প্রভাবিত করেছিল অনুরূপ ভাবে ভাস্কর্য ও শিল্পেও এর বহুল প্রভাব বাংলার শিল্পজগতে পরিলক্ষিত হয় বিশেষ করে পাল যুগেই। বড়ই বিস্ময়ের ব্যাপার যে মহাযানীয় বৌদ্ধধর্মের চিন্তা ও আদর্শ 'আদিবুদ্ধ' কেন্দ্রিক হলেও মহাযান, বজ্রযান, তন্ত্রযান প্রভাবিত বাঙ্গলার শিল্পভাস্কর্যে 'আদিবুদ্ধের' একটি মূর্তিও আবিষ্কৃত হয় নি। আদিবুদ্ধ দর্শনতত্ত্ব মূলতঃ কাশ্মীর, নেপাল, তিব্বত দেশে প্রাধান্য লাভ করে। ফলতঃ এসব স্থানে আদিবুদ্ধের শিল্পায়ন স্বাভাবিক ছিল। কিন্তু আরও আশ্চর্য্যের বিষয় আদিবুদ্ধ সম্ভূত বিভিন্ন ধ্যানীবুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের (অবলোকিতেশ্বর, লোকনাথ, খসর্পণ, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, মঞ্জুবর এবং তৎসহ তাদের শক্তি দেবীকুলের যথা মারীচী, তারা, জম্ভলা, পর্ণশবরী) তান্ত্রিক রূপগুলি বাঙ্‌লায় প্রচুর পরিমাণে আবিষ্কৃত হয়েছে রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রাম, কুমিল্লা ও সমতটের বিভিন্ন জায়গায়, ভিক্ষু সুনীথানন্দ 'বাংলাদেশের ভাস্কর্য' গ্রন্থে চিত্রসহ এদের বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছেন। এ সব দেবদেবীর জন্য পাঠকবর্গকে শ্রদ্ধেয় সুনীথানন্দের গ্রন্থখানি দেখতে অনুরোধ করি। আদিবুদ্ধ ও পঞ্চধ্যানীবুদ্ধ ব্যতীত সাধনমালা গ্রন্থে উল্লিখিত একটি ষষ্ঠ ধ্যানী বুদ্ধের কথা

উল্লিখিত। ঢাকার সুখবাসপুরে, বীরাসনে উপবিষ্ট বজ্রসত্ত্বের অনুরূপ মূর্তিটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সংরক্ষণশালায় সংরক্ষিত দৃষ্ট। উক্ত যাদুঘরে গৌড়ীয় শিল্পের আদর্শে নির্মিত লোকনাথের উপবিষ্ট মূর্তি দৃষ্ট। বিবিধ অলঙ্কারে ভূষিত বোধিসত্ত্ব পদ্মপাণির সুসজ্জিত একটি ব্রোঞ্জমূর্তি চট্টগ্রাম থেকে পাওয়া গিয়েছে। পূর্বেই বলা হয়েছে যে পাহাড়পুরের ধ্বংসাবশেষের মধ্যে খ্রীষ্টীয় সপ্তম বা অষ্টম শতাব্দীর একটি পদ্মপাণির প্রস্তরনির্মিত মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। প্রস্তর বা ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি ছাড়াও একটি পিত্তল-নির্মিত (আনুমানিক একাদশ শতাব্দীর) পদ্মপাণির মূর্তিও আবিষ্কৃত হয়েছে।

বেলেপাথরে নির্মিত সিংহনাদ লোকেশ্বর ও অবলোকিতেশ্বরের প্রস্তর মূর্তি রাজশাহী—চিত্রশালায় সংরক্ষিত।

ত্রিপুরা থেকে আনীত খসর্পণ লোকনাথের মূর্তিটি ঢাকার সংগ্রহশালায় দৃশ্যমান। ভারতের মালদহের রাণীপুরে আবিষ্কৃত চর্তুভুজা ষড়ক্ষরী লোকেশ্বরের মূর্তিটি মালদহ-চিত্রশালায় সুরক্ষিত। বিশেষ ভাবে লক্ষণীয় যে এই মূর্তিটি অবলোকিতেশ্বর-বোধিসত্ত্বের একটি বিচিত্র রূপ মাত্র। মূর্তিটির সম্মুখদেশের হস্তদ্বয় অঞ্জলি-ভঙ্গিমায়, পেছনের বাঁ হাতে পদ্মফুল ও ডানদিকের হাতে অক্ষমালা সন্নিবেশিত। মাথার জটামুকুট থেকে এই মূর্তিটি চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রস্তর, ব্রোঞ্জ ও তাম্রধাতুর বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি নির্মিত হলেও ঢাকার সোনারবঙ্গে একটি কাষ্ঠনির্মিত লোকনাথের মূর্তিটি বিশেষ উল্লেখ্য। ললিতাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটি কিয়দংশ ভগ্ন অবস্থায় প্রাপ্ত। পুরুষমূর্তি ব্যতীত শক্তির প্রতীক বেশ কিছু দেবীমূর্তিও বাঙ্গলায় আবিষ্কৃত হয়েছে। স্পষ্টত:ই এগুলি তান্ত্রিক বৌদ্ধমতের দেবী। এদের মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য শ্যামতারা, পীততারা, সিতাতপত্রা (শ্বেততারা)। মূর্তিগুলি হয় বেলেপাথরের নতুবা কষ্টিপাথরে নির্মিত। নবম শতাব্দী থেকে দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত এই মূর্তিগুলির নির্মাণ কাল বলা চলে। ইহাদের অধিকাংশ-ই বাংলাদেশের ঢাকা, চট্টগ্রাম ও বগুড়ার সন্দর্শনশালায় সুরক্ষিত। এদের বিস্তৃত বিবরণ দেওয়া থেকে বিরত হলাম পরিসরের সীমাবদ্ধতায়। আনুমানিক সপ্তম শতাব্দীতে ব্রঞ্জ নির্মিত ও স্বর্ণপাতে অলংকৃত, রৌপ্যনেত্রে খচিত একটি তারামূর্তির বগুড়া জেলা থেকে আবিষ্কার বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য।

অবলোকিতেশ্বরের পরেই বোধিসত্ত্ব মঞ্জুশ্রীর পূজা বন্দনা গুপ্তযুগেই বাঙ্গালায় প্রচলিত হয়। মঞ্জুশ্রী হলেন বিদ্যার অধিষ্ঠাত্রী বাগীশ্বরীর বিকল্প বৌদ্ধরূপ। এই মূর্তিগুলি বাংলাদেশের ঢাকায়, রাজশাহীর তালন্দায়, ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বীরভূমে (বরাগ্রাম), ত্রিপুরায় বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গিয়েছে। এই সব মূর্তি বিভিন্ন ভঙ্গিমা, মুদ্রাসন প্রস্তর ও ব্রোঞ্জ নির্মিতরূপ। বড়ই দু:খের বিষয় যে পাহাড়পুরে মৃত্তিকা বা প্রস্তর নির্মিত কোন মঞ্জুশ্রীমূর্তি পাওয়া যায় নি।

মঞ্জুশ্রীর পরেই সর্বাপেক্ষা লোকপ্রিয় দেবতা মূর্তি হল মারীচী (উপদেবী) হারীতি,জম্ভলা,

হেরুক, হে-বজ্র প্রভৃতি। বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চল (বিক্রমপুর, রাজশাহী, ঢাকা, পাহাড়পুর, চট্টগ্রাম) থেকে এবং ভারতের মুর্শিদাবাদ (আজিমগঞ্জ), উত্তরবঙ্গ, ত্রিপুরা (বড়কামতা), দিনাজপুরে আবিষ্কৃত হওয়ার পর কোলকাতা, রাজশাহী, ঢাকা, চট্টগ্রামের বিভিন্ন সংগ্রহশালায় সংগৃহীত হয়েছে। এক কথায় অবিভক্ত বাঙ্‌লায় প্রাপ্ত বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব ও অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তি গুলির অধিকাংশই মহাযান, বজ্রযান, তন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাবেই নির্মিত হয়। এদের নির্মাণ কাল কুষাণ-গুপ্ত যুগ থেকে পালযুগ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলে ঐতিহাসিক গণের ধারণা।

বৌদ্ধধর্মের সাহিত্য ও ভাস্কর্য শিল্পচর্চা ছিল বিহার ও চৈত্য কেন্দ্রিক। যদিও কিছু কিছু নির্মাণ বণিক, নৃপতি ও সাধারণ উপাসকের উৎসাহে গড়ে উঠেছিল। বিহারগুলি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের আবাসস্থল, এখানে চর্চিত শাস্ত্র ও শিল্পকলা বঙ্গদেশে তথা সমগ্র বিশ্বে প্রসারিত হয়। বিহারের বিভিন্ন পরিবেণ বা কোষ্ঠেই তাঁরা বাস করতেন, আবার কোন কোন ভিক্ষু বিভিন্ন প্রাসাদ ও গুহায় অবস্থান করতেন। কিন্তু বিহার ও গুহাগুলিই মূলতঃ বৌদ্ধধর্ম ও শিল্পচর্চার কেন্দ্রবিন্দু। পরিবেণগুলি ছিল বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের বিদ্যামন্দির। বিহারগুলি যে রাজা, বণিক, উপাসকগণের অকাতর অর্থদানে গড়ে উঠত তা বিভিন্ন শিলালেখ, তাম্রপট্টোলী থেকে জানা যায়। 'বিহার-দান'-কে 'ধম্মদান' বলে উপাসকগণ মনে করতেন। বিহারকে সুসজ্জিত করবার জন্য বিভিন্ন অলংকরণ সৃজন বৌদ্ধ ভাস্কর্যকে শিল্পক্ষেত্রে এক নূতন প্রতিষ্ঠা প্রদান করেছে।

পাল রাজাদের বহুপূর্বেই যে বঙ্গদেশে বহু বিহার বা সঙ্ঘারাম ছিল তা চীনা পরিব্রাজিক ফা-হিয়েন, হিউয়েন-সাঙ্‌ ও ইৎসিঙের প্রদত্ত বিবরণ থেকে অবগত হই। তিব্বতী ঐতিহাসিকগণের বিবরণ থেকেও বাংলার বৌদ্ধধর্ম তথা ভাস্কর্যের অস্তিত্ব বিষয়ে বিবরণ লিপিবদ্ধ হয়েছে। হিউয়েন-সাঙ্‌ উত্তরবঙ্গের পুণ্ড্রবর্ধনে কুড়িটি, সমতটে ত্রিশটি ও তাম্রলিপ্তিতে (ভারতের তমলুক) দশটি বৌদ্ধ বিহারের অবস্থানের কথা জানিয়েছেন। ভারতের মুর্শিদাবাদের কর্ণসুবর্ণতে দশটি ও পুণ্ড্রবর্ধনের বিহারগুলি সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য। কর্ণসুবর্ণ সম্বন্ধে অধুনা আবিষ্কারের কথা পরে বিবৃত হবে। বগুড়ার মহাস্থানের নিকট আবিষ্কৃত 'ভাসু-বিহার'-এর ধ্বংসাবশেষ সম্ভবতঃ হিউয়েন-সাঙ্‌ বর্ণিত 'পো-চি-পো' বিহারটি। কর্ণসুবর্ণের সঙ্ঘারামটি অভিহিত ছিল 'রক্তভিটি' বা 'রক্তভিত্তি' রূপে। বাংলাদেশের সোমপুর-বিহারটিও বৌদ্ধ স্থাপত্যের এক অনবদ্য নিদর্শন। পাহাড়পুর খননের দ্বারা যে ক্রুশাকার মন্দিরটি আবিষ্কৃত হয় তন্মধ্যেই সোমপুরী-বিহারের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই বিহারটিও ধর্মপালের পুত্র দেবপালের পৃষ্ঠপোষকতায় নির্মিত হয়েছিল বলে তিব্বতী ও অন্যান্য ঐতিহাসিকগণের ধারণা।

'বিক্রমপুরী বিহার' নামক আর একটি বিহারের উল্লেখ থেকে মনে হয় বাংলাদেশের

ঢাকা জেলার বিক্রমপুরেই এই বিহারটি ছিল। ধর্মপালের শাসনকালে 'ত্রৈকূটক-বিহার' নামে আর একটি বিহার বাংলাদেশে ছিল বলে বৌদ্ধশাস্ত্রে উল্লেখ করা হয়েছে। আচার্য হরিভদ্র, তাঁর 'অষ্টসাহস্রিকা প্রজ্ঞা পারমিতা'র উপর প্রসিদ্ধ টীকাটি এই বিহারে অবস্থানকালে রচনা করেন। কিন্তু বিহারটির অবস্থানপ্রদেশ আজ পর্যন্ত অজ্ঞাত। অনুরূপভাবে চট্টগ্রামের 'পণ্ডিত-বিহার'টি একটি বৃহদায়তনের বিহার ছিল বলে বৌদ্ধ সাহিত্যে উল্লিখিত হলেও সঠিকভাবে এর স্থান নির্ণীত হয় নি। বৌদ্ধ সাহিত্যে বর্ণিত প্রসিদ্ধ কাশ্মীরের 'কণকস্তূপ-' বিহারটি সম্ভবত: বাংলাদেশের কুমিল্লা জিলার পট্টিকেরকে অবস্থিত ছিল। 'পট্টিকের' কাহার-কাহার মতে চট্টগ্রাম সন্নিহিত অঞ্চল ছিল।

কুমিল্লার নিকট ময়নামতীতে মূর্তিসহ ইষ্টক-নির্মিত একটি সৌধ বা নির্মাণ-সংস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে। এর বিষয়ে পরে বিস্তৃতভাবে আলোচনার ইচ্ছা রইল, 'আনন্দবাজার-প্রাসাদ' নামে পরিচিত যে স্তূপটি ময়নামতীতে প্রসিদ্ধ তাকে একটি বৌদ্ধস্তূপ বলেই মনে করা হয়।

রামপাল নির্মিত (একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দী) জগদ্দল মহাবিহারটি সোমপুরী বিহারের পরে অত্যন্ত প্রসিদ্ধি লাভ করে। এটি গঙ্গা-করোতয়া নদীর সংগমস্থলে রামাবতী নগরীর উপস্থ ছিল। এই বিহারে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর ও মহাতারার মূর্তিটি প্রতিষ্ঠিত হয়। বাংলাদেশের প্রত্নতাত্ত্বিকগণ উৎখননের দ্বারা জগদ্দল মহাবিহার-টি বাংলাদেশের উত্তরাঞ্চলে অবস্থিত ছিল বলে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন। তৎকালে এই বিহারে বিভিন্ন স্থান থেকে আগত পণ্ডিতগণ শাস্ত্রচর্চার দ্বারা এই বিহারটি বিশেষ বৌদ্ধপীঠে পরিণত করেন।

পশ্চিমবঙ্গের নদীয়া জিলার কৃষ্ণনগরের নিকট সুবর্ণ-বিহারস্তূপটির (তিব্বতী গ্রন্থে বর্ণিত) উল্লেখ রয়েছে।

খ্রীষ্টীয় সপ্তমশতকে গুপ্তযুগীয় শাসনব্যবস্থার অবসানে বঙ্গদেশে যে অরাজকতা সৃষ্ট হয় (খালিমপুর তাম্রশাসনে উল্লিখিত) তাঁকে অতিক্রম করে পাল রাজাদের স্থিতিশীলতার ফসল বঙ্গ-রাঢ় মগধ ও বরেন্দ্র-তে এক নূতন শিল্পযুগের সূচনা হয়।

গুপ্তযুগ থেকে পালযুগ পর্যন্ত ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতির বিস্তৃত প্রভাব সাহিত্যে বিধৃত হলেও তুলনায় শিল্পক্ষেত্রে তার প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম ছিল। হিউয়েন সাঙের বর্ণিত ভ্রমণবৃত্তান্তে অসংখ্য বৌদ্ধ বিহারের কথা উল্লেখ থাকলেও আনুপাতিক ভাবে হিন্দু-মন্দিরের কথা কম। পাহাড়পুরে কিন্তু হিন্দু-বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের এক সম্মিলিত সৃষ্টিকলার সাক্ষর রয়েছে। পাল রাজগণ নিজেরা মহাযানী বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী হলেও তাঁদের মন্ত্রিপরিষদবর্গের অনেকেই ব্রাহ্মণ্যধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন। তাই এই যুগে বৌদ্ধ-ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনুপ্রেরণা বৌদ্ধ ব্রাহ্মণ্য মিলন ভিত্তিক এক সুসমৃদ্ধ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডল গঠনে সহায়ক ছিল। যার প্রতিফলনই শিল্পকলায় দৃষ্ট হয়। পালযুগের শিল্পীরাও গৌড় অঞ্চল থেকে অন্যত্র গিয়ে তাঁদের শিল্পপ্রতিভা

ও শিল্পরীতিকে পূর্ণভাবে বিকশিত করেন। নারায়ণ পালের ভাগলপুরের তাম্রলিপিতে মংখ/মংগদাস নামে এক শিল্পীর কথা উল্লিখিত। এই শিল্পীরা তাদের নিজস্ব শিল্পসত্তার দ্বারা এমনকি ব্রাহ্মণ্য পুরাণ নির্দেশিত শিল্পরীতিকে অতিক্রম করে এক নূতন শিল্প-রীতির প্রবর্তন করেন। ক্লান্তিদায়ক এই এক-ঘেয়েমির মধ্যে দীর্ঘকাল শিল্প আপনার প্রাণধর্ম বজায় রেখে প্রতিমার বৈচিত্র্য, প্রসন্নতা ও ভাব-সৌন্দর্যের সঞ্চারে পরাঙ্মুখ হয়নি। ফলে পাল-আমলে সেই সুদৃঢ় শাস্ত্রবেষ্টনীর মধ্যেই একটি প্রাণবন্ত আলোক সমৃদ্ধ সুষ্ঠু শিল্পের রূপানুভূতি লক্ষ্য করা যায়। কৃষ্ণপ্রস্তরে বা ধাতুতে রূপায়িত মূর্তির ক্ষীণ দৃঢ়বদ্ধ স্পর্শশীল তনুদেহ, মণ্ডন-নৈপুণ্যে সমৃদ্ধ অলংকার, সূক্ষ্মভাবহীন পরিচ্ছদ, আনন্দের প্রশান্ত মাধুর্য, পদদ্বয়ের অটলতা পালযুগের প্রতিমাশিল্পকে এক অপূর্ব মহিমায় মণ্ডিত করে রেখেছিল। সেন-যুগে কিন্তু এই শিল্পের ধারণা ও রীতি বজায় রইল না নানাবিধ রাজনৈতিক, ধর্মীয় ও সামাজিক কারণে।

বঙ্গদেশে অধুনা আবিষ্কৃত কয়েকটি উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী

ভারতের পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন স্থানে এবং বাংলাদেশের বেশ কয়েকটি অঞ্চলে দুটি দেশের আর্কিওলজিকাল সার্ভের প্রচেষ্টায় কিছু কিছু নূতন বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান অথবা পুরানো বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলির নূতনভাবে পুরাতাত্ত্বিক সমীক্ষা ও অনুসন্ধান কালে যে সব পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী ও স্থাপত্য অবয়ব বা গঠন আবিষ্কৃত হয়েছে তাতে সমগ্র বঙ্গদেশের বৌদ্ধ সংস্কৃতির নূতন পরিচয় ও দিগন্ত উদ্ভাসিত হচ্ছে দিনে দিনে। এদের সব বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয় বলে দু'একটি স্থানের কথা অতি সংক্ষেপে বিবৃত হোল। পশ্চিমবঙ্গস্থ উত্তর চব্বিশপরগণার বেড়াচাঁপা, বর্ধমানের পাণ্ডুরাজার ভিটা, মুর্শিদাবাদের রাজবাড়ীডাঙ্গাস্থ কর্ণসুবর্ণের, মালদহের জগজ্জীবনপুর এবং বাংলাদেশের ময়নামতী, পাহাড়পুর প্রভৃতি অঞ্চলের ঐতিহাসিক তথ্যকে ভিত্তি করে বারে বারেই পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান বহুদিন ধরেই চলেছে। এদের মধ্যে-মালদহের জগজ্জীবনপুর, বাংলাদেশের সমতটস্থ (প্রাচীন পট্টিকেরার শহরটি) ময়নামতীর ধ্বংসাবশেষ ও বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের কথাই কিছু বলব। প্রসঙ্গক্রমে মুর্শিদাবাদস্থ রাজবাড়ীভাঙ্গা ও কর্ণসুবর্ণের কিছু আবিষ্কৃত তথ্য ও সম্পদ বিষয়ে বলার 'ইচ্ছা রইল।

জগজ্জীবনপুরের নন্দদীর্ঘি-বিহারটি পশ্চিমবঙ্গের পুরাতত্ত্ববিভাগের-তত্ত্বাবধানে ও প্রচেষ্টায় অতিসম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়ে বাংলাদেশের প্রাচীন বৌদ্ধ স্থাপত্য ভুমি ও ইতিহাস সম্বন্ধে এক নূতন ধারার সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। এই বিহারটি পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জিলায় অবস্থিত। জগজ্জীবনপুর (উ: অক্ষাংশ ২৫°০২'২৪" পূর্ব দ্রাঘিমায় ৮৮°২২'৮২") স্থানটি মালদহ শহরের পূর্ব দিকের ৪১ কি.মি. দূরে অবস্থিত এবং বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার অতিসন্নিকটস্থ। এই স্থানে একটি বৌদ্ধবিহারের অস্তিত্ব, বিভিন্ন বোধিসত্ত্ব মূর্তি এবং পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী সমূহ খননকালে আবিষ্কৃত হয়েছে। তুলাভিটায় অবস্থিত একটি ঢিবি খনন ১৯৯৫ থেকে শুরু হয় এবং ২০০০ সাল পর্যন্ত খননের দ্বারা যে বিহারের নক্সার

নিদর্শন পাওয়া গিয়েছে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এ পর্যন্ত খনন কার্যে ৮৩টি পরিখা সৃষ্ট হয়েছে এবং পরিখাগুলির জমির আয়তন মোট ২৯৮৮ বর্গমিটার। আরও ৯৯টি পরিখা খনিত হলে এই বিহারটির সম্বন্ধে বিশদ ধারণা করা সম্ভব হবে। বিহারটির নক্সার থেকে স্পষ্ট যে এই বিহারটি খ্রীষ্টীয় নবমশতাব্দীর এবং বিহারের ভাগলপুরস্থ বিক্রমশীল বিহারটির শিল্পরীতি ও নক্সায় নির্মিত। ইষ্টক নির্মিত বিহারটি চতুর্দিকে প্রসারিত অক্ষ থেকে দুর্গাকারের প্রতিচ্ছবি প্রদান করে। এই বিহার ও স্তূপটির আবিষ্কারের ফলে প্রাচীন বঙ্গ ইতিহাস সম্বন্ধে এক নূতন তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। এই স্থানে আবিষ্কৃত পালরাজ মহেন্দ্রপালের একটি তাম্রশাসন লিপির মাধ্যমে পালশাসনের নূতন ইতিহাসটি উদঘাটিত হয়েছে। এই তাম্রশাসন লিপিতে উল্লিখিত রাজা মহেন্দ্রপাল রাজন্যপুরুষ ও জনতার সম্মুখে ঘোষণা করেন যে তাঁর অন্যতম সেনাপতি বজ্রদেব নন্দদীর্ঘিকা উদ্রঙ্গের নিকটবর্তী স্থানটি বৌদ্ধ দেবতাগণের পূজাবন্দনা এবং সংরক্ষণের জন্য দান করলেন তাঁর পিতৃদেব, নিজের এবং অন্যান্য প্রাণিদের পুণ্যার্জ্জনের জন্য। তাম্রশাসনটি থেকে আরও জানা যায় পুণ্ড্রবর্দ্ধন ভুক্তির অন্তর্গত কুদ্দালখাতক বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত ছিল। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও তাম্রশাসনটি খুব গুরুত্বপূর্ণ, কারণ মহেন্দ্রপাল নামক কোন পালবংশের রাজার নাম অপরিজ্ঞাত থাকায় এই তাম্রশাসনটি ও বিহারের আবিষ্কার পশ্চিমবঙ্গ তথা বাংলাদেশের বৌদ্ধ ইতিহাসে একটি নূতন তথ্যও সংযোজিত করেছে। এ স্থলে প্রাপ্ত একটি পোড়ামাটির সীলমোহর থেকে এই বিহারটির অস্তিত্ব আরও স্পষ্ট হয়েছে। মুদ্রাফলকে (সীলিং) লিখিত "শ্রীবজ্রদেব কারিত নন্দদীর্ঘিকা বিহারিয় আর্য-ভিক্ষু-সংঘস্য। অতএব এই লেখা থেকেও প্রত্যায়িত যে বজ্রদেব এই বিহারটি নির্মাণ করে 'নন্দদীর্ঘিকা' নামে অভিহিত করেছিলেন। সীলটি (Seal) বা মুদ্রাফলকে একটি ধর্মচক্র উদগত রয়েছে এবং চক্রটির দুই পাশে দুটি উপবিষ্ট মৃগের অবস্থান থেকে ভগবান বুদ্ধের ধর্মচক্র প্রবর্তনের ঘটনাকেই আভাসিত করে। এই শীলমোহর বা ফলকটি নৃতত্ত্ববিদ্‌গণ খ্রীষ্টীয় দশম শতাব্দীর বলেই মনে করেন। নন্দদীঘি বিহারটি যে একটি জলাশয়ের পাড়েই অবস্থিত ছিল তাহাও সুনিশ্চিত। বড়ই বিস্ময়ের বিষয় যে 'নন্দদীঘি' নামে একটি জলাশয় এই স্থানে আজও বিদ্যমান। জগজ্জীবনপুরস্থ 'নন্দদীঘি বৌদ্ধবিহার'টি মোটরপথে আহিও বুলবুলচণ্ডী, হাবিবপুর এবং বাহাদুরপুর হয়ে পৌঁছানো যায়।

পূর্বেই বলা হয়েছে তুলাভিটা (সলাইডাঙা) ঢিবিটি উৎখননকালে পালরাজ মহেন্দ্রপালের যে তাম্রপট্টোলিটি আবিষ্কৃত হয় তাতে পট্টোলিটির উভয়পৃষ্ঠে সিদ্ধমাতৃকা লিপিতে (খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দী) সংস্কৃতভাষায় লেখা এবং ধর্মচক্রমুদ্রায় উৎকীর্ণ একটি সীল মোহর (ফলক) রয়েছে। এই তাম্রশাসনটিতে পালবংশের লুপ্ত ও অজ্ঞাত রাজা মহেন্দ্রপালের নাম উৎকীর্ণ হওয়া (৮ -১২ শতাব্দী) ঐতিহাসিকগণের নিকট এক অমূল্য তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। ফলে পাল রাজবংশের ইতিহাস নূতন ভাবে জানার সুযোগ ঘটেছে। এ ছাড়া কুদ্দাল-ক্খাতক এবং দর্দবন্তী মণ্ডল নামে দুইটি শাসন সঞ্চালন কেন্দ্র যে পাল রাজবংশের অধীন

ছিল তাও অবগত হওয়া যায়। এখানে প্রাপ্ত পুরাতাত্ত্বিক ও স্থাপত্য সম্ভার বা সামগ্রী-নিচয়ের মধ্যে কয়েকটির বিবরণ সংক্ষেপে প্রদত্ত হল।

১) তাম্রনির্মিত বুদ্ধের মূর্তি

ক্ষুদ্রাকার তাম্রও ব্রোঞ্জনির্মিত মূর্তি ডঃ গৌতম সেনগুপ্ত ও ড: অশোক ভট্টাচার্য কর্তৃক এস্থলে উদ্ধার করা হয়েছে। বর্তমানে মালদহ জেলার সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত আছে।

(২) ১৯৯৮ সালে আবিষ্কৃত কৃষ্ণপ্রস্তর নির্মিত বুদ্ধমূর্তিটি বিশ্বপদ্মের উপরে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন দৃষ্ট। পদ্মাসনের ভূমিপৃষ্ঠে একটি বজ্র উৎকীর্ণ এবং পদ্মাসনের নিম্নাংশে সন্নিবিষ্ট। কেন্দ্রস্থলে একটি হস্তীদৃষ্ট এবং দুপাশে দুইটি সিংহ এবং অঞ্জলি-মুদ্রায় দুই উপাসকভক্তও দৃশ্যমান। ভগবান বুদ্ধের উভয়পার্শ্বেই দুইটি উপবিষ্ট বোধিসত্ত্বমূর্তি সন্নিবিষ্ট। স্তম্ভটির (Stele) ঊর্দ্ধাংশের দু'দিকে দুটি উড়ন্ত বিদ্যাধরের মূর্তি এবং মুক্তালোভী হংস শোভিত। সর্বোচ্চস্থানে একটি বোধিবৃক্ষ সহ পঞ্চ ধ্যানীবুদ্ধের মূর্তি খচিত। মূর্তিটি দশ থেকে একাদশ খ্রীষ্টীয় শতাব্দীর বলে অনুমিত।

৩) ব্রোঞ্জ নির্মিত মারীচীর মূর্তি

এ স্থলে প্রাপ্ত বা আবিষ্কৃত পুরাতাত্ত্বিক সামগ্রী ও দেবদেবীর মধ্যে সর্বাপেক্ষা উল্লেখ্য ও গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধদেবী মারীচীর মূর্তিটি। এই মূর্তিটি বৌদ্ধবিহারটির ১৩নং প্রকোষ্ঠ (Cell) এ প্রাপ্ত। মূর্তিটি উচ্চতায় ১৭.৫ সে.মি. এবং প্রশস্তে ৮.৩ সে.মি ও ঘনত্বে ৩.৬ সে.মি.। এই বৌদ্ধমূর্তিটির হিন্দুগণের সূর্যদেবতার সাদৃশ্য মেলে; তবে সূর্যের রথ অশ্বচালিত পক্ষান্তরে মারীচীর রথ শূকর চালিত। জগজ্জীবনপুরে প্রাপ্ত মারীচী মূর্তিটি প্রত্যালীঢ় -মুদ্রায় উপবিষ্ট। ইহার হাত ছয়টি। মুখ তিনটি। এদের মধ্যে বাম-দিকস্থিত মুখটি শূকরের আকার বিশিষ্ট। ডানদিকের সকলের উপরে স্থিত হস্তে বজ্রধৃত। মধ্যস্থিত হস্তে একটি তীর এবং সকলের নীচস্থিত দক্ষিণ হস্তে সূচিকা (Needle) ধৃত এবং তার বিপরীত দিকে বামদিকের হস্তদ্বারা সূত্রধৃত। রত্নগিরি ও নালন্দাতেও অনুরূপ মারীচী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে।

৪) প্রায় ৮২টি মুদ্রাফলকও সাধারণ শীল মুদ্রা (Seal) এখানে পাওয়া গিয়েছে। এই সকল উপাদানের সাহায্যে 'নন্দদীর্ঘি' বৌদ্ধবিহারটির সনাক্ত করা সহজতর হয়েছে। এই বিহারটিতে অধ্যাপনারও ব্যবস্থা ছিল বলে অনুমিত।

৫) পোড়ামাটির ফলক

'তুলাভিটা' উৎখননের দ্বারা প্রায় ১৭৯টি পোড়ামাটির ফলক আবিষ্কৃত হয়েছে। এদের মধ্যে বহুলাংশই দেবদেবীর মূর্তি উৎকীর্ণ উপদেবতা, মানুষ ও বিভিন্ন জন্তু ও পশুপাখীতে ও ফলকগুলি অলংকৃত বা খচিত। ফলকসমূহ নিঃসন্দেহে বিহারটির গাত্রে অলংকরণ কার্যে ব্যবহৃত হয়েছিল। পাহাড়পুর সোমপুরীর বিহার মন্দিরটি যেমন বিভিন্ন বৌদ্ধদেবদেবীর

অলংকরণ দ্বারা শোভিত ছিল অনুরূপ ভাবে এই বিহারটি তদনুকরণে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতেশ্বর, মঞ্জুশ্রী ও মৈত্রেয় বুদ্ধের প্রতিমায় পরিপূর্ণ ছিল।

তুলাভিটা উৎখননের দ্বারা একটি ইটের তৈরী বিশাল বৌদ্ধ-বিহার-ক্ষেত্র (Complex) গর্ভগৃহ সহ আবিষ্কৃত হয়েছে। ধাপে ধাপে সোপানবিশিষ্ট ও প্রদক্ষিণকারী পথ বিশিষ্ট এই সংঘারামটি তৎকালীন বিহার নির্মাণের শিল্প কৌশলকে প্রকাশ করে। বিহারটিতে ভিক্ষুগণের আবাসকক্ষের প্রকোষ্ঠ ও টানা বারান্দা দৃষ্ট হয়েছে। বিহারটি প্রধান চারদিকে প্রসারিত, অবস্থান ও নির্মাণগুলি প্রাচীন দুর্গের নক্সার সাদৃশ্য বহন করে। বিহারের ভাগলপুর স্থিত বিক্রমশীল বিহারের সাদৃশ্য এই বিহারের নক্সায় অনুভূত হয়।

২) রাজবাড়ীডাঙ্গা (কর্ণসুবর্ণ)

ভারতের পশ্চিমবঙ্গে অধুনা আবিষ্কৃত বৌদ্ধ অঞ্চলটির মধ্যে অপরটি হোল রাজবাড়ী ডাঙ্গা (কর্ণসুবর্ণ)। মুর্শিদাবাদ জিলার বহরমপুরে ১৯৬২-৬৩ সালে চিরুটি রেলস্টেশনের সন্নিকটস্থ ভারতীয় পুরাতত্ত্ববিভাগ এবং কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের যৌথ তত্ত্বাবধান ও সহযোগিতায় রাজবাড়ীডাঙ্গার খননকার্যে শুরু হয়। উক্ত উৎখনন কার্যের ফলে পশ্চিমবঙ্গ তথা বঙ্গদেশের ইতিহাস প্রসিদ্ধ কর্ণ সুবর্ণ স্থানটি আবিষ্কার ও সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এখানে বৌদ্ধবিহার বা সংঘারামের অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়ার ফলে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতির ইতিহাসে একটি নূতন দিগন্ত উদ্ভাসিত হয়েছে। চৈনিক পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ্ (সপ্তম শতাব্দী)-এর ভ্রমণবৃত্তান্তে যে রক্তমৃত্তিকা সংঘারামের উল্লেখ রয়েছে তা রাজবাড়ীডাঙ্গা খননে আবিষ্কৃত এবং সনাক্ত হয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ থেকে কর্ণসুবর্ণের রক্তমৃত্তিকা বিহারটি বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন ঐতিহাসিক ও পুরাতত্ত্ববিদগণের চিহ্নিত করার প্রয়াস অবশেষে সফল হওয়ার ফলে এই অঞ্চলের বৌদ্ধস্থাপত্য শিল্পকলা ও ইতিহাস সম্বন্ধে আমরা নূতন তথ্যের সন্ধান পেয়েছি। রাজা শশাঙ্কের ইতিহাস প্রাসঙ্গিক ভাবে এই আবিষ্কারের ফলে পরিজ্ঞাত হওয়া গিয়েছে।

মুর্শিদাবাদ জিলার রাক্ষসীডাঙ্গায় রক্তমৃত্তিকা বিহারটির অস্তিত্ব বা অবস্থান ১৯২৮-২৯ খ্রীষ্টাব্দে আর্কেওলজিকাল সার্ভে অব্ ইণ্ডিয়া-কর্ত্তৃক অনুমিত হলেও তা সার্থকভাবে কর্ণসুবর্ণ অথবা রক্তমৃত্তিকা বিহারটির নির্ণয় করা সম্ভব হয়নি। অবশেষে ১৯৬১ সালে শশাঙ্ক ও কর্ণসুবর্ণের ইতিহাস, রক্তমৃত্তিকা বিহারের অবস্থান চিরুটিস্থিত ঢিবির উৎখননের দ্বারা এ-স্থলের বৌদ্ধ স্থাপত্যের কথা বিশদভাবে জানতে সমর্থ হয়েছি। চিরুটির নিকটস্থ রাজবাড়ীডাঙ্গার উৎখননের বেশ কিছু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাচীনকালের উপাদান বা দ্রব্য পাওয়া গিয়েছে। এগুলি ছাড়া বেশ কিছু পোড়ামাটির সীলমোহরাঙ্কিত গোলাকার ফলক রয়েছে। এই সীলগুলির খোদিত লেখায় রক্তমৃত্তিকা বিহারটি উল্লিখিত। এর থেকে প্রমাণিত যে রাজবাড়ীডাঙ্গার সন্নিকটস্থ অঞ্চলেই রক্তমৃত্তিকা বিহার এবং শশাঙ্কের রাজধানী কর্ণসুবর্ণ অবস্থিত ছিল।

রাজবাড়ী ডাঙ্গা শব্দটির বিন্যাসে দুটি পৃথক শব্দ পাই। রাজবাড়ী (রাজার প্রাসাদ) এবং ডাঙ্গা (ঢিবি)। এই রাজবাড়ী ঢিবিটি মুর্শিদাবাদের যদুপুর গ্রামাঞ্চলস্থ। এই যদুপুর গ্রামটি ভাগীরথী নদীর পশ্চিম দিকস্থ উঁচু খাড়া পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। ঢিবিটি খননের ফলে প্রাপ্ত বিষয়গুলির সারাংশ সংযোজিত হল।

১) রাজবাড়ীডাঙ্গার অস্তিত্ব খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতক থেকে দ্বাদশ এয়োদশ শতক পর্যন্ত ব্যাপ্ত ছিল।

২) আবিষ্কৃত সীল বা সীলিংস থেকে প্রমাণিত যে এই স্থাপত্য বিভিন্ন সময়ের নির্মাণ বিশেষ।

৩) জন অধ্যুষিত স্থানটির প্রথমস্তর বন্যা অথবা অন্যান্য প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিনষ্ট প্রাপ্ত হয়।

৪) এই স্থলের নির্মাণ পাঁচটি কালিক-স্তরে বিন্যস্ত ছিল।

৫) উৎখনিত ও আবিষ্কৃত ইমারত গুচ্ছ সমূহ থেকে একটি সম্পূর্ণ ইমারত বা অট্টালিকার নক্সা না পাওয়া গেলেও এস্থল থেকে উদ্ধারকৃত উপাদানসমূহ থেকে আমরা নিশ্চিত রূপে অবগত হই যে এখানে একটি বৌদ্ধস্তূপ সুদৃঢ় ভিত্তিসহ উন্নত মঞ্চবিশিষ্ট ছিল। স্তূপে ওঠার জন্য ইষ্টকনির্মিত সিঁড়ি বা সোপান ও প্রদক্ষিণ পথ ছিল। প্রদক্ষিণ পথটি ইঁটের আস্তরণ দ্বারা মণ্ডিত ছিল।

৬) উৎখননে আবিষ্কৃত উপাদান নিচয়ের মধ্যে চূর্ণবালিমিশ্রণে নির্মিত বুদ্ধ বা বোধিসত্ত্বের মস্তক, তাম্রনির্মিত চক্র ও অন্যান্য ভগ্নাংশ থেকে এই নির্মাণটি যে একটি বৌদ্ধস্তূপই ছিল তাহা সন্দেহাতীত রূপে প্রমাণিত।

এছাড়া শীলমোহর, মুদ্রা ও গোলাকৃতি ফলকগুলিও এস্থলের একটি বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্বকে সমর্থন করে।

রাজবাড়ী ডাঙ্গার আবিষ্কারের ফলে বাংলার ইতিহাসের এক নূতন তথ্য সংযোজিত হয়। গৌড়রাজ শশাঙ্কের রাজধানী যে কর্ণসুবর্ণতেই ছিল ইহাও প্রমাণিত। খ্রীষ্টীয় ঊনবিংশ শতাব্দী থেকেই বিভিন্ন সময়ে রক্তমৃত্তিকাবিহার ও কর্ণসুবর্ণের পরিচিতির মধ্যে পণ্ডিতগণের মতভেদ প্রচলিত থাকলেও বর্তমানের এই আবিষ্কারে পণ্ডিতগণের মধ্যে মতভেদ নিরসিত হয়েছে এবং তৎকালীন গৌড়বঙ্গ শাসনের তথ্যকে সমৃদ্ধ করেছে।

বাংলাদেশে আবিষ্কৃত ময়নামতীর বৌদ্ধ নিদর্শন ঃ

বাংলাদেশের (প্রাক্তন পূর্বপাকিস্তান) রাজশাহীর পাহাড়পুর মন্দির আবিষ্কারের পর সর্বাপেক্ষা চমৎকৃত বৌদ্ধ স্থাপত্য স্থান হল ময়নামতী। প্রকৃতপক্ষে এই স্থানটি আবিষ্কারে

মধ্যকালীনযুগের বাংলা তথা সমতট অঞ্চলের ইতিহাস সম্বন্ধে এক নূতন ধারণা সংযোজিত হয়েছে। বাংলাদেশে বৌদ্ধ শিল্প-চেতনার পৃষ্ঠভূমিরূপে ময়নামতীর দান অনস্বীকার্য এবং অভূতপূর্ব। সমতটীয় বাংলাদেশের উত্তর-দক্ষিণে বিস্তৃত স্বল্প উচ্চতায় অবস্থিত এই শৈলীশ্রেণীতে ময়নামতীর অবস্থান। বদ্বীপীয়াঞ্চলের সন্নিকটস্থ নির্জন এই জায়গাটি প্রাকৃতিক মনোরমতার জন্য বৌদ্ধ ভিক্ষুগণের ধর্মসাধনার আবাসস্থল গড়ার পক্ষে ছিল আদর্শ শৈলাঞ্চল। প্রকৃতপক্ষে এই অঞ্চলটি বাংলাদেশের প্রাচীনতম প্রাগৈতিহাসিক স্থান রূপে চিহ্নিত। দৈর্ঘ্যে এগারো কি: মাইল ব্যাপী প্রসারিত এই শৈলশ্রেণী প্রশস্তায়ও ছিল পাঁচ কি: মাইল ব্যাপ্ত। ফলে নির্জন এই বনাঞ্চল বহুসংখ্যক বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান ও পীঠস্থান নির্মাণের পক্ষে আদর্শ রূপে ভিক্ষুগণ কর্ত্তৃক নির্বাচিত হয়। বেশ কয়েকটি রাজশাসনের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রায় ৬০০ থেকে ৭০০ বৎসর ধরে এই স্থানটি গড়ে উঠেছিল। প্রায় ৫৫টি Archaeological site বা প্রত্নতাত্ত্বিক অঞ্চলও এস্থলে আবিষ্কৃত হয়— এদের অধিকাংশ বৌদ্ধ নির্মাণ হলেও হিন্দু ও জৈন মন্দিরেরও ভগ্নাংশ এখানে আবিষ্কৃত হয়েছে। তাই ময়নামতীর ঢিবিটি এক বিশিষ্টতা অর্জন করেছে।

চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (৬৩৮ খ্রীষ্টাব্দ) সমতট অঞ্চলটি পরিদর্শন করেন বলে জানা যায়। ময়নামতী থেকে বৌদ্ধ শিল্প ভাস্কর্য ও সংস্কৃতি সভ্যতা বহির্ভারতের বর্মা, দক্ষিণপূর্ব এশিয়া প্রভৃতি স্থানে প্রসারিত ও প্রচারিত হয় বলেই পণ্ডিতগণের ধারণা। এন, কে, ভট্রশালীর (১৯১৭) এই স্থানটির পরিদর্শনের দ্বারা আমরা অবহিত যে এই টিলাটি বহু মন্দির ও স্তূপে আকীর্ণ ছিল। প্রকৃতপক্ষে এই টিলায় প্রাপ্ত বা আবিষ্কৃত ১৮৩০ খ্রীষ্টাব্দের রণবঙ্কমল্ল হরিকালদেবের একটি তাম্রশাসন থেকে ময়নামতী অঞ্চলটি বৌদ্ধ পীঠ হিসাবে অস্তিত্বের কথা আভাসিত হয়। প্রাচীন পাট্টিকেরা শহরটি যে এ অঞ্চলেই অবস্থিত ছিল তা এ স্থলে প্রাপ্ত বিবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে ভট্রশালী মহোদয়ের নিশ্চিত ধারণা ছিল। বর্তমানে বাংলাদেশ সরকারের পুরাতাত্ত্বিক আধিকারিকগণের তত্ত্বাবধানে যে অনুসন্ধান পুনরায় শুরু হয় (১৯৫৫-১৯৭১ খ্রী:) তার ফল স্বরূপ আনন্দবিহার ও ময়নামতী প্রাসাদ ঢিবি উৎখনন হয়। এই খননের দ্বারা বিভিন্ন বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। ময়নামতী রাজধানী ঢিবিটি উৎখননের দ্বারা প্রাথমিক স্তরে বৌদ্ধবিহার আবিষ্কৃত না হলেও পরবর্তীকালে খননের ফলে আটটি বৌদ্ধবিহার ও স্তূপের সন্ধান মেলে। কোটিলমুরা স্থাপত্য ও অট্টালিকা গুচ্ছ সংস্থান (Complex) থেকে তিনটি স্তূপের নির্মাণ-(Structure) রূপ খুঁজে পাওয়া গিয়েছে। এই স্তূপত্রয় বৌদ্ধ ত্রিরত্নের (বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ) প্রতীকী রূপে কল্পিত। এদের মধ্যে কেন্দ্রস্থিত স্তূপটি অত্যন্ত গুরুত্ব পায় ধর্মচক্রের প্রতীক বলে। ইষ্টক নির্মিত এই স্তূপটির কাছে আটটি কোষ্ঠ (Cell) ছিল। ইহার ভিতটি চতুষ্কৌণিক

এবং উর্দ্ধভাগ গোলাকার অণ্ডবিশিষ্ট অর্দ্ধাকার ড্রাম বা পিপের মত আকার বিশিষ্ট ছিল। এ স্থলে প্রাপ্ত অন্যান্য স্তূপটি থেকে এই স্তূপটি ছিল গঠন বৈচিত্র্যে স্বতন্ত্র।

কোটিলমুরার অন্য দুটি স্তূপ ইষ্টক নির্মিত ইমারত বিশেষ ছিল। ইহার অভ্যন্তর ভাগ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু মৃত্তিকাস্তূপ ও পোড়ামাটির সীলিং ও সীলমোহরে আবৃত ছিল। ধূসরবর্ণের নরম পাথরে (Soft Stone) নির্মিত অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের দুইটি মূর্তিও স্তূপে দৃষ্ট।

স্তূপটির নির্মাণ পদ্ধতি সম্ভবত: গুপ্তযুগের স্থাপত্য শৈলীর প্রভাবে প্রভাবান্বিত। স্তূপের কেন্দ্রীয় স্তম্ভটির (Stele) কেন্দ্রস্থিত মূর্তিটি চারহাত বিশিষ্ট অবলোকিতেশ্বরের এবং ইহা বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্ব মূর্তি এবং অন্যান্য দেবদেবীর মূর্তির দ্বারা আবেষ্টিত বা শীর্ষিত ছিল। পাদপীঠটি(Pedestal) বিভিন্ন ভক্ত বা উপাসকদ্বারা অলংকৃত। এছাড়া একটি নরমপ্রস্তরের (Soap Stone!) 'লোকেশ্বর' মূর্তি নিকটস্থ রত্নগিরি স্তূপ থেকে আবিষ্কৃত হয়েছে।

শিল্পশৈলীতে কোটিলমুরার স্তূপ ও ভাস্কর্যসমূহে গুপ্তযুগীয় ভাস্কর্য কলারীতির সাদৃশ্য থাকলেও উত্তর গুপ্তযুগীয় শিল্পধারার বৈশিষ্ট্যও লক্ষ্যণীয়। সম্ভবত: খড়্গবংশীয় নৃপতিগণের পৃষ্ঠপোষকতায় এই শিল্প নির্মাণ প্রভাবিত ও সমৃদ্ধ হয়। কারণ চৈনিক পরিব্রাজক সেঙ্-চির (সপ্তম খ্রীষ্টাব্দ) সমতট ভ্রমণকালে রাজভট্ট নামক এক নৃপতির উল্লেখ করেন। এই রাজভট যে খড়্গরাজ বংশের অন্যতম রাজা-ই ছিলেন তা অনেকেরই ধারণা। পরমবৌদ্ধভক্ত এই রাজভট ত্রি-রত্নকে বিশেষভাবে শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করে ত্রি-রত্নস্তূপের নির্মাণ করান।

ময়নামতীর রাজপ্রাসাদ ঢিবি সহ বিভিন্ন বিহারের আবিষ্কার দ্বারা নূতন নূতন তথ্যের সন্ধান পাওয়া যায়। সমতট অঞ্চলের রূপবান বিহারের পূর্বদিকস্থ বিহারাংশে বেলেপাথর নির্মিত একটি সু-উচ্চ (২.৬ মিটার) বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মূর্তিটি গুপ্তযুগীয় শৈল ভাস্কর্য রীতির প্রভাব দৃষ্ট হলেও শিল্পরীতির বৈশিষ্ট্যও এখানে দৃষ্ট। অনুরূপভাবে ইটখোলা বিহারে প্রাপ্ত চূণ ও বালি নির্মিত মস্তকবিহীন ধ্যানী বুদ্ধের অক্ষোভ্য মূর্তিটির নিম্নাংশ থেকে বোঝা যায় যে মূর্তিটি বাংলা শিল্পরীতির (সপ্তম শতাব্দীর) ভাস্কর্যকলার এক অপরূপ নিদর্শন। স্তূপ নির্মাণ শৈলীতেও সমতটীয় ময়নামতীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য। বৌদ্ধমন্দিরের নির্মাণ শৈলীতেও সমতটীয় ময়নামতীর বৈশিষ্ট্য উল্লেখ্য। বৌদ্ধমন্দিরের নির্মাণ নক্সার পরিবর্তন সমতটের বৌদ্ধবিহারগুলিতে বহুল পরিমাণে দৃষ্ট। ক্রুশাকারের সোপান শ্রেণী সমন্বিত, প্রলম্বিত আয়কের দ্বারা একটি নূতন শৈলীর সৃষ্টি খ্রীষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীর দেববংশীয় নৃপতিগণের সাহচর্য্য ও অনুপ্রেরণায় নির্মিত হয়েছিল বলেই শিল্পমহলের ধারণা।

সমতটের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে বিশেষ করে ময়নামতীতে রূপো ও সোনার মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে। এ অঞ্চলটি তৎকালে বিশেষ উন্নত ও সমৃদ্ধ ছিল তা নিঃসন্দেহে বলা যায় এবং সমগ্র বাঙ্গালী জাতিই ইহার জন্য গর্বিত বোধ করেন।

গ্রন্থপঞ্জী

1. Archaeology of Eastern India, New Perspectives. Published: Centre for Archaeological Studies and Training, Eastern India, Edited by Dr. Gautam Sengupta & Sheema Panja. Articles : a) Samatata, Mainamati : Some Observations; Abu Imam. b) A Newly Discovered Buddhist Monastery at Jagajjivanpar, West Bengal, by Amal Roy. c) Chandraketugarh– A Site in Lower Bengal , by Sharmi Chakraborty.
2. Bangladesher Bauddha Bhaskarya, by Bhikshu Sunithananda. Publisher The Asiatic Society of Bangladesh, 1999, Dacca.
3. Journal of the Department of Pali, Volume : XIII, 2005. Article : Jagajjivanpur, A Newly Discovered Buddhist in Malda, W. Bengal, by Prof Samir Kumar Mukherji.
4. Shilpa o Shilpi (2nd Part) by Krishnalal Das. Published by Paschim Banga Rajya Pustak Parshad, Calcutta, 1982.
5. Early Sculpture of Bengal by Prof. S. K. Saraswati; Sambodhi Publications Private Ltd. Calcutta.
6. Buddhism in Ancient Bengal by Gayatri Sen Mazumdar, Published by Navana, Calcutta.
7. Banglar Bhaskarya by Professer Kalyan Kumar Ganguli Published by Suvarnarekha Calcutta, 1986.
8. Sthapatya Paribhasha, by Prof. Muhammad Mokhalechur Rahaman. Published by – Bangla Academy Dacca, 1994.
9. Rajbadidanga; 1962 by Prof. Sudhir Ranjan Das. Published by: The Asiatic Society, Calcutta 1968.
10. Buddhist Monuments, by Devala Mitra, Sahitya Samsad, Calcutta, 1971
11. Banglaya Bauddhadharma, by Sri Nalininath Dasgupta (Reprint) Shaivya Prakashan, Calcutta 2001.
12. Bauddha Shilpa O Sthapatya by Sadhan Chandra Sarkar. Published by Mahabodhi Book Agency, Calcutta, 1997.
13. Iconography of Buddhist and Brahmanical Sculptures in the Dacca Museum, Dacca 1929.
14. Si-Yu-Ki–Account of Hiuen Tsang, Records of the Western World. translated from Chinese to Eng. by Samuel Beal, 2Vols, London 1906 (Reprint).

বাংলার তথা ভারতীয় সংগ্রহশালায় সংরক্ষিত বৌদ্ধ ভাস্কর্য

চিত্তরঞ্জন পাত্র*

ভারতীয় সংগ্রহালয়ে সংরক্ষিত বাংলার বৌদ্ধভাস্কর্যের তালিকা প্রদানের পূর্বে বাংলার ভাস্কর্য শিল্পের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিহাস আলোচনার প্রয়োজন রয়েছে। উৎখননের ফলে উত্তর ও মধ্য ভারত থেকে বহুল পরিমাণে প্রাপ্ত ভাস্কর্য থেকে একথা অনুমান করা যেতে পারে, খ্রীষ্টের জন্মের পূর্ববর্তী সময় থেকেই এদেশে বৌদ্ধশিল্পকলার বিস্তার লাভ ঘটেছিল। গুপ্ত যুগের পূর্ববর্তী সময়ের বৌদ্ধ শিল্পকলার নমুনা ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে অধিক পরিমাণে পরিদৃষ্ট হলেও বাংলায় তার সংখ্যা অত্যল্প। প্রস্তরগাত্রে উৎকীর্ণ লিপি থেকে আমরা জানতে পারি, মৌর্য আমল থেকেই বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বাংলায় বসবাস ছিল। কিন্তু প্রাপ্ত ভাস্কর্যের পরিমাণ অনধিক হওয়ায়, মনে করা হয় গুপ্ত-পূর্ববর্তী সময়ে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের তেমন কোন প্রভাব-প্রতিপত্তি গড়ে ওঠেনি। ভাস্কর্যের দুষ্প্রাপ্যতার মধ্যেও খ্রীষ্টীয় অব্দের প্রথম দিকে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বের একটি আবক্ষ মূর্তির উল্লেখ করা যায়। মথুরার বেলেপাথরে তৈরী এই মূর্তিটি চন্দ্রকেতুগড় থেকে পাওয়া গিয়েছে। মথুরাশৈলীর মতই গোলাকার মাথা, খোলা প্রসারিত চক্ষু, এবং একই রকম পোশাক পরিহিত হলেও প্রত্নগত দিক থেকে এখনও পর্যন্ত মূর্তিটির সঠিক সময় নিরূপিত হয়নি। এর ফলে মূর্তিটি যে কুষান আমলের বুদ্ধমূর্তি সে কথা নির্দিষ্ট করে বলা যায় না। কিন্তু মুখাবয়বের গঠনগত বৈশিষ্ট্য সমূহ তথা পরিধান থেকে মূর্তিটি যে কুষান আমলের মথুরাশৈলীতে নির্মিত তা স্পষ্টতই প্রতীয়মান হয়। চন্দ্রকেতুগড় থেকে প্রাপ্ত মূর্তির কথা বাদ দিলে পরবর্তীসময়ের যে বুদ্ধমূর্তিটি পাওয়া যায়, তা গুপ্তযুগের। মূর্তিটি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার 'বিহারেল' নামক একটি স্থান থেকে পাওয়া গেছে। চুনার, বেলেপাথরে প্রস্তুত এই দণ্ডায়মান বুদ্ধমূর্তিটিতে গুপ্তযুগের সারনাথ শৈলীর সমস্ত বৈশিষ্ট্য পরিলক্ষিত হয়। মূর্তিটির সহজ ভঙ্গিমা, ডান হাঁটুতে ঈষৎ ভাঁজ, শরীরের ডানদিকে কিছুটা ঝুঁকে দাঁড়ানো, এবং এর স্বচ্ছ ও ঔজ্জ্বল্যভাব সারনাথশৈলীতে অন্তর্ভুক্তির মূল কারণ। উভয় স্কন্ধের উপর আচ্ছাদিত স্বচ্ছ সংঘাটি এবং নাসিকার গোড়ায় অবস্থিত অর্ধমুদিত চক্ষুদ্বয় গুপ্ত শিল্পকলার কথা মনে করিয়ে দেয়। 'রক্তমৃত্তিকা' মহাবিহারের দ্বিতীয় পর্যায়ে খননকার্যের ফলে কিছু ছাঁচে ঢালা মস্তকের মূর্তিগুলি গুপ্ত পরবর্তী বা শশাঙ্কের পূর্ববর্তী সময়ে প্রস্তুত হয়েছিল বলে মনে হয়। মুর্শিদাবাদ জেলার 'রাক্ষসীডাঙ্গা' (রক্তমৃত্তিকার

---

* ড: চিত্তরঞ্জন পাত্র ইন্ডিয়ান মিউজিয়াম বা ভারতীয় সংগ্রহশালা কলকাতার গ্রন্থাগারিক এবং বিশিষ্ট লেখক।

কাছেই অবস্থিত) থেকে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বের ছাঁচে ঢালা মূর্তিগুলিকে একই শ্রেণীভুক্ত করা যায়। প্রাপ্ত মস্তকগুলি কিছুটা ক্ষতিগ্রস্ত, চাপা পুরু ঠোঁট, এবং ধনুকের মত বাঁকানো ভ্রু-যুগলের তলায় অর্ধ-নিমীলিত এবং প্রসারিত চক্ষুদ্বয়ের মধ্যে এক শান্ত ও স্থিতধী ধ্যানমগ্নতার চিহ্ন ফুটে উঠে। চুলগুলি সুন্দরভাবে একটি গ্রন্থিতে আবদ্ধ। মুখের কোমল ও নমনীয় ভাবের সঙ্গে কুষান-গুপ্ত যুগের বুদ্ধ / বোধিসত্ত্বের মূর্তির মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

মহাস্থানগড় বা পূর্বেকার পুণ্ড্রবর্ধন (উত্তরবঙ্গ) থেকে প্রাপ্ত একই রকম কিছু ছাঁচে ঢালা মূর্তি গুলিকেও একই পর্যায়ভুক্ত করা যায়। গঠন শৈলীর দিক থেকে মস্তকগুলিতে গুপ্তযুগের শিল্পবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। নিম্নগঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে রূপনারায়ন উপত্যকায় খননকার্যের ফলে শুঙ্গ-কুষান-গুপ্ত যুগের বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ টেরাকোটার মূর্তি পাওয়া গেছে। এগুলির মধ্যে মেদিনীপুর জেলায় 'পান্না'তে প্রাপ্ত বুদ্ধের একটি মূর্তির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মূর্তিটির মধ্যে গুপ্ত শিল্পকলার ছাপ স্পষ্ট। টেরাকোটার এই ফলকটিতে ধর্মচক্রমুদ্রায় স্থিত বুদ্ধকে লক্ষ্য করা যায়। অ-গভীর বাঁকানো রেখা দেখে বোঝা যায়, মূর্তিটি স্বচ্ছ পোশাক পরিহিত এবং দুটি কাঁধেই বিস্তৃত-এছাড়া মস্তকের পিছনে উজ্জ্বল জ্যোতি তথা পর্ণরাজির উপস্থিতি গুপ্ত শিল্পকলারই ঐতিহ্য বহন করছে। ফলকের উপর গুপ্তযুগের ব্রাহ্মীলিপিতে লেখা একটি লিপি ও এই শিল্পবস্তুটিকে গুপ্তযুগের শিল্পকলার উদাহরণস্বরূপ চিহ্নিত করতে সহায়তা করে।

বাংলায় বৌদ্ধশিল্পকলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রধান বাধা হল পাল-পূর্বযুগের স্থাপত্যকলা নিদর্শনের দুর্লভতা। পাল-পূর্বযুগের বাংলায় বৌদ্ধধর্ম যে যথেষ্ট বিকশিত হয়েছিল এবং বাংলায় বহু বৌদ্ধ মঠ গড়ে উঠেছিল তার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। এগুলির মধ্যে কর্ণসুর্বনের রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার, মহাস্থানের ভাসুবিহার, বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা জেলার ময়নামতী-লালমাই পার্ব্বত্য অঞ্চলের অন্তর্গত দেব-পর্বতের বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানগুলি সেই সময়ে যথেষ্ট পরিমাণে সুপরিচিত ছিল। বৌদ্ধধর্ম তথা বৌদ্ধ মঠ স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত মঠগুলিতে অবস্থানকারী ভক্তদের চাহিদা পূরণের জন্য বৌদ্ধ শিল্পকলাও যে যথেষ্ট বিকশিত হয়েছিল সে কথা নিশ্চিত করেই বলা যায়। এই সময় উত্তর, পূর্ব এবং দক্ষিণ ভারতে বৌদ্ধমঠের উপস্থিতি সত্ত্বেও আশ্চর্যজনক ভাবে বৌদ্ধ স্থাপত্যশৈলীর কোন সুনির্দিষ্ট সময় সারনী তৈরী করা সম্ভব হয়নি। খননকার্যের ফলে এই সময়ের যে সমস্ত শিল্পবস্তুর নিদর্শন পাওয়া যায়, তার উপর ভিত্তি করে এই সময়ের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসের বিবরণ দেওয়া অসম্ভব। খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত অল্প সংখ্যক এবং আকস্মিকভাবে প্রাপ্ত নিদর্শন গুলির উপরই আমাদের মূলত নির্ভর করতে হয়। শিল্প-বৈশিষ্ট্যগত বা ভূতাত্ত্বিকভাবে নির্দিষ্ট সময় নির্ধারণের পক্ষে এইরূপ কিছু গুরুত্বপূর্ণ মূর্তিগুলির মধ্যে মহাস্থান অঞ্চলের খোদার পাথরে প্রাপ্ত একটি ফলকের উপর সারিবদ্ধভাবে উপবেশিত বুদ্ধের মূর্তির কথা উল্লেখযোগ্য। বাংলাদেশ আর্কিওলজিকাল সার্ভের খননকার্য পরিচালনাকারীদের মতে, এই

ভাস্কর্যটি গুপ্তযুগের শিল্পকলার নিদর্শন। দীর্ঘ সমান্তরাল এই খন্ডটি চারটি বাঁকানো কুলুঙ্গিতে বিভক্ত। প্রতিটি কুলুঙ্গি একটি চতুষ্কোন স্তম্ভের মাধ্যমে একে অপরের থেকে বিভক্ত হয়ে রয়েছে। প্রতিটি কুলুঙ্গির মধ্যে বজ্র-পর্যাঙ্কাসনে উপবেশিত ক্ষুদ্রাকার বুদ্ধের মূর্তি রক্ষিত। ডানদিকের মূর্তিটি ক্ষতিগ্রস্ত, বাকী তিনটি মূর্তির মধ্যে মধ্যেরটি ধ্যান এবং দুপাশে দুটি মূর্তিকে ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় দেখা যায়। শিল্পশৈলীর দিক থেকে এই মূর্তিগুলির মধ্যে এক যুগসন্ধিক্ষণের আভাস দেখতে পাওয়া যায়—একদিকে গুপ্তযুগের শিল্পশৈলীর শেষ দিক, অপরদিকে আঞ্চলিক শিল্পশৈলীর ক্রমপ্রবাহ। প্রত্নতত্ত্বগতভাবে রাজবাড়ী ডাঙ্গাতে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক বিকাশের দ্বিতীয় পর্যায়ের কিছু কৌতুহলোদ্দীপক ব্রোঞ্জ ভাস্কর্যের কথা উল্লেখ করা যায়। খননকারীদের মতে এই মূর্তিগুলি খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ ও নবম শতাব্দীর মধ্যভাগে তৈরী। শিল্পশৈলীর দিক থেকে এই মূর্তিগুলির মধ্যে একটি উপবেশিত বুদ্ধ, অবলোকিতেশ্বর, তারা মস্তক এবং একটি গনেশের মূর্তির কথা উল্লেখ্য। গঠনগত ও বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এই মূর্তিগুলির সঙ্গে গুপ্তযুগের শিল্পশৈলীর ফারাক লক্ষ্য করা যায়। এই নূতন শিল্পশৈলী পরবর্তীকালে সমতট হরিকেল অঞ্চলের শিল্পের মধ্যে তার উৎকর্ষের চূড়ান্ত সীমায় পৌঁছেছিল। শিল্পশৈলীগত দিক থেকে বিচার করলে এ কথা নিশ্চিতরূপে বলা যায় যে, 'রাজবাড়ীডাঙ্গা' থেকে প্রাপ্ত উপবেশিত বুদ্ধ ও দন্ডায়মান অবলোকিতেশ্বরের মূর্তির উপর এক ধরনের আঞ্চলিক শিল্পশৈলীর প্রভাব পড়েছে। পাহাড়পুরের টেরাকোটার শিল্পশৈলী এর আদিরূপ বলে মনে করা হয়। পাদদেশে ফুল সমন্বিত একটি ধাতব ধর্মচক্রের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখনীয়। পাদদেশের ফুল এবং তার সঙ্গে গুচ্ছাকারে রক্ষিত পাতা চক্রটিকে উপরে তুলে রাখতে সহায়তা করেছে। অলঙ্কৃত এই চক্রের আটটি দন্ড পদ্মের পাপড়ির ন্যায় দেখতে। ভূতাত্ত্বিকদের মতে এই চক্রটি খ্রীষ্টীয় সপ্তম অথবা অষ্টম শতাব্দীতে তৈরী। এই সময় যথেষ্ট পরিমাণ মূর্তি পাওয়া গেলেও এবং মূর্তিপূজার প্রচলন থাকলেও ধর্মের প্রতীক হিসেবে ধর্মচক্রকেও পূজা করার প্রথা সে সময়ের বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচলিত ছিল। সোমপুর মহাবিহার থেকে প্রাপ্ত একইরকম দেখতে টেরাকোটার একটি ধর্মচক্রের কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। রাজবাড়ীডাঙ্গা থেকে প্রাপ্ত ধাতব ধর্মচক্রের গুরুত্বও অপরিসীম। কারণ এ থেকেই নিশ্চিত করে বলা যায়, সে সময় ধর্ম চক্রকে যে শুধু ধর্মগত দিক থেকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছিল তাই নয়, রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও এর পূজার প্রচলন ছিল। সালারের একটি শুস্ক পুকুর থেকে প্রাপ্ত একজন পুরুষের অবয়ব সমন্বিত চক্রের আবিষ্কারও অত্যন্ত উৎসাহব্যঞ্জক। এই চক্রটির সময়কাল ষষ্ঠ কিংবা সপ্তম শতাব্দী বলে মনে করা হয়। প্রথমে আর্য অবলোকিতেশ্বর এবং পরে চক্রপুরুষ বলে চিহ্নিত এই মূর্তিটির সঙ্গে গুপ্তযুগের সারনাথ শিল্পশৈলীর মিল লক্ষ্য করা যায়।

রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের স্তম্ভাদি এবং কার্নিশের মধ্যবর্তী স্থানে অবস্থিত টেরাকোটার

একটি পাখির স্তরের কথা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্যনীয়। রক্তমৃত্তিকার খননকার্যের দ্বিতীয় স্তর থেকে প্রাপ্ত এই পাখির শ্রেনীটির সময়কাল খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ থেকে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যভাগ বলে মনে করা হয়। গঠনশৈলীর দিক থেকে সবকটি পাখিই একইরকমভাবে নির্মিত— খোলামুখ, লম্বা এবং সৌন্দর্যময় বাঁকানো গলা, তীক্ষ্ণভাবে গোলবৃত্ত খোদাই এবং তার মধ্যে সুস্পষ্ট বিন্দু দিয়ে চোখগুলি আঁকা হয়েছে। পাখার আকারের লেজটি লিপ্তপদ সমন্বিত পিছনের ছোট পাগুলিকে আড়াল করছে। খুব সম্ভবত রাজহংস বা হংসজাতীয় এই পাখীগুলি তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে অথবা ধর্মগত দিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ কোন স্মৃতিচিহ্ন যে মাটির পাত্রে থাকত তার চতুর্দিকে সৌন্দর্যবর্ধন করার জন্য ব্যবহৃত হত। পাহাড়পুর এবং ময়নামাটি থেকেও একই ধরনের টেরাকোটা হংসের চিহ্ন পাওয়া গেছে। কিন্তু গঠনশৈলীর দিক থেকে রাজবাড়ীডাঙ্গাতে প্রাপ্ত হংসের চিহ্নের সঙ্গে অন্যত্র প্রাপ্ত হংসের মূর্তির ফারাক রয়েছে। রাজবাড়ীডাঙ্গাতে যেখানে শ্রেণীবদ্ধ হংসের ছবি পাওয়া যায়, অন্যত্র কিন্তু হংসের ছবি পাওয়া গেছে এককভাবে।

একই শিল্পশৈলীর অর্ন্তগত কিন্তু পরবর্তী সময়ে প্রস্তুত মঞ্জুশ্রীর একটি দন্ডায়মান মূর্তি মহাস্থানগড়ের বলাইটপ ঢিবি থেকে পাওয়া গেছে। এই মূর্তিটির গঠনের মধ্যে গুপ্ত আমলের শিল্পশৈলীর উপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠা এক নতুন শিল্পশৈলীর ছাপ স্পষ্ট। এই মূর্তিটি রাজশাহীর বরেন্দ্র রিসার্চ সোসাইটির সংগ্রহালয়ে রক্ষিত আছে। মূর্তিটিতে জটাযুক্ত সম্বলিত অক্ষোভ্যের প্রতিমূর্তি লক্ষ্য করা যায়। মূর্তিটির ডানহাত বরদমুদ্রায় এবং বামহাত বিতর্ক ভঙ্গিতে রক্ষিত। মস্তিষ্কের উর্দ্ধভাগে চুলগুলি একটি গ্রন্থিতে বাঁধা এবং তা কাঁধ এবং বুকের উপর ঢেউ খেলানো অবস্থায় ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও গঠনগত দিক থেকে এই মূর্তিটির সঙ্গে অষ্টম শতাব্দীর কিংবা তার পরে তৈরী নালন্দা থেকে প্রাপ্ত অবলোকিতেশ্বরের একটি ব্রোঞ্জ মূর্তির সাদৃশ্য রয়েছে। একই স্থান থেকে চতুর্ভুজ বোধিসত্ত্বের একটি মূর্তিও পাওয়া গেছে। এই মূর্তিটির শরীরে একমাত্র উপবীত ছাড়া কোনরকম অলঙ্কারের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায় না। দুটি পদ্মের উপর উপবেশিত এবং মস্তিষ্কের পিছনে উজ্জ্বল স্বর্ণাভ জ্যোতিশ্চক্র সমেত এই মূর্তিটির গঠনগত বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে অষ্টম শতাব্দীর ব্রোঞ্জের তৈরী ভাস্কর্যের মিল রয়েছে। গুণগত দিক থেকে এই মূর্তিটির মধ্যে গুপ্তযুগের মূর্তি গঠনশৈলীর ধারাবাহিকতা বিদ্যমান।

খননকার্যের ফলে কিংবা অন্যভাবে আবিষ্কারের ফলে পাল-পূর্ব যুগের যে সমস্ত ভাস্কর্যের সন্ধান পাওয়া গেছে তার মধ্যে টেরাকোটা কিংবা ছাঁচে ঢালা মূর্তির তুলনায় পাথরের ভাস্কর্যের সংখ্যা নিতান্তই অল্প। মহাস্থান অঞ্চলের ভাসুবিহার থেকে এরকম একটি মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। দুই পাপড়ি বিশিষ্ট পদ্মের উপর দন্ডায়মান বুদ্ধের দক্ষিণ হস্ত বরদমুদ্রায় এবং বাম হস্তে ধরা সংঘাটির প্রান্ত, বুদ্ধের ডানদিকে হাঁটুমুড়ে বসে থাকা একজন ভক্তকেও দেখা যায়। মূর্তির বাম হাতে স্বচ্ছ সংহাতির প্রান্ত ধরে থাকা গুপ্তযুগের মূর্তি গঠনের

বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পড়ে। গাঢ় ধূসর-বর্ণের স্ফটিকে প্রস্তুত এই মূর্তিটির অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি অসমান। ফলে এই মূর্তিটির গঠনের মধ্যে সূক্ষ্মতার অভাব রয়েছে। এছাড়াও গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তির এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য-বুদ্ধের চেহারার মধ্যে এক স্বর্গীয় দীপ্তিময় মহিমা। কিন্তু এই মূর্তির মধ্যে তাও অনুপস্থিত। তথাপি এ কথাও সত্য যে গুপ্তযুগের সারনাথ শিল্পশৈলীর সঙ্গে এই মূর্তিটির গঠনের একটি মিল রয়েছে। বাংলায় এই ধরনের নমনীয় পাথরের ভাস্কর্য তৈরী করার প্রচলন বহুদিন অক্ষুন্ন ছিল।

বর্তমান বাংলাদেশের লালমাই পার্বত্য অঞ্চলের ময়নামতীর কোটিলমুরা থেকে প্রাপ্ত ভাস্কর্য সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এখান থেকে প্রাপ্ত সমস্ত মূর্তিগুলির মধ্যে দুটি মূর্তির কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ্য। এই দুটি ফলকে বৃন্তের ফুটন্ত পদ্মের উপর উপবেশিত বুদ্ধকে লক্ষ্য করা যায়। এদের মধ্যে প্রথমটির সঙ্গে গঠনশৈলীগত দিক থেকে গুপ্তযুগের নমনীয় পাথরে তৈরী মূর্তির মিল রয়েছে। মূর্তিগত দিক থেকে এই ফলকটিকে অষ্ট মহাবোধিসত্ত্ব মন্ডল বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। কিন্তু ফলকটির নীচের দিকে দুটি পদ্মের উপর দুজন নারীভক্তের উপস্থিতি থেকে মনে করা হয় এটিতে মহাযান মতের বুদ্ধের অলৌকিক উপস্থিতি এবং ভক্তদের মধ্যে তাঁর বাণী প্রচার সংক্রান্ত কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। একইভাবে প্রস্তুত অন্য মূর্তিটি চতুর্ভুজ (অবলোকিতেশ্বর) এবং মূল কান্ড থেকে বের হওয়া মধ্যের পদ্মের উপর মূর্তিটি আসীন এবং পাশ থেকে বের হওয়া অন্যান্য ফুলগুলি অন্যসব অনধিক গুরুত্বপূর্ণ মূর্তিদের আসন হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। মূল মূর্তিটির মাথায় জটা, কোঁকড়ানো কেশরাশি কাঁধ পর্যন্ত বিস্তৃত এবং একটি ডানহাত বুকের কাছে কোন অজানা বস্তু ধরে আছে। বাম দিকে ঈষৎ ঝুঁকে থাকা মুখটি বামহাতের উপর স্থিত। মূর্তিটির বেশ খানিকটা অংশ ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ায় বাকি দুটি হাতের বৈশিষ্ট্যসমূহ নিরূপণ করা সম্ভব হয়নি। মূর্তিগত দিক থেকে এই মূর্তিটির দুটি ভঙ্গিমা কিঞ্চিৎ অস্বাভাবিক, যদিও টেরাকোটা শিল্পের উপর প্রস্তুত একই ধরনের মূর্তি নালন্দা থেকেও পাওয়া গেছে। গঠনশৈলীগত দিক থেকে বিচার করলে এটা স্পষ্ট বোঝা যায়, বহুদিন ধরেই বাংলার শিল্পীরা গুপ্ত যুগের মগধ থেকে উৎসারিত শিল্পশৈলীর অনুসরণ করেছিলেন। কিন্তু একই সঙ্গে একথাও সত্য যে মূর্তিগত দিক থেকে বাংলায় এগুলি পরবর্তীকালের বৌদ্ধধর্মের ফসল।

আশরফপুর থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্র ব্রোঞ্জের স্তুপ থেকে দুই বাহু সমন্বিত উচ্চশিল্প সুষমা মন্ডিত অবলোকিতেশ্বরের মূর্তিটিকে একই পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত করা যায়। শৈলীগত দিক থেকে উপরে বর্ণিত ময়নামতীতে প্রাপ্ত বোধিসত্ত্বের মূর্তির সঙ্গে এর মিল রয়েছে। প্রাপ্ত দুটি তামার শিলালিপি (যাদের সময়সীমা সপ্তম শতাব্দীর শেষভাগ কিংবা অষ্টম শতাব্দীর প্রথমভাগ বলে নির্মিত হয়েছে) থেকে মনে হয়, এই স্তুপটি কোটিলমুরা মূর্তিগুলির সমকালে নির্মিত হয়েছিল। শাসনকালের দিক থেকে এটি খড়গদের শাসনকালে নির্মিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

বর্ধমান জেলার বর্তমান পানাগড়ের কাছে অবস্থিত ভরতপুরে খননের ফলে খ্রীষ্টীয় অষ্টম অথবা নবম শতাব্দীর বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের সন্ধান মিলেছে। বাংলার সবথেকে বড় স্তুপের সন্ধানও এই স্থানটিকে সেদিক থেকে অনন্যতা প্রদান করেছে। এ বিষয়ে মনোযোগ আকর্ষনের বিষয়টি হল, আশরফপুরের ক্ষুদ্রাকার ব্রোঞ্জের স্তুপের মতোই ইঁট নির্মিত এই স্তুপটির চারদিকে চারটি কুলুঙ্গিতে উপবেশিত বুদ্ধের মূর্তি বিদ্যমান। প্রতিটি বুদ্ধের মূর্তির মুখ এক নির্দিষ্ট দিকে (যেমন পূর্ব, পশ্চিম, উত্তর কিংবা দক্ষিণ) নিবদ্ধ। এই ধরণের চারদিকে বুদ্ধের মূর্তি সমেত স্তুপ শুধু বাংলায় নয়, সে সময় নালন্দা এবং রাজগীরেও জনপ্রিয় ছিল; এই ধরনের স্তুপের আদর্শ উদাহরণ হল, নেপালের স্বয়ম্ভু স্তূপ। প্রতিটি বুদ্ধের মূর্তি নরম বেলেপাথরের উপর সুস্পষ্টভাবে খোদাই করা, দ্বিরথ বা ত্রিরথ বেদীতে বিভক্ত ফুটন্ত পদ্মের উপর প্রতিটি বুদ্ধের মূর্তি প্রতিষ্ঠিত, এবং প্রতিটি মূর্তি ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় আসীন। শৈলীগত দিক থেকে নবম শতাব্দীর এই মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্য হল অর্ধমুদ্রিত চক্ষুদ্বয়, পূর্ণ গোলাকার গন্ড, ঠোঁটে মৃদু হাসি, শরীরের উপর ভাঁজকরা বস্ত্র এবং সুঠাম শরীর।

এ প্রসঙ্গে মহাস্থানগড়ের কাছাকাছি স্থান থেকে পাথরের তৈরী অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। দীর্ঘকায়, রোগাটে, ষড়ভুজ এবং দ্বিস্তর পাপড়িযুক্ত পদ্মের উপর আভঙ্গ মুদ্রায় দন্ডায়মান এই মূর্তিটির মধ্যে কিছু অভিনব বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। চক্র এবং অন্যান্য রত্ন চিহ্ন সমেত এই মূর্তিটি একটি বেদীর উপর স্থাপিত। মূর্তিটির চারপাশে তারা, ভৃকুতি, হয়গ্রীব এবং সূচীমুখকে দেখা যায়। পেছনের প্রস্তরখন্ডের উপর অবস্থিত বৃত্তাকার জ্যোতিশ্চক্রটি সে সময়কার পাথরের ভাস্কর্যের মধ্যে সাধারণত দেখা যায় না। কিন্তু এই ধরনের বৈশিষ্ট্য সে সময় বাংলার ব্রোঞ্জের ভাস্কর্য প্রস্তুত কারীদের মধ্যে বেশ জনপ্রিয় ছিল। জ্যোতিশ্চক্রের প্রান্তভাগ অগ্নিশিখার ন্যায় খোদিত। এই অগ্নিশিখাগুলির একটি কেন্দ্র বিদ্যমান এবং সেগুলি উপরের দিকে নিবদ্ধ। ভাস্কর্যের এই ধরণের বৈশিষ্ট্য নবম শতাব্দীর পাল শিল্পশৈলীর মধ্যে সুপ্রচলিত ছিল। এছাড়া এই ভাস্কর্যটির অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যগুলি হল— ভেতরের দিকে বলয় সমেত পদ্মের প্রতিটি পাপড়ির সুন্দর গঠন, বোধিসত্ত্বের শরীরে অলঙ্কারের অধিক উপস্থিতি— এগুলির মধ্যে হস্তবন্ধনী, নেকলেশ এবং কোমরবন্ধনী সুস্পষ্টরূপে খোদিত এবং মস্তকের সুসজ্জিত রূপ।

উপরের আলোচনা থেকে পরিষ্কার বোঝা যায়, বাংলার বৌদ্ধ ভাস্কর্যকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। এদের মধ্যে প্রথমটির সময়কাল খ্রীষ্টীয় সপ্তম কিংবা অষ্টম শতাব্দীর বলে মনে করা হয়। এই সময়ের ভাস্কর্যগুলির সঙ্গে গুপ্ত যুগের মূর্তি তৈরীর শৈলীর সাযুজ্য পাওয়া যায়। বিষয়গত দিক থেকে এই মূর্তিগুলি কিছু বিচ্ছিন্ন উদাহরণ এবং এগুলিকে স্তূপ স্থাপত্যশিল্পের অংশ বলেই মনে করা হয়। এই সময়ের বৌদ্ধ শিল্পকলার মধ্যে মূর্তি তৈরীর দিকে ঝোঁক দেখা যায়, এবং তাদের দৃষ্টিভঙ্গি এবং বিভঙ্গে জীবনের গভীর অভিজ্ঞতার ছাপ পরিস্ফূট।

বাংলায় বৌদ্ধ ভাস্কর্যের দ্বিতীয় পর্যায় হিসেবে এর পরবর্তীকালকে চিহ্নিত করা যায়। এই সময় বাংলায় মহাযান মতবাদের পূর্ণ বিকাশ ঘটে এবং তার মধ্যে বহু ব্রাহ্মণ্য দেব-দেবীর অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই সময় তান্ত্রিক আচার পদ্ধতির প্রভাবও লক্ষণীয়। ধর্মীয় আচার আচরণের এই পরিবর্তন তৎকালীন শিল্পচর্চাকে নিঃসন্দেহে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করেছিল। ফলতঃ এই সময়ের ভাস্কর্যগুলির সঙ্গে পূর্বেকার ভাস্কর্যগুলির তুলনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, এই সময়ের মূর্তিগুলি গঠনে সুঠাম, বলশালী এবং বিভঙ্গে বৈচিত্রপূর্ণ। এ থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে অষ্টম এবং নবম শতাব্দীতে বাংলার শিল্পীরা পূর্বভারতের মধ্যযুগের শিল্পশৈলীর মত তাদের এক নিজস্ব শৈলী সৃষ্টি করেছিলেন। তারানাথ তাঁর বিবরণীতে কিভাবে বাংলায় ধর্মপাল এবং দেবপাল (783-858 A.D.)-এর আমলে ধীমান এবং তাঁর পুত্র বীতপাল বাংলায় ভাস্কর্য, ছাঁচে ঢালাই ব্রোঞ্জ এবং অঙ্কন শৈলীর এক নতুন ধারার গোড়াপত্তন করেছিলেন তার বিবরণ দিয়েছেন। তাঁর মতে এঁরা এক নতুন শৈলীর প্রবর্তক। এই শিল্পশৈলীর অর্ন্তগত বেশীর ভাগ ভাস্কর্যই কালো আগ্নেয় শিলা দিয়ে তৈরী এবং এদের পিছনে একটি প্রস্তরখন্ড খাড়াভাবে স্থাপিত। বেশীরভাগ ভাস্কর্যের মধ্যে কোন না কোন দেবদেবীর মূর্তি লক্ষ্য করা যায়। মঠের মধ্যে স্থাপন করে পুজো করার উদ্দেশ্য নিয়ে তৈরী এই মূর্তিগুলি সামনের দিকে সোজাসুজি তাকানো। শৈলীগত দিক থেকে অবিক্ষিপ্তভাবে গোলাকার এই মূর্তিগুলিতে ক্রমশ: পিছনের উল্লম্ব প্রস্তর খন্ডের ব্যবহার কমতে থাকে। পরবর্তীকালের মূর্তিগুলির মধ্যে নমনীয় ভাব কমতে থাকে। অত্যন্ত সুসজ্জিত বেদীর উপর বসে কিংবা দাঁড়িয়ে থাকতে দেখা যায়। এই বেদীগুলি ক্রমশঃ মন্দিরের ত্রিরথ থেকে সপ্তরথের আকার নিতে থাকে।

লক্ষণীয় ব্যাপার হল এই ধরণের শৈল্পিক ক্রিয়াকলাপ বিভিন্ন মাধ্যমের কাজের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। যেমন টেরাকোটার মূর্তিগুলি তৈরী হয়েছিল মূলত: দরজা বা জানালার প্যানেল বসানোর জন্য এবং ব্রোঞ্জ ও পাথরে তৈরী মূর্তিগুলি পুজোর জন্য। ব্রোঞ্জের মূর্তিগুলি ছোট আকারে তৈরী করা হয়েছিল এবং এগুলি নির্মাণে অনেক সুক্ষ্মতার পরিচয় ছিল। তুলনায় পাথরে তৈরী মূর্তিগুলির ক্ষেত্রে এ কথা প্রযোজ্য নয়। এই সমস্ত ভাস্কর্যগুলিকে গভীরভাবে নিরীক্ষণ করলে বোঝা যায় সে সময়ের বাংলার শিল্পীরা পাথরের উপর খোদাই করে মূর্তি প্রস্তুত করার সময় একটি নির্দিষ্ট রীতি মেনে চলতেন।এবং এই রীতি তৎকালীন মগধের শিল্পীরাও তাঁদের আঞ্চলিক চরিত্রকে বজায় রেখেই মেনে চলতেন। গুপ্ত যুগ থেকে উৎসারিত এই শিল্পকলারীতি গোটা পূর্বভারতে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিশেষকরে ব্রোঞ্জের তৈরী মূর্তি নির্মাণে সে সময়ের শিল্পীরা চরম উৎকর্ষের পরিচয় দিয়েছিলেন। এই মাধ্যমের কাজের দুটি ভিন্ন ধারার পরিচয় পাওয়া যায়। প্রথম ধারাটি হল মগধ কেন্দ্রিক এবং এর সন্ধান মূলত: উত্তরবঙ্গ এবং সমতটের কিছু অঞ্চলে পাওয়া যায়। এই শিল্পধারা সাধারণত পাথরের তৈরী ভাস্কর্যের মধ্যেই প্রতিফলিত এবং তা গুপ্তযুগ থেকে লক্ষ্য করা

যায়, এবং দ্বিতীয় ধারাটি মূলত: আঞ্চলিক এবং তা রক্তমৃত্তিকা মহাবিহার এবং ভাসুবিহার-এ প্রাপ্ত বুদ্ধের মূর্তির মধ্যে প্রতিফলিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে; পরবর্তীকালে এই ধারাটিই উত্তর এবং দক্ষিণ পূর্ব বাংলায় একটি পৃথক আঞ্চলিক শিল্পশৈলী হিসেবে পরিগণিত হয়। এই সময়ের মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি হল - খোলা চক্ষুদ্বয়, খোলা ঠোঁটে ব্যঙ্গাত্মক মলিন হাসি, পুরুষ এবং মহিলা উভয়েরই ক্ষেত্রে সুস্পষ্ট স্তনবৃন্ত, পোশাকের অর্ধস্বচ্ছতা লক্ষনীয়।

উপরোক্ত বর্ণিত দু ধরনের শিল্পরীতির মধ্যে পাহাড়পুরের টেরাকোটা শিল্পরীতিরই প্রথম বিকাশ ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। বিষয়ের উপর ভিত্তি করে পাহাড়পুর টেরাকোটা শিল্পকে মোটামুটিভাবে দুভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম ভাগের ভাস্কর্যগুলি মূলত: বর্ণনা-ধর্মী, বিভিন্ন মহাকাব্য থেকে নেওয়া পৌরানিক কিংবা লৌকিক কাহিনী, অথবা স্থানীয় বিভিন্ন বীরদের গাথা বর্ণিত হয়েছে। অন্যশ্রেণীর ভাস্কর্যগুলিতে বিভিন্নি পরিচিত মুদ্রায় বুদ্ধ/বোধিসত্ত্বকে লক্ষ্য করা যায়। দ্বিতীয় ধরনের শিল্পরীতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল — ক্ষুদ্রাকার দেহাবয়ব, শিল্পসুষমা বিহীন মুখমণ্ডল, গোল খোলা চক্ষুদ্বয়, বাইরের দিকে প্রসারিত ঠোঁট। কৌতূহলের বিষয় হল পাহাড়পুরের বিখ্যাত মন্দিরের নিম্নভাগের অভিক্ষিপ্ত কোণের অংশ থেকে যে সমস্ত পাথরের ভাস্কর্য পাওয়া গেছে, শিল্পগত এবং বিষয়গত দিক থেকে তাদের সঙ্গে টেরাকোটার শিল্পসামগ্রীর একই নিয়ম এবং বৈশিষ্ট্যগত গুণাবলী মেনে চলতে দেখা গেছে।

শালবনের মহাবিহার থেকে টেরাকোটা, ব্রোঞ্জ এবং পাথরের তৈরী প্রচুর শিল্প সামগ্রীর প্রমাণ মিলেছে। এখানেও টেরাকোটার সামগ্রীগুলি মূলত: মন্দির গাত্রের সৌন্দর্যবৃদ্ধির জন্য ব্যবহৃত হত। সোমপুর মহাবিহারের মত শালবন মহাবিহারেও টেরাকোটার ভাস্কর্যের মাধ্যমে মানুষের দৈনন্দিন জীবনযাত্রাকে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। জীবনের এই সমস্ত উপাদানের মধ্যে বুদ্ধকে পদ্মাসন অথবা দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় লক্ষ্য করা যায়। গঠনগত দিক থেকে মূর্তিগুলির মধ্যে আধ্যাত্মিক এবং জাগতিক উভয় বৈশিষ্ট্যই প্রতিবিম্বিত হয়েছে। উদাহরণ হিসেবে শালবন মহাবিহার থেকে প্রাপ্ত মারিচির মূর্তিটির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মূর্তিটির বৈশিষ্ট্যগুলি হল—ভারী ক্ষুদ্রাকার চেহারা, বিস্ফারিত খোলা চক্ষুদ্বয়, পুরু ঠোঁট এবং ভারী বক্ষ।

এই যুগের ব্রোঞ্জের ভাস্কর্যগুলির মধ্যে এক গভীর শিল্পবোধের পরিচয় পাওয়া যায়। এই শিল্পগুলির মূল বৈশিষ্ট্যই হল ছাঁচ অনুযায়ী মূর্তি গঠন। ধর্মীয় এই নিয়মনীতির মধ্যেই কিছু প্রতিভাবান শিল্পী তাঁদের কাজের মধ্যে হৃদয়ের গভীর অনুভবের ছাপ রেখেছিলেন। এই সমস্ত মূর্তিগুলির মধ্যে সবথেকে কৌতুহলোদ্দীপক মূর্তিটি হল মঞ্জুশ্রীর। এই ভাস্কর্যটিতে মঞ্জুশ্রী একটি উঁচু চতুষ্কোন বেদীর উপর মহারাজলীলা ভঙ্গিতে বসে আছেন। দেবী মঞ্জুশ্রী একটি প্রস্ফুটিত পদ্মের মূল কেন্দ্রটিতে বসে এবং তাঁর চারপাশে

আরো অনেক মানুষের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। দেবীর কোমল এবং নমনীয় চেহারাটি যথেষ্ট সূক্ষ্মতার সঙ্গে প্রস্তুত করা হয়েছে এবং দেবীর অভিব্যক্তিতে এক সহজ সরল ভাব পরিস্ফূট। দেবীর ডান হাত দেবীর উত্থিত ডান হাঁটুর উপর স্থিত। দেবীর প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত একটি পান্ডুলিপি বা পুস্তক দেবীর বামদিকে উত্থিত একটি পদ্মের উপর রক্ষিত, দেবীর বসে থাকার ভঙ্গিমার মধ্যে যে লক্ষনীয় রকমের আয়াসহীনতা রয়েছে তা নজর কাড়ার মত। উক্ত অঞ্চল থেকে পাওয়া অবলোকিতেশ্বরের একটি ব্রোঞ্জের মূর্তিতে একই ধরনের বাহ্যিক গঠন সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। ললিতাসন মুদ্রায় অত্যন্ত অনায়াস ভঙ্গিমায় মূর্তিটির দাঁড়ানো চোখে পড়ার মত। বৃহৎ দল থেকে নির্গত একটি বৃহৎ পদ্মের উপর দ্বিবাহুযুক্ত অবলোকিতেশ্বর আসীন। তাঁর ডান হস্ত বরদমুদ্রায় এবং বাম হস্ত পদ্মের উপর স্থির। পূর্ণ প্রস্ফুটিত একটি পদ্ম মূর্তিটির মাথার পিছনের জ্যোতিশ্চক্রের বামদিকে অবস্থিত। মূর্তিটি বেশ ক্ষতিগ্রস্ত অবস্থায় পাওয়া গেছে—বিশেষ করে পিছনের আলোকচক্র এবং উত্থিত বেদী।

সিলেটের বন্দর বাজার থেকে আবিষ্কৃত ব্রোঞ্জের তৈরী লোকনাথের দন্ডায়মান মূর্তির সঙ্গে উপরোক্ত মূর্তিগুলির শিল্পরীতিতে সাদৃশ্য রয়েছে। ঈষৎ দীর্ঘকায় এবং কৃশ এই মূর্তিটি দ্বিদল বিশিষ্ট একটি পদ্মের উপর দন্ডায়মান। মূর্তিটির ডান হাত বরদ মুদ্রায় এবং বাম হাতে একটি পূর্ণ প্রস্ফুটিত পদ্ম ধরা আছে। ধ্যানী বুদ্ধ অমিতাভ একটি আচ্ছাদিত চূড়ার উপর আসীন। মূর্তিগঠনের উপযোগী নমনীয় উপাদান ব্যবহারের ফলে মূর্তির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ এবং মুখাবয়বের মধ্যে এক প্রকার নমনীয়তা লক্ষ্য করা যায়। মূর্তিটির গঠনে কমনীয়তা গঙ্গা অববাহিকা অঞ্চলে গুপ্ত শিল্পরীতির প্রভাবের কথা মনে করিয়ে দেয়।

শালবন মহাবিহারে প্রাপ্ত ভাস্কর্যের সমান্তরাল হিসেবে বর্তমান ত্রিপুরা রাজ্যের জোলাই বাড়ি-পিলক অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ভাস্কর্যের কথা উল্লেখ করা যায়। কালক্রমানুসারে এই শিল্প নিদর্শনগুলি শালবন মহাবিহারের সমকালের হলেও শিল্পবৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে তা এক পৃথক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত। স্থানীয় বেলে পাথরে তৈরী মূর্তিগুলির স্বকীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যসমূহ থেকে তাদের স্থানীয় লোকায়ত রূপটি সহজে প্রতিভাত হয়। এই মূর্তিগুলির বাহ্যিক গঠন সংক্রান্ত বৈশিষ্ট্যগুলি পার্শ্ববর্তী প্রাচীন হরিকেল অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত শিল্প সামগ্রীর থেকে পৃথক। অর্থাৎ বলা যায়, জোলাইবাড়ি অঞ্চলের পাথরের ভাস্কর্য স্থানীয় পাহাড় কেটে শিল্পবস্তু নির্মানের ঐতিহ্য থেকেই উদ্ভুত।

কিন্তু ব্রোঞ্জের তৈরী ভাস্কর্যের ক্ষেত্রে এই অঞ্চলের মূর্তিগুলির সঙ্গে সমতট হরিকেল অঞ্চলের ভাস্কর্যের শৈলীগত এবং মূর্তিগত দিক থেকে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। পিলক অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত বহু ব্রোঞ্জের মূর্তির মধ্যে অবলোকিতেশ্বরের একটি মূর্তি এই ধরনের ভাস্কর্যের উদাহরণ। বর্তমানে এটি ত্রিপুরার ত্রিপুরা সরকারী সংগ্রহালয়ে রক্ষিত। গঠনগত এবং বৈশিষ্ট্যগত দিক থেকে এই মূর্তিটি ঝেওয়ারী ব্রোঞ্জের মূর্তির অনুসারী। বুদ্ধের

উপবেশিত অবস্থায় পাওয়া একটি মূর্তির কথাও এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য। এই মূর্তিটির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যগুলি হল—অদ্ভুত রকমের চওড়া মুখমণ্ডল, ভারী অর্ধনিমীলিত চক্ষুদ্বয়, বাইরের দিকে প্রসারিত পুরু ঠোঁট, খ্রীষ্টীয় নবম এবং দশম শতাব্দীর বাংলায় বুদ্ধের মূর্তিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যায় পাল যুগের শিল্পকলা সে যুগের ভারতীয় শিল্পকলার ধারাই অনুসরণ করত এবং তার মধ্যে পূর্বভারতের আঞ্চলিক প্রভাব ছাড়াও গুপ্ত শিল্পকলার প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। উল্লেখযোগ্য বিষয় হল গুপ্তযুগের মগধ শিল্পকলার ধারা মূলত: বরেন্দ্র অঞ্চলের শিল্পের উপর প্রভাব বিস্তার করেছিল। প্রাপ্ত শিলালিপি এবং খননকার্যের ফলে পাওয়া অন্যান্য সামগ্রী থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় বরেন্দ্র অঞ্চলের ভাস্করদের সঙ্গে মগধ অঞ্চলের ভাস্করদের যোগাযোগ ছিল। এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টি হল এখানকার শিল্পরীতি এবং শৈলীর সঙ্গে মগধের শিল্পরীতি এবং শৈলীর গভীর মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বাংলা এবং বিহারের শিল্পের মধ্যে মিলের কারণ হিসেবে তাদের ভাবগত ধারণার আদান প্রদান তথা একই সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের কথা উল্লেখ করা যায়। প্রকৃত অর্থে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস গভীর ভাবে অধ্যয়ন করলে বোঝা যায় ভবিষ্যৎ সম্ভাবনা সংক্রান্ত চিন্তা ভাবনা এই সময় মূলতঃ বিহারে অবস্থিত বৌদ্ধমঠগুলিতে হয়েছিল। এই ধরনের আলোচনা এবং চিন্তাভাবনার রেশ সেসময় বাংলায়ও ছড়িয়ে পড়েছিল।

বাংলাদেশের সোমপুর থেকে প্রাপ্ত আনুমানিক দশম শতাব্দীতে প্রস্তুত অষ্টমহাভয় তারার মূর্তিতে পূর্বাঞ্চলের নিজস্ব ছাপ সমন্বিত গুপ্ত শিল্পরীতির প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। যার প্রকৃষ্ট প্রমাণ হল মূর্তিটির সূক্ষ্ম নমনীয় সৌন্দর্য। ললিতাসনে উপবিষ্ট মূর্তিটির মধ্যে একটি দীর্ঘায়তভাব মূর্তিটির বক্ষদেশ থেকে নীচের দিকে লক্ষ্য করলে বোঝা যায়। উদরের কাছে লক্ষিত ভাঁজ থেকে অবশ্য একটি সুগঠিত শরীরের পরিচয় পাওয়া যায়। এই মূর্তিটির সব থেকে উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্যটি হল— অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাকার মুখ এবং বুকের তুলনায় শরীরের বাকি অংশের দীর্ঘায়তভাব। মূল মূর্তিটির দুই পার্শ্বে অবস্থিত সহযোগী মূর্তিগুলি যেমন তারা, ভৃকুতি, হয়গ্রীব এবং সূচীমুখ-তাদের আকারের মধ্যে একই রকম বৈশিষ্ট্য বর্তমান। রাজশাহী থেকে প্রাপ্ত মঞ্জুশ্রীর মূর্তিও একই শ্রেণীভুক্ত। ধর্মচক্রমুদ্রায় দণ্ডায়মান দ্বিবাহু যুক্ত বোধিসত্ত্বের মূর্তিটি ঈষৎভাঁজ যুক্ত। মূর্তিটির শরীরের উপরের অংশ ঈষৎ সংকুচিত, যদিও নীচের অংশ প্রলম্বিত।

শরীরের গঠনে কোমলভাব অর্পণ করা ছাড়াও তাদের চেহারার মধ্যে মাধুর্য্য এবং সুরুচিপূর্ণ ভাব প্রদান করে বাংলার শিল্পীরা মূর্তি গঠনের ক্ষেত্রে এক নতুন প্রথার প্রচলন করেছিলেন। দীর্ঘকায় এবং কৃশ মূর্তি গঠনে এই সময়ে বিশেষ ঝোঁক ছিল। অবশ্য শুধু বাংলা নয়, বিহারেও এই ধরনের শৈলীতে মূর্তি প্রস্তুত করার প্রচলন কয়েকশো বছর প্রচলিত ছিল। শিল্প বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে মূর্তিগুলির শরীরের পাতলা গড়ন এবং পায়ের গঠনে ঈষৎ কাঠিন্য এই মূর্তিগুলির বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল। মূর্তিগুলির মুখের গড়নে

সুডৌলভাব প্রদান করে মুখমণ্ডলের মধ্যে ঐশ্বরিকভাব ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করা হয়েছে। এতদ্‌সত্ত্বেও বিস্তৃত এবং দীর্ঘ শারীরিক গঠনের মধ্যে দিয়ে এক শারীরিক সৌন্দর্যের পরিগুল গড়ে তোলার চেষ্টা হয়েছে এই মূর্তিগুলি গঠনের মধ্য দিয়ে।

নির্দিষ্ট করে সময় নির্ধারণ করা বৌদ্ধ মূর্তির উপস্থিতি সেই সময়ের বাংলায় প্রায় নেই বললেই চলে। বাস্তবে এই অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত যে সব মূর্তিগুলির সময়কাল সঠিক নির্ধারণ করা যায়, তাদের সাহায্য নিয়েও অন্যান্য মূর্তিগুলির সময়কাল নির্ধারণ এবং শিল্পশৈলী বিচার কঠিন হয়ে পড়ে। এই অঞ্চলের শিল্পশৈলীর সময়কাল নির্ধারণের জন্য তৎকালীন বিহারের শিল্পশৈলী এবং মূর্তিগুলির দিকে নজর ফেরানো যেতে পারে। সঠিক আলোচনার স্বার্থে বিহার থেকে প্রাপ্ত নির্দিষ্ট সময়কালের বহু মূর্তির মধ্যে নীচের মূর্তিগুলির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। মূর্তিগুলির সময় নিরূপণের জন্য দুটি বৌদ্ধমূর্তির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। প্রথমটি ত্রয়ত্রিংশ স্বর্গ থেকে আগত বুদ্ধ এবং অপরটি সুরপালের শাসনকালের তৃতীয় বর্ষে প্রস্তুত নীলগিরি হস্তীকে বশে আনা। দুটি ভাস্কর্যেই দুটি স্তম্ভের উপর তিনটি খিলানযুক্ত তোরনে বুদ্ধদেব সম্পদস্থানক মুদ্রায় দন্ডায়মান। তাঁর ডান হস্ত অনাবৃত কিন্তু বাম হস্তে সংঘাটির প্রান্ত ধরা। গঠনগত এবং শৈলীগত উভয়দিক থেকেই মূর্তিদুটি গুপ্তযুগের প্রধান ভাস্কর্য কৌশলকে মনে করিয়ে দেয়। এ প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে, গঠন এবং দাঁড়ানোর ভঙ্গিমায় এই ধরনের মূর্তি সে সময় বাংলায় বিশেষ জনপ্রিয় ছিল।

রাজ্যপালের (C.A.D. 917-952) শাসনকালের বত্রিশতম বছরে তৈরী বসুধারা-তে কিঞ্চিৎ ভিন্ন ধরণের গঠনশৈলীর পরিচয় পাওয়া যায়। মূর্তিগুলি খোদাই-এর মধ্যে এক ধরনের সূক্ষ্মতা এবং তীক্ষ্ণতা লক্ষ্য করা যায়। আগের গোলাকার আকৃতির পরিবর্তে এই সময়ের মূর্তিগুলি বরং কৃশ এবং আরো সূক্ষ্ম আকারের। শিল্পসুষমার দিক থেকে এই সময়ের মূর্তিগুলির মধ্যে স্থানীয় চিন্তাভাবনার আরো বেশী প্রতিফলন দেখা যায়। শিল্পকলার এই নতুন ধারা বাংলার বিশেষত বরেন্দ্র অঞ্চলের শিল্পের উপর ছাপ ফেলেছিল।

রাজা দ্বিতীয় বিগ্রহপাল (C.A.D. 1043-1070) এর আমলে প্রস্তুত কুর্কিহার থেকে প্রাপ্ত দুটি দন্ডায়মান বুদ্ধের মূর্তি থেকে পালযুগে বুদ্ধের মূর্তি তৈরী কলা সম্পর্কে সম্যক জানা যায়। মূর্তিদুটি রথের ন্যায় বেদীর উপর দ্বিপক্ষের উপর "সম্পদ স্থানক' ভাবে 'অভয়' ভঙ্গিমায় দন্ডায়মান। পরনের স্বচ্ছ পোশাক এবং স্বর্গীয় আভাযুক্ত চেহারা ছাড়াও শরীরে অত্যধিক গহনার উপস্থিতি বিহারের পাল যুগের শিল্পকলার এক অন্যতম বিষয়। পাথরের বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করতে গিয়ে বাংলার শিল্পীরা এই একই শৈল্পিক মুদ্রা অনুসরণ করেছেন। বিহার এবং বাংলা থেকে প্রাপ্ত খদিরবনি তারার মূর্তি মনযোগ সহকারে পর্যালোচনা করলে এই ধরনের শৈলীর বিকাশের বিষয়ে নতুন তথ্যের উন্মেষ ঘটতে পারে।

এ প্রসঙ্গে রামপালের শাসনকালের দ্বিতীয় বছরে প্রস্তুত একটি মূর্তি নিয়ে আলোচনা করা যেতে পারে। মূর্তিটির বৈশিষ্ট্য হল অস্বাভাবিক রকমের উন্নত বক্ষদেশ এবং নিতম্ব এবং

কোমরের অস্বাভাবিক কৃশতা। ব্যবহৃত পোশাক থেকে শরীরের কোমলভাব বোঝা যায়।

একই দেবীর অন্য একটি মূর্তি যা বর্তমানে ভারতীয় সংগ্রহালয়, কলকাতাতে রক্ষিত সেটিতেও একইরকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এই মূর্তিটিতেও বক্ষদেশ, নিতম্ব, কোমর ও পোশাকে একই রকম বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। দিনাজপুর জেলার অগ্রদিগুন থেকে পাওয়া একই দেবীর অপর একটি মূর্তিতেও একই রকম বৈশিষ্টাদি লক্ষ্য করা যায় যা কিছু কিছু ক্ষেত্রে উত্তেজনাকর। বিক্রমপুর থেকে প্রাপ্ত বাগীশ্বরী নামক একটি মূর্তির মধ্যে একই রকম শৈল্পিক বৈশিষ্ট্যসমূহ লক্ষ্য করা যায়। অষ্টহাতের এই মূর্তিটির মধ্যে একধরনের পরিপূর্ণ জীবনীশক্তি লক্ষ্য করা যায়, যার তুলনা একমাত্র মগধের পালশৈলীর মধ্যেই মেলে। একাদশ শতাব্দীর বাংলার মূর্তি নির্মাণের মধ্যে বিভিন্ন ধরনের জটিল শারীরিক গঠন পদ্ধতি লক্ষ্য করা যায়। ফলস্বরূপ পাহাড়পুর থেকে প্রাপ্ত হেবজ্র এবং রাজশাহীর তালন্ত ও বোলোই থেকে প্রাপ্ত মঞ্জুবর মঞ্জুশ্রীর শারীরিক গঠনের মধ্যে একাধিক ভাঁজ লক্ষ্য করা যায়।

এই সমস্ত মূর্তিগুলিকে তাদের নির্মাণ শৈলীর দিক থেকে বিচার করলে বোঝা যায়, বাংলার অন্যান্য স্থানে যেমন হরিকেল সমতট অঞ্চলে এক নতুন ধরনের শিল্পকলার সূচনা হয়েছিল। দশম কিংবা একাদশ শতাব্দীর মধ্যে এই শিল্পকলা এক ভিন্নপ্রকার শৈল্পিক আঙ্গিক থেকে উদ্ভুত হয়েছিল। শিল্পকলার এই নতুন কেন্দ্র তার শিল্পীদের কল্পনাশক্তি এবং তৎকালীন লোক সমাজের প্রচলিত প্রথা থেকে অনুপ্রেরণা লাভ করেছিল। কিন্তু একইভাবে এই শিল্পকলা এক পরিপূর্ণভাবে বিকশিত মূর্তিনির্ভর বৌদ্ধধর্মের মুখোমুখি হয়েছিল। শিল্প বিকাশের এই সময়কালকে আমরা অষ্টম শতাব্দীর ময়নামতী লালমাই অঞ্চলের চন্দ্র বংশের স্বাধীন শাসনকালের সঙ্গে সংযুক্ত করতে পারি। চট্টগ্রাম জেলার ঝেওয়ারি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত ব্রোঞ্জের শিল্প সামগ্রীর কথা এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য। এই শিল্পসামগ্রীগুলি দুটি সূত্র থেকে উদ্ভুত। এদের মধ্যে প্রথম শ্রেণীভুক্ত মূর্তিগুলির বৈশিষ্ট্যগুলি হল-চওড়া মুখগুল, ধনুকের মত বাঁকানো ভ্রূ, চওড়া কাঁধ এবং বুক, সমান সঙ্গতিপূর্ণ কোমর তথা সুগঠিত শরীর। এই মূর্তিগুলির সঙ্গে মগধের পাল আমলে তৈরী শিল্পমূর্তিগুলি সামঞ্জস্যপূর্ণ। অন্য শ্রেণীটির বৈশিষ্ট্যসমুহগুলি হল বলিষ্ঠ কিন্তু বেঁটে খাটো এবং মুখমণ্ডলের সঙ্গে আরাকান অঞ্চলের পার্বত্য এলাকার জনজাতিভুক্ত মানুষদের মিল বর্তমান। বলিষ্ঠ চেহারা এবং সুঠাম গঠন এই মূর্তিগুলির শারীরিক গঠনের মূল বৈশিষ্ট্য। মূর্তিগুলির সঙ্গে অনেক লিপি খোদিত অবস্থায় পাওয়া যায় এবং এদের সময়কাল নবম থেকে দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যেকার বলে মনে করা হয়। এই ধরনের মূর্তিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল বজ্রসত্ত্ব এবং বসুধারা। মূর্তিগুলি নির্মাণে তৎকালীন বাংলার টেরাকোটা মূর্তি তৈরীর শৈলী অনুসরণ করা হয়েছে। তৎকালের ক্রমাগত বাড়তে থাকা বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের চাহিদা পূরণার্থে বিভিন্ন স্থানে এই মূর্তি নির্মাণ শিল্প গড়ে উঠেছিল। আঞ্চলিক প্রভাবের ফলে হরিকেল সমতট অঞ্চলের শিল্পীরা পাল আমলের শিল্পশৈলী থেকে সেন যুগের গোঁড়া ধর্মবিশ্বাসের যুগে ক্রমশ: শিলার উপর মূর্তি

নির্মাণ শুরু করেন। দীর্ঘতর হলেও মুখমণ্ডল খোদাই ক্রমাগত সরু হয়ে পুরু এবং বাঁকানো ঠোঁটের নীচে সূচালো চিবুকে পরিণত করে গঠন করেছিলেন। কপালের উপরের অংশের চুলের রেখা, ভ্রু, চোখের পাতা, ঠোঁট সমস্ত কিছুর গঠনের মধ্যে অদ্ভুত একধরনের ছোট এবং বাঁকানো তরঙ্গ সদৃশ অভিঘাত লক্ষ্য করা যায়। কানের গঠনের মধ্যে একধরনের শৈল্পিক পুনরাবৃত্তি তথা গলার গঠন এবং শঙ্খসদৃশ দাগগুলি পরিষ্কারভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন। অত্যধিক সরু কোমর এই মূর্তিগুলির অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পাগুলি কোন কোন সময় বাকি শরীরের তুলনায় দীর্ঘতর এবং তা ক্রমশ: কঠিন হতে থাকে।

শিল্পশৈলীতে উপরোক্ত পরিবর্তনগুলি থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় পুরানো প্রাচীন শৈলীকে পরিত্যাগ করে এক নতুন শিল্পশৈলীর প্রচলন ঘটতে থাকে, শৈলীগত দিক থেকে যা 'medieval art' বা মধ্যযুগের শিল্প নামে পরিচিত।

ভারতীয় সংগ্রহালয়ে সংগৃহীত বাংলার বৌদ্ধ ভাস্কর্যের তালিকা

ভারতীয় সংগ্রহালয়ে রক্ষিত সর্বস্তরের বৌদ্ধমূর্তির মধ্যে ঝেওয়ারি থেকে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি সবথেকে উল্লেখযোগ্য। চট্টগ্রামের কাছাকাছি অঞ্চল থেকে প্রাপ্ত এই সমস্ত মূর্তিগুলির মধ্যে বেশীরভাগই ব্রোঞ্জের তৈরী, বিষয় অনুসারে এই সমস্ত মূর্তিগুলিকে নিম্নলিখিত ভাগে ভাগ করা যায়— (ক) ভূমিস্পর্শমুদ্রায় বুদ্ধ (খ) অভয় মুদ্রায় দন্ডায়মান বুদ্ধ (গ) ধর্মচক্রমুদ্রায় বুদ্ধ (ঘ) মহাপরিনির্বাণে বুদ্ধ (ঙ) ধ্যানী বুদ্ধ (চ) শ্রেনীবদ্ধ মূর্তিসমূহ (ছ) বোধিসত্ত্ব (জ) দেবী মূর্তি সমূহ (ঝ) পাথরের ভাস্কর্য। প্রতিটি ভাগ থেকে একটি করে উদাহরণ নিম্নে প্রদত্ত হল।

(ক) ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধ (৩২)

Acc. No.	8141/A 24334
প্রাপ্তিস্থান	ঝেওয়ারি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
সময়কাল	আনুমানিক দশম শতাব্দী
উচ্চতা	38.5 c.m.
বর্ণনা	ভূমিস্পর্শ মুদ্রায় বুদ্ধ এখানে বজ্রপর্যঙ্কাসনে গদীযুক্ত খানিকটা ত্রিকোণ একটি বেদীর উপর উপবেশিত। মূর্তিটির বৈশিষ্ট্যগুলি হল ওড়নার ব্যবহার, মৃদু হাসি, বর্ধিত কানের পাতা, গলায় শুভলক্ষণ যুক্ত দাগ এবং নাভির উপরে যুক্ত চিহ্ন। মূর্তিটির পরণে অন্তর্বাস এবং পাট করা উত্তরীয়। পাটভাঙ্গা পোশাকটি লম্বায় ছোট এবং তা কাঁধের দুদিক দিয়ে ঝুলছে। মূর্তিটির পিছনের দিকে লিপি খোদিত।

(খ) অভয়মুদ্রায় বুদ্ধ (৯)

Acc. No. 8147/A 24333
প্রাপ্তিস্থান ঝেওয়ারি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
সময়কাল আনুমানিক দশম শতাব্দী
উপাদান ব্রোঞ্জ
উচ্চতা 28 c.m.
বর্ণনা অভয় মুদ্রায় বুদ্ধ এখানে দন্ডায়মান। মূর্তিটির পা এবং বেদী বর্তমানে পাওয়া যায় না। মূর্তিটির বৈশিষ্ট্যগুলি হল-পাপড়ির মত দেখতে অর্ধনিমীলিত চক্ষুদ্বয়, স্মিত হাসির উজ্জ্বল প্রশান্ত মুখমণ্ডল, কোমল এবং সূক্ষ্ম মাধুর্য সমন্বিত সুগঠিত শরীর। দুই কাঁধ ঢাকা স্বচ্ছ বস্ত্র মূর্তিটির পরিধানে রয়েছে। তাঁর ডান হাত অভয়মুদ্রায় এবং বাম হাত বরদমুদ্রায় এবং এই হাতেই বস্ত্রের প্রান্তভাগ ধরে আছেন। ওড়না এবং চক্ষুদ্বয় রৌপ্য দ্বারা খচিত।

(গ) ধর্মচক্রপ্রবর্তন মুদ্রায় বুদ্ধ (২)

Acc. No. : 8174/A 24330
প্রাপ্তিস্থান : ঝেওয়ারি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
সময়কাল : আনুমানিক দশম শতাব্দী
উপাদান : ব্রোঞ্জ
উচ্চতা : 12.4 c.m.
বর্ণনা : বুদ্ধ এখানে আয়তাকার বেদীর উপর অবস্থানরত একটি পদ্মের উপর বজ্রপর্যাঙ্কভাবে কোলের ঠিক উপরে দুটি হাত ধর্মচক্রমুদ্রায় রেখে বসে আছেন। হাতের তালুগুলি বুকের কাছে ধরা রয়েছে। মূর্তিটির ঠিক পিছনে প্রায় বৃত্তাকার একটি জ্যোতিশ্চক্র বর্তমান। এর উপরের অংশ একটি অর্ধেক ফুল এবং তিনটি পত্রশাখার সাহায্যে খচিত। তবে মূর্তিটির কিছুটা অংশ অস্পষ্ট।

(ঘ) ধ্যানী বুদ্ধ(৪)

Acc. No. : 8167/A 24338
প্রাপ্তিস্থান : ঝেওয়ারি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
সময়কাল : আনুমানিক দশম শতাব্দী
উপাদান : ব্রোঞ্জ
উচ্চতা : আনুমানিক 6 c.m.

বর্ণনা ভূমিস্পর্শমুদ্রায় উপবেশিত এই মূর্তিটি খুব সম্ভবত ধ্যানী বুদ্ধ অক্ষভ্যোরই প্রতিভূ। উপরে বর্ণিত ভূমিস্পর্শমুদ্রায় অন্যান্য মূর্তির সঙ্গে এর বৈশিষ্ট্যগত ফারাক বর্তমান। যথেষ্ট ক্ষয়িত এই মূর্তিটির কোন বেদী নেই। অগভীর দাগ দিয়ে বস্ত্রের উপস্থিতি বোঝান হয়েছে। উপরের বস্ত্রাদি বাম স্কন্ধ এবং বুক ঢাকতে সাহায্য করেছে।

(ঙ) মহাপরিনির্বাণরত অবস্থায় বুদ্ধ (১)

Acc. No. : 8177/A 24340
প্রাপ্তিস্থান : ঝেওয়ারি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
সময়কাল : আনুমানিক নবম অথবা দশম শতাব্দী
উপাদান : ব্রোঞ্জ
উচ্চতা 7 c.m.
বর্ণনা শায়িত অবস্থায় বুদ্ধের একটি ক্ষুদ্রাকার মূর্তি। তাঁর ডান তালু মাথার ডানদিকের নীচে স্থিত এবং বাম হাত ভাঁজ করা বস্ত্রের প্রান্তভাগ ধরা। মূর্তিটির পিছনের দিকে দুটি গোলাকার অভিক্ষিপ্ত (প্রতিবিম্বের ন্যায়) বস্তু বর্তমান।

(চ) শ্রেণীবদ্ধ মূর্তিসমূহ (৪)

Acc. No. 8152/A 24312
প্রাপ্তিস্থান ঝেওয়ারি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
সময়কাল আনুমানিক নবম শতাব্দী
উপাদান ব্রোঞ্জ
উচ্চতা 16.5 c.m.
বর্ণনা এই শ্রেণীবদ্ধ ফলকটিতে মোট তিনটি মূর্তি রয়েছে। প্রথমটি একটি পদ্মের মধ্যস্থলে স্থিত বুদ্ধ, তাঁর ডানদিকে দন্ডায়মান অবলোকিতেশ্বর বা বামদিকে মৈত্রেয়। অবলোকিতেশ্বরের ডান হাতে বাঁট সমেত একটি চামর ধরা রয়েছে। এবং বাম হাতে পদ্মের বৃন্ত। অন্যদিকে মৈত্রেয়র ডান হাতে নাগকেশর ফুলের বৃন্ত এবং বাম হাতে চামর ধরা রয়েছে। মূর্তি তিনটি ত্রিরথ বেদীর উপর অবস্থিত।

(ছ) বোধিসত্ত্ব (৯)

Acc. No. : 8181/A 24316
প্রাপ্তিস্থান : ঝেওয়ারি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ
সময়কাল : আনুমানিক একাদশ শতাব্দী
উপাদান : ব্রোঞ্জ
উচ্চতা : 7.3 c.m.
বর্ণনা : চারটি চক্র সমন্বিত একটি পদ্মের উপর চতুর্ভুজ বোধিসত্ত্ব বজ্রাসনে উপবেশিত। দুই হাত ধ্যানীমুদ্রায় রক্ষিত। তাঁর ডান হাতে একটি অস্পষ্ট বস্তু ধরা (জপমালা) এবং বাম হাত ভগ্ন। সুন্দররূপে অলংকৃত মূর্তিটির মাথায় একটি মুকুট বর্তমান। চুলের কোন কোন গুচ্ছ কাঁধের উপর ছড়িয়ে পড়লেও মূলত: তা মাথার ঠিক মাঝখানে শঙ্কুর জটার ন্যায় গ্রন্থিত (নীলকন্ঠ লোকেশ্বর)।

(জ) দেবীমূর্তি (৩)

Acc. No. : 8179/A 24347
প্রাপ্তিস্থান : ঝেওয়ারি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।
সময়কাল : আনুমানিক দশম অথবা একাদশ শতাব্দী
উপাদান : ব্রোঞ্জ
উচ্চতা : 11.5 c.m.
বর্ণনা : পদ্মের বেদীর উপর ললিতাসনে দ্বিবাহুযুক্ত বসুধারা উপবেশিত। সুগঠিত শরীর এবং সুন্দর মুখমণ্ডলসহ দেবীর ডান হাত বরদমুদ্রায় একটি রত্ন সহকারে অধিষ্ঠিত। তাঁর বাম তালুতে ধরা একটি ধ্যান মঞ্জরী।

(ঝ) পাথরের ভাস্কর্য (৮)

Acc. No. : 71/9
প্রাপ্তিস্থান : দিনাজপুর, পশ্চিমবঙ্গ
সময়কাল : আনুমানিক দশম শতাব্দী
উপাদান : ব্রোঞ্জ
উচ্চতা 80.5 c.m.
বর্ণনা একটি চতুর্ভুজ শয্যার উপর বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণে শায়িত। ডান হাতের উপর তাঁর মস্তক স্থিত এবং একটি প্রস্তরখন্ড বালিশরূপে ব্যবহৃত হয়েছে। বেদীর দুই দিকে শোকাভূত দুজন পরিচারক

বর্তমান এবং মধ্যবর্তী স্থানে অপর একজন শ্রদ্ধাবনত ভঙ্গিতে দাঁড়িয়ে। অলঙ্কারবিহীন কেন্দ্রস্তম্ভের মধ্যে একটি স্তূপ এবং তার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য বস্তু বর্তমান। এই ভাস্কর্যটির সবচেয়ে আকর্ষণীয় বৈশিষ্ট্যটি হল এখানে স্তূপের দুদিক থেকে দুজোড়া হাত নির্গত হয়ে মেঘমালার ন্যায় প্রতীয়মান হচ্ছে। বাম দিকের হস্তদ্বয়ে ধরা একটি ঢোলক এবং ডানদিকের হস্তদ্বয়ে করতাল সহযোগে বাজানোর ভঙ্গিমায় অবস্থানরত।

বুদ্ধের মূর্তি ছাড়াও সংগ্রহশালায় রয়েছে বিভিন্ন মহাযানী দেবদেবীর মূর্তি, যথা — অবলোকিতেশ্বর, মৈত্রেয়, মঞ্জুশ্রী, অমিতাভ, বৈরোচন, অক্ষোভ্য প্রমুখ। বিস্তারিত তথ্যের জন্য অনিসন্ধিৎসু পাঠক ও গবেষকগণ গ্রন্থাগারিক, ভারতীয় সংগ্রহালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ করতে পারেন।

তথ্যপঞ্জী

1. Annual Reports of the Archaeological Survey of India
2. Asher, F. M. – The Art of Eastern India, 300-800, Delhi, 1981.
3. Bandyopadhyay, B – Metal Sculptures of Eastern India, Delhi, 1981
4. Banerjee, R. D. – Eastern Indian School of Medieval Sculpture, Delhi, 1933.
5. Bloch, T., – Supplementary Catalogue of the Archaeological Collection of the Indian Museum, Calcutta, 1911.
6. Das, S. R., – Rajbadidanga, 1962
7. Gangopadhyay, K., – Banglar Bhaskarya, Suvarnarekha, Kolikata, 1986.
8. Kramrische, Stella, – 'Pala and Sena Sculpture', Rupam, no. 40, October, 1929 pp. 107-26
9. Mitra, S. K. ed. – East Indian Bronzes, Calcutta.
10. Patra, Chittaranjan, – Present Buddhist Tribals and Viharas in West Bengal, Sarkar & Co., Calcutta, 1991
11. Ramachandran, T. N. – 'Recent Archaeological Discovery along the Mainamati and Lalmai Ranges,' Tippera District, East Bengal, B. C. Law Volume part-II, Poona, 1946
12. Roy, Niharranjan – Bangalir itihas: adi Parva, Book Emporium, Kolkata, 1356 B.S.
13. Saraswati, S. K., – Early Sculpture of Bengal, Calcutta, 1962.
14. Sengupta, A, – Buddhist art of Bengal, Rahul Publishing House, Delhi, 1993.

তিব্বতী স্রোতে প্রাচীন বঙ্গের বৌদ্ধমত

সুনীতি কুমার পাঠক*

তিব্বতী স্রোতের পরিচয়

আগেই তিব্বতী স্রোত বলতে তিব্বতী ভাষায় লেখা উপাদানের পরিচয় জানা দরকার। তিব্বতের সঙ্গে ভারতবর্ষের মানুষের যোগাযোগ কয়েক হাজার বছর ধরে চলে আসছে। তিব্বতের কৈলাস মানস সরোবরের কথা ভারতবর্ষের প্রাচীন সাহিত্যে বার বার উল্লেখ আছে। সম্ভবত বেদোত্তর প্রাকবুদ্ধ শ্রৌতসূত্রে ও ধর্মশাস্ত্রের কিছু অংশ তিনহাজার বছর আগে গড়ে উঠেছিল। জৈন শ্রমণেরাও কৈলাস শিখরকে 'কেবলটঠান' বলেছেন। এতো ভারতীয় সাহিত্যের স্রোত।

তিব্বতী সাহিত্যের দুটি মুখ্য ধারা প্রায় দেড় হাজার বছর ধরে বয়ে চলেছে। একটি বোন্-পো সাহিত্য সম্ভার অন্যটি বৌদ্ধ সাহিত্যের বিপুল বিস্তার। তিব্বতীজনেরা ভারতবর্ষের হিমালয়ের আনাচে কানাচে নানা ছোটবড় গোষ্ঠীতে অনেক দিন ধরে বাস করে চলেছে। তারা সবাই ভারতবর্ষের জনগণ। তাদের ভিতরে বোন-দেবতা শেন রবে পূজারী আছে, আবার বৌদ্ধও। ভারতবর্ষের পূর্বাঞ্চলের পুরাতন নামকরণ নিয়ে আজকের গবেষকেরা যেভাবে দেখেছেন, তা আগে ছিল না। তাই তিব্বতী ভাষায় বঙ্গ বা বাংলা তথা বাংলাদেশ আধুনিক সীমায় বাঁধা ছিল না। তা ছাড়া, বাংলা বা বঙ্গভূমি সীমার নানা পরিবর্তন ঘটেছিল। আজও ঘটে চলেছে। তিব্বতী স্রোতে 'বঙ্গাল' শব্দের প্রয়োগ যেমন আছে তেমনি কামরূপ ও মগধের নামও মিলে। সমতট, বরেন্দ্র, ওডিবিশ (উড়িষ্যা), কাঞ্চী, (দাক্ষিণাত্যের পূর্বশৈল অঞ্চল) ও মলয় গিরি (মলয়রি) প্রভৃতি নাম প্রসঙ্গত মিলে। তাছাড়া স্থানীয় জায়গার উল্লেখ নানাভাবে তিব্বতীরা ব্যবসা বাণিজ্যের কেন্দ্র বলতে জানত। তাদের জনজীবনে হিমালয়ের পাদদেশ যতটা পরিচিত ছিল ততটা সমতলের গঙ্গা গোদাবরী বিধৌত অঞ্চল জানা ছিল না।

তিব্বতী ভাষায় ভৌগলিক উপাদান এখনকার ভূগোল শাস্ত্রের মত লেখা নেই। তবে তাদের ইতিহাস লেখার একটা বিশেষত্ব খুব গোড়া থেকে দেখা যায়। বোন-পো পুরোহিতেরা বোন-গোষ্ঠীর লোকজন নিয়ে ইরাণের পূর্ব উত্তর তগজিক (স্তগ্ জিগ) থেকে সিন্ধু উপত্যকার উপর দিয়ে হিমালয় ডিঙিয়ে কেমন করে গু-গে (হিমাচলপ্রদেশের উত্তরের তিব্বতী ভূখণ্ডে)

---

* বিশ্বভারতীর Indo-Tibetan Studies বিভাগের প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বিশিষ্ট তিব্বতী শাস্ত্রবিশারদ।

প্রবেশ করেছিল, তা তিব্বতী স্রোতে মিলে। আবার, হোর দেশের রাজাকে কেমন করে কে-সর (গে-সর) উপযুক্ত শাস্তি দিয়েছিল তা তিব্বতী লোকগাথায় মিলে। এই সব তিব্বতীভাষায় প্রাক্-বৌদ্ধ ভৌট্টজনের ইতিকথা বলা যেতে পারে। এ সব ঘটনা হিমালয়ের পশ্চিমাঞ্চলের জনজীবনে আজও দাগ কেটে রয়েছে। তারা অনেকেই রাম-কথার চেয়ে গে-সর কাহিনী সুর করে গান করে। হিমাচলের খু-নু (কিনৌর) বা লাহুলী জনেরা বোনদের কথা বলতে ভালবাসে। সে তুলনায় পূর্ব হিমালয়ের সানুদেশে বঙ্গভূমির তথা বাংলার উল্লেখ কেবল ভৌট্ট বুদ্ধিজীবী বৌদ্ধ বিদ্বানদের লেখায় প্রায়ই মিলে।

ঐ উপাদান গুলিকে তিনভাগে ভাগ করা যায়।

১। ভারতবর্ষের পণ্ডিতেরা তিব্বতীভাষায় বৌদ্ধশাস্ত্র অনুবাদ করে গেছেন তাদের সঙ্কলন।

২। তিব্বতী বৌদ্ধ ও বোন গ্রন্থের লেখকেরা ভারতবর্ষের বিষয়ে যে সকল তথ্য প্রসঙ্গত উল্লেখ করেছেন।

৩। তিব্বতীজনেরা ভারতবর্ষের হিমালয়ের বাসিন্দা হয়ে ব্যবসা বাণিজ্য, তীর্থযাত্রা ইত্যাদি প্রসঙ্গে যে সকল বিবরণ সংগ্রহ করেছে। সেগুলি অনেকক্ষেত্রে শোনা-কথা লোকগাথা ও প্রবাদ প্রবচনেও ছড়িয়ে রয়েছে।

তা ছাড়া তিব্বতীভাষায় লেখা ইতিহাসে পরোক্ষভাবে কিছু কিছু ভারতের জন সাধারণের বিষয় এসে গেছে। যেমন, বু-স্তোন রিনছেন ডুব, লামা তারনাথ, জোন নু পল, সুম প খন পো ভারতের মাটিতে পা না দিয়েও ভারতের বৌদ্ধদের কথা, রাজা রাজড়ার কথা, এমন কি বৌদ্ধেতর সমাজের কথা লিখে গেছেন। সেগুলিকে আশ্রয় করে উনিশ ও বিশ শতকের বিদ্বান গবেষকেরা অনেক সূত্র খুঁজে পেয়েছেন।

তবে হিউ-এন-সঙ্, ফা হিয়ান, অথবা ইৎসিং এর মত বৃত্তান্ত লেখক তিব্বতীদের ভিতর তেমন কেউ ছিলেন না। যেমন ধর্মস্বামিন, ছোয় গোন, মর পা লোচারা ভারতবর্ষে এসেছিলেন অথচ কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য সঙ্কলন করেন নি। ছোয় গোন ধর্মস্বামিন নিজের চোখে নালন্দা ধ্বংস হতে দেখেছিলেন, অথচ নালন্দা ধ্বংসের পিছনে আর্থসামাজিক কারণ কিরূপ ছিল সে বিষয়ে প্রায় নীরব। থোন মি সম্ভোট ৭ম শতকে ভারতবর্ষে এসে পড়াশুনা করেছেন। কিন্তু তার কোন বিবরণ নেই।

তিব্বতীভাষায় অনূদিত বৌদ্ধ শাস্ত্রে বাংলা ও বাঙালী

নালন্দার বাঙালী পণ্ডিত শান্তরক্ষিত তিব্বতের রাজা খ্রি সোভ্ দে চনের সময়ে হিমালয়ের তুষার গিরিপথ পার হয়ে তিব্বতে যান। তিনি বাংলার রাজা ধর্মপালের সমসাময়িক ছিলেন। তিনি গোড়ার দিকে বোন পুরোহিতদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারেন নি। পরে তিনি পদ্মসম্ভবকে নেপাল থেকে তিব্বতী রাজার অনুনয়ে আমন্ত্রণ জানান। দুজনে মিলে তিব্বতে ভারতীয় বৌদ্ধদের প্রথম মঠ 'অচিন্ত্যবিহার' স্থাপন করেন। তিব্বতী সন তারিখের হিসাবে খৃষ্টীয় ৭৫০ অব্দ।

শান্তরক্ষিত ধীরে ধীরে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী বোন-পো পুরোহিত ও চীনের মহাযান ভিক্ষুগণকে সরিয়ে দিতে সক্ষম হন। উৎসাহভরে ভারতীয় বৌদ্ধ শাস্ত্র ও বুদ্ধবচন তিব্বতী জনসাধারণের সহজে বোঝার জন্য তিব্বতী ভাষায় রূপান্তর করতে উদ্যোগী হন। বাঙালী বিদ্বানের ঐ উদ্যম সার্থক হয়ে উঠেছিল ঐ সময়ের ভারতের নেপালী, কাশ্মীরী ও বাঙালী বৌদ্ধপণ্ডিতদের সমবেত প্রচেষ্টায়। তাঁর সঙ্গে তাঁর শিষ্য বাঙালী কমল শীল ঐ প্রকল্পে পুরোপুরি অংশ নিতে পারেন। তাঁর আত্মবলির বিবরণ আজও তিব্বতের ইতিহাসে আত্মত্যাগের মহিমায় প্রতিষ্ঠা পেয়েছে।

শান্তরক্ষিত তিব্বতে বৌদ্ধমতের যে ধারা বহন করে নিয়ে গেছিলেন তার বিশেষত্ব ছিল—মূলসর্বাস্তিবাদ বিনয়। সেই সঙ্গে তিনি মাধ্যমিক মত ও বজ্রযান তন্ত্রের প্রসার করেছিলেন তার কারণ, পাল যুগের বাংলায় বাঙালী বৌদ্ধেরা উদারভাবে মগধ, কামরূপ, ওডিবিশ, বরেন্দ্রভূমি এমন কি তাম্রলিপ্তের বৌদ্ধদের সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হতে পেরেছিলেন।

বলাবাহুল্য তখন বাঙালীরা আর্থসামাজিক পুষ্টির দিকে প্রতিবেশীদের চেয়ে কোনরূপ ঊন ছিল না। ব্যবসা বাণিজ্যের লেনদেন ও কৃষিকার্যের প্রসার ঘটায় বাংলায় অনেকগুলি ছোটবড় বৌদ্ধজনগোষ্ঠীর বিকাশ ঘটেছিল। যেমন তাম্রলিপ্ত, সাগরের উপকণ্ঠে বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল, তেমনি তাম্রলিপ্তের স্থানীয় অধিবাসীরা বৌদ্ধ, জৈন ও ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তিব্বতী স্রোতে তাম্রলিপ্তের তেমন পরিচয় নাই। তাম্রদ্বীপ স. ঙ. শিঙের উল্লেখ মিলে। তা দ্বীপময় ভারতের যবদ্বীপ ও সুবর্ণদ্বীপের অন্তবর্তী ছিল। দ্বীপময় ভারতের সঙ্গে ব্যবসা বাণিজ্যের একটা বড় কেন্দ্র তাম্রলিপ্ত ছিল। শান্তরক্ষিত তাঁর উদ্যোগে ভারতীয় বৌদ্ধ গ্রন্থগুলি তিব্বতী ভাষায় অনুবাদের কাজ শুরু করেন তখন তিনি কোনরূপ স্থানীয়তা বা নিকায় ভেদ নিয়ে ব্যস্ত হন নি। উদাহরণ স্বরূপ, গয়ধর কায়স্থের প্রসঙ্গ এসে পড়ে।

গয়ধর কায়স্থ

তিব্বতী ভাষায় বুদ্ধমতের প্রসারের দুটি অধ্যায় আছে। একটিকে প্রাচীন প্রসারের অধ্যায় বলা হয় সঙ্ দর্ (ঙহদর), অন্যটি অর্বাচীন প্রসারের অধ্যায় বা ফ্যি দর (ছি. দর)। প্রথম অধ্যায়ের পুরোধা শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব। আর দ্বিতীয় অধ্যায়ের পুরোধা, বাঙালী দীপঙ্কর অতীশ। গয়ধর কায়স্থ তাম্রলিপ্ত বৌদ্ধ বিহারের উপাসক বিদ্বান ছিলেন। তিনি যে সকল বৌদ্ধ গ্রন্থ তিব্বতীতে রূপান্তরে সহায়তা করেছিলেন, তার থেকে বোঝা যায় যে তিনি বৌদ্ধ বিদ্যার ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে পারঙ্গম ছিলেন। বাংলায় (তিব্বতীতে বঙ্গাল, ভঙ্গল অথবা ভংঘল) বৌদ্ধ মঠের ও মন্দিরের সূচনা সম্ভবত নাগার্জুন করেছিলেন, একথা তারনাথের ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে প্রসঙ্গত উল্লেখ আছে।

শাস্ত্রবিশেষজ্ঞ গয়ধর কায়স্থের সঙ্গে তিব্বতী লোচবা শাক্যই-সে ও লু চয় অনেকক্ষেত্রে সহায়তা করেছিলেন। তাঁদের অনূদিত কয়েকখানি তন্ত্রের গ্রন্থ আছে। তা থেকে বোঝা যায় ঐ সময় বাংলায় বৌদ্ধেরা তন্ত্রেও অভিজ্ঞ ছিলেন। এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধেরা তন্ত্রে রুচিশীল কবে

হয়েছিলেন ও কেমন করে হয়েছিলেন তা নিয়ে যথেষ্ট মতভেদ আছে। তবে বৈশালী, মগধ, কাঞ্চীপুর তথা শ্রীপর্বত (অধুনা নাগার্জুনীকোণ্ডার সন্নিকটস্থ পর্বতশৈল) কামরূপ ওডিবিশ (উড়িষ্যা) জলন্ধর, ওড্ডীয়ান (অধুনা বেলুচিস্তান) প্রভৃতি স্থানে বৌদ্ধেরা তন্ত্রমার্গী ছিলেন। নালন্দা, বিক্রমশীল ও ওদন্তপুরীর মত সোমপুরী বিহার, রক্তমৃত্তিকা বিহার ও জগদ্দল বিহারের ধ্বংসাবশেষ থেকে অনেক তান্ত্রিক দেবদেবীর মূর্তি উদ্ধার করা হয়েছে। অতএব গয়ধর কায়স্থ সম্বরতন্ত্র, সম্পুটতন্ত্র হেবজ্রতন্ত্র প্রভৃতি গ্রন্থের তিব্বতী অনুবাদের কাজে বিশেষজ্ঞ ছিলেন সে কথা সহজে অনুমান করা যেতে পারে। কেননা, ঐ সকল অনূদিত গ্রন্থের ভূমিকায় গয়ধর কায়স্থের নাম মিলে।

নাগবোধি

বঙ্গালে বৌদ্ধ শাস্ত্র রচনার সূত্রধার সম্ভবত নাগবোধি ছিলেন। নাগবোধির বাবা মা ব্রাহ্মণ ছিলেন। তাঁরা আচার্য নাগার্জুনের সহায়তা ধাতুকুশলী ও রসায়নে সিদ্ধ হয়ে উঠেছিলেন। তাঁদের একমাত্র সন্তান নাগবোধিও বৌদ্ধ তন্ত্রে পারঙ্গম হয়েছিলেন। তাঁর রচিত তন্ত্রশাস্ত্রের তিব্বতী অনুবাদ পাওয়া যায়— কৃষ্ণয়মারি -চক্রোপদেশ, আর্যনীলাম্বর ধর-বজ্রপাণি সাধন উপায়িকা, ছাড়াও বৌদ্ধ ষড়ঙ্গযোগ ও পঞ্চক্রমের বিষয় উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধ যোগ ক্রিয়ার ছ'টি অঙ্গ। অথচ পাতঞ্জলীর যোগের আটটি অঙ্গ। নাগবোধি ঐ যোগক্রিয়া আচার্য নাগার্জুনের থেকে শিখেছিলেন। সেদিক থেকে নাগবোধি আনুমানিক খৃষ্টীয় ২য় শতকে বিরাজমান ছিলেন। আচার্য নাগার্জুনের জীবনী চীনা ও তিব্বতীতে যেভাবে পাওয়া যায় তা থেকে আধুনিক পণ্ডিতরা একাধিক ব্যক্তি অনুমান করেন। কিন্তু নাগবোধির সঙ্গে নাগার্জুনের গুরুশিষ্য সম্পর্ক ছিল। গুরু শিষ্য পরম্পরার বিবরণ তিব্বতী স্রোতে যত্রতত্র মিলে। তিব্বতীতে নাগবোধি ছাড়াও নাগবুদ্ধির নামও পাওয়া যায়। তিব্বতী অনুবাদে নাগবোধি ও নাগবুদ্ধি ভিন্ন ভিন্ন থাকায় এক ব্যক্তি নয়, তা বোঝা যায়। নিবন্ধের আকার বৃদ্ধির আশঙ্কায় এখন তিব্বতী স্রোতের দ্বিতীয় উপাদান নিয়ে আলোচনা করা হোক।

তিব্বতী ভাষায় স্বকীয় রচনায় বাংলা ও বাঙালী

তিব্বতী ভাষায় স্বকীয় রচনা বহুমুখী। যেমন, ইতিহাস, ছন্দশাস্ত্র, কাব্য, গদ্য, কাহিনী ও নিবন্ধ। তা ছাড়া শিল্পবিদ্যা, ন্যায় শাস্ত্র বা হেতুবিদ্যা, শব্দশাস্ত্র, শারীরবিদ্যা, ভেষজবিজ্ঞান, জ্যোতিষ, অশ্বাদি পশুচিকিৎসা বিজ্ঞান, গণিত, ধাতুবিজ্ঞান, রসায়ন-বিদ্যা, বাস্তুবিদ্যা ইত্যাদি। আরও অধ্যাত্মবিদ্যায় বুদ্ধবচন ও বৌদ্ধ শাস্ত্রের টীকা টিপ্পনী তো আছেই। এমন কি অলঙ্কার শাস্ত্রের উপর তিব্বতী বিদ্বানদের নিজস্ব রচনা মিলে। ঐ ব্যাপক তিব্বতী স্বকীয় সাহিত্যে বাংলা ও বাঙালী প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা সংক্ষেপে করা যায় না। তাই তিব্বতী ইতিহাসে, কথাসাহিত্য ও কাব্যের থেকে মুখ্য বিষয় চর্চা করা হোল।

তিব্বতী ইতিহাসের ভিতর বৌদ্ধ ঐতিহাসিকেরা অনেকে ভারতবর্ষের প্রাচীন পণ্ডিতেরা কিভাবে বৌদ্ধধর্ম প্রসার করেছিলেন সেই কথা বলেছেন। যেমন বু-স্তোন রিনছেন ডুব (জন্ম দ্বাদশ শতক) প্রথম পর্যায়ের ভারতীয় ধর্মের প্রসারে বেশি ঝোঁক দিয়েছেন। সেখানে বাঙালী পণ্ডিত শান্তরক্ষিত ও পদ্মসম্ভব ছাড়াও বিমলমিত্রের কথা বিস্তারিত ভাবে মিলে। তার আগে তিব্বতী প্রাচীন বৃত্তান্ত গ্রন্থ মনিকাবুম গ্রন্থে হিমালয়ের পরিচয় মিলে কিন্তু গাঙ্গেয় বাংলার পরিচয় তেমন নাই।

চৌদ্দ শতকের কুমারশ্রী (গ্শোন নু দ্পল্) তাঁর ইতিহাসে বলেছেন যে থোনমি সম্ভোট সম্ভবত বাঙালীর উচ্চারণে চ, ছ, জ, এর বিকৃত উচ্চারণ অনুসরণ করে তিব্বতী বর্ণমালায় পঞ্চমবর্গের ঐ তিন বর্ণকে স্থান দিয়েছিলেন। এই মত কতদূর গ্রহণযোগ্য তা নিরূপণ করা কঠিন। সেদিক থেকে তারনাথের ভারতীয় ধর্মের ইতিহাস অনেক বেশি উপাদানে ঋদ্ধ। মোঙ্গলবাসী তিব্বতী ঐতিহাসিক সুম প খনপো ই সে পনজোর ইতিহাস রচনার শৈলী ও বিচারে প্রবীণ হলেও ভারতীয় তাঁর পগ সম জোন্ সা.ঙ উপকরণ বহুল নয়। বিংশ শতকের কৃতিমান বিদ্বান গে দুন ছোয় ফেলের দব থের করপো অনেকটা বৈদুর কর পোর মতই সঙ্গতি সম্পন্ন চুম্বকীকরণ বলা যেতে পারে। তাই শেষোক্ত রচনা দুটিতে বাংলা ও বাঙালীর বিষয়ে তেমন কোন বিশেষ স্থান পায় নি।

তিব্বতীতে স্বকীয় রচনার এক বিপুল সম্ভার জীবনী সাহিত্য। তা বোন পোদের শঙ্ শুঙ্ ভাষায় যেমন আছে তেমনি বৌদ্ধবিদ্বানের ক্ষেত্রেও। ক্রিমা প্রাচীন তন্ত্রচারীর ভিতর গোড়া থেকেই দেখা যায়। পরে কাগু স স্ক্য ও গেলু বিদ্বানদের ভিতরে এই ধারা মিলে। তাই ইতিহাস লেখকদের চেয়ে জীবনী লেখকেরা ব্যক্তির কর্মজীবনের স্বপক্ষে তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্ত, বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে যোগাযোগ প্রায়ই উল্লেখ করেছেন। সে দিক থেকে পদ্ মা কর গোর ছোয় জ্যুঙ ধর্ম কথা একাধারে ইতিহাস ও বিশিষ্ট বৌদ্ধ বিদ্বানদের ব্যক্তিত্বের সমাবেশ বলা যেতে পারে। সেখানে নবীনতন্ত্রের উদগম ও বিকাশ প্রসঙ্গে মরপা লোচাবা নারোপা ও তিলোপার কাছে বাঙালীর যোগ সাধনার যে সম্পদ পেয়েছিলেন তা উল্লেখ যোগ্য। বাঙালীর জীবন সাধনায় যুক্তির সঙ্গে ভাবের রাখীবন্ধন যুগ যুগ ধরে চলে এসেছে। সেদিক থেকে মিলারেপার জীবনী এক অনবদ্য তিব্বতী সাহিত্যের উপাদান। মর পা তাঁর গুরুদের জীবনের যে চিত্র এঁকেছেন তা যতটা বৌদ্ধিক ততটা ভাবুক। পদ ম কর-পো সেখানে নারোপার প্রসঙ্গ বিস্তারিত করেছেন।

তিব্বতী স্রোতে সিদ্ধাচার্যদের জীবনী সংগ্রহ বাংলা ও বাঙালীর প্রায় পাঁচশ বছরের বৌদ্ধ সমাজ, বৌদ্ধমাত্রের জীবনের আয়াম ও আজীবের নিখুঁত চিত্র মিলে। প্রয়াত অলকা চট্টোপাধ্যায় তাঁর সাবলীল ভঙ্গিতে বাঙালীর তৎকালীন জীবনচর্চা তুলে ধরেছেন। তিব্বতী স্রোতে সিদ্ধাচার্যদের রচিত গান ও দোঁহা যা মিলে তা নিয়ে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী থেকে মহম্মদ শহীদুল্লাহ, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, রাহুল সাংকৃত্যায়ন ঐ বিষয়ে নানাভাবে আলোকপাত করেছেন। তার পুনরুক্তির প্রয়োজন নাই।

হিমালয়ের ভিতর দিয়ে ভোটিয়াদের বাণিজ্য পথ

তিব্বতীজনেরা পরিবেশগত কারণে বাণিজ্য ব্যবসায়ী। হিমালয়ের সানু-প্রদেশের ও নদী উপত্যকায় কৃষিজীবীরাও অবসরমত ছোট বড় ব্যবসায়ে ব্যস্ত থাকে। তিব্বতী দেব থের স্তোন পোতে তাঁর উল্লেখ মিলে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে থোন মি সম্ভোট সম্ভবত ব্রহ্মপুত্রের গতিপথ ধরে পূর্ব ভারতে এসেছিলেন। অন্য কোনো সূত্রে একথার তেমন সমর্থন মিলে না। তবে কামরূপ থেকে একটি পথ দক্ষিণ তিব্বতে হো চোনা অবধি ভুটান ড্রুগ য়ুল হয়ে প্রসারিত ছিল, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। তা ছাড়া, কামরূপ থেকে আরাকানের ভিতর দিয়ে সুবর্ণভূমিতে (ম্যানমর) দিকে ইরাবতী নদীর প্রবাহ ধরে যাতায়াতের পথ ছিল। অন্য একটি পথ বাঁ দিকে লো লো ও অন্য প্রতিবেশীদের অধ্যুষিত অঞ্চল ধরে দক্ষিণ চীনের ভিতরে প্রবেশ করেছিল। প্রবোধচন্দ্র বাগচী ঐ পথ দিয়ে বাণিজ্য সম্ভার কেমন করে চীন ভারতের প্রাচীন আর্থ সামাজিক পুষ্টি প্রসার করত তা আলোচনা করেছেন।

এই প্রসঙ্গে সিক্কিম ও ভুটানের সঙ্গে বাংলা ও বাঙালীর ঘনিষ্ঠ বাণিজ্য-সংযোগকে উপেক্ষা করা যায় না। প্রাচীন বাংলার বাণিজ্য পথ নিয়ে অল্প বিস্তার আলোচনা মিলে। বাঙালীর বৌদ্ধ সংস্কৃতির অধ্যয়নে ঐ পথগুলির পরিচয় সুস্পষ্টভাবে জানা দরকার। কেননা, তীর্থযাত্রায় দেশ বিদেশে পরিক্রমার সঙ্গে মূল্যবান বস্তুসামগ্রীর বাণিজ্যিক লেনদেন প্রাচীন কাল থেকে চলে এসেছে। তিব্বতীদের সঙ্গে সিক্কিম ও ভুটানের গিরিপথ ধরে বরেন্দ্রভূমি, কামরূপ ও বৈশালীতে যোগাযোগের অনেক পথ ছিল।

গত দুশো বছরের ইংরাজ আমলে ঐ গিরিপথগুলি ভারত-তিব্বত বাণিজ্যের সুগম ছিল তা অজানা নেই। কিন্তু পাটলিপুত্র থেকে এখনকার রাজমহলের পাশ দিয়ে গঙ্গা পার হয়ে সোমপুরী বিহারকে বাঁ দিকে রেখে একটি বাণিজ্য পথ কামরূপের দিকে অগ্রসর হয়েছিল। তেমন আর একটি গিরিপথ এখনকার সিক্কিমের নাথু-লা ও জলিপ লা হয়ে সরাসরি তিব্বতের চুম্বী বা টোমো পার্বত্য উপত্যকায় সুপ্রাচীন কাল থেকে চলে আসছে, যাঁরা সিক্কিমে ভ্রমণ করেন তাঁরা আজও ঐ পুরাতন ঘোড়ায় চলা পথের ভগ্নাবশেষ দেখতে পান। তা ছাড়া ভুটান হয়ে দুটি গিরিপথ এখানকার অরুণাচলের তাওয়াঙ্ বুমলা হয়ে ভারতে প্রবেশ করেছে। সেটি পাশিঘাট অবধি নেমে এসেছে। অন্যটি ভুটান থেকে উত্তরবঙ্গে সরাসরি ঢুকে পড়তো। ঐটির সঙ্গে রঙ্ পো কালিম্পঙের যোগ ছিল।

অতএব বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের বিকাশে বাংলায় পালযুগ ও সেনযুগে তিব্বতীদের সঙ্গে বাঙালীর বাণিজ্যিক সূত্রে যোগাযোগের বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ। রাজা মহারাজার অনুগ্রহে বৌদ্ধধর্মের পুষ্টি ঘটেছিল, সেকথা সর্বৈব সত্য নয়। প্রত্যেকটি বৌদ্ধমঠের আর্থিক বিকাশের কথা সুস্পষ্টভাবে আজও অধ্যয়ন হয় নি। প্রাচীনকালে মুসলমানের অভিযানের আগে বাঙালার ইতিহাসের চুম্বক আলোচনা রমেশচন্দ্র মজুমদার ও নীহাররঞ্জন রায় কিছুটা করেছেন। প্রফুল্লচন্দ্র রায় বাঙালীর রসায়ন-বিদ্যায় কুশলতা ও ধাতবশিল্পে বিকাশের তথ্যপূর্ণ বিবরণ দিয়েছেন। অধুনা বৌদ্ধস্রোত থেকে নগরায়ন সম্বন্ধে বাংলাদেশে কিছু কিছু উদ্যোগী বিদ্বান প্রয়াস করেছেন।

গুপ্তযুগের বাংলা ও বাঙালীর বিবরণ তেমন স্পষ্ট নয়। তবে বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের বিকাশে যে কয়টি বৌদ্ধ বিহারের অস্তিত্ব অনুমান করা হয় সেগুলির পরিচয় তিব্বতীস্রোতে মিলে। অধ্যাপক দীপক কুমার বড়ুয়া ও অধ্যাপক বিনয় কুমার চৌধুরী কিছুটা আলোকপাত করেছেন। জগদ্দল বিহার, রঙ্গমৃত্তিকা ও তাম্রলিপ্তের যোগাযোগের পথটি গঙ্গার ধার বেয়ে সরস্বতী নদী পর্যন্ত গ্রামগুলির উপর দিয়ে ঐ সময় বিদ্যমান ছিল। তারনাথ রাঢ় তথা রা-রা ও বঙ্গাল দুটি ভিন্ন অঞ্চল বলে উল্লেখ করেছেন। তিনি পালযুগের দেবপাল ও তার সন্তানের কথা বলতে গিয়ে দুটি সোমপুরীর কথা বলেছেন। বরেন্দ্রভূমির সোমপুরী বিহারের মত ওডিবিশ ও রাঢ়ের প্রত্যন্তে অন্য একটি সোমপুরী বিহার ছিল কিনা সংশয় জাগে। তিনি রঙ্গমৃত্তিকার উল্লেখ করেন নি। তাম্রলিপ্তের প্রসঙ্গ নেই। এই বিষয়ে অধ্যাপক নলিনী নাথ দাশগুপ্ত মহাশয়ের বিবরণ তথ্যপূর্ণ।

অন্যদিকে গৌড় ছিল গুড় উৎপাদনের প্রসিদ্ধ স্থান, একথা তিব্বতীস্রোতে মিলে। গৌড়ের সঙ্গে পশ্চিমে বিক্রমশীল হয়ে নালন্দা যাবার পথে অনেকগুলি প্রাচীন গ্রাম ছিল। তাদের একটি গ্রাম বীরভূমের উত্তর সীমানায়-অধুনা বাড়া বা বারাহ্ নামে পাওয়া যায়। সেখানে অনেক বৌদ্ধ প্রস্তর মূর্তি মিলেছে, যদিও অধুনা গ্রামটির অধিবাসীরা মুখ্যত মুসলমান।

আরও পুণ্ড্রদেশের করতোয়া পার হয়ে মহাস্থানগড় থেকে পঞ্চনগরী ও পাহাড়পুর সোমপুরী বিহার থেকে একটি পথ তিস্তা বা ত্রা-সি-ত্রা (সম্ভবত পরবর্তী যুগে সিকিমে তা-সি-তা) নদীর ধার বেয়ে সিক্কিমের ভিতর দিয়ে তিব্বতে প্রবেশ করেছিল) সোমপুরী বিহারের উৎখননের ফলে নানাবিধ প্রত্নসম্পদ উদ্ধার করা হয়েছে। তার সঙ্গে তিব্বতীভাষায় অনূদিত ভারতীয় মূর্তিকলার গ্রন্থ ও তিব্বতীদের স্বকীয় রচনার বিষয়বস্তুর বহু উপাদানের সাদৃশ্য মিলে। এই প্রসঙ্গে পাকিস্তানের আহমদ হাসান দানি ও বাংলাদেশের প্রত্নতত্ত্ববিদরা গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে গবেষণা করে চলেছেন। ঐ সকল মূর্তির রচনা শৈলীর মূলস্রোত সাধনমালা প্রভৃতি গ্রন্থ যেগুলির তিব্বতীভাষায় অনুবাদ মিলে। সাধনমালা ও নিষ্পন্নযোগাবলী ছাড়া প্রতিমা নির্মাণের বেশ কয়েকখানি গ্রন্থ তিব্বতীদের স্বকীয় রচনা।

গৌড় থেকে আর একটি পথ দক্ষিণ-পূর্ব অভিমুখী চট্টলী বাণিজ্যকেন্দ্র অবধি প্রসারিত হয়েছিল। ঐ পথ পদ্মা ও মেঘনা নদী কোনস্থানে পারাপার করত তা নির্ণয় করা কঠিন। তবে অনুমান করা যায় বজ্রযোগিনী বিহারের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামপালের সময়ে শ্রীবিক্রমপুর একটি বাণিজ্য নগরী ছিল। তখনকার দিনেও বৌদ্ধেরা সঙ্ঘবদ্ধভাবে মন্দির নির্মাণে এখনকার মত উদ্যোগী হতেন। কোন বরিষ্ঠ বিদ্বান ও সিদ্ধব্যক্তির সন্ধান পেলে তাঁকে আশ্রয় করে বৌদ্ধ, মন্দির ও মঠ প্রতিষ্ঠা করা হোত। একটি মঠ অন্য একটি মঠের আশ্রিত না হয়ে অনেকক্ষেত্রে আর্থসামাজিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতে উদ্যোগী ছিল। কেননা, ঐ সময়ে বৌদ্ধ নিকায় ও তন্ত্রের সাধনামার্গের বিকাশ নানামুখী হয়ে গড়ে উঠেছিল। এ বিষয়ে পৃথক অধ্যয়নের সম্ভাবনা আছে।

পরিশেষে বাংলায় বৌদ্ধমত সম্পর্কে অদ্বয়বজ্র তাঁর তত্ত্বরত্নাবলীতে অতি সংক্ষেপে যা

ইঙ্গিত করেছেন তা প্রণিধানযোগ্য; তিনি শ্রাবকযান, প্রত্যেক (বুদ্ধ) যান, ও মহাযান বা বোধিসত্ত্বযানের ত্রয়ী নিকায়ের উল্লেখ করেছেন। সেই সঙ্গে বৌদ্ধমতের চারটি ভাগ সৌতান্ত্রিক, বৈভাষিক, মাধ্যমিক ও যোগাচার-কিভাবে শ্রাবক যান ও মহাযানের ভিতর বিকাশ লাভ করেছিল তা স্পষ্ট করেছেন। বাঙালী বৌদ্ধেরা মহাযানের পারমিতা-নয় ও মন্ত্রনয় অনুসরণ করলেও মন্ত্রনয়ের উপর বেশি বল দিয়েছিলেন। পাল ও সেনযুগে মন্ত্রনয়ের বিকাশে বাঙালীর যোগদানের স্বাক্ষর ঐ সময়ের সাহিত্যে ও মূর্তিকলায় বিদ্যামান।

প্রাচীন বাংলায় বৌদ্ধ মঠ, বিহার ও সঙ্ঘারাম

আশ্রম বিহার (৫০৭ খৃ. বৈদ্যগুপ্তের গুনাইঘর তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য)।
কর্ণসুবর্ন রঙ্গভিত্তি সঙ্ঘারাম
কণকস্তূপ বিহার (সম্ভবত কুমিল্লা) পট্টিকেরক পট্টিকায়া?
কাপট্য বিহার (প্রজ্ঞাবর্মা ও তাঁর গুরু বোধিবর্মা)
জগদ্দল বিহার
জিনসেন বিহার
তাম্রলিপ্ত সঙ্ঘারাম
ত্রৈকূটক বিহার
দেবীকোট বিহার
পণ্ডিতবিহার (চট্টলী)
পুণ্ড্রবর্ধন বিহার (হিউয়েন সঙ্ লিখিত পো. চি পা)
বজ্রযোগিনী মঠ
বারাহ-বিহার (তাম্রলিপ্ত সন্নিকটস্থ ইৎ-সিং বিবরণ দ্রষ্টব্য)
বরাড নগরী সন্নগর (বীরভূমের বাড়া/ বাবাহ গ্রাম?)
বালাণ্ডা বিহার (?)
বিক্রমপুরী বিহার
বেজখণ্ড (১২২০খৃ. পট্টিকেরক রাজের ময়নামতী তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য)
রাজবিহার-জগদ্দল বিহার?
শীলবর্ষ বিহার (বগুড়া?)
শ্রী মহাবোধি মন্দির (জগদ্দল বিহার সংলগ্ন)
সঙ্ঘ মিত্র বিহার (বাংলাদেশের আসরফপুর তাম্রশাসন দ্রষ্টব্য)
সমতটের বিহার (নাম অজ্ঞাত)
সোমপুরী বিহার
সুবর্নবিহার (নদীয়া কৃষ্ণনগর)
হলুদ বিহার (পাহাড়পুর দক্ষিণ-পশ্চিমে দীপগঞ্জে স্তূপ?)

হিউ এন সঙের বিবরণে পুন্ড্রবর্ধনে ২০, সমতটে ৩০, তাম্রলিপ্তি ১০ ও কর্ণসুবর্ণে ১০ বিহার/ সঙ্ঘারাম অথবা মঠের উল্লেখ মিলে। তবে বৌদ্ধ স্তূপ নানা জায়গায় নির্মিত ছিল।

হিউয়েনসাং এর ভ্রমনপথ
আরলহ্রদ
কিস্তান
বোখারা
সমরকন্দ
কুচি
কিরগিজ
কাশগড়
ইয়ারকন্দ
গোবি মরুভূমি
চীনের প্রাচীর
কোরিয়া
খোটান
চাংসান
কপিশা
তিব্বত
হিমালয় পর্বত
থানেশ্বর
কনৌজ
উজ্জয়িনী
নালন্দা
বলভী
তাম্রলিপ্তি
আনাম
ক্যাম্বোডিয়া
হর্ষবর্ধনের সাম্রাজ্য
তাইসুং এর সাম্রাজ্য

সিনকিয়াং
ইয়ারকন্দ
খোটান
আমদো
তিব্বত
খাম
মানস সরোবর
লাসা
ভুটান
নেপাল
ভারত
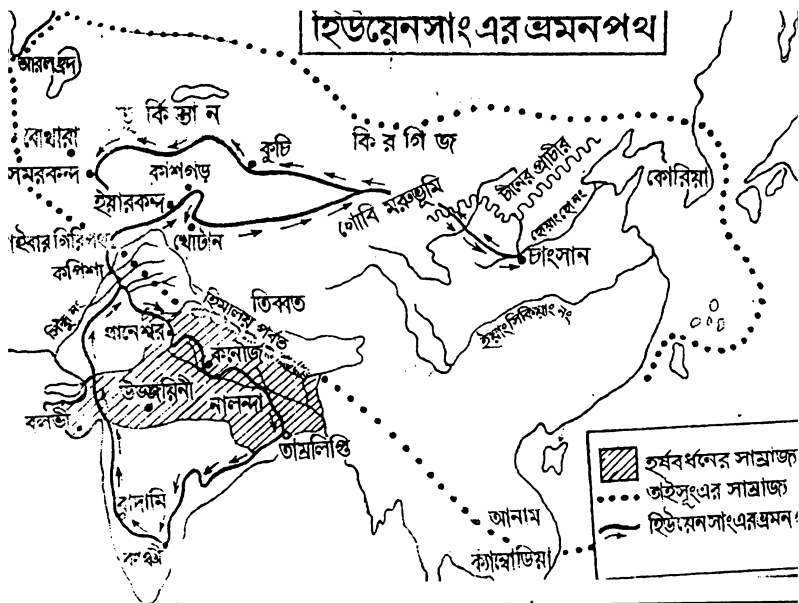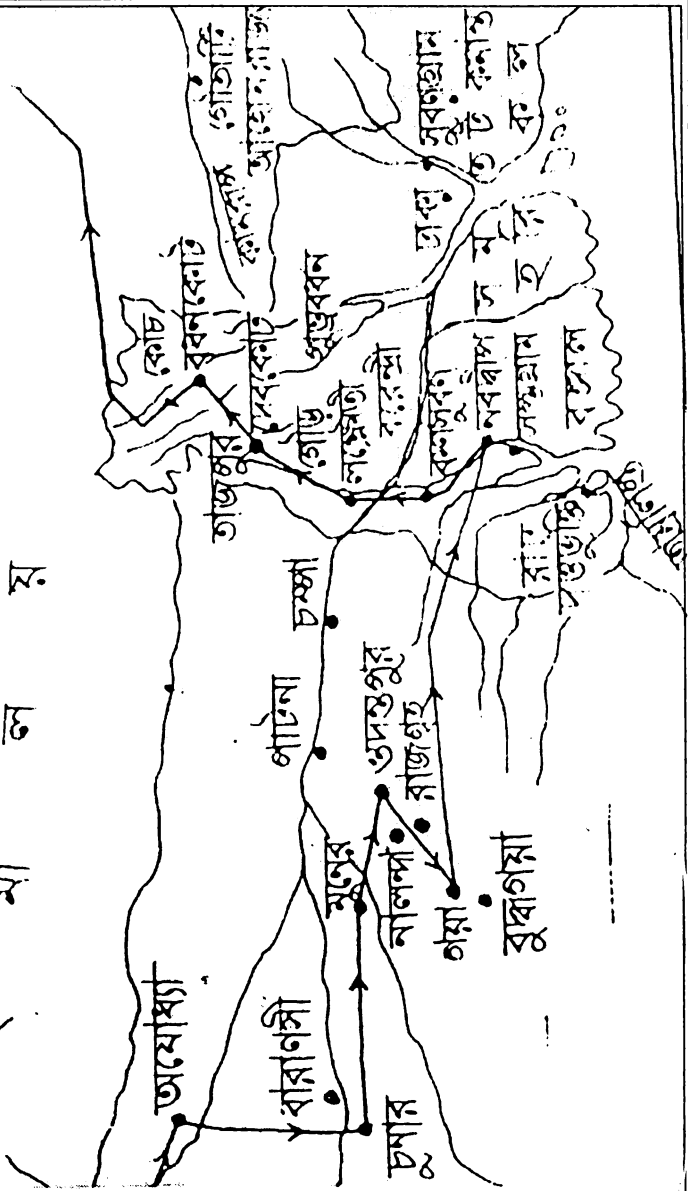
প্রথম আন্তর্জাতিক বাঙালী: অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান

হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী*

একদা বঙ্গকবি সত্যেন্দ্রনাথ দত্তের দরদভরা কণ্ঠে উচ্চারিত হয়েছিল:

বাঙালী অতীশ লঙ্ঘিল গিরি তুষারে ভয়ঙ্কর
জ্বালিল জ্ঞানের দীপ তিব্বতে বাঙালী দীপঙ্কর।

অতীশের জন্ম ৯৮২ খ্রিষ্টাব্দে। পিতার নাম রাজা কল্যাণশ্রী, মাতার নাম রাণী প্রভাবতী। পিতৃদত্ত নাম চন্দ্রগর্ভ। জন্মস্থান বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা জেলার বিক্রমপুরে বজ্রযোগিনী গ্রামে। এই বজ্রযোগিনী গ্রামের একটি মাটির ঢিবিকে 'অতীশের ভিটা' বলে শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করা হয়। তাঁর জন্মভূমি তাঁকে বিশেষ মনে রাখেনি। বাঙালী সত্যিই আত্মবিস্মৃত জাতি। তাঁকে মনে রেখেছে তিব্বত। তিব্বতী সাহিত্য ও সংস্কৃতির সবকটি শাখার মধ্য দিয়ে; সেদেশের লোককাহিনী, ধর্মইতিহাস, জীবনীগ্রন্থ, রাজকাহিনী এবং কাঞ্জুর ও তাঞ্জুর নামে সুবিশাল গ্রন্থসংকলনের মাধ্যমে তিনি চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। তিব্বতের বাইরে তিব্বতবিশেষজ্ঞদের মধ্যে জার্মান পণ্ডিত কোয়পেন প্রথম অতীশ দীপঙ্কর সম্পর্কে উল্লেখ করেন। তারপর শরৎচন্দ্র দাস ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে The Journal of the Buddhist Text Society তে ও পরে Indian Pundits in the Land of Snow গ্রন্থে 'অতীশের জীবনী' প্রকাশ করেন।

অতীশের জীবনী থেকে জানা যায় তাঁর পিতা তাঁকে অতি অল্প বয়সেই শিক্ষার জন্য গুরু জেতারির কাছে পাঠান। জেতারির কাছে বিদ্যার্জনের ফলে তাঁর পরবর্তী জীবনে ধর্ম ও দর্শনচর্চার পথ সুগম হয়। জেতারি তাঁকে উচ্চতর শিক্ষালাভের জন্য নালন্দায় যেতে উপদেশ দেন। তিব্বতবিশারদরা সকলেই একমত যে তান্ত্রিক দীক্ষার মাধ্যমে অতীশের ধর্মজীবন শুরু হয়েছিল। তাঁর শিক্ষালাভের জীবনকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়: (১) তান্ত্রিক দীক্ষাগ্রহণ, (২) প্রব্রজ্যাগ্রহণ ও বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন, (৩) বহির্ভারতযাত্রা ও সুবর্ণদ্বীপের গুরু ধর্মকীর্তির কাছে শাস্ত্র শিক্ষালাভ। তিনি যেসময়ে জন্মেছিলেন, সেসময়টাই ছিল তান্ত্রিক প্রভাবে আচ্ছন্ন। তাই স্বভাবতই তান্ত্রিকদীক্ষা ও ধর্মচর্চার মধ্য দিয়েই তাঁর শিক্ষাজীবন শুরু হয়েছিল। শরৎচন্দ্র দাসের মতে ওদন্তপুরীর মহাসাঙ্ঘিক আচার্য শীলরক্ষিতের কাছে উনিশ বছর বয়সে তিনি শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। রাহুল সাংকৃত্যায়নের মতে, গুরু জেতারি তাঁকে নালন্দার বোধিভদ্রের কাছে পাঠান। আচার্য

* বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক, জগজ্জ্যোতি পত্রিকার সম্পাদক, প্রাবন্ধিক ও কবি।

বোধিভদ্রের কাছে নালন্দার শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষালাভের পর তাঁর নাম হয় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান।

১০১২ খ্রিস্টাব্দে আরও উচ্চতর জ্ঞানের সন্ধানে তিনি স্বদেশ থেকে সুবর্ণদ্বীপে যান। সুবর্ণদ্বীপ বা সুবর্ণভূমি সেসময়ে বৌদ্ধধর্মচর্চার এক উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র ছিল। আচার্য ধর্মকীর্তি ছিলেন এর প্রধান। দীর্ঘ চৌদ্দমাস দুস্তর সমুদ্রযাত্রা শেষে অতি কষ্টে দীপঙ্কর সুবর্ণদ্বীপে পৌঁছান। ধর্মকীর্তির শিষ্যত্ব গ্রহণ করে তিনি বার বছর অধ্যয়ন করেন। শিক্ষান্তে ১০২৫ খ্রিস্টাব্দে তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তখন তাঁর বয়স ৪৪ বৎসর।

দীপঙ্কর যখন ফিরে আসেন বাংলার শাসনকর্তা তখন পালরাজ মহীপাল। দীপঙ্করের খ্যাতিতে মুগ্ধ পালরাজ তাঁকে বিক্রমশীল মহাবিহারে আমন্ত্রণ জানান। এই মহাবিহারের প্রকৃত নাম বিক্রমশীল না বিক্রমশীলা— এনিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ আছে। শরৎচন্দ্র দাস এক জায়গায় একে বিক্রমশীলা বলেছেন, আবার অন্য জায়গায় একে বিক্রমশীল বলেছেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ এ প্রসঙ্গে দুটি সংস্কৃত উদ্ধৃতির উল্লেখ করেছেন, যেখানে দেবনাগরী হরফে বিক্রমশীলই আছে। রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে এই মহাবিহারের প্রতিষ্ঠাতা ধর্মপালের অন্য নাম ছিল বিক্রমশীল। তিব্বতীসূত্রও এই মতকে সমর্থন করে। তিব্বতী ইতিহাসবিদ্ লামা তারানাথ ও সুম্‌পা-র মতে ধর্মপাল যে বিহারগুলি নির্মাণ করেছিলেন তাদের মধ্যে বিক্রমশীলই সবচেয়ে বেশি প্রসিদ্ধ ছিল।

দীপঙ্কর যখন বিক্রমশীলে আসেন, সেসময়ে এ মহাবিহারের মহাচার্য ছিলেন রত্নাকর। নালন্দা যেমন বুদ্ধচর্চার কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয়ে জগদ্বাসীকে জ্ঞান বিতরণ করেছিলো, বিক্রমশীলও সে-ভূমিকা পালনে অকৃপণ ছিল। নালন্দার সৌরভ-গৌরবে আকৃষ্ট হয়ে পৃথিবীর নানা প্রান্ত থেকে জ্ঞানপিপাসু ছাত্র যেমন এখানে এসে সমবেত হত, বিক্রমশীলেরও খ্যাতি গৌরবে আকৃষ্ট হয়ে ভারত ও বহির্ভারতের বহু জনপদের বহু জ্ঞানান্বেষী এই মহাবিহারে এসে সমবেত হত। বিক্রমশীল মহাবিহার সুদীর্ঘ চারশো বছর নিরবচ্ছিন্ন ও অক্লান্তভাবে ধর্ম সংস্কৃতি সভ্যতা প্রচার ও জ্ঞানের আলোক বিকিরণ করে। এই মহাতীর্থ বখতিয়ার খিলজির আক্রমণে ধূলিসাৎ হয়ে যায় ১২০৩ সালে। হাজার হাজার জ্ঞানী ব্যক্তি যেখানে বিদ্যাদেবীর আরাধনা করতেন সেখানে আবির্ভূত হল বখতিয়ারের তুর্কীসেনা। বিদ্যার মূল্য তাদের কাছে কিছুই নয়—জ্ঞানার্জন অর্থহীন বিলাস। তারা শিখেছিল এসব প্রতিষ্ঠান ভাঙলে পুণ্য হয়, ধনলাভও হয়। তাই তারা পরম উৎসাহে বিক্রমশীল মহাবিহারকে গঙ্গাগর্ভে ডুবিয়ে দিল! বিক্রমশীলের সুদীর্ঘকালের ইতিহাসে ২৬জন বৌদ্ধাচার্য এই জ্ঞানের মন্দিরে পৌরোহিত্য করেছিলেন। এছাড়া মহাবিহারে ১০৮ জন অধ্যাপক, বহুসংখ্যক ভিক্ষু ও ছাত্র বাস করতেন। এর শেষ আচার্য ছিলেন কাশ্মিরের পণ্ডিত শাক্যশ্রী। এখানকার আচার্যপদের গুরুদায়িত্ব পালন করেও দীপঙ্কর ওদন্তপুরী ও সোমপুরী মহাবিহারের সাথেও সম্পৃক্ত ছিলেন। তাঁর জীবনের বিভিন্ন ঘটনা বর্ণনায় বজ্রাসন, ওদন্তপুরী, নালন্দা, সোমপুরী এবং সর্বোপরি বিক্রমশীলের কথা বারবার উল্লেখিত হয়েছে।

দীপঙ্করের সময়ে তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের রূপ ছিল অন্যরকম। আবিলতায় আচ্ছন্ন বৌদ্ধধর্ম তখন সংস্কারের অপেক্ষায়। দশম-একাদশ শতকে তিব্বতের রাজা খোরদে বৌদ্ধধর্মে শরণ নেওয়ার পর তাঁর নাম হয় এশেওদ বা জ্ঞানপ্রভ। মূলতঃ তাঁরই আন্তরিকতায় দীপঙ্কর তিব্বতে যান। তিব্বতের ঐতিহাসিকেরা এই যুগান্তকারী ঘটনাকে তিব্বতের পরম সৌভাগ্য বলে বিবেচনা করেন। এশেওদের জীবদ্দশায় দীপঙ্করের তিব্বতযাত্রা সম্ভব হয়নি। ১০২৫ সালে তিব্বতরাজ এশেওদ এক নতুন বৌদ্ধবিহার নির্মাণ করেন এবং বিশুদ্ধ ও অবিকৃত বৌদ্ধধর্মচর্চার জন্য তিব্বতে জ্ঞানীপণ্ডিতদের নিয়ে আসার জন্য একুশজন শ্রমণকে ভারতে পাঠান। পথের দুর্গমতা আর প্রকৃতির প্রতিকূলতায় তাদের মধ্যে মাত্র দুজন প্রাণে বাঁচেন আর শিক্ষা শেষ করে নিজেরা দেশে ফিরে যান। বিক্রমশীল সম্বন্ধে তাদের বিবৃতিতে আকৃষ্ট হয়ে একশো পার্শ্বচর আর প্রচুর স্বর্ণ দিয়ে তিব্বতরাজ দ্বিতীয়বার দীপঙ্করের কাছে দূত পাঠান। দীপঙ্কর উত্তর দিয়েছিলেন, তাঁর তিব্বতে যাওয়ার দুটি কারণ হতে পারে। সোনাদানা লাভ আর ধর্মীয় নেতৃত্ব গ্রহণের ফলে প্রতিপত্তি লাভ। দুটির কোনটিতেই তার লোভ নেই। দূত ফিরে গেলেন। রাজা আবার আমন্ত্রণ পাঠালেন। ইতিমধ্যে রাজা বন্দী হন। মুক্তিপণ হিসেবে বন্দীকর্তা রাজা যত সোনা দাবী করেছিলেন তা দিতে রাজী না হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং অন্তিম ইচ্ছা প্রকাশ করেন—ওই সোনা যেন বুদ্ধচর্চায় ব্যয় হয় এবং দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান যেন এই প্রার্থনা জানতে পারেন। এবার আর দীপঙ্কর আমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করতে পারলেন না। বিধর্মীদের হাতে এশেওদের মৃত্যুর পর তাঁর সকরুণ অনুরোধ ও তিব্বতীদের প্রতি অপার করুণা এবং তিব্বতে বৌদ্ধধর্মের অবস্থায় বিচলিত হয়ে দীপঙ্কর তিব্বত যেতে সম্মত হন। যাবার আগে একবার বুদ্ধগয়ায় পরিভ্রমণ করে ১০৪০ সালে তিনি তিব্বতের পথে যাত্রা করেন।

আজ থেকে হাজার বছর আগে উত্তরবঙ্গের মধ্য দিয়ে পথ। তারপরে পৃথিবীর মধ্যে সর্বোচ্চ গিরিরাজিময় হিমালয়ের রাজ্য নেপাল। সেই রাজ্য অতিক্রম করলে আসবে দুর্গম অরণ্যময়, পশু ও সর্পসঙ্কুল তুষারাবৃত অজানা পথ। তিব্বতের মধ্যের অভিযান তার চেয়ে অনেক বেশি কষ্টের। এই কষ্টসাধন শুধু ঐকান্তিক আন্তরিকতায় সম্ভব। যুগে যুগে মহামানবেরা সাধারণ মানুষের পরিত্রাণের জন্য এমনই আত্মত্যাগ করেছেন। তিব্বত যাত্রাপথে দীপঙ্কর এক বৎসর নেপালে অতিবাহিত করেন। তিনটি কারণে তাঁর নেপালবাস স্মরণীয়—(১) মগধরাজ নয়পালের কাছে 'বিমলরত্ন লেখনাম' পত্রপ্রেরণ, (২) 'চর্যা-সংগ্রহ প্রদীপ' রচনা (৩) নেপালরাজ কর্তৃক দীপঙ্করকে বিশাল সম্বর্ধনা এবং তাঁর সম্মানে এক বিহার নির্মাণ।

১০৪২ সালে দীপঙ্কর তিব্বতে প্রবেশ করেন। তাঁর যাত্রাপথ প্রার্থনায়, পূজায়, বিহারপ্রতিষ্ঠায় আর ধর্মপ্রচারে পরিপূর্ণ ও পবিত্র হয়ে উঠেছিল। অতি সামান্য বস্তুও তাঁর

অন্তরের আশীর্বাদে ধন্য হয়ে যেত। তিব্বতের মাটিতে পদার্পণের সময় রাজ প্রতিনিধিরা তাঁকে চা দিয়ে অভ্যর্থনা করেছিলেন। বলেছিলেন, চা হচ্ছে ইচ্ছাতরুর নির্যাস। স্বর্গীয় পানীয়। এর নাম চা। তিব্বতের ভিক্ষুরা চা পান করেন। উত্তরে দীপঙ্কর বলেছিলেন, এত ভাল পনীয় নিশ্চয়ই তিব্বতী ভিক্ষুদের ধর্ম আর পুণ্যের প্রসাদ। সমগ্র তিব্বত দীপঙ্করের আগমনে ধন্যবোধ করেছিল। ঘোষণা করেছিল তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা ও আস্থায় তিব্বত সুমেরু পর্বতের মত অবিচল থাকবে। তিব্বতের নানা কুপ্রথা বৌদ্ধধর্মকে কলুষিত করেছিল। তাঁর প্রভাবে বৌদ্ধধর্ম তার সজীবতা আর পবিত্রতা ফিরে পায়। মাত্র বার বছরে তিনি হাজার বছরের ধর্মাচারকে প্রতিষ্ঠিত করে যান। পণ্ডিত শিরোমনি ম্যাক্সমুলার দীপঙ্করের এই অবদানকে নতমস্তকে স্বীকার করেছেন। মহাযান বৌদ্ধধর্মে মঞ্জুশ্রীকে ধর্মের রক্ষক বলে অভিহিত করা হয়। অক্সফোর্ডের পন্ডিত ইভান্স ওয়েন্জ 'মহামুক্তির তিব্বতীয় পুঁথি'তে লিখেছেন, তিব্বত ভারত চীন ও নেপালে দীপঙ্করকে মঞ্জুশ্রীর প্রতিভূরূপে পূজা করা হয়। তাঞ্জুরে তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত ভারতীয় গ্রন্থগুলির মধ্যে দুশোরও বেশি গ্রন্থের রচনা, অনুবাদ ও সংশোধনের সঙ্গে দীপঙ্করের নাম যুক্ত আছে। বহু শতাব্দী ধরে পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় লালিত অসংখ্য পন্ডিত তিব্বতে ধর্ম ও সংস্কৃতির বিস্তার করেন। পূর্বভারতের এই অতুলনীয় অবদান বর্তমান বঙ্গদেশের ভৌগোলিক রেখা দিয়ে চিহ্নিত করার চেষ্টা অসঙ্গত হবে। তিব্বতীরা তাঁদের মধ্যে দীপঙ্করকেই শ্রেষ্ঠ গুরু ও ধর্মসংস্কারক রূপে মান্য করেন। তারা তাঁকে শ্রদ্ধাবশত দীপঙ্কর নামে সম্বোধন না করে অতীশ নামে সম্বোধন করতেন। অতীশ মানে মহাপ্রভু। মহামানব। অতীশের গ্রন্থসংখ্যা ১৭৫। তার মধ্যে 'বোধিপথ প্রদীপ' এবং 'মহাযানপথ সাধন' মৌলিক গ্রন্থ হিসেবে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তিনি শুধু ধর্মবিষয়ক বই লেখেননি। লিখেছেন চিকিৎসা বিষয়ক বহু বই। তিব্বতীদের সাহায্যার্থে তিনি বন্যা নিয়ন্ত্রণের জন্য একটি জলাধার নির্মাণ করেছিলেন যা এখনও বর্তমান। তিব্বতের একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পরিভ্রমণ করে তিনি জনসাধারণের মধ্যে বুদ্ধবাণী প্রচার করেছিলেন। দীর্ঘদিন অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে তাঁর দেহ ভেঙে পড়ে। ১০৫৪ সালে তিয়াত্তর বছর বয়সে অতীশ দীপঙ্কর লাসার কাছে নেথাঙ বিহারে মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর ব্যবহার্য দ্রব্যসামগ্রী, পোষাক পরিচ্ছদ এখনও সেখানে সংরক্ষিত আছে।

একটি জাতির ধর্মীয় জীবনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বাংলার এই সূর্যসন্তান অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। চারিত্রে, পান্ডিত্যে ও মনীষায় সমসাময়িক বাংলা ও ভারতবর্ষে তিনি ছিলেন এক উজ্জ্বল জ্যোতিষ্ক। হাজার বছরের আগের এই মানুষটি আজও আমাদের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক।

হাজার বছর পরে অতীশ

১৯৭৮ সালের ২৮ জুন বাংলাদেশ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতায় মহাসঙ্ঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ

মহাথেরোর নেতৃত্বে চীন থেকে ঢাকায় আনা হয় অতীশের পবিত্র দেহভস্মের কিয়দংশ। নিঃসন্দেহে এটি একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। অবশ্য এর সূচনা হয় ১৯৬৩ সালে। সুদূর বেজিঙে অনুষ্ঠিত সংগ্রামী ভিয়েতনামী বৌদ্ধদের সমর্থনে এক আন্তর্জাতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। Great Hall of People-এ চীনের তদানীন্তন প্রধানমন্ত্রী চৌএনলাই-এর সাথে বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরো দু-দেশের সাংস্কৃতিক সম্পর্ক ও মৈত্রী নির্মাণ প্রসঙ্গে তাঁকে অতীশের দেহভস্মের ব্যাপারে অনুরোধ জানান। এরই ফলশ্রুতিতে কূটনৈতিক মিশনের মাধ্যমে তা বাস্তবায়িত হয়। স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পর ১৯৭৮ সালে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের সভাপতি মহাসঙ্ঘনায়ক বিশুদ্ধানন্দ মহাথেরোর নেতৃত্বে সাত সদস্যের এক প্রতিনিধি দল চিনে যান অতীশের দেহভস্ম আনার জন্য। এই প্রতিনিধিদলে ছিলেন ভদন্ত শুদ্ধানন্দ মহাথের, বাংলাদেশের ধর্ম ও সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়ের যুগ্মসচিব জনাব আসাফদৌল্লা, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক মোহম্মদ শাহ কোরেশি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক রণধীর বড়ুয়া প্রমুখ। অতীশ ঘর ছেড়েছিলেন সশরীরে, পদব্রজে। হাজার বছর পর ফিরে এলেন এক সোনালী পাত্রে। ২৮ জুন অতীশের দেহভস্ম ঢাকা বিমানবন্দরে পৌঁছানোর পর বিশাল শোভাযাত্রা সহকারে তা ধর্মরাজিকা বৌদ্ধবিহারে আনা হয়। এভাবে বাংলার শ্রেষ্ঠ সন্তান অতীশ হাজার বছর পর স্বদেশের মাটিতে প্রত্যাবর্তন করেন। বাংলাদেশ সরকারকে অভিনন্দন এক মহান জাতীয় কর্তব্য পালনের জন্য। ঢাকা ধর্মরাজিকা বৌদ্ধ বিহারের পাশ দিয়ে যে রাস্তাটি গেছে তার নামকরণ হয় অতীশ দীপঙ্কর সড়ক।

পরবর্তীতে বাংলাদেশ সরকারের বদান্যতায় আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অতীশ দীপঙ্করের সহস্র জন্মবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয় বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সঙ্ঘের উদ্যোগে। ১৯৮৩ সালের ২৬ ফেব্রুয়ারী-৪ মার্চ ঢাকা মহানগরীতে সপ্তাহব্যাপী এই অনুষ্ঠানের সূচনা করেন বাংলাদেশের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি হুসেন মোহম্মদ এরশাদ। প্রধান অতিথি ছিলেন UNESCO -র ডিরেক্টর জেনারেল এমবো। এই স্মরণীয় অনুষ্ঠানে এপার বাংলা থেকে অংশ গ্রহণ করেন বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সাধারণ সম্পাদক ভদন্ত ধর্মপাল মহাথেরোর নেতৃত্বে শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, ড. অলকা চট্টোপাধ্যায়, অধ্যাপক লামা চিম্‌পা, হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী, সুখপদ বড়ুয়া, শান্তিস্বরূপ বড়ুয়া প্রমুখ। কলকাতাতেও অতীশের জন্মসহস্রবর্ষ উদ্‌যাপিত হয় বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার উদ্যোগে। ১৯৮৩-র ২৯-৩১ জানুয়ারী তিনদিনব্যাপী এই অনুষ্ঠানের শুভসূচনা করেন মহামান্য দলাই লামা রবীন্দ্রসদন সভাগৃহে। উদ্বোধনী ভাষণে তিনি বলেন, ‘বুদ্ধ নির্দেশিত শান্তির পথে চললে বর্তমান পৃথিবীর অস্থিরতা ও সংকটমোচন সম্ভব। পৃথিবীর সমস্ত মানুষের শান্তিতে ও আনন্দের সঙ্গে বেঁচে থাকার অধিকার আছে। অথচ দুর্ভাগ্যবশত এই গ্রহের বহু মানুষ রাজনৈতিক নির্যাতনে জর্জরিত হচ্ছেন, অনাহারে মৃত্যুবরণ করছেন। এই নির্যাতিত মানুষদের জন্য কিছু করা আমাদের নৈতিক দায়িত্ব।’

(*আজকাল/৩০.১.১৯৮৩*) ভারতীয় জাদুঘরে তিব্বতী তংকার সপ্তাহব্যাপী প্রদর্শনীর উদ্বোধন করে দলাই লামা বলেন, 'ভারত তিব্বতের গুরু। আমাদের সম্পর্ক গুরু-চেলার। আমরা তিব্বতী উদ্বাস্তুরা এখানে গুরুর অতিথি।... অতীশের শিক্ষা আমি ৩০ বছর পালন করে আসছি। তাঁর শিক্ষা করুণা আজকের পৃথিবীতে বড় বেশি করে প্রয়োজন।' (*আনন্দবাজার পত্রিকা/ ৩০.১.১৯৮৩*) অনুষ্ঠান উপলক্ষে বেঙ্গল বুদ্ধিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের (বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা) পক্ষ থেকে হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী সম্পাদিত এক স্মারকগ্রন্থ প্রকাশ করা হয়। সোভিয়েত রাশিয়ার খাম্বো লামা এর প্রথম খণ্ডটি দলাই লামার হাতে তুলে দেন (*বসুমতী/৩০.১.১৯৮৩*)। অনুষ্ঠান প্রসঙ্গে রামকৃষ্ণ মঠ ও মিশনের মুখপত্র উদ্বোধন (ফাল্গুন ১৩৮৯) পত্রিকার সম্পাদকীয়তে লেখা হয়েছে—'ভারতের গৌরব, বাঙালীর গর্ব, সেই বৌদ্ধ মহাচার্য অতীশ দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের প্রতি আমাদের মস্তক শ্রদ্ধায় আনত হইতেছে। সারা বিশ্বে আজ অতীশ দীপঙ্করের আবির্ভাব-সহস্রবার্ষিকী সসম্ভ্রমে উদ্‌যাপিত হইতেছে।... কলিকাতাতেও কয়েকটি অনুষ্ঠান হইয়া গেল। স্বয়ং পূজ্য দলাই লামাও এই উপলক্ষে মহানগরীতে আগমন করিয়াছিলেন। অনাস্থা, দ্বন্দ্ব ও বিক্ষোভ চঞ্চল এই নিষ্প্রভ মহাজনপদে ইহা বাস্তবিকই ক্ষণিক বিদ্যুৎ-চমকের মতো একটি আলোকিত সংবাদ।... তাঁর জন্ম-সহস্র-বার্ষিকীতে, বৌদ্ধ ধর্মাচার্যদের সঙ্গে আমরাও সমস্বরে বলিতে পারি, সেদিনের সেই ঘনায়মান মেঘান্ধকারের মধ্যে দীপঙ্করই ছিলেন একমাত্র আলোকধারা। ডঃ দীনেশচন্দ্র সেনের ভাষার অনুকরণে এখানে বলিতে চাহিতেছি, দীপঙ্কর বাঙালী জাতির গৌরব।'

অতীশ দীপঙ্করই প্রথম বাঙালী 'ইউনিভার্সাল ম্যান'। হাজার বছর পরে তাঁর কথা স্মরণে রেখে রবীন্দ্রনাথের বাণী নিয়ে গর্ব করে বেড়াই—

চমকি ত্রাসে দাঁড়ালে উঠি শিলা—আসন ফেলে,
শুধালে, 'কেন এলে'।
কহিনু আমি, 'রেখো না ভয় মনে,
পূজার ফুল তুলিতে চাহি তোমার ফুলবনে'।
এবার আমি আনিনি ডালি দখিন সমীরণে,
সাগরকূলে তোমার ফুলবনে!
এনেছি শুধু বীণা,
দেখো তো চেয়ে আমারে তুমি চিনিতে পার কিনা।

মধ্যযুগ

মধ্যযুগে বাংলায় বৌদ্ধধর্ম

সুকোমল চৌধুরী*

মধ্যযুগ বলতে বোঝায় ত্রয়োদশ থেকে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত ছয়শত বৎসর। ভারতবর্ষে সেই সময় মুসলমান শাসন বলবৎ ছিল। বাংলাও তার প্রভাব থেকে মুক্ত হতে পারেনি। দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে রামপালের মৃত্যুর পর পালযুগের অবসান ঘটে। সেনবংশের অভ্যুদয় হয়। উক্ত বংশের দুই খ্যাতিমান নৃপতি বল্লাল সেন ও লক্ষ্মন সেন অর্ধ শতাব্দীকাল রাজত্ব করেছিলেন (১১৫৮-১২০৫ খ্রীষ্টাব্দ)। দ্বাদশ শতাব্দীর শেষে ইখতিয়ারউদ্দিন মুহম্মদ বখতিয়ার খিলজী বাংলায় মুসলমান আধিপত্য বিস্তার করেন। তার সাথে বাংলায় প্রাচীন যুগের অবসান ঘটে এবং মধ্যযুগের সূত্রপাত হয়। মধ্যযুগ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে এক অন্ধকার যুগ। পঞ্চদশ শতক থেকে বৌদ্ধধর্ম বাংলা থেকে প্রায় বিলীন হয়ে যায়। কিছুটা অবশিষ্ট ছিল চট্টগ্রাম অঞ্চলে। সেখানে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ হয় উনবিংশ শতকের মধ্যভাগে।

সেন বংশের রাজত্বকালে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাসপ্রাপ্ত হল। সেনরাজারা ব্রাহ্মণ্যধর্মের পৃষ্ঠপোষক হওয়ায় বৌদ্ধদের তাঁরা পাষণ্ড বলে অভিহিত করলেন যদিও সেনবংশের রাজারা বৌদ্ধবিহারাদি ধ্বংস করেন নি। তবুও তখনকার তন্ত্রমন্ত্রপ্রধান বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্যধর্মের যাগযজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের সঙ্গে মিশে একাকার হয়ে গেল। বুদ্ধ দশ অবতারের এক অবতাররূপে স্বীকৃত হলেন। ক্রমে এমন অবস্থা এসে দাঁড়াল যে বৌদ্ধ ভিক্ষু এবং ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মধ্যে কোন পার্থক্য থাকল না। কারণ, বৌদ্ধ ভিক্ষুরাও ব্রাহ্মণ পুরোহিতদের মতো সামাজিক ক্রিয়াকলাপ, পূজা-অর্চনা ইত্যাদিতে সক্রিয় অংশ গ্রহণ করল। ক্রমে বৌদ্ধভিক্ষুরা বিহারে বা সংঘারামে থাকার প্রয়োজন বোধ করল না। এর ফলে ভিক্ষুশূন্য বৌদ্ধ বিহারগুলি নামে মাত্র বৌদ্ধধর্মের স্মৃতি ধারণ করে কঙ্কালের মতো দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে তুর্কী আক্রমণের ফলে (ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রথমভাগে) সেই বৌদ্ধবিহারগুলোও ধূলিসাৎ হয়ে গেল। বৌদ্ধ পুঁথি ও পাণ্ডুলিপি আগুনে পুড়ে ছাই হয়ে গেল। শুধুমাত্র চট্টগ্রাম অঞ্চল এই আক্রমণের হাত থেকে কিছুটা আত্মরক্ষা করতে পেরেছিল।

---

* ডঃ সুকোমল চৌধুরী, ত্রিপিটক বিশারদ, গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, বহু গ্রন্থ রচয়িতা, পালি ভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত এবং বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, এশিয়াটিক সোসাইটি এবং নব নালন্দা মহাবিহারে অধ্যাপনা ও গবেষণায় রত। "বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি" গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতক

ত্রয়োদশ শতকেই অভ্যুদয় ঘটেছিল বিখ্যাত বাঙালী বৌদ্ধকবি রামচন্দ্র কবি-ভারতীর। জাতিতে তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ। তর্ক, ব্যাকরণ, স্মৃতি, শ্রুতি, মহাকাব্য, আগম, অলংকার, ছন্দ, জ্যোতিষ, নাটক প্রভৃতি সংস্কৃতশাস্ত্রে তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। সংস্কৃত-ভাষায় বিরচিত বৌদ্ধশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি বৌদ্ধধর্মের সারবত্তা হৃদয়ঙ্গম করে মুগ্ধ হন। কিন্তু স্বদেশে বৌদ্ধধর্মের শোচনীয় দুরবস্থা দেখে তিনি সিংহলে যান। তখন সিংহলের রাজা ছিলেন দ্বিতীয় পরাক্রমবাহু (১২২৫-১২৬০ খৃঃ)। সিংহলে গিয়ে তিনি স্থবির রাহুলের নিকট বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন। বৌদ্ধশাস্ত্রে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য দেখে রাজা পরাক্রমবাহু তাঁকে "বৌদ্ধাগমচক্রবর্তী" উপাধিতে ভূষিত করেন। তিনি ভক্তি-শতকম্ নামে একশত গাথা-সম্বলিত একটি কাব্য রচনা করে বুদ্ধের প্রতি তাঁর অগাধ ভক্তি নিবেদন করেন। তিনি বৃত্তরত্নাকরপঞ্জিকা ও বৃত্তমালা নামেও দু'খানা গ্রন্থ রচনা করেছিলেন।

তিব্বতী ঐতিহাসিক তারনাথের 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' থেকে আমরা জানতে পারি যে বাংলার রাজা প্রতীতসেনের মৃত্যুর পর চিঙ্গলরাজ (পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রথমভাগ) নামে জনৈক বাঙালী রাজা বাংলাদেশ থেকে আরম্ভ করে দিল্লী পর্য্যন্ত অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমানদের বশীভূত করেন। মূলতঃ তিনি ব্রাহ্মণ্যধর্মের উপাসক হলেও তাঁর রাণীর প্রভাবে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হন এবং বজ্রাসন অঞ্চলে (বুদ্ধগয়া) মুসলমানদের দ্বারা ধ্বংসপ্রাপ্ত বহু মন্দিরের সংস্কারসাধন করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের সঙ্গে সংমিশ্রিত ও একাকার বৌদ্ধধর্মকে রক্ষা করতে তিনি সক্ষম হননি। বেণ্ডেল সাহেবের মতে ১৪৪৬ খৃঃ পর্যন্ত বাংলাদেশে বৌদ্ধ পুঁথি লিখিত হয়েছে। ১৪৪৮ সালে চিঙ্গলরাজের মৃত্যু হয়।

ব্রাহ্মণ্য শক্তি ও বৌদ্ধ তন্ত্রবাদের সমন্বয়ে বাংলায় এক নতুন শাক্ত-সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় যার নাম হচ্ছে কৌল। কৌলজ্ঞান-নির্ণয় শীর্ষক গ্রন্থ থেকে এই কৌল-সম্প্রদায় সম্বন্ধে বিস্তৃতভাবে জানা যায়। ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী মহোদয় এই গ্রন্থ সম্পাদিত করেন। তাঁর মতে এই গ্রন্থের রচনাকাল হচ্ছে একাদশ শতাব্দী। এই গ্রন্থ রচনার বহু পূর্বেই কৌলসম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়। বিশিষ্ট কৌল সম্প্রদায়গুলোর নাম হচ্ছে, যথা বৃষণোত্থ কৌল, বহ্নিকৌল, মহাকৌল, সিদ্ধকৌল, সিদ্ধামৃতকৌল, মৎস্যোদর ও যোগিনীকৌল। অকুলবীরতন্ত্রে কৌলদের দুইটি শ্রেণীর নাম পাওয়া যায় কৃতক ও সহজ। কৃতকেরা দ্বৈতবাদী ও সাংসারিক ব্যাপারে লিপ্ত থাকতেন। আর সহজেরা আরাধ্য দেবতার সঙ্গে একাত্ম হওয়াই লক্ষ্যবস্তু বলে মনে করতেন। দু'এর মধ্যে সহজকেই উচ্চস্থান দেওয়া হয়েছে। অকুলবীরতন্ত্রে বলা হয়েছে যে যজ্ঞ, উপবাস, ক্রিয়া, বর্ণভেদ, জপ, অর্চনা, স্নান, হোম ইত্যাদি লৌকিকমার্গের দ্বারা সিদ্ধি বা মুক্তি লাভ হতে পারে না।

বিভিন্ন কৌল ও বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের মধ্যে পঞ্চ কুলের উল্লেখ পাওয়া যায়, যথা, ডোম্বী,

নটী, রজকী, চণ্ডালী ও ব্রাহ্মণী। বৌদ্ধতন্ত্রে এই এক একটি কুলকে এক একটি শক্তি বা প্রজ্ঞা বলা হয়েছে। কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে বজ্র, শান্তিকা এবং পৌষ্টিকা (যা মনের শক্তি বৃদ্ধি করে) শব্দ রয়েছে। তা ছাড়া কৌলজ্ঞাননির্ণয়ে যেমন রহস্যময় খাদ্য ও পানীয়ের বর্ণনা আছে বৌদ্ধ অনঙ্গবজ্রের প্রজ্ঞোপায়-বিনিশ্চয়সিদ্ধি, ইন্দ্রভূতির জ্ঞানসিদ্ধি ও তথাগত-গুহ্যকেও রহস্যময় খাদ্য-পানীয়ের উল্লেখ আছে। এসব সাদৃশ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, বৌদ্ধতন্ত্রের সঙ্গে কৌলশাস্ত্রের অনেক সাদৃশ্য আছে। ডঃ বাগচীও তাই সমর্থন করেন। এ সময় বৌদ্ধ অতীন্দ্রিয়বাদের সঙ্গে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্র ও শাক্ত-ধর্মের সংমিশ্রণে নাথ, অবধূত ইত্যাদি সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। প্রথম অবস্থায় এগুলোতে কোন প্রকার বৈসাদৃশ্য লক্ষ্য করা যেতো না। কিন্তু ক্রমশঃ এগুলো স্বতন্ত্র হয় এবং ত্রয়োদশ শতকের মধ্যেই এগুলো সম্পূর্ণ স্বতন্ত্ররূপ ধারণ করে।

সিদ্ধাচার্যদের ধর্ম থেকেই নাথ সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। মৎস্যেন্দ্রনাথই এই সম্প্রদায়ের প্রবর্তক। অনেকে মনে করেন যে মৎস্যেন্দ্রনাথ ও লুইপাদ এক ও অভিন্ন। নাথ সম্প্রদায়ের বিশিষ্ট সিদ্ধগণের মধ্যে মীননাথ, গোরক্ষনাথ, চৌরঙ্গীনাথ প্রভৃতি প্রধান। উত্তরবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গে নাথ-সম্প্রদায় বিশেষ প্রাধান্য লাভ করেছিল। নাথমার্গে হিন্দুর তন্ত্র ও বৌদ্ধ সহজিয়াদের রহস্যবাদের অপূর্ব সংমিশ্রণ ঘটেছে। 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' রচয়িতা দীনেশ চন্দ্র সেন বলেছেন—"নাথ মহান্তদের ধর্ম বৌদ্ধভাবাপন্ন এবং নাথগীতিকাগুলিতে ও হাড়িপার উপদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব আছে। গোরক্ষের চরিত্রে বৌদ্ধযুগের চরিত্রবল, উচ্চনীতি ও গুরুভক্তি আছে। এই রূপে নাথধর্মে বৌদ্ধ ও শৈবধর্মের শ্রেষ্ঠ উপকরণ মিশিয়া গিয়াছিল।"

বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্যগণের দ্বারাই আবার অবধূত সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়েছিল। অদ্বয়বজ্র, অবধূতিপাদ নামে পরিচিত ছিলেন। অবধূতেরা বৌদ্ধ যোগসাধনাকেই অনুসরণ করতেন। এই যোগসাধনায় অবধূতি নামক নাড়ীর জ্ঞানলাভ অত্যাবশ্যক। সম্ভবত বৌদ্ধ ধুতাঙ্গ (দ্বাদশ প্রকার কৃচ্ছ্র সাধন—ভিক্ষা করা, ছেঁড়া কাপড় পরা, লোকালয়ে না থাকা ইত্যাদি) থেকেই অবধূত সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়েছে। অবধূতেরা সন্ন্যাসজীবন যাপন করতেন। এঁরা বর্ণাশ্রমধর্মের বিরোধী ছিলেন। শ্রীচৈতন্যের প্রধান সহচর নিত্যানন্দও অবধূত ছিলেন। চৈতন্য-ভাগবতে (মধ্যঃ ৩ ও অন্তঃ ৭) এই সম্প্রদায়ের লোকদের জীবনযাত্রা সম্বন্ধে ভাল বর্ণনা আছে। অবধূতেরা মানতেন যে, শাস্ত্রালোচনা বা তীর্থদর্শনের দ্বারা কেউ মুক্তিলাভ করতে পারে না। তাঁরা তাই সমস্ত বন্ধন মুক্ত হয়ে পাগলের মতো ঘুরে বেড়াতেন।

সহজিয়াদের উৎপত্তি শ্রীচৈতন্যের (১৪৮৬-১৫৩৪ খৃঃ) বহু আগেই হয়েছিল। ইহা এমনকি নাথ সম্প্রদায়েরও আগে সৃষ্ট হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতকের ময়নামতী প্লেটের লিপি থেকেও জানা যায় যে, ত্রিপুরার (Tippera) পট্টিকেরকে সহজধর্মের আচরণকারী অনেক লোক ছিল। বৌদ্ধ সহজযান থেকেই এই সম্প্রদায়ের সৃষ্টি হয়। এমনকি স্বয়ং শ্রীচৈতন্য এই সম্প্রদায়ের দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েছিলেন। চণ্ডীদাসের কৃষ্ণ-কীর্তন থেকে সহজিয়াদের

মতভেদ সম্বন্ধে অনেক কিছু জানা যায়। সহজিয়াদের মতে 'মহামুদ্রা'র দর্শন হলেই সিদ্ধিলাভ হয়। এই মহামুদ্রা হচ্ছে শূন্যতা ও করুণার অভেদ বিষয়ে জ্ঞান। ব্রাহ্মণ্যতন্ত্রের যা শিব ও শক্তি, বজ্রযান ও সহজযানের তাই শূন্যতা ও করুণা। এদের মিলনের দ্বারা যে মহাসুখ অনুভূত হয় তাই এবম্-কার।

সহজযান থেকেই আবার বাউল সম্প্রদায়ের উৎপত্তি। বাউলরা সহজিয়াদের চেয়েও গোঁড়াপন্থী। তাঁদের কাছে রাধা ও কৃষ্ণ অর্থশূন্য। তাঁরা বরং নাড়ী (ললনা, রসনা, অবধূতী প্রভৃতি), কুণ্ডলী ও শক্তি ইত্যাদিকেই প্রাধান্য দান করেন।

উপরিউক্ত সম্প্রদায়সমূহের মধ্যে বাউল ব্যতীত আর সবই পরবর্তী কালে বৈষ্ণবধর্মের স্রোতে ভেসে যায়। কিন্তু বাউলরা আজ অবধি তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেছেন। বাউলদের গান-সমূহ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে দেখা যে তাঁদের বেশীর ভাগ মতবাদই বৌদ্ধ মতবাদ।

পঞ্চদশ থেকে সপ্তদশ শতক

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতকের বাংলায় বৌদ্ধধর্ম শুধু নামে মাত্র ছিল—তাও চট্টগ্রাম ও তৎসংলগ্ন কয়েকটি জায়গায়। কাজেই এর পরের শতাব্দীগুলোতে বাংলার ঐসব অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের কোন উন্নতি হয়েছিল কিনা সেটাই আমরা আলোচনা করবো। তবে তার আগে এতদঞ্চলের রাজনৈতিক ইতিহাস একটু জানা দরকার। উত্তরদিকে ত্রিপুরায় তখন রাজত্ব করছিলেন হিন্দুরাজা ধন্যমাণিক্য। সমতট বাংলায় রাজত্ব করছিলেন মুসলমান রাজা সৈয়দবংশীয় আলাউদ্দিন ওয়াদ্দিন আবুল মুজাফর হুসেনসাহ। পূর্বদিকে আরাকানে রাজত্ব করছিলেন বৌদ্ধ মঘরাজা মেঙ্গদি (সংক্ষেপে মেং)। একদিকে হিন্দু, অপরদিকে বৌদ্ধ এবং মাঝখানে মুসলমান। কাজেই তিন ধর্মেরই প্রভাব তখন চট্টগ্রাম-অঞ্চলকে ভীষণভাবে প্রভাবিত করেছিল। এর পর আবার ১৫১২ খৃঃ চট্টগ্রামের আধিপত্য নিয়ে উক্ত তিন শক্তির মধ্যে তুমুল যুদ্ধ শুরু হয়। তিনজাতির রুধিরধারায় চট্টগ্রামের মাটি লাল হয়ে গেল। যুদ্ধে অবশ্য জয়ী হলেন ত্রিপুরার হিন্দুরাজা ধন্যমাণিক্য। কিন্তু আরাকানরাজ এই পরাজয়ে মর্মাহত হলেন। পাঁচ বছরের মধ্যে তিনি আবার চট্টগ্রামের বিরুদ্ধে যুদ্ধঘোষণা করেন এবং চট্টগ্রাম দখল করে সেখানে কিছুকাল অবস্থান করেন। অন্যদিকে তৎপুত্র ইরেমং সন্দীপ, হাতিয়া প্রভৃতি স্থান অধিকার করে সৈন্যসামন্ত সহ নোয়াখালির দিকে অগ্রসর হন। ১৫২২ খৃঃ আবার ত্রিপুরার রাজা ধন্যমাণিক্যের পুত্র দেবমাণিক্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন মঘরাজ গজাবদিকে পরাস্ত করে চট্টগ্রাম দখল করে নেন। কিন্তু কিছুকাল পরে হুসেনসাহের পুত্র নছরত সাহ বাহুবলে চট্টগ্রাম পুনরুদ্ধার করেন। ১৫৩৬ খৃঃ দেবমাণিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়মাণিক্য আবার চট্টগ্রাম দখল করেন। পরে ইহার আধিপত্য নিয়ে ত্রিপুরাধিপতি উদয়মাণিক্যের সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ হয়। ১৫৮৫ খৃঃ চট্টগ্রাম মোগলদের হস্তগত হয়। ১৫৮৭ খৃঃ আরাকানরাজ মেংফালোং চট্টগ্রাম জয় করে ত্রিপুরা লুঠ করেন এবং মেঘনাতীরে

বিজয়পতাকা উড্ডীন করেন। ইতিমধ্যে আরাকানরাজ ব্রহ্মরাজের সঙ্গে মিলিত হয়ে পেগু জয় করেন এবং বিজিত পেগুরাজার যুবতী কন্যাকে বিয়ে করেন। এরপর ১৬০৯-১০ খৃঃ ত্রিপুরেশ্বর বিজয়মাণিক্যের পুত্র অমরমাণিক্য আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। বারবার যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে আরাকানরাজ পর্তুগীজদের সাহায্য প্রার্থনা করেন। পর্তুগীজদিগের সাহায্যে তিনি ত্রিপুরারাজকে পরাভূত করেন। অমরমাণিক্য আবার আক্রমণের চেষ্টা করলে আরাকানাধিপতি এক বছর যুদ্ধ বন্ধ রাখার অনুরোধ করেন। কিন্তু নিজেই এই প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে চট্টগ্রাম অধিকার করে বসেন। সংবাদ পেয়ে ত্রিপুরারাজ তিন পুত্রকে যুদ্ধে পাঠালেন। যুদ্ধে আরাকানরাজ পর্তুগীজদিগের সাহায্যে ত্রিপুরাসৈন্যবাহিনীকে পরাজিত করে উদয়পুর লুঠ করে ত্রিপুরাকে সর্বস্বান্ত করে যান (১৬১০-১১ খৃঃ)। এরপর চট্টগ্রাম কখনও আর ত্রিপুরার অধীন হয়নি। ১৬১৪ খৃঃ আরাকানাধিপতি তদীয় শ্যালককে (পেগুরাজপুত্র) চট্টগ্রামের শাসনভার অর্পণ করেন। এরপর ২৪ বছর যাবত চট্টগ্রামের অধিবাসীরা আরাকানের মঘ ও পর্তুগীজদের দ্বারা উৎপীড়িত হয়েছিল। ১৬৩৮ খৃঃ বাংলার শাসনকর্তা ইসলাম খাঁ মস্‌হৌদী চট্টগ্রাম আক্রমণ করেন। মঘরাজ ইসলাম খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেন। কিন্তু পরে তিনি আবার চট্টগ্রাম অধিকার করে নেন। এর পর বাংলার নবাব শায়েস্তা খাঁ পর্তুগীজদের নানা প্রলোভনে বশীভূত করে ১৬৬৬ খৃঃ চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এভাবে আরকানরাজও চিরতরে চট্টগ্রাম হারালেন। তবে দক্ষিণ অংশে অর্থাৎ কর্ণফুলী ও রামুতে আরাকানরাজ চন্দ্র-সুধর্মার রাজত্ব এর পরেও চলতে থাকে। কিন্তু সপ্তদশ শতাব্দীর আরম্ভের পূর্বেই সমস্ত চট্টগ্রাম মোগলদের অধীনে চলে যায়। পরে মোগলদের হাত থেকে চট্টগ্রাম ইংরেজদের হাতে চলে যায় ১৭৭৪ খৃঃ।

উপরিউক্ত তিন শত বছরের ইতিহাস থেকে আমরা বুঝতে পারি যে চট্টগ্রাম এবং তৎসংলগ্ন অঞ্চলে হিন্দু, বৌদ্ধ বা মুসলমান কোন ধর্মের অবস্থাই বিশেষ সুবিধাজনক ছিল না। যখন যে রাজা রাজত্ব করেছেন সে রাজার ধর্মের প্রভাব পড়েছে। অবশ্য শেষের দিকে মুসলমানদের রাজত্বকালে ইসলাম ধর্মেরই প্রভাব বেশী পড়েছে। অধিকাংশ লোক ইসলাম ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিলেন স্বেচ্ছায় বা বাধ্য হয়ে। তবে শেষ পর্য্যন্ত হিন্দু এবং বৌদ্ধদের সংখ্যা একেবারে কমে যায়নি। হিন্দুর চেয়ে বৌদ্ধের সংখ্যা ছিল অধিক।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভ পর্য্যন্ত ত্রিপুরার রাজারা তান্ত্রিক বৌদ্ধই ছিলেন। কথিত আছে যে, ১৫০১ খৃঃ ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্য স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে চট্টগ্রাম আক্রমণ করে মগধেশ্বরীকে নিয়ে আসেন এবং উদয়পুরে 'ত্রিপুরাসুন্দরী' নামে প্রতিষ্ঠা করেন। পরে অমরমাণিক্যের পুত্র রাজধর মাণিক্য (১৬১১-২৩) সর্বপ্রথম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। আরাকান রাজাদের রাজত্বকালে বাঙালী বৌদ্ধরা তান্ত্রিক বৌদ্ধই ছিলেন। তাঁদের তান্ত্রিক দেবী মগধেশ্বরীর প্রভাব আরাকানের রাজধানী মিহং বা পাথরকিল্লাতেও সংক্রামিত হয়েছিল। ১৬৩১ খৃঃ মুকুটরায়ের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা ত্রিপুরাধিপতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা

করেন। উদ্দেশ্য তাঁদের মগধেশ্বরী-দেবীকে পুনরুদ্ধার করা। রাজমালার কল্যাণমাণিক্যখণ্ডে পাওয়া যায় —

'কালিকার মঠচূড়া মঘে ভাঙ্গি ছিল,
পুনর্বার মহারাজ নির্মাণ করিল।'

অর্থাৎ মুকুটরায় ত্রিপুরা আক্রমণ করে উদয়পুরের ত্রিপুরাসুন্দরীর মন্দিরের যথেষ্ট ক্ষতিসাধন করেন। পরে অবশ্য ১৬৮১ খৃঃ মহারাজ রামমাণিক্য এই মন্দিরের সংস্কার করেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে আজও নোয়াখালি, লাকসাম ও ত্রিপুরার বৌদ্ধরা মগধেশ্বরীর নামে মাংসভোগ দিয়ে থাকে।

এই যুগেও বৌদ্ধধর্মের বেশী ক্ষতিসাধন করেছিল মুসলমানরা। মুসলমানরা বহু বৌদ্ধ মন্দির ধ্বংস করেছে এবং কতকগুলোকে মসজিদে রূপান্তরিত করেছে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আজও 'বুদের মকান' নামে একশ্রেণীর উপাসনাগার আছে। অথচ সেগুলোতে মসজিদের কোন চিহ্ন নেই। পণ্ডিত আবদুল করীম প্রভৃতি মনীষীরা মনে করেন যে, ওগুলো বৌদ্ধ-মঠ ছিল। স্থানীয় বৌদ্ধদের মুসলমান ধর্ম গ্রহণের পর বুদ্ধমূর্তিগুলো সরিয়ে ফেলা হয়েছে। এই সময়েই চট্টগ্রামের পণ্ডিতবিহার ধ্বংস করা হয় বলে অনেকের ধারণা। পণ্ডিতবিহার ধ্বংসের পর বাঙালী বৌদ্ধদের নিকট আর কোন ধর্মগ্রন্থই থাকলো না। বৌদ্ধেরাও ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হয়ে গেল। শতাব্দীকাল ধরে ইসলাম রাজত্বে থাকার ফলে বৌদ্ধদের বিরাট অংশ ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়।

অষ্টাদশ থেকে ঊনবিংশ শতকের মধ্যকাল

১৭৬০ খৃষ্টাব্দের ২৭শে সেপ্টেম্বর মীর মহম্মদ কাসেম খাঁ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে চট্টগ্রাম, বর্ধমান ও মেদিনীপুরের সর্বাধিকারিত্ব প্রদান করেন। সেই সঙ্গে চাক্‌মা রাজ্যও (পার্বত্য চট্টগ্রাম) ইংরেজদের হাতে চলে যায়। এর মাত্র পাঁচ মাসের মধ্যে ত্রিপুরারাজ্যও ইংরেজদের কুক্ষিগত হয়। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ইংরেজরা আনুষ্ঠানিকভাবে সমগ্র বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যার দেওয়ানি অর্থাৎ রাজস্ব আদায়ের ক্ষমতা পেলেন। বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যায় দ্বৈত শাসন প্রবর্তিত হল। কিন্তু প্রত্যক্ষভাবে তখনও এ সব অঞ্চলে ইংরেজ শাসন কায়েম না হওয়ায় খৃষ্টধর্ম প্রচারের সুযোগ ঘটেনি। যদিও সর্বপ্রথম ১৮১২ খৃঃ 'লণ্ডন ব্যাপটিষ্ট্ মিশনারী সোসাইটি' চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চলে খৃষ্টধর্ম প্রচারের কাজ শুরু করে তথাপি ১৯০০ খৃষ্টাব্দের আগে এরা বিশেষ সুবিধা করতে পারেনি। অতএব, অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলাদেশে তিনটি ধর্মই ছিল—মুসলমান, হিন্দু ও বৌদ্ধ। তন্মধ্যে মুসলমান ধর্মই প্রধান। এটা মুসলমান রাজত্বের ফলেই হয়েছে। ইতিপূর্বে এ বিষয়ে আমরা কিছু আলোচনা করেছি। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রভাবও একেবারে নগণ্য ছিল না। এর আগে আমরা বলেছি যে শ্রীচৈতন্যের আবির্ভাব ও তাঁর অসাধারণ ব্যক্তিত্ব ও কর্মদক্ষতার ফলে একদিন

সমগ্র বাংলাদেশে হিন্দুধর্মের যে নবজাগরণ সূচিত হয়েছিল তার সুদূরপ্রসারী প্রভাব বাঙালী জনসাধারণের মধ্যে বহুদিন ধরে বিশেষভাবে বর্তমান ছিল। কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের গতিও ছিল অপ্রতিহত। একদিন বৈষ্ণবধর্মের স্রোতে হিন্দুরা গা ভাসিয়ে দিয়েছিল বটে, কিন্তু ব্রাহ্মণ্যধর্মের দোর্দণ্ড প্রতাপশালী অশরীরী আত্মার নাগপাশ থেকে তারা কখনও মুক্ত হতে পারে নি। শুধু হিন্দুরা নয় বৌদ্ধরাও এর প্রভাব থেকে মুক্ত হ'তে পারেনি। অবশ্য মুক্ত হ'তে পারেনি বললে ভুল বলা হবে, বলা উচিত বৌদ্ধরা চিন্তায়, কাজে ও কর্মে ব্রাহ্মণ্য ধারা ও আদর্শ অনুসরণ করে নিজেরাই তাতে হারিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কেন এটা সম্ভব হয়েছিল তার উত্তর আমরা ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার একটি উক্তি থেকে পেয়ে যাবো। তিনি বলেছেন—"অগ্নিহোত্র বা কালীপূজা লৌকিক ধর্মের অঙ্গবিশেষ। এইরূপে আমরা যতই অতীতের দিকে অগ্রসর হই না কেন দেখিতে পাইব যে সর্বত্রই একটি মানবগৃহ্যধর্মের ধারা রহিয়াছে এবং এই ধারার সহিত বিরোধ ও রফারফি করার ফলেই ব্রাহ্মণ্য, আজীবিক, জৈন, বৌদ্ধ প্রভৃতি উচ্চতর ধর্মের যুগে যুগে অনেক পরিবর্তন সাধিত হইয়াছে। একথা সত্য যে এ সকল উচ্চতর ধর্মের মধ্যে ব্রাহ্মণ্যের ন্যায় আর কোনও ধর্ম মানবগৃহ্যধর্মকে আত্মস্থ করিতে পারে নাই, অপর কোন ধর্ম নিজের সঙ্কীর্ণতা ও উদারতা, দর্শন ও কুসংস্কার, বিধি ও ব্যবস্থা, সত্য, শিব ও সৌন্দর্য দিয়া একটি পূর্ণায়তন হিন্দুধর্ম গঠন করিতে পারে নাই।"

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর বৌদ্ধধর্ম ও বৌদ্ধ সমাজের অবস্থা আলোচনা করলেও আমরা উপরিউক্ত মত সমর্থন না করে পারবো না। তখনকার বৌদ্ধ ভিক্ষুরা 'বিনয়পিটকের' নিয়মকানুন সম্বন্ধে কিছুই জানতেন না। তাঁরা রাত্রে ভাত ছাড়া অন্যান্য খাদ্য-পানীয় গ্রহণ করতেন, যেটা বিনয়-বিরুদ্ধ কাজ। তাঁদের চীবর অর্থাৎ পরিধেয়বস্ত্র বিনয়-নিয়মানুসারে তৈরী হ'তো না। উপসম্পদা বা পূর্ণাঙ্গ ভিক্ষুত্ব অর্জনের নিয়ম-কানুন সঠিকভাবে মানতেন না। দশ বছরের ছেলেকেও উপসম্পদা দেওয়া হ'তো। কিন্তু বৌদ্ধ বিনয়-মতে কুড়ি-বছরের কম বয়সের কাউকে উপসম্পদা দেওয়া নিষেধ। তখন বৌদ্ধ ভিক্ষুরা মাত্র দশটি শীল বা নীতি মেনে চলতেন তাও ভাল করে নয়। যে কোন প্রকার সামাজিক কাজে ভিক্ষুরা অংশ গ্রহণ করতেন। বিয়ের ঘটকালী থেকে শুরু করে বিয়ের সময় নিমন্ত্রিতদের খাদ্য-পানীয় পরিবেশন পর্যন্ত সব কাজ ভিক্ষুরা সম্পন্ন করতেন। তাঁরা ভিক্ষুদের অবশ্য করণীয় 'উপোসথ', 'পবারণা' ইত্যাদি বিনয়-কর্ম সম্পাদন করতেন না। এ প্রসঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের বক্তব্য আমরা এখানে উদ্ধৃত করবো। তিনি লিখেছেন—

"মুসলমান অধিকারের পরে নূতন সমাজে যাহারা অনাচরণীয় হইল—বৌদ্ধধর্ম শেষে তাহাদের মধ্যে নিবদ্ধ হইয়া পড়িল এবং তাহারা ক্রমে প্রজ্ঞা, উপায় ও বোধিসত্ত্ব ভুলিয়া গেল ; শূন্যবাদ, বিজ্ঞানবাদ, করুণাবাদ ভুলিয়া গেল; দর্শন ভুলিয়া গেল ; শীল বিনয় ভুলিয়া গেল। তখন রহিল জন কতক মুর্খ ভিক্ষু অথবা ভিক্ষু নামধারী বিবাহিত পুরোহিত। তাহারা আপনার মত করিয়া বৌদ্ধধর্ম গড়িয়া লইল।" বাঙালী বৌদ্ধরা কতকগুলো লৌকিক

পূজা-কর্মে অভ্যস্ত ছিল, যথা—দুর্গাপূজা, লক্ষ্মীপূজা, সরস্বতীপূজা, শনিপূজা, মগধেশ্বরীর পূজা, কালীপূজা, ঈষামতীর পূজা, মনসা পূজা, ডাকিনীর পূজা, নবগ্রহ পূজা, গ্রাম্যদেবতার পূজা, গৃহদেবতার পূজা, কার্ত্তিকব্রত, বিষুবসংক্রান্তি উৎসব ইত্যাদি। বিভিন্ন দেবতার পূজায় এমন কি নানাপ্রকার পশু-পক্ষীও বলিদান করা হোত। পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা বৌদ্ধদের মধ্যেও এ সকল পূজা-পার্বণ প্রচলিত ছিল। চাক্‌মা বৌদ্ধরা "মা-লক্ষ্মী-মা"র যথাবিধি পূজা করে শূকর, মোরগ প্রভৃতি বলি দিত। পরে সেই প্রসাদী মাংস খেত। এ ছাড়া "হোইয়া" বা "কালাইয়া" পূজা অর্থাৎ কালীপূজা, শিবপূজা ইত্যাদিতে বলিদান করে প্রসাদী-মাংস খাওয়ার বিধান ছিল। মুসলমানদের অবতার সত্যপীর, মানিকপীর, বদরসাহেব ইত্যাদির নামে 'সিন্নি' দেওয়ার প্রথা ছিল। সত্যপীর বাস্তবিকই মুসলমানদের দেবতা কিনা এ বিষয়ে অনেক মতানৈক্য আছে। এ প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বক্তব্য উল্লেখযোগ্য। তিনি লিখছেন—"মুসলমান সমাজের অবতার বিশেষ হইলেও সত্যপীর বহুদিন হইতে 'সত্যনারায়ণ' আখ্যায় হিন্দু সম্প্রদায়েরও পূজা লাভ করিয়া আসিয়াছেন। হিন্দুগণ নারায়ণ ঠাকুরের এত রকমবেরকমের সাজসজ্জায়ও পরিতৃপ্ত হইতে না পারিয়া ফকিরী আলখাল্লা এবং 'নম্রমান দাড়ী-গোঁপ, গায় কাঁথা শিরে টোপ, হাতে আশা কাঁধে ঝোলা ঝুলি' ইত্যাদিতে সাজাইয়াছেন। বস্তুতঃ হিন্দু ও মুসলমানগণ বহুকাল যাবত একত্র বাসনিবন্ধন এই শ্রেণীর মিশ্র দেবতার পূজা উভয় সমাজেই প্রচলিত হইয়াছে। প্রাচীন কবি ফকিররাম দাস উদার প্রাণে লিখিয়াছেন—

"দেখ থাকে পুরাণ, কোরাণ থাকে দেখো।
জোই রাম রহিম দোনহি হোয়ে একো।"

ক্রমে তা বৌদ্ধ সমাজেও ছড়িয়ে পড়েছে। এ ছাড়া মগধেশ্বরীর (পরবর্তী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের একজন দেবী) পূজাও বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে বিশেষভাবে প্রচলিত ছিল। এই পূজায় ছাগ বলি দিয়ে কাঁচা মাংস ভোগ দেওয়া হোত। কথিত আছে যে বৌদ্ধ পুরোহিতরাই স্বয়ং বলিদান করতেন। ইতিপূর্বে আমরা বলেছি যে এখনও নোয়াখালি, লাকসাম ও ত্রিপুরা অঞ্চলে বৌদ্ধরা মগধেশ্বরীর নামে মাংসভোগ দিয়ে থাকে। অন্যান্য দেব-দেবীর পূজাও এখন একেবারে উঠে যায়নি তবে দুর্গাপূজা হয় না। ইদানীং পশু-পক্ষীও বলিদান করা হয় না। জীবরক্তের পরিবর্তে "ম্যাজেণ্ডার" রং ব্যবহার করা হয়। মগধেশ্বরী ও ঈষামতীর পূজায় ছাগ বলিদান না করে ছেড়ে দেওয়া হয়। এখনও বাঙালী বৌদ্ধরা গ্রহশান্তির জন্য পূজারী ব্রাহ্মণকে পূজোপকরণ ও দক্ষিণা দিয়ে থাকে। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে—"প্রচলিত লৌকিক পূজাপদ্ধতি হইতে প্রমাণিত হয় যে চট্টগ্রাম ও কলিকাতার বড়ুয়া সমাজ (বাঙালী বৌদ্ধ) একটি হিন্দু বা আর্য্যভাবাপন্ন গৃহস্থ সমাজ। শাক্তদের সহিত বড়ুয়াদের ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ ; 'কালিকা মার' কৃপাভিক্ষা এখনও তাঁহাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। বৌদ্ধধর্মের প্রভাবে এই সমাজ হইতে ক্রমশঃ সনাতন আর্য্য গৃহ্যধর্ম ও আচারপদ্ধতি ঈষৎ রূপান্তরিত হইয়াছে ও হইতেছে।"

সে যুগের বৌদ্ধ পুরোহিতদের বলা হোত 'রাউলী' (চাক্‌মা-ভাষায় রঅড়ী)। চট্টগ্রামে এঁদের বলা হোত 'বড়ুয়া রাউলী' এবং পার্বত্য চট্টগ্রামে এঁদের 'চাকমা রাউলী' বলা হোত। নেপাল, তিব্বত, চীন, কোরিয়া এবং জাপানের অধিকাংশ মহাযানী পুরোহিতদের মতো রাউলীরা সংসারধর্ম করতেন এবং বিয়ে করতেন। উপসম্পদা বা ভিক্ষুত্ব লাভের পর মাত্র সাতদিন তাঁরা দশশীল বা নীতি পালন করতেন। সাত দিন পর তাঁরা আবার গার্হস্থ্যধর্ম গ্রহণ করতেন এবং স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের সঙ্গে সংসারধর্ম পালন করতেন। তবে মজার ব্যাপার হ'ল এই যে, গেরুয়া কাপড়টি তাঁরা তাঁদের কাছেই রেখে দিতেন এবং যে কোন ধর্মীয় কাজ করার সময় সেই গেরুয়া কাপড় গলায় জড়িয়ে নিতেন। চট্টগ্রামে এখন রাউলী পুরোহিত দেখা যায় না। তবে তাঁদের বংশধারা এখনও চলছে, যেমন যধর রাউলী, থান রাউলী, খুদ্যা রাউলী, চান রাউলী প্রভৃতি। এখনও চট্টগ্রামের মুসলমানরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের 'রাউলী' বলে ডাকে। যদি কোন বৌদ্ধ ভিক্ষু বা ভিক্ষুর দল মুসলমান পাড়ার ভেতর দিয়ে যায়, তখন মুসলমান ছেলে-মেয়েরা সমস্বরে চীৎকার করে বলে "রঅলী, রঅলী, কুরা খাইবার যম" (অর্থাৎ রাউলীরা ভীষণ মুরগীর মাংসের ভক্ত) ইত্যাদি। অথবা মুসলমান যুবতী মেয়েরা সমস্বরে বলে "অ রঅলী, পোয়া দি জ, অ র অলী পোয়া দি জা" (অর্থাৎ ওহে রাউলী, আমাকে একটি ছেলে দিয়ে যাও) ইত্যাদি। এখনও চট্টগ্রামের কিছু রাস্তা-ঘাট, পুল, হাট-বাজার, পুকুর, ভিটা ইত্যাদির নামের সঙ্গে "রাউলী' নাম দেখা যায়। পার্বত্য চট্টগ্রামে এখনও রাউলী পুরোহিত কিছু কিছু আছেন। প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, এখনও সিংহলের বহু বড় বড় বৌদ্ধমন্দিরে 'রাউলী' জাতীয় পুরোহিত দেখা যায়। এঁদের কাজ হচ্ছে সেবাইতি করা। বৌদ্ধপ্রধান সিংহল দেশে গিয়ে ওখানকার মঠে-মন্দিরে এখনও এ জাতীয় সেবাইতদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তি দেখে আমাদের সত্যিই অবাক লেগেছিল।

রাউলীদের আবার তিনটি শ্রেণী ছিল, যথা, মাথের, কামে ও পাঞ্জাং। সম্ভবতঃ পালি 'মহাথের' (অর্থাৎ বহু বছর ধরে নিষ্ঠা সহকারে ভিক্ষুজীবন যাপন করে যাঁরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়েছেন) শব্দ থেকেই 'মাথের' শব্দের উৎপত্তি। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ করা যেতে পারে যে, পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের ভিক্ষুসঙ্ঘ দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে পড়েছিল—মাথের দল ও সঙ্ঘরাজের দল।

চট্টগ্রাম বিভাগে আরও এক শ্রেণীর বৌদ্ধ পুরোহিত ছিলেন। তাঁদেরকে বলা হোত পুংগ্রী, যেমন আরিপা পুংগ্রী, আনপ্পা পুংগ্রী, মোরপ্পা পুংগ্রী, হারিপা পুংগ্রী ইত্যাদি।

পরবর্তীকালে চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা তাঁদের ধর্মগুরুকে বলতে আরম্ভ করলেন 'ঠাউর'। নিশ্চয়ই হিন্দুদের প্রভাবেই এটা হয়েছে। কারণ হিন্দুরা তাঁদের পুরোহিতকে 'ঠাকুর' বলেন। বৌদ্ধদের লালমোহন ঠাউর, কমল ঠাউর, হরি ঠাউর, সুখচান ঠাউর, দুরাজ ঠাউর, অভয়াচরণ ঠাউর ইত্যাদি নাম উল্লেখযোগ্য।

ঊনবিংশ শতকে চট্টগ্রামের বৌদ্ধদের কোন ধর্মগ্রন্থ ছিল না বললেই হয়। বুদ্ধ, ধর্ম

এবং সঙ্ঘ এই ত্রিরত্নের পূজা ও বন্দনায়, তিথি-শ্রাদ্ধাদি সামাজিক ক্রিয়া-কলাপে, বিবাহাদি মাঙ্গলিক কাজে বৌদ্ধরা যে মন্ত্র ব্যবহার করতেন তার ভাষা অদ্ভুত। সেটা মোটামুটি পালি ও আরাকানী ভাষার মিশ্রিত অপভ্রংশমাত্র। কিছু কিছু মন্ত্র ছিল পালি ও সংস্কৃত মিশ্রিত। কিছু উদাহরণ আমরা এখানে দেবো ঃ

১। শ্রী যত্র দুর্গা

কলদি পুরাণী মন্ত্র ঃ—

'উং নাম্ম ভূধানুস্রেদি।

উং নাম্ম ধর্মানুস্রেদি।

উং নাম্ম চাংকানুস্রেদি।

চাপাইংধারে উনোচাংধু'—এর পালি তর্জমা করলে দাঁড়াবে ঃ

'ওং নমো বুদ্ধানুস্‌সতি।

ওং নমো ধম্মানুস্‌সতি।

ওং নমো সঙ্ঘানুস্‌সতি।

সব্বন্তরায়ে বিনাসমেন্তু'।

অর্থাৎ বুদ্ধ, ধর্ম এবং সঙ্ঘের অনুস্মৃতিকে নমস্কার। সমস্ত প্রকার আপদ-বিপদ বিনাশ-প্রাপ্ত হোক।

২। বসুমতি যুদ্দ মন্ত্র (বসুমতী শুদ্ধ মন্ত্র) ঃ—

'হে আঁধু নিমিতাইং আও তা মাঙ্গালেইঞ্জা .... গুংনা গাহানা ... আমাপইন্তে।'

পালি—'মং দুন্নিমিত্তং অবমঙ্গলং চ .....গুণ (গণ) গহনা

... আম ভন্তে'। অর্থাৎ হে প্রভো, যে দুর্নিমিত্ত অর্থাৎ দুর্লক্ষণ, অমঙ্গল..... গুন-গণ-গহন.....।

পার্বত্য চট্টগ্রামের চাক্‌মা বৌদ্ধগণের মধ্যেও এজাতীয় মন্ত্র প্রচলিত ছিল। এ মন্ত্রের ভাষা "আরাকানী, বড়ুয়া ও চাক্‌মা-উচ্চারণ বিকৃত পালি।" আমরা এখানে চাক্‌মাদের সিগল-মগল-তারা (জয়মঙ্গল-সূত্র) থেকে কিছু অংশ উদ্ধৃত করবো। সাধারণতঃ বিবাহকালে বর-কন্যাকে আশীর্বাদ করার সময় এ মন্ত্র পাঠ করা হোত।

"..... জায়ান্তো বোধিয়া মূলে সাক্যানাং নান্দিবদ্বনো।

এয়াং তুয়াং জায়াং হোতি জায়াসু জায়ামাঙ্গালাং।।

আপরাজিতা পালাঙ্কে সিসে পুতুহি মুক্‌খালে।

আভিসেক্‌খো সাম্বুদ্ধানাং আগ্‌গাপাদু পামুদাত্তি।।

সুনাক্‌খাতাং সুমাঙ্গালাং সুভাবাতাং সুহুত্তিতাং।

সুখুন সুমাহতুৎসা সুহিতাং ব্রহ্মসারিসু।।

... ...

যং কিঞ্চি রাতানাং লুকে বিজ্জতি বিবিধা পুতু।

রাতানাং বুদ্ধাং সামাং নাত্থি তাস্মা সাতি ভাবান্তুতে।।

... ...

রাতানা ধাম্মা সামাং নাত্থি তাস্মা সাতি ভাবান্তুতে।।

... ...

রাতানাং সাঙ্ঘাং সামাং নাত্থি তাস্মা সাতি ভাবান্তুতে।। ইত্যাদি

পালি— জয়ন্তে বোধিয়া মূলে সক্যানং নন্দিবড্ঢনো।
এবমেব জয়ো হোতু জয়স্সু জয়মঙ্গলে।।
অপরাজিত-পল্লঙ্কে সীসে পুথুবী মুক্খেলে।
অভিসেকে সম্বুদ্ধানং অগ্গপ্পত্তো পমোদতি।।
সুনক্খত্তং সুমঙ্গলং সুপ্পভাতং সুহুট্ঠিতং।
সুখণেহু সুমুত্তো চ, সুসিট্ঠং ব্রহ্মচারীসু।।

... ...

যং কিঞ্চি রতনং লোকে বিজ্জতি বিবিধা পুথু।
রতনং বুদ্ধসমং নত্থি তস্মা সোত্থি ভবন্তু তে।।

... ...

রতনং ধম্মসমং নত্থি তস্মা সোত্থি ভবন্তু তে।।

... ...

রতনং সঙ্ঘসমং নত্থি তস্মা সোত্থি ভবন্তু তে।।

অনুবাদ—শাক্যদের আনন্দবর্ধনকারী (বুদ্ধ) বোধিমূলে বিজয়ী হয়েছেন। এরূপ তোমাদেরও জয়-মঙ্গল হোক। সম্বুদ্ধগণের অভিষেকধন্য জগতের শীর্ষস্থান এই অপরাজিত বোধি-পালংকে অগ্রফল বা নির্বাণ পেয়ে বুদ্ধ যেমন প্রমোদিত হন— সেরূপ তোমরাও প্রমোদিত হও। ব্রহ্মচারীর সেবাই সুনক্ষত্র, সুমঙ্গল, সুপ্রভাত, শুভ-উত্থান, সুক্ষণ ও শুভ-মুহূর্ত। .... এ জগতে যত প্রকার রত্ন আছে তাদের মধ্যে বুদ্ধরত্ন .... ধর্মরত্ন .... সঙ্ঘরত্নসম কোন রত্ন নেই। এ সত্যবাক্যদ্বারা তোমাদের স্বস্তি হোক।

এই উদাহরণগুলো থেকে আমরা বুঝতে পারি বাঙালী বৌদ্ধরা তাদের শাস্ত্র সম্বন্ধে কত অজ্ঞ ছিল। তারা যাকে শাস্ত্র বলে মানতো সেটা ছিল মূলশাস্ত্রের বিকৃত অবশেষমাত্র। আরাকানী এবং মহাযানী বৌদ্ধদের প্রভাবে তারা বুদ্ধকে বলতো 'ফরা', ধর্মকে বলতো 'তারা' এবং সঙ্ঘকে বলতো 'চাংকা'। এখনও চট্টগ্রামের বাঙালী বৌদ্ধদের অনেককেই রাত্রে শোওয়ার আগে বলতে শোনা যায়—'রা—তারা—চাংকা। আনিচ্চা-দুক্খো-হানাতা। ডঃ বড়ুয়াও তাই যথার্থই বলেছেন "বড়ুয়াদের অবলম্বিত বৌদ্ধধর্মের উপর মন্ত্রযান বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ছিল এখনও আছে" (*বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি, পৃঃ ৩।০*)। এসব নজির থেকে মোটামুটি বোঝা যায় যে শ্রীচৈতন্যের পরে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম তার সব কিছুই হারিয়ে ফেলেছিল। তা ক্রমে তন্ত্র, মন্ত্র, বৈষ্ণব আগম, সহজিয়া আউল, বাউল এবং নাথের মধ্যে বিলীন হয়ে গিয়েছিল।

বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা

সাধন কমল চৌধুরী*

মহাযানী বৌদ্ধরা নিজেদের মতো করে বুদ্ধের আদর্শ ও ধর্মকে শুধু সাজালো না, তারা বুদ্ধের নির্বাণ মার্গকে পাশ কাটিয়ে তার সহজ সরল ধ্যানে নিয়ে এলো তন্ত্রসাধনা। নাগার্জুনের শূন্যবাদের ভিত্তিতে তার তন্ত্রসাধনার বিকাশ ঘটালো এই দেশে খুব সম্ভবত খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে। সাধারণ মানুষ নাকি শূন্যবাদের তত্ত্বকথা ও ধ্যানের স্তরগুলো কিছুই বুঝতে পারলো না। তারা যাদুমন্ত্র, মন্ডল, ধারণী, বীজ ইত্যাদি সহজে বুঝলো।

যাদুশক্তি, মন্ত্রশক্তি বুদ্ধের ধর্মদর্শনে নেই। এগুলো মহাযানী সৃষ্ট ধ্যান-কল্পনা। হীনযানী বৌদ্ধদর্শনে কোন দেব-দেবীর পূজার কথা নেই। বুদ্ধের পূজাও সেখানে নেই। কিন্তু মহাযানীরা বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রচুর দেব-দেবীর উদ্ভব করলো। মঞ্জুশ্রী, হারিতী, তারা, প্রজ্ঞাপারমিতা, পদ্মসম্ভব, বজ্রসম্ভব ইত্যাদি নানা দেব-দেবীরা এলো। মন্ত্রযান, বজ্রযান ও সহজযানে দেব-দেবীর সংখ্যা আরও বাড়লো। মহাযানী পন্ডিতরা মন্ত্রের ভিত্তিতে নতুন ধ্যানকল্পনার উদ্ভব করলো। আর সেই ধ্যানের মাধ্যমে দেখা অসংখ্য দেব-দেবী তারা বৌদ্ধধর্মে নিয়ে এলো। তাদের কাছে মন্ত্রই হলো মূলপ্রেরণা। মন্ত্রের শক্তিতে অভীষ্ট সিদ্ধির কথা বললো তারা। এই মন্ত্রশক্তি মহাযানী সাধনমার্গের সম্পূর্ণটাই প্রায় জুড়ে রইল। যাদু, মন্ডল, ধারণী, বীজ ইত্যাদি এই মন্ত্রশক্তির গোড়ার কথা। এগুলো মন্ত্রের শক্তিকে সাহায্য করে। এই পথকেই বলা হলো মন্ত্রযান। যাদু, টোনা, বশীকরণ ইত্যাদি এলো এই পথ ধরে।

বৌদ্ধ তন্ত্রশক্তির পরের সাধনা হলো বজ্রযান। এটাকে তন্ত্রসাধনার দ্বিতীয় সাধনাও বলা চলে।

মহাযানী শূন্যবাদীদের কাছে নির্বাণ হচ্ছে শূন্যতার পরম-জ্ঞান। নির্বাণ প্রাপ্তি হচ্ছে জীবের মহাসুখকর অনুভূতি। শূন্যরূপ এই নির্বাণকে মহাযানীরা তন্ত্রসাধনায় কল্পনা করলো দেবীরূপে। আর যে চিত্তে সম্যকজ্ঞান বা বোধিজ্ঞানের সঙ্কল্প রয়েছে তাকে বলা হলো 'বোধিচিত্ত'। এই বোধিচিত্ত যখন শূন্যতায় বিলীন হয় তখনই হয় নির্বাণ প্রাপ্তি যা এক মহাসুখকর অবস্থা। তন্ত্রে বলা হলো বোধিচিত্ত তখন কল্পিত দেবীর আলিঙ্গনাবদ্ধ হয়ে মহামিলনের সুখকর অবস্থায় উপনীত হয়। বোধিচিত্তের মহাসুখ প্রাপ্তির জন্যে যে সাধনার পথ তাকেই বলা হলো বজ্রযান।

---

* বৌদ্ধ সাহিত্যিক ও প্রবন্ধকার। তাঁর রচিত "বুদ্ধের ধ্যানপদ্ধতি ও বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা" গ্রন্থ থেকে এটি পুনর্মুদ্রিত।

নির্বাণ প্রাপ্তিকে এইভাবে সহজ করে নিল মহাযানীরা। প্রজ্ঞা, শীল, অষ্টাঙ্গিক মার্গ ইত্যাদির জটিলতায় না গিয়ে মহাযানীরা তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে বুদ্ধ বর্ণিত নির্বাণ লাভের সহজ পথ দেখান। তবে বোধিচিত্তে এই বজ্রভাব আনা খুবই কঠিন কাজ। তাছাড়া, বোধিচিত্তও সহজে লাভ করা যায় না। বোধিচিত্তের জন্য কঠোর ধ্যানের প্রয়োজন। আর ধ্যানের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়শক্তি দমন করলে তবেই চিত্ত বজ্র-কঠিন হবে। তার জন্য সম্যক জ্ঞানের প্রয়োজন থাকে। সুতরাং প্রজ্ঞাকে তারা সমূলে বাদ দিতে পারলো না। আর তার সঙ্গে অষ্টাঙ্গিক মার্গের কিছুটা রয়েই গেল। খিচুড়ী মিশাল দিয়ে মহাযানী তন্ত্রসাধকরা নির্বাণের পথ দেখাল।

বজ্রযানীরা বলল, রমণযোগে যে চরম সুখানুভূতি সেই অনুভূতিই নির্বাণ স্বরূপ। বোধিচিত্তে রমণজাত সুখানুভূতি স্থায়ী করা যায় মন্ত্রশক্তির সাহায্যে। আর চিত্ত বজ্র-কঠিন হলে ইন্দ্রিয়শক্তি দমন সম্ভব। কথাটা সঠিক বোধগম্য নয়। রমণজাত সুখানুভূতির উদয় হয় ইন্দ্রিয়শক্তির কারণে। সেই সুখানুভূতি তবে ইন্দ্রিশক্তির দমনে আর থাকছে কোথায়? আর সেই সুখানুভূতি স্থায়ী করলে ইন্দ্রিয়শক্তি দমন হয় কী করে? যাই হোক বজ্রযানীরা সাধারণ মানুষকে তাই বোঝালো।

এই সুখানুভূতির সময় নাকি নানা দেব-দেবীর মূর্তি সাধকের কল্পনায় উদয় হয়। সেই সব দেব-দেবীর ধ্যানে নিমগ্ন থেকে বোধিচিত্তকে স্থির রেখে নাকি বোধিজ্ঞান লাভ হয়। খুবই কষ্টকল্পিত ব্যাপার। যাই হোক্, এই হচ্ছে বজ্রযানীদের নির্বাণ মার্গ।

আর এক বিশেষ তন্ত্রসাধনাকে বলা হলো সহজযান তন্ত্র। বজ্রযানে অসংখ্য দেব-দেবীর কথা থাকলেও সহজযানে এইসব কিছু নেই। মন্ত্র, মুদ্রা, পূজা, আচার-অনুষ্ঠানে ঠাসা বজ্রযানের সাধনমার্গ। কিন্তু সহজযানে এই সব কিছু নেই। সহজযানে পূজা, আচার-অনুষ্ঠানের কোন মূল্য নেই। তাদের কাছে মন্ত্র, মুদ্রা, সাধনা, সন্ন্যাস ইত্যাদিও অর্থহীন। কোন রকম দেব-দেবীও তারা মানে না। তাদের সাধনা হচ্ছে শরীর নিয়ে। দেহবাদ ও কায়াবাদী তারা। জ্ঞান লাভ করতে হবে দেহের মধ্যে। দেহের রমণ সুখানুভূতিকে শরীরের ঊর্দ্ধে স্থিত মাথার তালুতে তুলে আনলে মহাসুখের মধ্য দিয়ে 'পরম সত্য' উপলব্ধি করা যায়। মহাসুখানুভূতি বোধি-চিত্তকে স্থির করে বোধিজ্ঞান প্রদান করে। সিদ্ধাচার্যরা একে বলে চৈতন্যের উদয়। এইভাবে সহজপথে নাকি বুদ্ধত্বলাভ করা যায়, বলল তারা।

এতে সহজযানীরা বোধিচিত্তকে স্থায়ী করার কথা বলল কোথায়? রমণজনিত যে সুখানুভূতি তার স্থায়িত্বকাল অতি সামান্য। এই সামান্য ক্ষণে পরমসত্য উপলব্ধি করা কি সম্ভব? সুতরাং মন্ত্রযানের ও বজ্রযানের নানা অনুষঙ্গ বাদ দিলেও সহজযানীরা হেঁয়ালির মধ্যেই রইল।

মহাযানী তন্ত্রসাধনায় আরও একটি নতুন তন্ত্রসাধনার উদ্ভব হলো। এটাকে বলা হলো 'কালচক্রযান'। তিব্বতে এই সাধনা বৌদ্ধধর্মের অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত। তিব্বতের দলাই

লামা (যাকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়) এই সাধনায় নাকি সিদ্ধ তান্ত্রিক সাধক। তিব্বতীরা এই কালচক্রযানে বিশ্বাসী। মহাযানী ধর্মদর্শন তিব্বতে প্রবেশ করলে পরবর্তীকালে মহাযানী তন্ত্রসাধনাও সেখানে বুদ্ধের ধর্মের অঙ্গ হিসাবে প্রচলিত হয়।

এইভাবে সিকিম, ভূটান, নেপাল, তিব্বত, লাদাক ও পরবর্তীকালে আসাম এবং বাংলায় বুদ্ধের সঠিক ধর্মদর্শনের পরিবর্তে মহাযানী তন্ত্রসাধনা প্রবলভাবে বিস্তার লাভ করে। সিকিম, ভূটান, লাদাক, নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি দেশের বৌদ্ধ মন্দিরে বুদ্ধের মূর্তির সঙ্গে তান্ত্রিক দেব-দেবীর মূর্তিরও পূজা হয়। বজ্রযান ও সহজযানের মৈথুন মূর্তিও সেই সব মন্দিরে পূজা পাচ্ছে। বুদ্ধমূর্তির আসনও সেখানে তান্ত্রিক রীতিতে পদ্মাসনে উপবিষ্ট। বুদ্ধের ধ্যানী মূর্তি এই সব মন্দিরে বিরল।

যাক সে কথা, এবার কালচক্রযান নিয়ে বলি। এই তন্ত্রসাধনায় বলা হয়েছে অতীত, বর্তমান ও ভবিষ্যৎ নিয়ে গঠিত কাল বা সময়ের চাকা চিরন্তর ঘুরে চলেছে। এই আবর্তে কাল বা সময় সব কিছু সৃষ্টি করে চলেছে। এই তন্ত্রসাধনার মূল উদ্দেশ্য হলো কালের এই চক্রকে স্তব্ধ করে দেওয়া। এর ফলে জন্ম-মৃত্যু রুদ্ধ হবে। পুনর্জন্ম আর থাকবে না। এটাই নির্বাণ। তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে প্রাণক্রিয়া রোধ করতে পারলে কালকেও স্তব্ধ করা সম্ভব। এটাকেই বলা হয় কালচক্রযান।

এইসব তন্ত্রসাধনার মধ্যে কেবল মন্ত্রযান হচ্ছে মন্ত্রের জোরে বাইরের শক্তিকে বশ করার উপায়। বাকিগুলো হলো মুক্তির পথ। হঠযোগের মাধ্যমেই সব কটি সাধনা।

কথা হচ্ছে, মহাযানীরা তন্ত্রসাধনার উদ্ভব করল কেন? মহাযানীদের মধ্যে পূর্বে বহু দিকপাল দার্শনিক থাকলেও পরের দিকে সেইরূপ জ্ঞানীগুণী পন্ডিতদের খামতি দেখা দিল। তাছাড়া, বহু জনগোষ্ঠীর মানুষ বৌদ্ধধর্মে একসময় প্রবেশ করলো রাজানুগ্রহের জন্যে। বেদে, হাড়ি, ধীবর, কর্মকার, চর্মকার, শুঁড়ি, ডোম, তেলি, কাঠুরে, চন্ডাল, মেথর, শবর ইত্যাদি নানা শ্রেণীর মানুষ দীক্ষা নিল এই ধর্মে। তারা নিয়ে এলো তাদের প্রাচীন ধর্মীয় বিশ্বাসগুলোকে। তাদের মধ্যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণাগুলো নতুন ধর্মে এসেও তারা ছাড়তে পারলো না। প্রাচীন বৃক্ষ পূজা, লিঙ্গযোনি পূজা, ভূত, প্রেত, পিশাচ, যক্ষ, রক্ষক, ডাকিনী-যোগিনী, দিকপাল, ভুমিপূজা, গৃহদেবতা পূজা প্রভৃতি তারা ছাড়তে পারলো না কুসংস্কার ও ভয়ভীতির কারণে। এই সব নব্য-বৌদ্ধদের প্রাচীন বিশ্বাস ও প্রথাগুলোকে উপেক্ষা করলে পাছে তারা ধর্মত্যাগ করে, সেই চিন্তা করে মহাযানীরা একসময় এগুলোকে বৌদ্ধধর্মে ঢুকিয়ে নিল। তাছাড়া, ধর্মকে 'পপুলার' করার উদ্দেশ্যেই তো মহাযানীদের উদ্ভব।

এই সকল মানুষ সংখ্যায় ভারী হলেও তাদের সীমিত জ্ঞানে বুদ্ধের ধর্ম বোঝা নাকি সম্ভব নয়। আর তারা চাইল ধর্ম যেন তাদের ভয়-ভীতি অতিক্রমে তাৎক্ষণিক শক্তি জোগায়। এই সব চিন্তা করে মহাশক্তি লাভের আশায় মহাযানীরা দ্বিতীয় শতকে তন্ত্র-সাধনার উদ্ভব

ঘটালো। মন্ত্র, যাদু, বশীকরণ ও যৌনতা ধর্মের নামে ভালই চলল। সাধারণ মানুষ তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে বৌদ্ধধর্মে আকৃষ্ট হলো। প্রথম দিকে তন্ত্রসাধনা ছোট আকারে উদ্ভব হলেও পরবর্তীকালে তন্ত্রসাধনা প্রবল হয়ে সারা দেশে দেখা দিল ও বুদ্ধের আসল ধর্ম শুধুমাত্র দেশের জ্ঞানী-গুণীদের মধ্যে সীমাবদ্ধ হয়ে গেল। বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী, জগদ্দল ও সোমাপুরী বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ছিল মহাযানী তন্ত্রসাধনার পীঠস্থান। বৌদ্ধ তন্ত্র-সাধনা এই দেশ থেকে বিদেশেও পাড়ি দিল।

তিব্বতী সূত্রে উল্লেখ পাই যে খৃষ্টীয় সপ্তম শতকে মহাযানী তন্ত্রসাধনা বাংলাদেশে আত্মপ্রকাশ করে ধর্মকীর্তির সময়ে।

পরে মহাযানী তন্ত্রসাধনা বাংলার অন্যান্য ধর্মেও প্রবেশ করে। যথা, বৈষ্ণব ধর্মে, শৈব ধর্মে ও শাক্ত ধর্মে। জোড়া-দেউলে পাওয়া বজ্রযোগিনীর মূর্তি, শিব-দুর্গার আলিঙ্গন মূর্তি, শিবের কোলে সুখাসনে আলিঙ্গন-বদ্ধা হাস্যময়ী উমার মূর্তি, উমা-মহেশ্বরের মিলিত অর্ধনারীশ্বর মূর্তি, বটুক ভৈরবীয় শিবের মূর্তি (উলঙ্গ, খড়ম পরিহিত পা, কুকুর সঙ্গী, নরমুন্ডশোভিত, বিকট হাস্যমুখ ইত্যাদি) সবই তান্ত্রিক ধ্যান ও কল্পনায় সৃষ্ট দেবতা। তাছাড়া রয়েছে তারা, যোগিনীচক্র, চক্রেশ্বরী মূর্তি, জাঙ্গুলি ইত্যাদি তান্ত্রিক মূর্তি। উগ্রচন্ডী, চন্ডনায়িকা, চন্ডরূপা, চন্ডা প্রভৃতি যে সব মূর্তি বাংলায় পাওয়া গেছে তাদের মধ্যে বজ্রযানী প্রভাব স্পষ্ট। নীলপদ্ম ও নরমুন্ড শোভিত উগ্রতারার মূর্তি মহাযানী দেব-দেবীর কথাই মনে করিয়ে দেয়। রুদ্রচামুন্ডা, সিদ্ধ চামুন্ডা মূর্তিগুলো তান্ত্রিক ধ্যান কল্পনায় পাওয়া। শবাসনা দেব-দেবীর মূর্তি তো তন্ত্রসাধনার কথাই বলে।

পশ্চিমবঙ্গের সোনারপুর থানার অন্তর্গত সুভাষগ্রাম রেল ষ্টেশনের কাছে পীতাম্বরীর মাঠে যে 'হাড়ি ঝি চন্ডী' দেবীর মূর্তি রয়েছে, সেটা বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী 'হারিতি'। দক্ষিণ চব্বিশ পরগণার নানাস্থানে নারায়ণী, বিশালাক্ষী, দীপলক্ষী চন্ডী মূর্তিগুলো সবই বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেব-দেবী অন্যভাবে পূজা পাচ্ছে। কালীও তান্ত্রিক মূর্তি, কারণ কালী আদ্যাশক্তি রূপে অতি শূন্যতারূপ পুরুষের সঙ্গে মৈথুন সৃষ্টির রূপ বিশেষ। নৈরাত্মা ও বজ্রযোগিনী, বজ্রযান বৌদ্ধ তান্ত্রিকদের দেবী। তাই পরবর্তীকালে কালী ও ছিন্নমস্তা হয়েছে। বজ্রযোগিনী মূর্তিও ভিন্নভাবে পূজা পাচ্ছে এই দেশে। বুড়োশিব (বুড়োশিব > বৃদ্ধশিব > বুদ্ধশিব) ও বৌদ্ধ দেবতা। বুদ্ধ-পূর্ণিমায় এই মূর্তির পূজা হয়। কঙ্কণদীঘির প্রাচীন বরাহি দেবীর মূর্তি (এক হাতে অস্ত্র ও এক হাতে ভিক্ষাপাত্র), বরাহ মুখের পেট মোটা প্রায় নগ্না নারী মূর্তিটিও বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবী। ধর্মঠাকুরও বৌদ্ধ তান্ত্রিক দেবতা। মৎস্যজীবীদের দেবতা মাকালঠাকুর, বৌদ্ধ স্তূপের প্রতীক দেবতা। দক্ষিণ রায় ঠাকুর ছিলেন বৌদ্ধ তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্য। 'চব্বিশ পরগণা—হাজার বর্ষ পূর্বে' প্রবন্ধে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় এইসব দেব-দেবী নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন। বৌদ্ধতন্ত্রের দেব-দেবীরা পৌরাণিক ধ্যান-ধারণায় মিশে গিয়ে এখন

লোকসমাজে পূজ্য হয়েছে। এক এক দেব-দেবীর পূজা এক এক রকম। বিশালাক্ষী দেবীর পূজা হয় মদ, মাংস, পোড়া মাছ ইত্যাদি দিয়ে।

এইভাবে বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনা বৈষ্ণব ধর্ম, শৈব ধর্ম ও শাক্ত ধর্মে ঢুকে যায়। তন্ত্রসাধনাই তখন মুক্তির একমাত্র পথ। বাংলায় তখন তন্ত্রসাধনার জোয়ার বইছে।

বিক্রমপুরের বৌদ্ধ বিহারে ছিলেন তখন সুপ্রসিদ্ধ আচার্য কুমারচন্দ্র। ইনি তান্ত্রিক টীকা গ্রন্থ লিখেছিলেন। প্রসিদ্ধ তন্ত্রাচার্য তৈলপাদ ছিলেন চট্টগ্রামের 'পণ্ডিত বিহারে'। এই বিহার ছিল তৎকালে তন্ত্রসাধনার প্রধান কেন্দ্র। বগুড়ার ও কৃষ্ণনগরের বৌদ্ধবিহারও ছিল তন্ত্রসাধনার অন্যতম কেন্দ্র। ইতিহাসে বলা হয়েছে, তৎকালে চুরাশি জন তন্ত্র সিদ্ধাচার্য এই দেশে ছিলেন। এঁদের মাধ্যমেই মহাযানী তন্ত্রসাধনার বিকাশ। তন্ত্রসাধনার বইও তাঁরা রচনা করেছিলেন। সেই সব বই এই দেশে বর্তমানে না থাকলেও তাঁদের তিব্বতী অনুবাদ এখনো তিব্বতে আছে। বাংলায় তন্ত্রসাধনার রমরমার স্থায়িত্বকাল আনুমানিক নবম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে। তার পরে এই সাধনা সম্পূর্ণটাই গুহ্যসাধনার আড়ালে চলে গেল। বজ্রযানী দেব-দেবীর পূজাও একসময় স্তিমিত হয়ে এলো। রইল শুধু দেহগত সাধনা আর হঠযোগ।

তন্ত্রসাধনা গুহ্যতত্ত্বের আড়ালে চলে যাওয়ার প্রকৃষ্ট উদাহরণ হচ্ছে ১৯০৭ সালে পন্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের নেপালে পাওয়া তালপাতার একটি পুঁথি যার নাম 'চর্যাগীতিকোষ'। এই পুঁথিটির সঙ্গে ছিল মুনিদত্ত নামে এক বৌদ্ধ পন্ডিতের টীকা। এই টীকার সাহায্যে পুঁথিটির পাঠোদ্ধার সম্ভব হয়। পুঁথিটিতে পঞ্চাশটি পদ ছিল, কিন্তু সাড়ে তিনটি পদ নষ্ট হয়ে যাওয়ায় সাড়ে ছেচল্লিশটি পদ পাওয়া যায়। ভাষাতাত্ত্বিকরা বলেছেন গ্রন্থটি আদি বাংলা ভাষার কাঠামোর উপর প্রতিষ্ঠিত, যদিও প্রচুর সৌরসেনী প্রাকৃতের অপভ্রংশ ও আঞ্চলিক অসমিয়া, উড়িয়া, মৈথিলি ও নেপালি কিছু কিছু শব্দও এই গ্রন্থের ভাষার মধ্যে রয়েছে। মোট চব্বিশ জন সহজযানী ও বজ্রযানী কবিরা মিলে গ্রন্থের পদগুলো রচনা করেন। ভাষাতত্ত্ববিদ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় পদগুলোর রচনাকাল বলেছেন আনুমানিক খৃষ্টীয় দশম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে। পন্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ণও সেই মত পোষণ করেন। ডঃ শহীদুল্লাহ কিন্তু বলেছেন দ্বাদশ শতাব্দীতে পদগুলোর রচনা শুরু হয়। তবে বাংলায় বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার বিবর্তন ও চর্যাপদে পদের বিষয়বস্তুর পরিবর্তন থেকে বোঝা যায় পদগুলোর রচনা শুরু হয় দশম শতাব্দীতে ও শেষ হয়েছে খুব সম্ভবত খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর পরে।

তান্ত্রিক মার্গগুলো কীভাবে চর্যাগীতিকোষে গুহ্য হয়ে টিকে রইল তা বুঝতে হলে চর্যাগীতিকোষ (চর্যাপদ) থেকে কিছু উদ্ধৃতি দরকার।

"কুলেঁ কুলেঁ মা হোইরে মূঢ়া উজূবাট সংসারা।
বাল ভিণ একুবাকু ণ ভূলহ রাজপথ কান্ধারা।।
মায় মোহ সমুদারে অন্ত ন বুঝাসি থাহা।
আগে নাব ন ভেলা দীসই ভন্তি ন পুচ্ছাসি লাহা।।
সূনাপান্তর উহ ন দীসই ভান্তি ন বাসসি জান্তে।
এষা অটমহাসিদ্ধি সিঝই উজ বাট জায়ন্তে।।"

অর্থাৎ— হে মূঢ়, কূলে কূলে ফিরিও না। সংসারে সহজ পথ আছে। সম্মুখে যে মায়া-মোহের সমুদ্র তাহার যদি না বোঝ অন্ত, না পাওয়া যায় থৈ, সম্মুখে যদি না দেখা যায় ভেলা বা কোন নৌকা, তবে এ-পথের যাঁরা অভিজ্ঞ পথিক, তাঁদের কাছে সন্ধান জানো। শূন্য প্রান্তরে যদি না পাও পথের দিশা, তবে ভ্রান্ত হয়ে এগিয়ো না। সহজ পথে চল, তাহলেই পাবে অষ্টমহাসিদ্ধি।

সহজযান সাধনার মাধ্যমে মায়া-মোহময় সংসার থেকে মুক্তির জন্য অষ্টমহাসিদ্ধির (অষ্টাঙ্গিক মার্গ) কথা বলা হয়েছে উপরের পদগুলোতে, তার জন্যে সহজযান সাধনাই সহজ উপায় (উজবাট জায়ন্তে)। এই গুহ্যতত্ত্ব লুকানো রয়েছে এই অনবদ্য কবিতাটির মধ্যে।

"টালত ঘর মোর নাহি পড়বেষী।
হাড়ীত ভাত নাঁহি নিতি আবেশী।।
বেংগ সংসার বাড়হিল জাঅ।
দুহিল দুধু কি বেন্টে যামায়।।"

অর্থাৎ—টিলার উপরে আমার ঘর। নেই কোন প্রতিবেশী। হাঁড়িতে ভাত নাই, অথচ নিত্য অতিথির আগমন হয়। ব্যাঙের সংসার বেড়েই চলেছে। দোয়া দুধ বাঁটে চলে যাচ্ছে।

তন্ত্রসাধনার টানে প্রচুর মানুষ আসছে, যদিও সবাইকে পথ দেখানোর গুরুর অভাব। মরণশীল জগতে যেখানে জন্মই দুঃখের (বৌদ্ধদর্শন) সেখানে ব্যাঙের সংসারের মতো জন্ম হয়েই চলেছে। "দুহিল দুধু কি বেন্টে যামায়" (দোয়া দুধ বাঁটে চলে যাচ্ছে) অর্থাৎ শূন্য। মহাযানী শূন্যবাদ এই লাইনে প্রচ্ছন্ন রাখা হয়েছে। তন্ত্রসাধনা যে স্তিমিতপ্রায় তাও রয়েছে প্রথম পদটিতে।

এমনি অনেক ছত্রে মহাযানী তন্ত্রসাধনা ও বৌদ্ধদর্শনের কথা লুকানো রয়েছে। তন্ত্র ও বৌদ্ধ ধর্মদর্শন না জানলে সেগুলো কবিতার মধ্যে সহজে খুঁজে পাওয়া যাবে না। কবিতাগুলোর আসল স্বাদও তবে পাওয়া সম্ভব নয়। প্রচ্ছন্ন রাখার এই ভাষাটিকে বলা হয় 'সন্ধ্যা ভাষা'। সন্ধ্যা শব্দটি সম + ধৈ ধাতু থেকে এসেছে অর্থাৎ 'যার অর্থ সম্যক ধ্যানে বুঝতে হয়।'

রূপক ও জীবনচিত্রের সাহায্যেও তত্ত্বকথা ব্যক্ত করা হয়েছে, যেমন—

'দেহ যেন নৌকা, মন তার দাঁড়' (বোধিচিত্ত সম্বন্ধে বলা হয়েছে), 'মাতাল হাতী পদ্মবনে প্রবেশ করে সব তছনছ করে ফেলেছে' (তন্ত্রের মাধ্যমে ইন্দ্রিয়ের দমন), 'শবর-শবরী মদ খেয়ে মত্ত হয়ে উঠেছে' (পুরুষ-প্রকৃতির মিলনে নির্বাণ প্রাপ্তি), 'গভীর জঙ্গলে শিকারীরা 'মার, মার' বলে হরিণের পিছনে ধাওয়া করেছে। বেচারা হরিণ প্রাণ ভয়ে ছুটেছে, কারণ সে জানে তার শরীরই তার পরম শত্রু' (দেহের সাথে শূন্যতার মিলন ছাড়া দেহের কোন মূল্য নাই। দেহ মা'র-এর মতো), 'শুঁড়ির মেয়ে জালায় করে মদ বিক্রি করছে' (তন্ত্রসাধনার প্রচার), 'অর্দ্ধরাত্রি ধরে পদ্মফুল ফুটে রইল' (বজ্রযানে বোধিচিত্তের দীর্ঘক্ষণ স্থায়িত্ব), 'দাবা খেলায় রাজাকে মাত করা হয়েছে'. (সহজযানে মহাসুখ প্রাপ্তি), 'নদী পারাপারের জন্য ছুতোর ও কাঠুরে কাঠ কেটে মাপ করে পাটাগুলিকে জুড়ে সাঁকো বানাচ্ছে' (তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে পরমসত্যের জন্য প্রস্তুতি)।

এই ভাবে একসময় মহাযানী তন্ত্রসাধনা বাংলায় গুহ্যতত্ত্ব হয়ে গুহ্য সাধনার আড়ালে চলে গেল।

তন্ত্রসাধনায় বুদ্ধের নির্বাণ ও পরমপ্রাপ্তিকে মহাযানীরা নিজেদের মতো করে সহজ করে নিলেও সেগুলো শুধু বাংলায় নয়, সবখানে, একসময় লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেল। এই দেহগত সাধনা আর হঠযোগ কেবল তান্ত্রিকদের মধ্যেই রইল। সিদ্ধাচার্যরা দেহগত সাধনা বা কায়সাধনার উপরে বিশেষ প্রাধান্য দিলেন। বাকি মন্ত্রযান ও বজ্রযান বাদ গেল। আবার পুরনো সহজযানেরও পরিবর্তন ঘটলো।

সিদ্ধাচার্যরা বললেন, বোধিচিত্তকে শরীরে ঊর্দ্ধমুখী করে মাথার ব্রহ্মতালুতে তুলতে পারলে যে কাঠিন্য (বজ্র) জন্মে, সেটাই চিত্তের চঞ্চলতা দূর করে মহাসুখ রূপ পরমসত্যে উপনীত করে। সিদ্ধাচার্যরা এই সাধনার কথা বললেন। শরীরের বত্রিশটি নাড়ীর নামও তাঁরা দিলেন, যেমন ললনা, রসনা, অবধূতি, প্রভনা, কৃষ্ণরূপিণী, সামান্যা, পাভকা, সুমনা, কামিনী ইত্যাদি। এঁদের মধ্যে ললনা, রসনা ও অবধূতি হলো প্রধান। ললনা ও রসনাকে আবার অনেক ক্ষেত্রে ঈড়া ও পিঙ্গলাও বলা হয়। অবধূতি হচ্ছে মধ্যমা নাড়ী যাকে সুসুমাও বলা হয়।

সিদ্ধাচার্যরা শরীরের কিছু বিশেষ বিশেষ স্থানকেও চিহ্নিত করলেন। পদ্ম বা চক্রের সঙ্গে তাদের তুলনা করলেন। সর্বোচ্চ স্থানকে বলা হলো 'মহাসুখ স্থান'। এই সর্বোচ্চ স্থান (মাথার ব্রহ্মতালু) চিত্তকে পৌঁছতে হলে শরীরের নানা স্থানের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়।

'মহাসুখ স্থান'কে কল্পনা করা হলো সহস্র বা চৌষট্টি পাপড়ির পদ্মের সঙ্গে। চর্যাগীতিকোষে (চর্যাপদ) দেখি এই মহাসুখ প্রাপ্তিকে সন্ধ্যা ভাষায় বলা হয়েছে ঃ—

'এক সো পদুমা চৌষট্ঠি পাখুড়ী।
তাঁহি চড়ি নাচঅ ডোম্বী বাপুড়ী।।'

অর্থাৎ— চৌষট্টি পাপড়ির পদ্মের উপর দাঁড়িয়ে ডোমনি নাচছে।

সিদ্ধাচার্যরা শরীরের বিভিন্ন স্থানকে আবার উল্লেখ করলেন তীর্থক্ষেত্র হিসাবে যেমন উড্ডিযান, জলন্ধর, পূর্ণগিরি ও কামরূপ। তীর্থক্ষেত্রকে প্রাধান্য না দিয়ে কায়সাধনার মাধ্যমে মুক্তির কথা বলতেই এই সব নামের উদ্ভব। সাধনার মাধ্যমে পরমলক্ষ্যে পৌঁছানোর 'সহজ' অবস্থাই মহাসুখ। এই সুখের আদি অন্ত নাই ও সমস্ত রকম সংশয় উত্তীর্ণ এই স্থানে পৌঁছতে পারলে বস্তুজগৎ দূর হয়ে সাধক সত্যের সম্মুখীন হয়। সংক্ষেপে এই হচ্ছে সিদ্ধাচার্যদের কায়সাধনা বা নব্য সহজিয়া সাধনা বা নব্য সহজযান তন্ত্র। পুরনো সহজযান তন্ত্রের করুণা ও শূন্যতার মিলন এখানে বাদ গেল। রইল শুধু বোধিচিত্ত।

নর-নারীর দৈহিক মিলনের মধ্য দিয়ে সুপ্ত কুলকুন্ডলিনীকে নাভি থেকে জাগ্রত করে ঊর্দ্ধমুখী করে সুসুমা বা অবধূতি নাড়ির মাধ্যমে ব্রহ্মতালুতে উপনীত করতে পারলে সহস্রদল বা চৌষট্টি পাপড়ির পদ্মের বিকাশ হয়। অর্থাৎ স্থির চিত্তে মহাসত্যের উদয় হয়।

শরীরের নিম্নভাগে রয়েছে 'মণিপুর' চক্র বা 'নির্মাণ' চক্র। এটা রয়েছে নাভি স্থানে। 'অনাহত' চক্র বা 'ধর্মচক্র' রয়েছে শরীরের মাঝামাঝি, হৃদপিন্ডের কাছে। 'মহাভোগ' চক্র রয়েছে হৃদপিন্ডের উপরে, ঘাড়ের কাছে। আর ব্রহ্মতালু হচ্ছে 'উষ্ণীষকমলা'। এটাই হচ্ছে পরমসত্য উপলব্ধির স্থান বা 'মহাসুখ' স্থান।

সুপ্ত মহাজাগতিকশক্তি বা কুলকুন্ডলিনীকে বলা হয়েছে ভয়ঙ্কর 'চন্ডালি'। সিদ্ধাচার্যরা বললেন, এই চন্ডালি সুপ্ত রয়েছে প্রতিটি মানুষের মধ্যে তার 'নির্মাণ' চক্রে। এই শক্তিকে মৈথুনের দ্বারা জাগ্রত করে নাড়ির মাধ্যমে উষ্ণীষকমলায় আনার জন্যেই তন্ত্রসাধনা।

আবার কিছু তান্ত্রিক সিদ্ধাচার্যরা বলেন, নাড়ির মাধ্যমে শরীরের দুই দিকে দুই স্রোত চিরন্তন বয়ে চলেছে। বাম দিকের স্রোতকে বলা হলো 'গঙ্গা' বা প্রজ্ঞা (নারী)। এটাকে চন্দ্রের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। ডান দিকের স্রোতটি হলো 'যমুনা' বা উপায় (পুরুষ)। এটাকে সূর্যের সঙ্গেও তুলনা করা হয়েছে। সাধক এই দুই স্রোতকে মিশিয়ে দিয়ে (প্রজ্ঞা উপায় একাকার) মধ্যনাড়ি অবধূতির মাধ্যমে স্রোতটিকে মহাসুখ স্থানে পৌঁছায়।

বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার এই প্রজ্ঞা ও উপায় পরবর্তীকালে ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রসাধনায় শিব ও শক্তিতে রূপান্তরিত হলো। বিজ্ঞান বলে, শূন্যতার মধ্যেও শক্তি প্রবাহ থাকে। তাই শূন্যতা শেষ কথা নয়। উপনিষদ বলে এরই নাম পর-ব্রহ্মণ বা অতিশূন্যতা। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রসাধনায় এই পর-ব্রহ্মণ হচ্ছে পুরুষ। এই পুরুষের সঙ্গে যখন শক্তির মৈথুন হয়, তখন প্রচন্ড বিস্ফোরণে অণু-পরমাণু সৃষ্টি হয়ে নতুন জগৎ গড়ে ওঠে। এই মিলনেই জগতের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব।

মৈথুনের মধ্যে দিয়ে যে লয় হবে, তাতেই হবে অনিত্যতার লয়। বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনায় পুরুষ বা সাধকের ভূমিকাটিই মুখ্য, আর নারী হচ্ছে তার সাহায্যকারী। আর ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রে নারীই হচ্ছে মুখ্য ও শক্তির প্রতীক, আর পুরুষ বা সাধক তার জোরেই সিদ্ধিলাভ করে। সহজিয়া বৈষ্ণব সাধকরা সহজযান বৌদ্ধ তান্ত্রিকতাই নিল। তারা পরমসত্য উপলব্ধিকে বলল 'চৈতন্যের উদয়'।

বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনায় শরীর হচ্ছে পরমসত্যের আগার। এই শরীরের মধ্যেই মহাজাগতিক সত্য ও শক্তি লুকিয়ে রয়েছে। মহাযানীরা বলে এই সত্য ও শক্তি তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে সহজে উপলব্ধি করা যায়। পরবর্তীকালে সহজিয়া দর্শনেও এই কথা বলা হলো। ব্রাহ্মণ্য তন্ত্রসাধনায়ও তাই বলা হলো। তারা বলল মানব দেহে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের রূপ রয়েছে। দেহের ব্রহ্মরন্ধ্রে(চূড়ায়) শক্তি স্থির হয়ে থাকে। পরে সেই শক্তি যখন চূড়া থেকে নীচে নামে, তখন স্নায়ুগুলো ভাঙতে থাকে ভাঁটার টানে। দেহে জরা দেখা দেয়।

কিন্তু যারা শক্তি ও পুরুষের মিলনে প্রাণশক্তিকে বা কুলকুন্ডলিনীকে ব্রহ্মরন্ধ্রে নিয়ে যেতে পারে, তবে সেই প্রাণশক্তি চূড়ায় এসে মহাশূন্যে (পর-ব্রহ্মণ) লীন হয়। এতে চিৎশক্তি ও দেহ লুপ্ত হয়। এই প্রাণশক্তিতে সাধক দিব্যদৃষ্টি পায়। সে নানা দেবদেবী দেখে। বৌদ্ধ তান্ত্রিকরাও তাই দেখেছেন।

তান্ত্রিকদের কাছে মৈথুন অপেক্ষা আধ্যাত্মিক অন্য কোন শ্রেষ্ঠ তত্ত্ব নেই। মৈথুন হচ্ছে সৃষ্টি, স্থিতি ও লয়ের কারণ। মৈথুন ছাড়া সৃষ্টি নাই। আর মৈথুনই প্রাণশক্তিকে একের থেকে অন্যের মধ্যে প্রদান করে জীবনকে চালু রাখে। তাই বলা হয়—'মৈথুনং পরম তত্ত্বং'।

বৌদ্ধধর্ম শাস্ত্র বিনয়পিটকে আছে বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষু ভরদ্বাজ নাকি একবার অলৌকিক শক্তিতে শূন্যে উপরে উঠে গাছ থেকে ভিক্ষাপাত্র নামিয়ে এনেছিলেন। তাছাড়া, বুদ্ধ নিজে নাকি একবার শ্রাবস্তিতে কিছু অলৌকিক শক্তি দেখিয়েছিলেন। পরে তিনি এইরূপ শক্তি দেখাতে শিষ্য-শিষ্যাদের বারণ করেছিলেন। বলেছিলেন, ধ্যানে বসলে প্রাথমিক স্তরে এই শক্তি এলেও এতে মানুষ পরমসত্যে পৌঁছতে পারে না। এই শক্তি লাভের জন্য ধ্যান নয়। ধ্যান করতে হবে নির্বাণের জন্য। জন্ম-মৃত্যুর অবসানের জন্য। সেই ধ্যান কেমন হবে তাও বুদ্ধ বলেছেন। বুদ্ধের দর্শনে তাই তন্ত্রের স্থান নেই।

কিন্তু পরবর্তীকালে বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর কিছু মহাযানী ভিক্ষুরা তাৎক্ষণিক শক্তিলাভের জন্য কিছু কিছু বৌদ্ধবিহারে গোপনে তন্ত্রসাধনা করতে লাগলেন। এইসব ভিক্ষুরা গোপনে 'গুহ্যসমাজ' নামে নিজেদের দলও গড়লেন। তাঁরা তন্ত্রসাধনার উপর সংহিতার আকারে 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' নামে গ্রন্থও লিখলেন। আচার্য ভিক্ষু অসঙ্গ খৃষ্টীয় তৃতীয় বা চতুর্থ শতকে এই গ্রন্থের অনুকরণে 'প্রজ্ঞাপারমিতা' নামে গ্রন্থও লিখলেন। তবে এই দুই গ্রন্থের পূর্বেও

বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ ছিল। 'মঞ্জুশ্রীমূলকল্প' গ্রন্থটি লেখা হয় এই দুই গ্রন্থের পূর্বে, খুব সম্ভবত খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে। এই গ্রন্থের অনুকরণেই 'গুহ্যসমাজতন্ত্র' গ্রন্থটি লেখা হয় আনুমানিক খৃষ্টীয় তৃতীয় শতকে। সুতরাং বলা যায় মহাযানী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে তন্ত্রসাধনা চালু হয় খুব সম্ভবত খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতকে। সেটা তখন অবশ্য সুপ্তই ছিল। পরে সেটা প্রবল আকারে আত্মপ্রকাশ করে। বৌদ্ধধর্মে তান্ত্রিকতা এলে নানা দেবদেবী ও বুদ্ধমূর্তি পূজাও এই ধর্মে এসে গেল। ফলে বৌদ্ধধর্ম তার স্বকীয়তা হারালো ও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের কাছে এসে গেল।

মহাযানী সিদ্ধাচার্যদের দেহবাদ বা কায়সাধনা বাংলায় গোড়াপত্তন করেন উড্ডিয়ানের রাজা ইন্দ্রভূতির বোন লক্ষ্মীঙ্কর দেবী। ইনি বললেন মূর্তিপূজা, উপবাস, স্নান, কৃচ্ছ্রসাধনা, ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান ও সামাজিক বিধি-নিষেধ ইত্যাদির কোন মূল্য নেই। এতে 'মোক্ষ' লাভ হয় না। 'সত্য' লাভের জন্য কোনরূপ বাধা-নিষেধ মানা উচিত নয়। তিনি কায়-সাধনাকে 'সত্য' উপলব্ধির জন্য বিশেষ প্রাধান্য দিলেন। পরে সহজিয়াদের মতো 'নাথ-সিদ্ধ' রাও এই সাধনা গ্রহণ করলো।

বৌদ্ধ তন্ত্রসাধনার প্রভাব মুসলমান সুফী সম্প্রদায়ের মধ্যেও পড়লো। বাংলার মুসলমানদের মধ্যেও ' যোগিনী'র উদ্ভব হলো। চর্যাপদের মতো রহস্যময় গীতেরও উদ্ভব হলো সুফীদের গানের মধ্যে। বৌদ্ধ অহিংস দর্শন আগেই সুফীদের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করেছিল।

মহাযানীরা তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে নির্বাণ বা মুক্তির কথা বলল বটে, তবে কোন সিদ্ধাচার্য এইভাবে নির্বাণ প্রাপ্ত হয়েছেন বলে ইতিহাসে নজির নেই। তাঁদের কোন সাহিত্যেও তার ইঙ্গিত নেই। সিদ্ধাচার্যরা ভৈরবীদের নিয়ে দেহবাদের উপর সাধনা করতে পারেন, তাতে চরম পুলক বা মহাসুখানুভূতি প্রাপ্তিও তাঁদের হতে পারে, কিন্তু তাতে নির্বাণ লাভ হয়েছে কিনা বলা কঠিন। কোথাও কোন উল্লেখ নেই। নির্বাণ এতো সহজে লাভ করা গেলে বুদ্ধের চতুরার্য সত্য, আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ ইত্যাদি অর্থহীন হয়ে যায়। সিদ্ধার্থের কষ্টকর বোধিজ্ঞান প্রাপ্তি বা বুদ্ধত্বলাভও মূল্যহীন হয়ে দাঁড়ায়। আর বুদ্ধের ধর্মদর্শনও ভেঙে পড়ে তাসের ঘরের মতো।

মহাযানী তন্ত্রসাধনা আজও এই দেশে রয়েছে। তিব্বত, নেপাল সিকিম, ভুটান ইত্যাদি দেশেও তা বৌদ্ধদর্শনের সঙ্গে মিশে গেছে।

বাংলাদেশে তন্ত্রসাধনা লোকচক্ষুর আড়ালে গোপনেই করা হল। কী ফলপ্রাপ্তি হলো তাও তাই অপ্রকাশ্য। যদি তন্ত্রসাধনায় নির্বাণ পাওয়া যেতো তবে বুদ্ধের সঠিক দর্শন আজও টিকে থাকতো না। আজও সারা বিশ্বে এই দর্শনের এতো সমাদর হতো না। যুক্তিবাদী বিজ্ঞানানুরাগী বিশ্বের বহু মানুষ আজ এই দর্শনের দিকে ঝুঁকেছে। এই দর্শনের নির্ব্বাণ

কোন সহজলভ্য ব্যাপার নয়। ইন্দ্রিয়সুখের মাধ্যমে তা লাভ করা যায় না। আর তা প্রাপ্ত হবার অন্য কোন সহজ পন্থাও নেই। থাকলে গৌতম বুদ্ধ নিশ্চয়ই তা বলে যেতেন। তন্ত্রসাধনায় আর যাই লাভ করা যাক্ না কেন, নির্বাণ লাভ অসম্ভব। তারাপীঠ, কামাখ্যা ও সিকিম, ভুটান, নেপাল ইত্যাদি তন্ত্রসাধনার পীঠে বহু তান্ত্রিকদের সঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করেছি। তাঁরা কিন্তু কেউ তাদের ফলপ্রাপ্তি সম্বন্ধে মুখ খোলেননি।

ব্যভিচার, যৌনতার উপর সামাজিক যে বাধা, সেই সবের তোয়াক্কা না করে পুরুষ ও নারীর তন্ত্রসাধনার মাধ্যমে যে অবাধ যৌনাচার, সেটা বৃহত্তর সমাজের পক্ষে ক্ষতিকরও বটে। এইরূপ যৌনমিলনে নারী যদি সন্তানসম্ভবা হয় তবে সেই সন্তানের উপায় বা কী হবে? জীবন সহজ হবে এটাই মানুষের কাম্য। আধ্যাত্মিকতার প্রয়োজন মুক্তির উদ্দেশ্যে। আর ইন্দ্রিয়-দমন হচ্ছে আধ্যাত্মিকতার প্রথম সোপান। স্বাভাবিক প্রবৃত্তিগুলোকে দমন করে তবেই মুক্তির পথে এগুতে হয়। এটাই চিরাচরিত শুদ্ধ পন্থা। দেহগত তন্ত্রসাধনা অবস্থাভেদে অপরাধেও পরিণত হতে পারে। কারণ দেহগত তন্ত্রসাধনার যে পদ্ধতি সেটা সম্পূর্ণ কামরহিত থাকে কিনা বলা কঠিন। সেই পথ ধরে বিপথগামী হওয়াটা অসম্ভব নয়। আর সেই পথ ধরে মুক্তি যদিও হয়, সেটা জন্ম-মৃত্যু ক্ষয় নির্বাণ হতে পারে না।

দেখা যাচ্ছে, দেহগত তন্ত্রসাধনায় বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। কিছু মানুষ এই তন্ত্রসাধনার নামে সমাজে নোংরামি ডেকে আনবে। তাই এইরূপ তন্ত্রসাধনায় না গিয়ে চিরাচরিত প্রথায় মুক্তিলাভের চেষ্টা করাই ভাল।

গীতায় শ্রীকৃষ্ণও নিষ্কাম কর্মের কথা বলেছেন। তিনি বলেছেন, নিষ্কাম কর্ম দ্বারা জীব লাভ করবে অখন্ড আনন্দ, যা সকাম কর্ম দ্বারা পাওয়া অসম্ভব (গীতাঃ ৬/১২)। এই আনন্দই হচ্ছে মানুষের পরমমুক্তি বা সিদ্ধি।

'যচ্চায়ং কাময়তে স ধর্মো ন।

যো ধর্মো নিয়মস্তস্য মূলম্।।

(মহাভারত ১৮, ১৩, ১১)

'কাম কোন ধর্ম নয়, ধর্মের মূল হচ্ছে কাম-সংযম'।

এই ভাবে তন্ত্রসাধনার উদ্ভব করে মহাযানী তান্ত্রিকরা বুদ্ধের ধর্মদর্শন ও ধ্যানপদ্ধতি থেকে অনেক দূরে সরে গেল। বুদ্ধের প্রদর্শিত মার্গ ত্যাগ করে, তাঁর প্রদত্ত শীল, অষ্টাঙ্গিক মার্গ ইত্যাদি ত্যাগ করে সহজ পথে মুক্তির উপায় খুঁজতে গিয়ে মহাযানীরা তন্ত্রমন্ত্রের হেঁয়ালির মধ্যে নিজেদের পথ হারালো। ধর্মের পতনের এটাও একটা বিশেষ কারণ। তন্ত্রের নামে যে অবাধ যৌনাচার দেশে একসময় প্রচলন হলো, তা বৃহত্তম সমাজে ধিকৃত হলো।

শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্মে নয়, তন্ত্রসাধনা যে ধর্মে প্রবেশ করলো যথা, বৈষ্ণব ধর্মে, শৈব ধর্মে

ও শাক্ত ধর্মে, তা সেই ধর্মের অবক্ষয় ডেকে আনলো। ভক্তিবাদের পরিবর্তে সেই সকল ধর্মে তন্ত্রবাদই আসল হয়ে দাঁড়াল। এই ভাবে সেইসব ধর্মও বৃহত্তর জনসমাজের শ্রদ্ধা হারালো। বিশেষ করে দেহভাবগত বামাচার তন্ত্রসাধনা লোকের চোখে কদর্য বলে মনে হলো।

এইরূপ, তন্ত্রসাধনায় আর যাই হোক নির্বাণ বা পরমজ্ঞান লাভ করা সম্ভব নয়। সেটা যদি সম্ভব হতো, তবে সর্বজ্ঞ বুদ্ধ নিশ্চয়ই তা বলতেন। মহাযানীরা সহজ পথ খুজতে গিয়ে তন্ত্রের পথ ধরেছেন। তবে আধ্যাত্মিক সাধনায় সহজ পথ বলে কিছু নাই। মুক্তি সাধনার যে চিরন্তন পথ সেই পথ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নাই। বুদ্ধ সেই চিরন্তন পথেরই নির্দেশ দিয়েছেন। তাই বুদ্ধকে তথাগতও বলা হয়। সেই প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ। সেই পথ ধরে বহু মানুষ নির্বাণ লাভ করেছেন। তন্ত্রসাধনায় আর যাই হোক, বুদ্ধের প্রদর্শিত নির্বাণ লাভ করা সম্ভব নয়। বোধিজ্ঞান লাভ করার তো কথাই ওঠে না। বুদ্ধের প্রদর্শিত পথই একমাত্র পথ, তন্ত্রসাধনা নয়। বুদ্ধের ধ্যানতত্ত্বই সেই পথ দেখাবে।

বাংলায় বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয় ও অবনতি

মণিকুন্তলা হালদার দে*

বর্তমান যে ভূখণ্ড পশ্চিমবংগ এবং বাংলাদেশ নামে পরিচিত, প্রাচীনকালে সেই ভূখণ্ড বিশেষ কোন একটি নামে পরিচিত ছিল না। পশ্চিমবঙ্গের নিম্নাংশ বিশেষতঃ গঙ্গার পশ্চিমভাগ অর্থাৎ বর্ধমান-বীরভূম অঞ্চল পরিচিত ছিল সুম্প বা রাঢ় নামে, উত্তরবঙ্গের পরিচিত ছিল পুণ্ড্র নামে। বাংলাদেশের ঢাকা-ফরিদপুর এবং সম্ভবত: যশোর অঞ্চলকে বঙ্গ এবং তার নিম্নবর্তী অঞ্চলকে বঙ্গাল বলা হত। নোয়াখালি-কুমিল্লাকে সমতট এবং চট্টগ্রাম-নোয়াখালি-কুমিল্লা-শ্রীহট্ট অঞ্চল একত্রে হরিখেল নামে পরিচিত ছিল যদিও বিভিন্ন সময়ে এই নামগুলির ভৌগোলিক তাৎপর্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটেছে। যাই হোক, উপরোক্ত উল্লেখ্য অঞ্চলসমূহকে বঙ্গদেশ বা বাংলাদেশ বলে অভিহিত করা যায়। সম্ভবত: খৃ: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীর আগে থেকেই বঙ্গদেশে আর্য সভ্যতা প্রসারিত হয়েছিল। খৃ: পূ: ষষ্ঠ শতাব্দীতে গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের সময়কালে বঙ্গদেশের উল্লেখ পাওয়া না গেলেও খৃ: পূ: ৪র্থ শতকের শেষভাগের অর্থাৎ মৌর্যযুগের নিদর্শন কিন্তু বঙ্গদেশে লভ্য হয়েছে। গুপ্তযুগের মুদ্রাও বাংলাদেশে আবিষ্কৃত হয়েছে। সাধারণভাবে বলা যায় পালরাজত্বেই বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও শ্রীবৃদ্ধি ঘটেছিল।

পালপর্বে বৌদ্ধধর্ম কেবলমাত্র বাংলাদেশেই নয়, সমগ্র পূর্বভারতে অভূতপূর্ব গৌরব ও সমৃদ্ধি অর্জন করেছিল। ভারতের বাইরে আন্তর্জাতিক বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্রেও তখন বাংলাদেশ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের রূপ ও রীতি বাংলাদেশ নির্ধারণ করেছিল। অন্যদিকে যবদ্বীপ এবং সংলগ্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের দায়িত্ব বাংলাদেশই গ্রহণ করেছিল বলা যায়। কিন্তু সেখানে পালরাজাদের সময়কালে নতুন উদ্যমে বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল থেকে কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের তিরোধান ঘটেছিল কেন— তার কারণ খুঁজতে গেলে সমগ্র ভারতবর্ষের বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতির প্রসঙ্গ এসে যায়। বস্তুত: বৌদ্ধধর্মের উন্নতির কারণগুলি আলোচনা করা যতখানি সহজ, অবনতির কারণগুলি আলোচনা করা ঠিক ততখানি সহজসাধ্য নয়। একসময়ে যে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করে সমগ্র বাংলাদেশ আচ্ছন্ন করে রেখেছিল তা ক্রমান্বয়ে ক্ষীণ হতে হতে ভিন্ন রূপ পরিগ্রহ করে বৌদ্ধধর্মকে অবলুপ্তির পথে টেনে নিয়ে গিয়েছিল। এককথায়, সমগ্র ভারতবর্ষে অষ্টম শতাব্দীর মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের অবলুপ্তি শুরু হয় এবং মধ্যযুগের অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভেই ভারতবর্ষ থেকে এর প্রায় অবলুপ্তি ঘটে যায়।

---

* ড: মণিকুন্তলা হালদার দে বর্তমান বিভাগীয় প্রধান, পালি বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। প্রাবন্ধিক ও লেখিকা।

এবিষয়ে প্রধানত: চীনা পরিব্রাজকদের বর্ণনা, মধ্যযুগের ভারতীয়, সিংহলী, তিব্বতীয় ও চীনা সাহিত্যগুলি থেকে উপাদান পাওয়া যায়। অন্যদিকে উল্লেখ করা যায় যে বৌদ্ধধর্মের তিরোধান সম্পর্কে বৌদ্ধ সাহিত্যগুলি থেকে বিশেষ তথ্য লভ্য হয় না। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মিত্র দেশীয় বৌদ্ধসাহিত্যগুলির নীরবতার স্বপক্ষে যুক্তি উত্থাপন করেছেন যে বৌদ্ধধর্মের ঔজ্জ্বল্যে হয়তো বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের রূপ ঢাকা পড়ে গেছে।[১] কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্য ছাড়াও অন্যান্য দেশীয় সাহিত্যে বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের স্বপক্ষে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। পণ্ডিতবর্গের মতে বাংলার বৌদ্ধধর্মের আচার আচরণের মধ্যে গূঢ় রহস্যময় বিদ্যার অনুপ্রবেশ ঘটে পূর্বভারতে তথা বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম এক নতুন রূপ পরিগ্রহ করে ও বৌদ্ধধর্মে পরিবর্তন ঘটে যায়।[২]

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবনতির পর্যালোচনার আগে দেখা দরকার সেখানে বৌদ্ধধর্মের সঠিক অবস্থান কিরকম ছিল। দ্বিতীয় ও তৃতীয় শতাব্দীর নাগার্জুনিকোণ্ডা অভিলেখ অনুযায়ী প্রাচীনকালেও বংগদেশ বা বাংলাদেশ একটি অত্যন্ত জনপ্রিয় স্থান ছিল এবং জানা যায় যে এখানকার লোকেদের সিংহলদেশের ভিক্ষুরা বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত করেছিল।[৩] চতুর্দশ শতাব্দীর একটি কোরিয়ার অভিলেখতে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কথা বলা আছে।[৪] এছাড়া, হরিশচন্দ্রের সাভার লেখতে সর্বাগ্রে বুদ্ধের আবাহন করা হয়েছে এবং সেখানে বর্ণিত আছে যে হরিশচন্দ্রের পূর্বপুরুষগণ দশবল বুদ্ধের পূজারী ছিলেন।[৫] যদিও এবিষয়ে ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার উক্ত অভিলেখটির যাথার্থতা নিয়ে সন্দেহ প্রকাশ করেছেন।[৬] যাই হোক, উপরোক্ত লেখগুলি থেকে প্রমাণিত হয় যে সঠিক বৌদ্ধগণের অবস্থান ছিল হিন্দুসমাজের মধ্যেই।[৭]

পুনরায়, ৫ম শতাব্দীর চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েনের কথা উল্লেখ করা যায়। ফা-হিয়েন তাঁর ভ্রমণবৃত্তান্তে বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রসারতার কথা বলেছেন। অন্য চীনা পরিব্রাজক ইৎসিং পঞ্চম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে বরেন্দ্র বা উত্তরবঙ্গে বোগুড়া জেলার মহাস্থানগড়ে, বিহারিলত্র বা রাজসাহীতে বহু মহাযান দেবদেবী মূর্ত্তি প্রাপ্তির কথা বলেছেন।[৮] অষ্টম শতাব্দীর একটি শ্যামদেশীয় মূর্তিরও উল্লেখ করা যায় যাতে বাংলাদেশের প্রভাব সুস্পষ্ট। এই সময়ে শৈবধর্মাবলম্বী শাসকদেরও মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করতে দেখা গেছে। অপর চীনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ সমতট থেকে তাম্রলিপ্তি পর্যন্ত পরিভ্রমণে গিয়ে হিন্দুদের মন্দিরের পাশাপাশি বৌদ্ধবিহারগুলির অস্তিত্ব লিপিবদ্ধ করেছেন।[৯] তিনি রাজমহলের নিকটবর্ত্তী রাজস্থল, সমতট উপরন্তু শশাঙ্কের রাজ্য কর্ণসুবর্ণতে বৌদ্ধধর্মের একটি সম্প্রদায় সম্মিতীয়দের কিছু কিছু বিহার ও বৌদ্ধভিক্ষুদের অস্তিত্ব লক্ষ্য করেছেন। এখানে উল্লেখ্য যে শশাঙ্কের সময়কালেও বৌদ্ধধর্মের তিরোধান ঘটেনি।[১০] কিন্তু বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীরা সংখ্যায় ক্রমশ: হ্রাস পাচ্ছিল বলা যায় কারণ ফা-হিয়েন (৫ম শতাব্দী) যে সংখ্যার কথা বলেছেন তার থেকে হিউয়েন সাঙ (৭ম শতাব্দী) হ্রাস সংখ্যা দেখেছেন এবং পরবর্তীকালে ইৎসিং

(৯ম শতাব্দী) বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অত্যন্ত ক্ষীণ অবস্থা লক্ষ্য করেছেন। ইৎসিং বর্ণনা করেছেন যে তাম্রলিপ্তি সেই সময় সংস্কৃত বৌদ্ধশাস্ত্র শিক্ষার পীঠস্থান ছিল, ইৎসিং স্বয়ং সেখানে সংস্কৃত গ্রন্থ শিক্ষা করে চীনাভাষায় গ্রন্থগুলি অনুবাদ করেছিলেন। ইৎসিং ছাড়া অন্য দুজন চীনা বিশেষজ্ঞ যথা—তাওলিং ও তাও-তাচেং-তেং বৌদ্ধধারণী ও নিদানশাস্ত্র শিক্ষা করেছিলেন তাম্রলিপ্তিতেই। জানা যায় যে সেইসময় তাম্রলিপ্তি সর্বাস্তিবাদীদের অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে পরিগণিত হত।[১১] সমতটের সেং-তাচেং নামে অন্য একজন ভিক্ষুর নাম পাওয়া যায় যিনি সেই সময়ে সমতটের রাজার বিশেষ অনুগ্রহ লাভ করেছিলেন। সেখানকার ব্রাহ্মণ শীলভদ্র হিউয়েন সাঙের আচার্য ছিলেন। হিউয়েন সাঙ বাংলাদেশে ৭০টি বৌদ্ধবিহার এবং ৩০টি দেবমন্দির দেখেছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান থেকে মনে হয় যে ঐ সংখ্যা আরও বেশি ছিল। বিক্রমশীল ও নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান ভৌগলিক দিক থেকে বাংলার বাইরে হলেও পালসাম্রাজ্যের অন্তর্গত ছিল। দুজন বাঙালী পণ্ডিত শীলভদ্র ও অতীশ দীপঙ্কর এদের অধ্যক্ষ ছিলেন। এখানকার ওদন্তপুরী ও সোমপুরবিহার, তৈকূটক (সম্ভবতঃ রাঢ়অঞ্চলে); দেবীকোট (উত্তরবঙ্গে), পণ্ডিতা (চট্টগ্রাম), সন্নগর (পূর্বভারতে); ফুল্লহরি (মুঙ্গেরের কাছে); পত্তিকেরা (ত্রিপুরা); বিক্রমপুরী (বিক্রমপুর, ঢাকা); জগদ্দল (বরেন্দ্রীতে) বিহার সমধিক বিখ্যাত ছিল। এই বিহারগুলিতে সাধারণভাবে তিব্বতী পণ্ডিতগণ বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থাদি অনুবাদের কাজে নিযুক্ত থাকতেন। বস্তুতঃ দ্বাদশ শতাব্দী পর্যন্ত সমতটে বৌদ্ধধর্ম অত্যন্ত জনপ্রিয় ছিল।[১২] যদিও হিউয়েন সাঙের বর্ণনায় পরিস্ফুট হয় যে ব্রাহ্মণ্যধর্মের জনপ্রিয়তা বৌদ্ধধর্মকে ক্রমশঃ ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর করছিল। জানা যায় যে সেইসময় বাংলাদেশের বৌদ্ধবিহারগুলি ক্রমশঃ ধ্বংসস্তূপে পরিণত হচ্ছিল এবং জনসাধারণ নিজেদের গৃহনির্মাণের জন্য ধ্বংসস্তূপ থেকে বিভিন্ন উপকরণ নিয়ে চলে যেত।[১৩]

পরবর্তীকালে বাংলার পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বৌদ্ধধর্ম পুনরুজ্জীবিত হয়।[১৪] তারা বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হলেও সামাজিক ক্রিয়াকলাপের ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণ্যধর্মকেই অনুসরণ করতো। লিখিত উপকরণ ও স্থাপত্যকলার নিদর্শনগুলি প্রমাণ করে যে ব্রাহ্মণ্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মাবলম্বী পালরাজা ধর্মপালের 'খালিমপুর তাম্রপট্টে' দেখা যায় যে ধর্মপালদেবের সঙ্গে তার সুযোগ্য পত্নীর সম্পর্কের বর্ণনায় তুলনা করা হয়েছে বিভিন্ন হিন্দু দেবদেবীর সম্পর্কের। সান্ধ্যকর নন্দীর 'রামচরিতমানস' গ্রন্থে দেখা যায় রাজা রামপাল বৌদ্ধধর্মাবলম্বী হয়েও হিন্দুদেবতাদের অনুগ্রহ লাভ করছেন। এছাড়া বৌদ্ধধর্মের পীঠস্থান বুদ্ধগয়াতেও চতুর্মুখ শিবের প্রতিষ্ঠা করতে দেখা গেছে যা ধর্মপালের ভাস্করের পুত্রের দ্বারা সংঘটিত হয়েছিল।[১৫] পরবর্তী দশম-একাদশ শতাব্দীতেও বুদ্ধ ও বাসুদেবের সহাবস্থান দেখা গেছে।[১৬] অন্যদিকে, ব্রাহ্মন্যধর্মবলম্বী বৈষ্ণব রাজারা মহাযান দেবতাদের মন্দিরে মুক্তহস্তে দান করতেন।[১৭] উপরন্তু কিছু গ্রন্থের উল্লেখ করা যায় যেখানে বৌদ্ধ শাস্ত্রগুলির অবাধে উদ্ধৃতি আছে যেমন—বৈষ্ণব রাজা বর্মণদের সময়কালে লেখক সর্বানন্দ তাঁর 'তর্কসর্বস্ব' গ্রন্থে

বৌদ্ধগ্রন্থবিদ্ অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত' ও 'সৌন্দরানন্দ' কাব্য থেকে উদ্ধৃতি দিয়েছেন। সুতরাং বর্মণরাজাদের সময়কালেও বৌদ্ধগ্রন্থগুলি সমাদর লাভ করতো। পরবর্তীকালে লক্ষ্ণণ সেনের সভাকবি জয়দেবের 'গীতগোবিন্দ'এ বিষ্ণুর অবতারদের মধ্যে বুদ্ধের স্থান দেখা যায়। শাক্তরাজাদের সময়কালেও দেখা যায় মহাযান দেবতামণ্ডলীর মধ্যে হিন্দুদেবদেবীদের অনুপ্রবেশ অন্যদিকে বুদ্ধও হিন্দুতন্ত্রের মধ্যে সশ্রদ্ধ স্থান করে নিয়েছেন।[১৮] বৌদ্ধ 'সদ্ধর্মপুণ্ডরীক সূত্রে' ব্রহ্মা প্রজাপতির উল্লেখ আছে এবং বুদ্ধকে পিতামহরূপে বর্ণনা করা হয়েছে। এছাড়া বাংলার অন্যান্য বৌদ্ধধর্মাবলম্বী শাসকদের নামও পাওয়া যায় যেমন-পূর্ববাংলার চন্দ্রবংশীয় শাসকগণ। এই বংশের প্রথম পুরুষ পূর্ণচন্দ্র সম্ভবত: 'রোহিতগিরি' বা কুমিল্লার লালমাই পাহাড় অঞ্চল থেকে এসেছিলেন। পরবর্তী রাজা শ্রীচন্দ্রের সময়কালের তিনটি তাম্রফলক আবিষ্কৃত হয়েছে ধর্মচক্রমুদ্রাসহ যেগুলির প্রথম শ্লোকেই বুদ্ধবন্দনা রয়েছে। তিব্বতীয় ঐতিহ্যানুসারে মহাযানের পরবর্তী তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম চন্দ্ররাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশে বিস্তারলাভ করেছিল। উক্ত চন্দ্রবংশীয় শ্রীগোপীচন্দ্র গূঢ় তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন বলে জানা যায়।[১৯] এখানে উল্লেখ্য যে বাংলার গৌরব অতীশ দীপঙ্কর সম্ভবত: এই বাংলাদেশীয় চন্দ্রবংশে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।[২০]

চন্দ্রবংশ ছাড়াও খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দীর মধ্যে দুতিনটি বৌদ্ধ রাজবংশ পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিল যার মধ্যে খড়গবংশ অন্যতম। আসরফপুরের তাম্রশাসন থেকে খড়গবংশের চারজন রাজার নাম পাওয়া যায় যথা—খড়্গোদ্যম, জাতখড়্গ, দেবখড়্গ এবং যুবরাজ রাজরাজভট্ট। কুমিল্লার অনতিদূরে কর্মান্তনগরে (সম্ভবত: বর্তমান বড়কাম্‌তা) প্রাপ্ত লিপিদ্বয়ে খড়্গগণকে "সর্বলোকবন্দ্য ত্রৈলোক্যখ্যাতকীর্তি ভগবান সুগত এবং তাঁহার শান্ত, ভব-বিভবভেদকারী যোগীগণের যোগগম্য ধর্ম এবং অপ্রমেয় বিবিধগুণসম্পন্ন সত্ত্বের পরম ভক্তিমান উপাসক" বলে দেখতে পাই। পুনরায়, দশম শতাব্দীর তৃতীয়ভাগে দ্বিতীয় বিগ্রহপালের সময়কালে ব্রহ্মদেশ ও বাঙ্গলার মধ্যবর্তী লুসাই পর্বত অঞ্চল থেকে আগত এক রাজবংশের প্রতিষ্ঠা হয়েছিল উত্তরবঙ্গে। এই নতুনবংশের রাজাদেরও 'পাল' উপাধি ছিল এবং উড়িষ্যার বালেশ্বর জেলার অন্তর্গত ইর্দাগ্রামে আবিষ্কৃত এই বংশীয় নয়পালদেবের তাম্রশাসনে দেখা যায় নয়পালের পিতা ছিলেন 'কম্বোজবংশতিলক মহারাজাধিরাজ'। পরবর্তী রাজা রাজ্যপাল ছিলেন 'পরম সৌগত' নামাঙ্কিত এবং তাম্রশাসন ছিল ধর্মচক্রমুদ্রাসম্বলিত।[২১] সুতরাং দেখা যাচ্ছে যে খৃষ্টীয় সপ্তম-অষ্টম শতাব্দী থেকে একাদশ শতাব্দী পর্যন্ত বৌদ্ধরাজবংশই পূর্ববঙ্গে রাজত্ব করেছিলেন।

পরবর্তী সেনপর্বে বৌদ্ধধর্ম ও দেবদেবীদের প্রভাব বিশেষভাবে হ্রাস পেয়েছিল। অল্পসংখ্যক বিহার তখনও অবশিষ্ট ছিল। সুতরাং অনুমেয় যে সেনরাজারা বৌদ্ধদের উৎপীড়ন হয়তো করেননি কিন্তু এটি স্পষ্ট যে তাদের বৌদ্ধদের প্রতি অশ্রদ্ধা ছিল। সাধারণভাবে বলা যায় যে সেনরাজ্যের পরিমণ্ডল বৌদ্ধধর্মের পক্ষে অনুকূল ছিল না।

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের অবনতির এটি একটি কারণ। তাছাড়া বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের প্রকৃতি পরিবর্তন হল বৌদ্ধধর্মের বিপর্যয়ের অন্যতম কারণ অর্থাৎ তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব যা তন্ত্রযান ও পরে বজ্রযান বলে খ্যাত হয় বাংলাদেশে। ঐতিহাসিকদের মতে বজ্রযানের উৎপত্তি হয় বাংলাদেশেই। বজ্রযান বৌদ্ধধর্মের একটি রূপ। এর অপর দুটি আকার হল সহজযান ও কালচক্রযান। বিস্তারলাভ করে তিব্বতে এবং সহজযান থেকেই পরবর্তী বাঙলার 'সহজিয়া ধর্মে'র উদ্ভব। এই ধর্মের আদি কবি বড়ু চণ্ডীদাস। চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যে' বৌদ্ধ সহজিয়াদের মূল সূত্রগুলি দেখা যায়।

সহজিয়াদের সম্পর্কে আলোচনার আগে পর্যালোচনা করে দেখা দরকার মহাযান বৌদ্ধধর্মের, যার থেকে বৌদ্ধধর্মের অবনতি হয়তো ত্বরান্বিত হয়েছিল। মহাযান বৌদ্ধধর্ম নিঃসন্দেহে বৌদ্ধধর্মের বিপুল বিস্তৃতির জন্য প্রশংসনীয় কিন্তু অন্যদিকে বলা যায় মহাযানই বৌদ্ধধর্মের গুণগত মানের অধঃপতন ত্বরান্বিত করেছিল।[২২] মহাযান প্রধানতঃ মূর্ত্তিপূজো, প্রার্থনা, মন্ত্রোচ্চারণ, জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠান ও রীতিনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। উপরন্তু মহাযানের মধ্যে বহু লোকাশ্রয়ী চিন্তাভাবনা, সাধারণ উপাসকদের মনোগত চাহিদা ইত্যাদির অনুপ্রবেশ ঘটে বৌদ্ধধর্মকে হিন্দুধর্মের নিকটবর্তী করেছিল। বস্তুতঃ উপাসক উপাসিকারা বিষ্ণু ও বুদ্ধ, শিব ও অবলোকিতেশ্বর তারা ও পার্বতীর মধ্যে কোন রকম পার্থক্য নির্ণয় করতে পারতো না। মহাযানী আচার্যগণ মানুষের ধর্মানুসরণ সহজ করার জন্য সহজপন্থার উদ্ভাবন করেছিলেন। আচার্যগণ মহাযান 'ধারণী' মুখস্ত করা বা জপ করা, ধারণী, পুঁথিপুজো করার অনুমোদন করেছিলেন যার দ্বারা মহাযানের পাঠ, স্বাধ্যায় ও যোগের সমপর্যায়ের ফললাভ করা যেত। সংক্ষিপ্ত অর্থশূন্য মন্ত্র যথা ওঁ ধুনুধুনু ক্রীং ফট্ স্বাহা' প্রভৃতি হল ধারনী। এভাবে মহাযানমতে পুজো করার জন্য বিশালসংখ্যক ধারণী তৈরী হয়েছিল যা বৌদ্ধসংঘের মান নানাভাবে নিম্নস্তরে নামিয়ে দিয়েছিল। ফলস্বরূপ বৌদ্ধধর্মে বিকৃতির অনুপ্রবেশ ঘটে।[২৩] সহজিয়া ধর্ম প্রধানতঃ পালরাজবংশের সময়কালে বাংলাদেশ এবং এর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। সহজযানে মহাযানী শূন্যতা হল প্রকৃতি এবং করুণা হল পুরুষ। শূন্যতা ও করুণার মিলনে উৎপাদন হয় বোধিচিত্তের যা প্রকৃতি ও পুরুষ অর্থাৎ নারী ও পুরুষের মিলনে যোগমার্গের এক অনির্বচনীয় সুখকর অবস্থা যা 'মহাসুখ' নামে অভিহিত। সেই যুগের জটিল দার্শনিক তত্ত্বগুলি সাধারণ মানুষের বোধগম্য ছিল না, উপরন্তু ধ্যানধারণা, মন্ত্রতন্ত্র, মুদ্রা, ধারনী ইত্যাদিগুলি জনসাধারণকে সহজেই আকৃষ্ট করতো এবং প্রচলিত ধারণা পাল্টে উক্ত ক্রিয়াকলাপই বুদ্ধত্বলাভের প্রকৃষ্ট উপায়রূপে বিবেচিত হতে থাকে। সহজযানের প্রধান ভূমিকা হল গুরু বা আচার্যের। গুরুরা পুনরায় সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্যরূপেই খ্যাত। সহজযানের গুরুসর্বস্ব মতবাদের দ্বারা চরম কাম্যবস্তু লাভ করা যায়। বলা বাহুল্য এই ধর্মমতটি প্রসারের ক্ষেত্রে প্রধানতঃ বাংলাদেশেরই সক্রিয় ভূমিকা ছিল। বৈষ্ণব সহজিয়া প্রেম কিন্তু বৌদ্ধ সহজিয়া সম্প্রদায় থেকেই উদ্ভূত। রাধাকৃষ্ণের সহজিয়া প্রেম বা যুগল

প্রেম বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের মুখ্যবস্তু। বৌদ্ধ সহজযানের শেষ পর্যায়ে 'মহাসুখ' বৈষ্ণবদেব সহজস্থানের সঙ্গে মিশে গেছে।[২৪] এখানে উল্লেখ্য যে সিদ্ধাচার্যগণের প্রভাবে বাংলায় বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিবর্তন ঘটে একটি শাক্তসম্প্রদায়ের সঙ্গে মিশে যায় এবং একটি নতুন সম্প্রদায়ের সৃষ্টি করে যা হিন্দুযোগের একটি শাখা 'হঠযোগ' নামে খ্যাত।[২৫] অন্যদিকে, শক্তি ও গূঢ়যোগের সংমিশ্রণে শক্তিদের কৌল বা কুলধর্মের সূচনা হয় যা মূলতঃ বৌদ্ধ রহস্যবাদ সম্বলিত। পরিবর্তিত বৌদ্ধধর্মের ন্যায় শাক্তদের মধ্যেও কুল বলতে শক্তি বা নারীকে বোঝায় এবং অকূল বলতে বোঝায় শিবকে। অন্তর্নিহিত শক্তিকে অভিহিত করা হয়েছে কুলকুন্ডলিনী শক্তিরূপে। কৌল গ্রন্থগুলি পাঠ করলে দেখা যাবে যে বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের রহস্যবাদই কৌলগ্রন্থগুলির মুখ্য উপজীব্য।[২৬] এছাড়া নাথসাহিত্য, অবধূত ও বাউল সাহিত্যের মধ্যেও গূঢ় বৌদ্ধধর্ম মিশে যায়। উপরন্তু এগুলি কয়েকটি স্থানীয় লোকায়ত ধর্মের সৃষ্টি করে যেমন, নাথধর্ম। নাথধর্ম প্রধানতঃ সিদ্ধাচার্যদের দ্বারাই প্রতিষ্ঠিত কারণ নাথধর্মের প্রতিষ্ঠাতা প্রখ্যাত মৎস্যেন্দ্রনাথকে সিদ্ধাই বলে অভিহিত করা হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় স্পষ্টতঃই নাথসম্প্রদায়কে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মেরই অন্য একটি শাখা বলে বর্ণনা করেছেন। যদিও উল্লেখ্য যে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে বাংলার নাথগণ প্রাচীন আজীবিক সম্প্রদায়ের ধর্মমত ও আচার অনুষ্ঠান গ্রহণ করেছিলেন। এর পরবর্তী সময়ে অবধূত নামে অন্য একটি সম্প্রদায় সিদ্ধাচার্যগণের প্রভাবেই গড়ে উঠেছিল। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে অবধূতিনাড়ী বৌদ্ধ যোগসাধনারই অন্যতম অংশ।[২৬] উল্লেখ্য যে শ্রীচৈতন্যদেবের শিষ্য নিত্যানন্দ একজন অবধূত ছিলেন। শ্রীচৈতন্যভাগবতে অবধূতগণের ধর্মের একটি স্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায়। যাই হোক্, সহজিয়াগণ বাংলাদেশে শ্রীচৈতন্যদেবের আগেই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল এবং চৈতন্যদেব সহজিয়াগণের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কারণ চণ্ডীদাসের 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে' বৌদ্ধ সহজযানের বহু বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ আছে। পুনরায়, বাংলাদেশের নিম্নবর্ণের মধ্যে প্রচারিত 'ধর্মসম্প্রদায়' নামে অন্য একটি সম্প্রদায়ের উল্লেখ করা যায় যারা কোন কোন পণ্ডিতের মতে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ সম্প্রদায়।[২৭] যাই হোক্, বৌদ্ধধর্মের অবনতির বর্ণনা প্রসঙ্গে পণ্ডিত হরপ্রসাদ শাস্ত্রীমহাশয় বিবৃত করেছেন যে সহজযানী সম্প্রদায় বৌদ্ধধর্মকে সহজ করতে গিয়ে ব্যাভিচারের স্রোতে ভেসে গিয়েছিল। ভিক্ষুরা ক্রমশঃ বাবুবিলাসী এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত হয়ে পড়েন।[২৮] অধ্যাপক যোশী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের বিবাহ করার কথা বলেছেন। হিউয়েন সাঙের বর্ণনায়, কহ্লণের রাজতরঙ্গিনী ও মুসলমানী চাচ্‌নামা[২৯] গ্রন্থেও বিবাহিত বৌদ্ধভিক্ষুদের উল্লেখ পাওয়া যায়। মহাযানীরা বোধিসত্ত্বের উচ্চচিন্তাধারা গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে মনে করতো যে শাক্যমুনি বুদ্ধ যেহেতু বিবাহিত ছিলেন সেহেতু বৌদ্ধভিক্ষুরা বিবাহ করতে পারবেন। মহাযানী বৈতুল্যবাদীদের মধ্যে প্রচলিত ছিল যে বিশেষ বিশেষ কারণে 'মৈথুনধর্ম' পালন করা যায়।[৩০] সম্ভবতঃ নারীশক্তি সহযোগে তন্ত্রসাধনার উৎস হয়তো

এটিই। বস্তুত: মূল বৌদ্ধধর্মে দেবতার সংস্রব ছিল না। দেবতার পূজার্চনারও এতে কোন স্থান ছিল না। কিন্তু বুদ্ধের মৃত্যুর চারপাঁচ শতকের মধ্যেই বৌদ্ধ বিহারগুলিতে প্রথম বুদ্ধের প্রতীকচিহ্ন ও পরে বুদ্ধমূর্ত্তিপুজোর প্রচলন হয়। কেবলমাত্র শাক্যমুনি বা গৌতমবুদ্ধই নয় ক্রমে ক্রমে পঞ্চ ধ্যানী বুদ্ধ, ধ্যানী বুদ্ধদের পঞ্চশক্তি বা সঙ্গিনীর পূজোরও প্রচলন ঘটে। তারপর একে একে ডাকিনীযোগিনী, পিশাচপিশাচী, যক্ষযক্ষিনী, ভৈরবভৈরবীরাও বৌদ্ধদের উপাস্য দেবতা হয়ে দাঁড়ায়। বুদ্ধ দেবতা মানতেন না কিন্তু তাঁর শিষ্যবর্গরা ধূমধাম করে দেবতা অপদেবতাদের পূজা শুরু করে বৌদ্ধধর্মকে বিকৃতির পর্যায়ে নিয়ে চলে যায়। ড: রমেশচন্দ্র মিত্রমহাশয় বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের অন্যতম কারণ হিসেবে সরাসরি দায়ী করেছেন সংঘের মধ্যেই বৌদ্ধধর্মের বিকৃতিকরণকে বা সংঘকে কলুষিত করাকে।[৩১] পরবর্তীকালের বৌদ্ধ গ্রন্থগুলিতে এর সাক্ষ্য প্রমাণ বর্তমান।[৩২]

বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্মের তিরোধানের শেষ পর্যায়ে অর্থাৎ সেন রাজত্বকালের কিছু পরেই দেখা যায় যে মুসলমান তুর্কী ও আফগানরা বাংলাদেশ জয় করে নেয় এবং বৌদ্ধবিহারগুলি ধ্বংসস্তূপে পরিণত করে। বৌদ্ধধর্ম মুলত: ছিল বিহারভিত্তিক, তারা বহু অমূল্য পাণ্ডুলিপি বিনষ্ট করে, বৌদ্ধভিক্ষুদের হত্যা করে বৌদ্ধধর্ম বিলোপের চেষ্টা করে। এখানে উল্লেখ্য বিষয় হল মুসলমানরা একমাত্র বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধমন্দির বা বুদ্ধমূর্ত্তিই নষ্ট করেনি, তারা সমপরিমানেই হিন্দুমন্দির, হিন্দুদেবদেবী, বিগ্রহ নষ্ট করেছে।[৩৩] কিন্তু মুসলমান আক্রমণের তীব্রতা হিন্দুধর্ম সহ্য করতে পারলেও বৌদ্ধধর্ম তা পারেনি। মুসলমান আক্রমণের বহু আগে থেকেই বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য ক্রমশ: ক্ষীণ থেকে ক্ষীণতর হয়ে যাচ্ছিল। হিন্দুধর্ম টিকে যায়। জানা যায় যে বাংলার সোমপুরী, জগদ্দল বিহারের কোন কোন ভিক্ষু নেপাল, সিংহল ও ব্রহ্মদেশে পালিয়ে যান। যাই হোক্ উল্লেখ্য যে মধ্যযুগের ক্ষয়িষ্ণু পরিমণ্ডলে বৌদ্ধধর্ম বাংলার কোন কোন অঞ্চলে বিশেষত: বৌদ্ধ আরাকানের প্রতিবেশী চট্টগ্রাম অঞ্চলে টিকে ছিল।[৩৪] পশ্চিমবঙ্গের বর্তমান উত্তরসীমানা অঞ্চলে বৌদ্ধধর্মের প্রসার তিব্বতী বৌদ্ধধর্মেরই প্রভাবের ফল। দেশবিভাগের পর পূর্ববাংলার অনেক বৌদ্ধ পরিবার পশ্চিমবঙ্গে এসে স্থায়ীভাবে বসবাস করছেন। মহাবোধি সোসাইটির প্রচেষ্টায় পশ্চিমবঙ্গেও বৌদ্ধধর্মের প্রতি বহুজন আকৃষ্ট হয়।[৩৫] এ প্রসঙ্গে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা বা বেঙ্গল বুদ্ধিষ্ট অ্যাসোসিয়েশনের অবদানও সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। উপসংহারে নির্দ্ধিধায় বলা যায় যে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তৃতি ঘটে পরিশেষে হয়তো বা তার বিকৃতি ঘটে বাংলাদেশে অবনতির দিকে এগিয়ে গিয়েছিল কিন্তু সমগ্র বাংলার ইতিহাসে কিন্তু বৌদ্ধধর্ম একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ স্থানের অধিকারী হয়ে আছে। বাঙালীর ধর্মবিশ্বাস, মানবতাবোধ ও ভাষাগঠনেও বৌদ্ধধর্মের স্থান অবিস্মরণীয়। বস্তুত: মৈত্রীমূলক সদ্ধর্ম তার সার্বজনীন রূপের জন্য কখনও বিনষ্ট হতে পারে না। আশা করা যায় হয়তো ধীরে ধীরে এর পুনরুত্থান ঘটবে এবং বর্তমান অস্থিরতার যুগে প্রশান্তির ছায়া বিস্তার করে মানুষকে আলোকবর্ত্তিকার দিকে এগিয়ে নিয়ে যাবে।

তথ্যসূত্র ঃ

১। দ্রঃ ডিক্লাইন অফ বুদ্ধিজিম ইন ইণ্ডিয়া (শান্তিনিকেতন, ১৯৪৯) পৃ. ১

২। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, মণিকুন্তলা হালদার দে (মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৫) পৃ.৩০৯

৩। দ্রঃ এপিগ্রাফিকা ইণ্ডিকা, ২০তম খণ্ড, পৃ. ২৩

৪। ডিক্লাইন অফ বুদ্ধিজিম্ ইন ইণ্ডিয়া, ড: রমেশচন্দ্র মিত্র বিরচিত পৃ. ৮৩

৫। ঢাকা রিভিউ, ১৯২০-২১ পৃ.১৭৫ তুলঃ হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল, ১ম খণ্ড (ঢাকা, ১৯৪৩) পৃ. ৪১৮ পাদটীকা নং ৯

৬। ডিক্লাইন অফ বুদ্ধিজিম্ পৃ. ৮৪

৭। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পৃ. ৩১৪

৮। তুলঃ বুদ্ধিজিম্ ইন ইণ্ডিয়া অ্যাণ্ড এব্রড, ড: অনুকূল চন্দ্র ব্যানার্জ্জী বিরচিত (ওয়ার্ল্ড প্রেস, কলিকাতা, ১৯৭২) পৃ. ১৯১

৯। তুলঃ ডিক্লাইন অফ বুদ্ধিজিম্ পৃ. ৫০

১০। ঐ; বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পৃ. ৩১০

১১। দ্রঃ 'Memoire sur les Religieux Eminents A. Chanennes কৃত (প্যারিস, ১৮৯৪) পৃ. ১০০

১২। ডিক্লাইন অফ বুদ্ধিজিম পৃ. ৫১

১৩। ঐ, পৃ. ৫২

১৪। দ্রঃ পালরাজাদের বিভিন্ন অভিলেখ

১৫। ডিক্লাইন অফ় বুদ্ধিজিম্ পৃ. ৫২

১৬। এ্যানুয়াল রিপোর্ট, ঢাকা মিউজিয়াম (১৯৩৯-৪০) পৃ. ৮

১৭। ডিক্লাইন অফ বুদ্ধিজিম্ পৃ. ৫৬

১৮। দ্রঃ ড: বিনয়তোষ ভট্টাচার্য বিরচিত 'দি ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট আইকোনোগ্রাফি', কলিকাতা ১৯৭৫

১৯। দ্রঃ জারনাল অফ্ দি ডিপার্টমেন্ট অফ লেটারস ৩০নং খণ্ড

২০। ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদারের 'হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল' (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৪৩) পৃ. ৪১৯

২১। বাঙ্গলায় বৌদ্ধধর্ম, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত (কোলকাতা, ২০০০ পুনর্মুদ্রণ) পৃ.৩৬

২২। হিন্দুজিম্ এ্যাণ্ড বুদ্ধিজিম্, স্যার চালর্স এলিয়ট ২য় খণ্ড (লন্ডন, ১৯৭১) পৃ. ৬

২৩। বৌদ্ধভারত, শরৎকুমার রায় (কলিকাতা, ১৯৩৯) পৃ. ২০৭

২৪। শশীভূষণ দাশগুপ্ত বিরচিত 'এ্যান্ ইন্ট্রুডাক্শন টু তান্ত্রিক বুদ্ধিজিম্' (কলিকাতা, ১৯৭৪ পুনর্মুদ্রণ) পৃ. ৯

২৫। ঐ, পৃ. ১২০-২১

২৬। হিস্ট্রি অফ বেঙ্গল পৃ. ৪২২

২৭। দ্রঃ বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পৃ. ২৭০

২৮। ‘বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত’ হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ, ৩য় খণ্ড (পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যপুস্তক পর্ষদ ১৯৮৪) পৃ. ৩৭৩-৮২

২৯। ইলিয়ট ও ডাউসন বিরচিত পৃ. ১৪৭

৩০। স্টাডিস্ ইন্ দি বুদ্ধিষ্ট কালচার ইন্ ইণ্ডিয়া, লালমনি যোশী বিরচিত (দিল্লী, ১৯৬৭) পৃ. ৩০৭

৩১। বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস পৃ. ৩৩৭

৩২। তুল: ঐ

৩৩। এ বিষয়ে রামাই পণ্ডিতের ‘শূন্যপুরাণ’ (নগেন্দ্রনাথ বসু বিরচিত, কলিকাতা, ১৯০৯) এর সুবিখ্যাত বর্ণনা উল্লেখ্য যা মুসলমানদের অত্যাচারের বিভীষিকার একটি পরিপূর্ণ চিত্র তুলে ধরেছে

৩৪। দ্রঃ কন্‌টেম্পরারি বুদ্ধিজিম ইন বাংলাদেশ, ডঃ সুকোমল চৌধুরী বিরচিত, কলকাতা

৩৫। পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ভদন্ত প্রজ্ঞানন্দশ্রী স্থবির বিরচিত (কলিকাতা, ১৯৮৭) পৃ. ৬০-৬৬, প্রেসেন্ট বুদ্ধিষ্ট ট্রাইবস্ এ্যান্ড বিহারস্ ইন্ ওয়েষ্ট বেঙ্গল (কলিকাতা, ১৯৯১) পৃ. ১২,২৪ ইত্যাদি।

বাংলার ভক্তি আন্দোলনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব

ভক্তি দে *

ভারতীয় জীবন ও সমাজ ভক্তি রসে সিক্ত। বেদসংহিতার আরণ্যক যুগ থেকে এই অনুরক্তির নানাবিধ প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। মানব মনের সুকুমার, কোমল হৃদবৃত্তির মধ্য দিয়ে এই ভক্তি রসের প্রকাশ ঘটেছে। সেখানে ব্রহ্মজ্ঞানের তত্ত্বমূলক গভীরতা গৌণ হয়ে গিয়ে শরণগমনের আকুতিই প্রধান হয়ে উঠেছে।[১] শুধু তাই নয়, ব্যক্তি মানসের এই আকুলতা পরবর্তীকালে প্রেমস্বরূপা, অমৃতস্বরূপা 'ভক্তি'[২] অভিধায় ব্যঞ্জিত হয়ে, জগতজনের কল্যাণ কামনায় ভারতীয় ধর্মের ধারাকে পুষ্ট করেছে।

খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীর প্রথমপাদ (১১৬৬ খৃ:) ভারতের জাতীয় ইতিহাসে এক স্মরণীয় অধ্যায়। দক্ষিণভারতের শৈবনায়নার, বৈষ্ণব আড়বার, আচার্য রামানুজ, আলবারাপন্থীদের নেতৃত্বে সারা ভারতে এক মহাবিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। এই আন্দোলন ভারতবর্ষের জাতীয় ইতিহাসে ভক্তি আন্দোলন নামে অভিহিত। পরবর্তীকালে ভক্ত কবীর, গুরু নানক, সুরদাস, মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেব, দাদু, মীরাবাঈ প্রমুখ ধর্মতত্ত্ববেত্তা পরম্পরায় সেই আন্দোলন আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষের জনমানসে ছড়িয়ে পড়েছিল।

কিন্তু এই প্রামাণ্য ঐতিহাসিক ঘটনা ব্যতিরেকেও আর এক নীরব রক্তপাতহীন মহাবিপ্লব ভারতবর্ষের বুকে সংঘঠিত হয়েছিল। যার সূচনা ও বিকাশ উভয়ত এক মহাজীবনকে কেন্দ্র করে আন্দোলিত হয়েছিল। তিনি হলেন শাক্য রাজবংশজাত কুমার, গৌতম।

খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতকে কপিলাবস্তুর রাজমহিষী মায়াদেবীর কোল আলো করে শুদ্ধোদন তনয়, সিদ্ধার্থ আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর জন্ম সম্বন্ধে বৈপুল্যসূত্রের অন্যতম গ্রন্থ ললিতবিস্তরে উল্লেখ রয়েছে, স্বর্গের তুষিতভবন থেকে সিদ্ধার্থ গৌতমের আবির্ভাবের প্রেক্ষাপটটি ছিল সম্পূর্ণভাবে অলৌকিক। জননী মায়াদেবী স্বপ্নে এক মহামানবের আবির্ভাব প্রত্যক্ষ করেছিলেন। ললিতবিস্তর এইভাবে বর্ণনা করেছে—

> " হিমরজত নিকাশশ্চন্দ্র সূর্যাতিরেক: সুচরন
> সুবিভক্ত: ষড়িষানো মহাত্মা। গজবরু দৃঢ়
> সংধিবজ্র কল্প সনুরুপ: উদারি সমম প্রবিষ্টস্তস্য হেতুং।[৩]

মায়াদেবীর স্বপ্ন বিচার করে রাজ জ্যোতিষী সিদ্ধান্তে এলেন যে, তাঁর কোলে রাজচক্রবর্তী মহামানবের আবির্ভাব হবে। মহাকালের অবশ্যম্ভাবী সম্ভাবনাকে ফলবতী করতে অশীতি

* ড: ভক্তি দে এশিয়াটিক সোসাইটি (কলকাতা)র ক্যাটলগার এবং প্রাবন্ধিক।

অনুব্যঞ্জজনা এবং দ্বাত্রিংশৎ মহাপুরুষ লক্ষণ নিয়ে আবির্ভূত হলেন শাক্যপুত্র গৌতম। এবং যথাকালে রাজজ্যোতিষীর বিচার অভ্রান্ত প্রমাণ করে, প্রেম ও করুণার মূর্তপ্রতীক রাজকুমার সিদ্ধার্থ যৌবনের পাদপ্রদীপে এসে সংসারের মায়ার বন্ধন ছিন্ন করে মহাজাগতিক কল্যাণ কামনায় সন্ন্যাসের বৈরাগ্যময় পথে পা বাড়িয়েছিলেন। তারপর সময়ের দীর্ঘপথ অতিক্রম করে নৈরঞ্জনা নদী তীরে ধ্যানসমাধির অচিন্ত্য আনন্দলোক থেকে তিনি বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এই মহৎ ঘটনাটিকে স্মরণ ও শ্রদ্ধা জানিয়ে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন—

"বৌদ্ধধর্মের যিনি প্রতিষ্ঠাতা তিনি ভক্তদের চোখে মানুষের সমস্ত স্বাভাবিক সীমা অতিক্রম করেছিলেন। তিনি মুক্ত হয়েও স্বেচ্ছায় বন্ধন স্বীকার করেছিলেন, তা অনির্বাচ কর্মফলদায়ক নয়। প্রেমের করুণার সম্মিলিত অবস্থান।"[৪]

গৌতমবুদ্ধের করুণা কেবল মনুষ্যজাতির মধ্যে সীমায়িত ছিল না। ত্রিলোকের সমস্ত জীবকোটির প্রতি তা সমানভাবে প্রযোজ্য ছিল। কুশলকর্মের মধ্য দিয়ে সত্ত্বের বেদনাক্লিষ্ট, দুঃখজর্জরিত কায়িক জীবনের নিরোধ ঘটাতে তিনি বুদ্ধ হয়েছিলেন। তাই করুণাঘন চিত্তে তিনি শ্রমণ-ভিক্ষুদের প্রতি আহ্বান জানালেন—"হে ভিক্ষুগণ, তোমরা দিকে দিকে যাও, বহুজনের হিতের জন্য, বহুজনের সুখের জন্য, দেবতা ও মানুষের কল্যাণের জন্য তোমরা ধর্ম উপদেশ দিও, যার আদিতে কল্যাণ, মধ্যে কল্যাণ এবং পর্যাবসানে বা অন্তে কল্যাণ।"[৫] গৌতমবুদ্ধের এই লোককল্যাণকামিতা খৃষ্টপূর্ব ষষ্ঠশতক থেকে প্রায় হাজার বছর ধরে বৌদ্ধসংঘ এবং সমাজে বিস্তার লাভ করেছিল। তাঁর মহাপরিনির্বাণের পর এই পরহিত ভাবনা বৌদ্ধ পরম্পরায় পরবর্তী ভারতীয় ধর্মধারায় বিশেষত বাংলার ধর্মীয় প্রেক্ষাপটটিকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত ও পুষ্ট করেছিল।

যাই হোক ইতিহাস এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে যুক্তিপূর্ণ সামজস্য রেখে ভারতীয় জীবন ও সমাজ অগ্রসর হয়েছে। রবীন্দ্রদৃষ্টিতে এই পরিবর্তনের পরিপ্রেক্ষিতটি সুন্দরভাবে বিশ্লেষিত হয়েছে। "ভারতবর্ষের চিরদিনই একমাত্র চেষ্টা দেখিতেছি প্রভেদের মধ্যে ঐক্য স্থাপন করা, নানাপথকে একই লক্ষ্যের অভিমুখীন করিয়া দেওয়া এবং বহুর মধ্যে এককে নিঃসংশয় রূপে অন্তরতর রূপে উপলব্ধি করা-বাহিরে যে সকল পার্থক্য প্রতীয়মান হয় সেগুলিকে নষ্ট না করিয়া তাহার ভিতরকার নিগূঢ় যোগকে আবিষ্কার করা।"[৬] শাক্যপুত্র গৌতমও এই সত্য স্বীকার করে তাঁর উপদেশে বলেছেন—'আমিও এক পুরাতন পথ, পুরাতন মার্গ আবিষ্কার করিয়াছি। প্রাচীনকালের সম্যক সম্বুদ্ধগণ এই পথে বিচরণ করিতেন।'[৭] এই অঙ্গীকারই বুঝিয়ে দেয় সনাতন ভারতীয় ধর্মধারার অবিচ্ছিন্ন অংশ হলো বৌদ্ধধর্ম। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান ধর্মের স্বরূপগত সাদৃশ্য স্মরণ করে তাঁর Indian Philosophy তে উল্লেখ করেছেন। 'Buddhism is only a later phase of the general movement of thought of which the Upanisadas were the earlier."[৮]

ভারতীয় ধর্মের এই সমীকরণের ইতিহাস বাংলাদেশের জীবন ও মননে সাঙ্গীকৃত হয়ে

গিয়েছিল। ফলে অষ্টম শতাব্দীর রাজন্য পৃষ্ঠপোষকতায় বাংলাদেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, মুসলমান ধর্মনায়কগণ বিভিন্ন ধর্মের অসম্প্রদায়িক সাধ্য সাধন তত্ত্বে দীক্ষিত হয়েছিলেন। এক্ষেত্রে বৌদ্ধধর্মের একটি বিশেষ ভূমিকা পরিলক্ষিত হয়। বৌদ্ধধর্মে প্রেম ও করুণার জগৎব্যাপী মৈত্রীর যে প্রকাশ ঘটেছিল তারই ফলে শূন্যবাদ, ভক্তির আশ্রয়ে নতুন রূপে প্রতিভাত হয়েছিল এবং বাংলাদেশে ভক্তি আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। যেমন বৌদ্ধ দেবদেবীরা নবীকরনের মধ্য দিয়ে হিন্দু ব্রাহ্মণ্য দেবদেবীর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিলেমিশে গিয়েছিলেন। এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য, চতুর্ভুজ শিবমূর্তির মাথায় ধ্যানী বুদ্ধের উপবিষ্ট মূর্তি। যিনি শিবলোকেশ্বর নামে অভিহিত। বুদ্ধ এবং তাঁর শক্তি সমূহের পূজা বন্দনার সঙ্গে সঙ্গে বৌদ্ধ ত্রিরত্নের ধর্ম এবং সঙ্ঘ, মূর্তি পরিগ্রহ করলেন। মহাবোধির একটি ভাস্কর্য শিল্পে এরই প্রতিফলন দেখা যায়। ভগবান বুদ্ধের বামদিকে ধর্ম, স্ত্রী মূর্তিতে এবং ডানদিকে সঙ্ঘ, পুরুষ মূর্তিতে বিরাজিত। কচ্ছপের পিঠে একাদশ শতাব্দীর লিপিতে উৎকীর্ণ একটি স্তর বাংলাদেশের ঢাকা সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। সেখানে কৃষ্ণ এবং বুদ্ধকে একই সঙ্গে প্রণাম জানান হয়েছে এইভাবে "নমো ভগবতে বাসুদেবায়। নমো বুদ্ধায়। সুজিনো জনানাং। নমো ভগবতে বাসুদেবায়।" আবার বজ্রসত্ত্ব ষড়ৈশ্বর্য ভগবান রূপে বৌদ্ধদের দ্বারা পূজিত হতে লাগলেন। "নমস্তে শূন্যতা গর্ভ সর্বসংকল্প বর্জিত। সর্বজ্ঞ জ্ঞান সন্দোহ জ্ঞানমূর্তে নমোহস্তুতে।" তাছাড়া বৌদ্ধ মঞ্জুশ্রী, ধর্মপাল, জম্ভল, তারা প্রভৃতি দেবদেবী হিন্দু সরস্বতী, যম, কুবের, কালী প্রভৃতির সঙ্গে মিলেমিশে গিয়েছে।

বৌদ্ধদেবদেবী ব্যতিরেকেও বৌদ্ধতন্ত্র সাধনার প্রচ্ছন্ন ধারা কখনও প্রত্যক্ষে কখনো পরোক্ষে বাংলাদেশের ধর্মপ্রবাহ তথা ভক্তিবাদকে প্রভাবিত করেছে।

বাংলাদেশের ধর্মাচরণে ও ভক্তিআন্দোলনে বৌদ্ধধর্মের প্রত্যক্ষ প্রভাব সম্ভবত অষ্টম শতাব্দীর পালরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় প্রথম লক্ষ্য করা যায়। পালরাজারা ছিলেন সৌগত। বৌদ্ধ সহজযান ধর্মমতের ধারক। তাঁদের আনুকূল্যে সেইসময় বাংলাদেশে বৌদ্ধ সহজযান প্রাধান্য লাভ করেছিল।

সহজযানের মূলতত্ত্ব হলো শূন্যতা ও করুণার যুগবন্ধ অবস্থা। এই তত্ত্বে উপনীত হলে সত্ত্ব সহজানন্দ লাভে সমর্থ হবেন এবং বোধিচিত্তের অধিকারী হবেন। অষ্টম থেকে দ্বাদশ শতকে আবির্ভূত একদল সিদ্ধসাধক (সিদ্ধাচার্য) তাঁদের সাধনার উপলব্ধি উদানগীতি রূপে প্রকাশ করেছেন, যা বাংলাসাহিত্যে চর্যাগীতি নামে অভিহিত। ভগবান বুদ্ধের লোককল্যাণ কামিতা, বৌদ্ধধর্মে মৈত্রী ভাবনায় রূপান্তরিত হয়েছিল। তাই সমস্ত বৌদ্ধ সাহিত্যে করুণাঘন চিত্তের একটি সংকল্প বিভিন্নভাবে ধ্বনিত হয়েছে—"আমি যেন অনাথের নাথ হই, পান্থজনের পথ প্রদর্শক হই। পারগামী লোকের পক্ষে হই নৌকা সহক্রম। যাঁহারা দীপার্থী আমি তাঁহাদের দীপ হইব, যাঁহারা শয্যার্থী তাঁহাদের শয্যা হইব। আমি হইব প্রাণীগণের চিন্তামণি রত্ন, ভদ্রঘট, সিদ্ধবিদ্যা, কল্পবৃক্ষ ও কামধেনু।"[১]

করুণামুদিত সিদ্ধাচার্যদের উদানগীতিতে (চর্যাপদ) নানাভাবে এই করুণার কথা, সর্বজীবের প্রতি মৈত্রী ভাবনা বারংবার ঘোষিত হয়েছে। সিদ্ধাচার্য চাটিলপাদের পদটি এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়—

"ভবনই গম্ভীর বেগেঁ বাহী
দু আন্তে চিখিল মাঝেঁ না যাহী
ধামর্থে চাটিল সা/ গঢ়ই
পারগামি লোঅ নিভর তরই।।[১০]

গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন, জাত, পাত, ধর্মভেদ প্রভৃতি প্রথা যেমন সমাজকে পঙ্গু করে তোলে, তেমনি আনুষ্ঠানিক ক্রিয়াকর্মের জটিলতা ধর্ম সাধনায় আত্মোন্নতির পথে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে। তাই তিনি তাঁর অনুগত জনদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন " হে ভিক্ষুগণ, যেমন গঙ্গা, যমুনা, অচিরবতী, সরয়ু, মহী প্রভৃতি মহানদী যখন সমুদ্রে পড়ে তখন তাদের পূর্বের নামগোত্র আর থাকে না, এবং সকলেই সমুদ্র নামে অভিহিত হয়, তেমনি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিজাতির লোক গৃহত্যাগ করে তথাগত প্রবর্তিত ধর্ম বিষয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তাদের পূর্বের নাম গোত্র আর থাকে না, সকলেই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণ নামে অভিহিত হয়।"[১১]

শাক্যপুত্র গৌতমবুদ্ধের এই বোধিজ্ঞানময় সংস্কৃত চিত্তের ভাবনা পরবর্তী বাংলাদেশের জনচিত্তকে প্রভাবিত করেছিল। চর্যাগান, দোহাগানে তার প্রচুর প্রমাণ পাওয়া যায়। যেমন সিদ্ধাচার্য কাহ্নপাদ আগম, পুঁথি, বেদ, ইষ্টমালার অসারতার কথা তাঁর দোঁহাবলীতে উল্লেখ করেছেন—

"আগম বেঅ পুরাণে পণ্ডিয়ামানবহান্তি
পড় সিরিফল অলিঅ জিম বাহেরিঅ ভমন্তি।।"[১২]

খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দী থেকে বৌদ্ধধর্মের এই প্রবাহমানতা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগ অবধি বাংলাদেশের ধর্মমনস্কতাকে প্রভাবিত করেছিল। চন্ডী, মনসা, শীতলা, ষষ্ঠী, কমলা, ধর্মঠাকুর প্রভৃতি দেবদেবীর রূপকল্পনায়, পূজা বন্দনায়, মন্ত্রসাধনায় বৌদ্ধধর্মের ছায়া প্রলম্বিত হয়েছে। যেমন মনসাদেবীর রূপ চিত্রনে বৌদ্ধভাবনা লক্ষ্য করা যায়। সাধনমালা, বিনয়বস্তু প্রভৃতি বৌদ্ধ মহাযান গ্রন্থে জাঙ্গুলিতারার যে বর্ণনা পাওয়া যায় সেখানে তাঁকে সর্পদেবী রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে। মহামায়ূরী সাধনায় বিষ নষ্ট করার কথা বৌদ্ধগ্রন্থে উল্লেখিত হয়েছে। মনসাদেবী বিষহরী রূপে বাংলাদেশে পূজিতা।

মধ্যযুগের বাংলাদেশে মনসার মতো চন্ডীদেবীও সমানভাবে ভক্তের পূজার্চনা গ্রহণ করেছেন। সেখানে বৌদ্ধ সহজ সাধনার তান্ত্রিক আচার, সাধনতত্ত্ব, প্রমুখ অবলীলায় স্থান করে নিয়েছে। তৎকালীন কবিদের রচিত কাব্যগুলিতে তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

ষষ্ঠীমঙ্গল কাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ষষ্ঠী, বৌদ্ধ দেবী হারিত্রীর সমধর্মী। উভয়ত শিশুদের

জীবনদায়িনী রক্ষয়িত্রীরূপে পূজিতা। মৃৎবৎসার দেশে তাঁরা নবজাতককে মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেন। কবি কৃষ্ণরামের কাব্যে এই মিল লক্ষ্য করা যায়। অনুরূপভাবে পন্ডিতেরা স্বীকার করেছেন বৌদ্ধদেবী, পর্ণশবরী বাংলাদেশে মা শীতলায় রূপান্তরিতা হয়েছেন। তবে ধর্মঠাকুরের চরিত্র চিত্রনে এবং সাধনতত্ত্বে বৌদ্ধপ্রভাব অধিক দৃষ্ট হয়। ধর্মপূর্জবিধানে ধর্মঠাকুরকে প্রচ্ছন্ন বুদ্ধরূপে অভিহিত করা হয়েছে। নিরঞ্জন, নিরাকার, নির্গুণ ধর্মঠাকুর বৌদ্ধধর্মের শূন্যবাদের চিন্তা স্মরণ করিয়ে দেয়। এমনকি ধর্মঠাকুরের পূজা উপাসনায় বৌদ্ধ সহজ ভাবনার তান্ত্রিক যোগাচারের মিল খুঁজে পাওয়া যায়। বিশেষত ধর্মপূজা বিধানে ঘরভরা, গাজনের সঙযাত্রা, বৈতরনী পার, ঘরদেখা, দ্বারভাঙ্গা, প্রভৃতি অংশে এই সাযুজ্য লক্ষ্যণীয়।

বৌদ্ধধর্মের সারার্থকে অন্তরে ধারণ করে 'নাথধর্ম' বাংলাদেশের ধর্মসাধনায় বিশিষ্টতা অর্জন করেছিল। সাধ্য-সাধন তত্ত্ব এবং সাধনার চরমপ্রাপ্তি পরমানন্দ লাভ, সমস্ত ক্ষেত্রেই নাথধর্ম বৌদ্ধধর্মকে সাঙ্গীকৃত করে নিয়েছে। যেমন, আসন, প্রাণায়াম, রসসিদ্ধি, ব্রজ্রোলী, সহাজালি, মুদ্রাকরণ রীতি প্রভৃতি ক্ষেত্রে নাথধর্ম বৌদ্ধধর্মানুসারী।

যদ্যপি বাংলাদেশে ভক্তি আন্দোলনে মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের প্রত্যক্ষ অবদান সর্বযুগ স্বীকৃত, তথাপি মহাপ্রভু প্রবর্তিত বৈষ্ণবধর্ম বৌদ্ধধর্মকে পরোক্ষে অঙ্গীকার করে নিয়েছে। রূপ গোস্বামী, কৃষ্ণদাস কবিরাজ প্রমুখ বৈষ্ণব মহাজনদের সাধ্য-সাধন তত্ত্বে, চন্ডীদাস, নরহরি দাস প্রমুখ বৈষ্ণব রসিকজনদের কামগায়ত্রী, কামবীজ, কৃষ্ণ উপাসনায় তান্ত্রিক বৌদ্ধ সহজ সাধনার মিল লক্ষ্য করা যায়। এই প্রসঙ্গে সহজিয়া বৈষ্ণবদের সাধনরীতির কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

বৌদ্ধধর্মের এই প্রবাহমানতা কেবলমাত্র ব্রাহ্মণ্যধর্মে সীমাবদ্ধ ছিল না। তৎকালীন বাংলাদেশের ইসলামধর্মও বৌদ্ধধর্মকে অন্তরে অন্তরে গ্রহণ করেছিল। আরাকান, চট্টগ্রাম অঞ্চলের ইসলামধর্মীরা মূলত এই স্রোতধারায় অবগাহন করেছিল। ইসলামী সুফীসাধনা, বেসর-ফকিরী ধর্মাচরণের মধ্যে মহাযান বৌদ্ধধর্মের রহস্যপূর্ণ তত্ত্ব ও সাধন পদ্ধতির মিল দেখা যায়। যেমন, দৌলত কাজীর লোরচন্দ্রানী কাব্যে 'আল্লাহ''কে 'বিশ্বলীন' বলে উল্লেখ করা হয়েছে—

"আহাদ আছিল এক মিম হস্ত পরতেক
যে মিমেতে জগৎ মোহন
নিজ সখা অবতার মহম্মদ অলঙ্কার
মিমে কৈল একটি ভবন।।[১৩]

বহু শতাব্দী পূর্বে 'অদ্বয় বজ্রগ্রন্থে' অনুরূপ কথার প্রতিধ্বনি শোনা যায়—

"নিষ্প্রপঞ্চো নিরাভাসো ধর্মকায়ো মহামুনেঃ
রূপকারৌ তদুদ্ভূতৌ পৃষ্ঠে মায়েব তিষ্ঠতে।।[১৪]

ইসলাম ধর্মের এই ধারা পরবর্তী কালে বাংলাদেশের আউল-বাউল সাধনার প্রবাহকে

অঙ্গীভূত করে নিয়েছিল যা বৌদ্ধ ধর্মানুসারী। বৌদ্ধ সহজ সাধনার রীতি পদ্ধতি এবং সাধনলব্ধ আনন্দ বাউল সাধনায় লক্ষ্য করা যায়।

বস্তুতপক্ষে একই মৃত্তিকা রসে সঞ্জীবিত বাংলাদেশের ধর্মসাধনার ধারাগুলি একই আদর্শকে অঙ্গীকার করে শতাব্দীর পর শতাব্দী প্রবাহিত হয়ে চলেছে। মত ও পথের ভিন্নতা সত্ত্বেও আন্তর-সাযুজ্যতায় সমস্ত ধর্মের মধ্যেই সমন্বয়ের সুর লক্ষিত হয়। তাই লোককল্যাণকামী ভগবান বুদ্ধ এবং তাঁর প্রবর্তিত ধর্মে যে সাধ্য-সাধন তত্ত্ব প্রকাশিত হয়েছিল, পরবর্তীকালে তারই অনুসৃতি বাংলাদেশের ধর্মধারায় অন্তঃসলিলা ফল্গুধারার মতো প্রবাহিত হয়েছে। বাংলাদেশের ভক্তি আন্দোলনে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব তাই অনিবার্য পরিণতি।

গ্রন্থপঞ্জী

১। যো ব্রহ্মানাং বিদধাতি পূর্বং যো বৈ বেদাংশ্চ প্রহিন্নোতি তস্মৈ তং হ দেবমাত্মবুদ্ধি প্রকাশং মুমুক্ষুর্বৈ শরণমহং প্রপদ্যে। (শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ: ৬.১৮)

২। "সো তস্মিন পরম প্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা চ, যলব্ধা পুমান সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।" (শাণ্ডিল্য সূত্র)

৩। *ললিতবিস্তর* : পৃ. ৫৬ L.F.-১৫

৪। *বুদ্ধদেব* : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৫। চরথ ভিক্খবে চারিকং বহুজন হিতায় বহুজনসুখায় লোকানুকম্পায় অত্থায় হিতায় সুখায় দেবমনুস্সানং মা একেন দ্বে অগাস্থি, দেখেন ভিক্খবে ধর্ম্মং আদি কল্যাণং মজ্ঝে কল্যাণং পরিযোসান কল্যাণং সাত্থং সব্যঞ্জনং কেবলং পরিপুন্নং পরিপুন্নং ব্রহ্মচরিয়ং পকাসথে। (বিনয় পিটক: মহাবগ্গ)

৬। *বুদ্ধদেব* : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

৭। সংযুক্ত নিকায়

৮। *Indian Philosophy* (Vol-1.p.470): Dr. S. Radhakrsnan.

৯। *বোধিচর্যাবতার*: শান্তিদেব ১৭-১৯নং শ্লোক

১০। চাটিলপাদ: *চর্যাপদ*

১১। *সুত্তপিটক* (অঙ্গুত্তর নিকায়, ৩য় ভাগ): ভিক্ষু জগদীশ কাশ্যপ সম্পাদিত পৃ. ৩১০

১২। কাহ্নপাদ: *দোহাগান*

১৩। দৌলতকাজী: *লোরচন্দ্রানী*

১৪। অদ্বয়বজ্রসংগ্রহ: তত্ত্বরত্নাবলী।

সহায়ক গ্রন্থাবলী

১. উপনিষদ (শ্বেতাশ্বতর): আনন্দ আশ্রম সংস্কৃত গ্রন্থাবলী

২. *অদ্বয় বজ্র সংগ্রহ*: হরপ্রসাদ শাস্ত্রী সম্পাদিত, ওরিয়েন্টাল ইন্সটিটিউট, বরোদা, ১৯২৭।
৩. *চর্যাগীতি কোষ*: প্রবোধ বাগচী ও শান্তিভিক্ষু সম্পাদিত, বিশ্বভারতী, ১৯৫৬
৪. *নাথ সম্প্রদায়ের ইতিহাস*, ধর্ম ও সাধনা, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৫০
৫. *বিনয়পিটক* (মহাবগগ): ভিক্ষু কাশ্যপ, নালন্দা ১৯৫৮
৬. *বোধিচর্যাবতার*: শান্তিদেব, মিথিলা বিদ্যাপীঠ, ১৯৬০
৭. *বাউল ও বাউল গান*: উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য
৮. *বৈষ্ণব পদাবলী সংগ্রহ*: হরেকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় সম্পাদিত, সাহিত্য সংসদ, কলকাতা ১৯৮০
৯. *ভারতকোষ*: ভারতকোষ পরিচালনা সমিতির সম্পাদকমন্ডলী সম্পাদিত, ১৯৭৩
১০. *বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস*, আশুতোষ ভট্টাচার্য: কলকাতা বুক হাউস, ১৯৭৫
১১. *বুদ্ধদেব*: রবীন্দ্রনাথ
১২. *ললিত বিস্তর*
১৩. *সংযুক্ত নিকায়*, বরোদা পাবলিকেশন, ১৯৫৯
১৪. *লোরচন্দ্রানী*: দৌলত কাজী
১৫. *Indian Philosophy* : S. Radhakrsnan, London, 1923
১৬. শান্ডিল্য সূত্র

চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম ঃ প্রচার ও বিকাশ

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া*

চট্টগ্রামের সীমা

চট্টগ্রাম বলতে বর্তমান কক্সবাজার জেলা ও চট্টগ্রাম জেলাকে বুঝানো হচ্ছে। এর সীমা পশ্চিমে বঙ্গোপসাগর ও ফেনী নদী, পূর্বে পার্বত্য চট্টগ্রাম, দক্ষিণে নাফ নদী এবং উত্তরে ফেনী নদী। এছাড়া, কুতুবদিয়া, মহেশখালী, মাতারবাড়ি, সোনাদিয়া, শাহপরী, সেন্টমার্টিন, উড়িরচর, সন্দ্বীপ-এসব দ্বীপও চট্টগ্রামের অন্তর্ভুক্ত। চট্টগ্রাম জেলার সীতাকুণ্ড পর্বতে ১৮৮৬ খ্রিস্টাব্দে প্রাগৈতিহাসিক যুগের কিছু নিদর্শন আবিষ্কৃত হবার ফলে গবেষকগণ মনে করেন যে, চট্টগ্রাম একটি সুপ্রাচীন দেশ। সীতাকুণ্ড পর্বতে নব্য প্রস্তরযুগের অশ্মীভূত (Fossil-ized) কাঠের তৈরি হাতিয়ার কৃপাণ আবিষ্কৃত হয়; এগুলোর চারখানা বৃটিশ মিউজিয়ামে এবং একখানা করে কলকাতা ও ঢাকা মিউজিয়ামে সংরক্ষিত আছে। এতে প্রমাণিত হয় যে, অতি প্রাচীনকাল থেকে চট্টগ্রামে জনবসতি ছিল।

কিংবদন্তী আছে, মহাভারতীয় যুগে চট্টগ্রাম বলির পুত্রের সুহ্মর রাজ্য সুহ্মর দেশের অন্তর্গত ছিল। অতঃপর কর্ণের পুত্র বিকর্ণ চট্টগ্রামে রাজত্ব করেন। তাঁর রাজধানী ছিল কাঞ্চননগর। পটিয়ায় ও ফটিকছড়িতে দু'টি কাঞ্চননগর রয়েছে। সাতকানিয়া থানায় কাঞ্চনা নামে অপর একটি স্থান আছে। এই তিনটি স্থান বিকর্ণের রাজধানীর গৌরব দাবী করে (শরীফ, আহমদ; *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, আগামী প্রকাশনী, ঢাকা, ২০০১,পৃঃ ১১)। নোয়াখালী জিলার সিলুয়া গ্রামে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতকে ব্রাহ্মী লিপিতে উৎকীর্ন শিলালিপি আবিষ্কারের ফলে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, নোয়াখালী ও চট্টগ্রাম মৌর্য সাম্রাজ্যভূক্ত অথবা সংস্কৃতির প্রভাবাধীন ছিল (হক চৌধুরী, আবদুলঃ *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা*, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃঃ ১০)।

চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের প্রচার

খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই চট্টগ্রাম তথা ভারতবর্ষের সাথে আরাকানের গভীর যোগাযোগ ছিল। মিয়ানমার ও আরাকানের কয়েকটি স্থানের নামকরণ যেমন—অমরাপুর, রামাবতী, ধান্যবতী (দিন্নওয়াতী), হংসবতী (হান্তাওয়াতী), বৈশালী প্রভৃতি থেকে এ ধারণা সুস্পষ্ট হয়। রাজাদের নাম অনিরুদ্ধ (অনোরহট), নরসিংহপতি এবং আরাকানের চন্দ্রসূর্য ও বৈশালীর চন্দ্রবংশের রাজাদের নামও ভারতীয় প্রথার অনুকরণ বলে মনে হয়। বৈশালীর

---

* ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাংলাদেশ) প্রাচ্যভাষা বিভাগের অধ্যাপক।

চন্দ্রবংশীয় রাজা ও সমতটের চন্দ্রবংশীয় রাজাদের মধ্যে নিকট সম্বন্ধ থাকাও বিচিত্র নয়। বিশেষ করে প্রাকৃতিক ও ভৌগোলিক দিক থেকেও আরাকান ও চট্টগ্রাম নিকটতম প্রতিবেশী ভূখণ্ড। এ সকল কারণে সুপ্রাচীন কাল থেকে চট্টগ্রাম ও আরাকানের মধ্যে একটি সুনিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠে এবং একটি অখণ্ড দেশরূপে পরিগণিত হয়।

পালি মহাবগ্‌গ নামে পিটক গ্রন্থে তপস্‌সু ও ভল্লিক নামে দুজন মধু বণিকের উল্লেখ আছে। গৌতম বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভ করার সপ্তম সপ্তাহের শেষ দিনে রাজায়তন বৃক্ষমূলে অবস্থানকালে উক্ত বণিকদ্বয় মধু ও মধুমিশ্রিত পিঠা বুদ্ধকে দান করেন। এরা দুজনই বুদ্ধের প্রথম গৃহী দ্বেবাচিক উপাসক নামে খ্যাত (মহাবগ্গ, অনুঃ পৃঃ ৪-৫)। পণ্ডিতগণ মনে করেন তাঁরা উভয়ে বর্তমান উড়িষ্যার অধিবাসী ছিলেন। অপরদিকে কেউ কেউ উক্ত বণিকদ্বয়কে মিয়ানমারের (বার্মা) অধিবাসী বলে দাবী করেছেন।

শাসনবংস নামক মিয়ানমারের ধর্মেতিহাস গ্রন্থেও তপস্‌সু, ভল্লিককে রামঞ্ঞ (বার্মা) রাজ্যের অধিবাসী বলে বর্ণিত হয়েছে (মহাস্থবির, ধর্মাধার (অনুঃ) কলিকাতা, ১৯৬২, পৃঃ ৫৩)।

শাসনবংশ থেকে জানা যায় গবম্পতি নামে জনৈক অর্হৎ ভিক্ষুর প্রার্থনাক্রমে তথাগত বুদ্ধ বোধি প্রাপ্তির অষ্টম বর্ষে অনেক শত ভিক্ষু-সংঘ সাথে নিয়ে আকাশ মার্গে রামঞ্ঞ রাষ্ট্রের সুধম্মপুরে উপনীত হয়ে সদ্ধর্মদেশনা ও প্রচার করেছিলেন (প্রাগুক্ত, পৃঃ৫৪-৫৬)।

পিটক বহির্ভূত পালি সাহিত্যে উল্লেখ আছে যে, মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি শেষে মোগ্গলিপুত্ত তিস্‌স থেরের নির্দেশে বিভিন্ন অঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য মিশন প্রেরণ করা হয়েছিল; তন্মধ্যে উত্তর ও সোণ নামক দু'জন প্রাজ্ঞ ভিক্ষুর নেতৃত্বে একটি মিশন সুবর্ণভূমি (বর্তমান মিয়ানমারের নিম্নবার্মার অন্তর্গত পেগু ও মৌলমেইন জিলা, শাসন বংশ মতে সুবর্ণভূমি বা সুধম্ম নগর বর্তমান থাটন (Thaton) সিতাং নদীর মোহনায় অবস্থিত) উপনীত হয়ে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকের নাগার্জুনকোণ্ডা লেখতে উল্লেখিত হয়েছে যে ব্রহ্মদেশে তৃতীয় শতকে বৌদ্ধধর্ম বর্তমান ছিল। প্রসিদ্ধ টীকাকার আচার্য বুদ্ধঘোষ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে বহু বৌদ্ধ শাস্ত্রসহ শ্রীলংকা হতে ব্রহ্মদেশে (মিয়ানমারে) আসেন এবং সেগুলো ব্রহ্মদেশীয় ভাষায় অনুবাদ করেন (হালদার, মনিকুন্তলা; *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা,* ১৯৯৬, পৃঃ ৩৭১)। কাজেই দেখা যায় খ্রিস্টীয় শতকের পূর্বেই মিয়ানমারে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়ে ক্রমান্বয়ে প্রতিষ্ঠা পেয়েছিল। তিব্বতী লামা তারনাথও উল্লেখ করেছেন যে, হীনযান ধর্মমত ব্রহ্মদেশের পাগান এবং পেগুতে সম্রাট অশোকের সময়কাল হতেই প্রচলিত ছিল কিন্তু আচার্য বসুবন্ধুর শিষ্য তথায় মহাযান ধর্ম প্রচলন করেন এবং ব্রহ্মদেশে হীনযান ও মহাযান বৌদ্ধধর্ম বহুদিন ধরে পাশাপাশি সহাবস্থান করেছিল (Eliot, Sir Charles; *Hinduism and Buddhism,* vol. III. London, 1922, p.52)।

উপরোক্ত আলোচনায় দেখা যায় যে, খ্রিস্টপূর্ব যুগ থেকেই মিয়ানমারের (বার্মা) সাথে ভারতবর্ষের নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। বুদ্ধ স্বয়ং সুবর্ণভূমি বা মিয়ানমারে উপনীত হয়ে যে ধর্ম প্রচার করেছিলেন বলে কিংবদন্তী রয়েছে তার ঐতিহাসিক সত্যতা নিয়ে পণ্ডিতদের মধ্যে যথেষ্ট সন্দেহ রয়েছে। চট্টগ্রামেও অনুরূপ কিংবদন্তী রয়েছে যে বুদ্ধ একসময় হস্তীগ্রামে আগমন করে পক্ষকাল ধর্ম প্রচার করেছিলেন। সেই হস্তীগ্রাম চট্টগ্রামের পটিয়া থানার অন্তর্গত হাইদগাঁও বলে ধারণা করা হয়। এখানে পূর্বে একটি বুদ্ধ মন্দির বা ক্যাং ছিল (আলম, ওহিদুল; *চট্টগ্রামের ইতিহাস*, চট্টগ্রাম, ১৯৮২, পৃঃ৮)। এ মতেরও কোনো সত্যতা প্রমাণিত হয়নি, তবে কিংবদন্তী বলে এসব প্রচলিত ধারণা একেবারে উপেক্ষা করার নয়। এছাড়া খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে অশোক কর্তৃক প্রেরিত মিশনকে চট্টগ্রাম হয়ে মিয়ামার (সুবর্ণভূমি) যেতে হয়েছে। কারণ তখন ভারতবর্ষ থেকে বার্মায় যাতায়াতের জন্য এটাই ছিল সহজ ও প্রশস্ত পথ। পণ্ডিতগণ ধারণা করেন প্রচারকদল যাবার পথে চট্টগ্রামে অবস্থান করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন এবং প্রচারকদের মধ্যে কয়েকজন চট্টগ্রামে থেকে গিয়েছিলেন।

ইতিমধ্যে পুণ্ড্রবর্ধন নগরে প্রাপ্ত মৌর্যযুগের একটি শিলালিপি এবং নোয়াখালী জেলার সিলুয়া গ্রামে আবিষ্কৃত ব্রাহ্মী শিলালিপি থেকে অনুমিত হয় যে, খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় শতকে বাংলাদেশ মৌর্য সাম্রাজ্যভুক্ত ছিল, কিংবা মৌর্যদের আজ্ঞাবহ সামন্তরাজ কর্তৃক শাসিত হত। মৌর্য সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় যেখানে সমগ্র ভারতবর্ষসহ বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ও প্রসার লাভ করেছিল সেক্ষেত্রে মগধের নিকটতর বৃহত্তর বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত না হওয়ার কোনো যুক্তিসংগত কারণ নেই। ঐতিহাসিক রমেশ চন্দ্র মজুমদার (*বাংলাদেশের ইতিহাস প্রাচীন যুগ*, কলিকাতা, ১৯৮১, পৃঃ ২০৯), নীহার রঞ্জন রায় (*বাঙ্গালীর ইতিহাস*, কলিকাতা, ১৪০২, পৃঃ ১১৭) প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন, অশোকের যুগেই বৌদ্ধধর্ম প্রাচীন বাংলায় কোনো কোনো স্থানে বিস্তার ও প্রতিষ্ঠা লাভ করেছিল। চট্টগ্রামেও যে বুদ্ধযুগে না হলেও মৌর্যযুগে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয়েছিল, এটা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

আরাকানের প্রাচীন ইতিহাস রাজোয়াং সূত্রে অবগত হওয়া যায় যে, খ্রিষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যভাগে (১৪৬ খ্রিস্টাব্দে) মগধ দেশের চন্দ্র-সূর্য নামক জনৈক সামন্ত যুবক তাঁর বহু অনুগামী সৈন্য সামন্ত নিয়ে চট্টগ্রাম ও আরাকান দখল করে একটি অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন এবং আরাকানের ধান্যবতীতে রাজধানী স্থাপন করেন। চন্দ্রসূর্য এবং তাঁর সাথে আগত সৈন্যদের অধিকাংশ ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। তাঁরা চট্টগ্রাম ও আরাকানে ভারতীয় ধর্ম ও সংস্কৃতি প্রসারে কার্যকর ভূমিকা পালন করেন। মগধাগত বৌদ্ধ এবং চট্টগ্রাম ও আরাকানের বৌদ্ধদের মধ্যে নিবিড় সাংস্কৃতিক ও ধর্মীয় সম্পর্ক গড়ে উঠে। তাঁদের মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্কও স্থাপিত হয়। রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতা পাওয়ায় আরাকানে

ও চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের দ্রুত বিস্তার লাভ ঘটে। বিভিন্ন স্থানে বহু বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য নির্মিত হয়।

চট্টগ্রামের শাসকশ্রেণী ও বৌদ্ধধর্মের অবস্থা

বার্মার ঐতিহ্য অনুযায়ী জানা যায়, চন্দ্র-সূর্য বংশের ২৫জন রাজা একাক্রমে ৬২৪ বছর চট্টগ্রামসহ আরাকানে রাজত্ব করেন। এসময়ের রাজারা হলেন যথাক্রমে চন্দ্র-সূর্য (১৪৬-১৯৮), সূর্যাধিপতি (১৯৮-২৪৫), সূর্য প্রতিপদ (২৪৫-২৯৪), সূর্যরূপ (২৯৪-৩১৩), সূর্যমণ্ডল (৩১৩-৩৭৫), সূর্যবর্ণ (৩৭৫-৪১৮), সূর্যনাথ (৪১৮-৪৫৯), সূর্যাবন্ত (৪৫৯-৪৬৪), সূর্যবন্ধু (৪৬৪-৪৭৪), সূর্যকল্যাণ (৪৭৪-৪৯২), সূর্যমুখ (৪৯২-৫১৩), সূর্যতেজ (৫১৩-৫৪৪),সূর্যপুণ্য (৫৪৪-৫৫২), সূর্যকলা (৫৫২-৫৭৫), সূর্যপ্রভা (৫৭৫-৬০০), সূর্য সিত্ত (৬০০-৬১৮), সূর্যতীর্থ (৬১৮-৬৪০),সূর্যবিমল (৬৪০-৬৪৮), সূর্যয়েন (৬৪৮-৬৭০), সূর্যগ্রন্থ (৬৭০-৬৮৬), সূর্যস্বর্গ(৬৮৬-৬৯৪), সূর্যশ্রী (৬৯৪-৭১৪), সূর্যক্ষিতি (৭১৪-৭২৩), সূর্যকূট (৭২৩-৭৪৬) ও সূর্যকেতু (৭৪৬-৭৮৮)।

৭৮৮ খ্রিস্টাব্দ থেকে চন্দ্র-সূর্য বংশের মহাসিংহ চন্দ্র (৭৮৮-৮১০) বৈশালীতে রাজধানী প্রতিষ্ঠা করে আরাকান শাসন করেন। এবংশের রাজাগণ যথাক্রমে সূর্যসিংহ চন্দ্র, সৌলসিংহ চন্দ্র, পুর সিংহ চন্দ্র, কালচন্দ্র সিংহ, তুবচন্দ্র সিংহ, শ্রীসিংহ চন্দ্র, তীক্ষ্ণসিংহ চন্দ্র, চুড়সিংহ চন্দ্র প্রমুখ রাজাগণ ৯৫৭ খ্রিস্টাব্দ অবধি রাজধানী বৈশালী থেকে আরাকান শাসন করেছেন। মিউগোত্রের অম্যহতু আরাকানের সিংহাসন দখল করেন, কিন্তু তাঁর পুত্র য়েপিউ থেকে চুড়সিংহ চন্দ্রের এক পুত্র সিংহাসন কেড়ে নেন। তারপর চুড়সিংহ চন্দ্রের ভ্রাতু ষ্পুত্রের সন্তান কিতাথিন রাজ্য অধিকার করে পিন্‌সাতে রাজধানী স্থাপন করেন। এরপর এবংশের লিটামিনু ১১০৩ অথবা ১১১৮ খ্রিস্টাব্দে পেরিনে রাজধানী স্থাপন করে আরাকান শাসন করেন। এ বংশের মিনুসা ১১৬৭ খ্রিস্টাব্দে হরকিতে রাজধানী স্থাপন করেন। ১১৮০ খ্রিস্টাব্দে এবংশের রাজা মিসুথন পুনরায় পিনসাতে রাজধানী স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর ১২৩৭ খ্রিস্টাব্দে লঙ্গিয়েতে রাজধানী স্থাপন করা হয়; ১৪৩৪ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত এখানে রাজধানী অবস্থিত ছিল। চৌদ্দ শতক অবধি আরাকান স্বাধীন ছিল। পনের শতকের প্রথমদিকে ত্রিশ বছরের জন্য আরাকান বার্মার অধীন হয়। ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে শঙ্খ নদের উত্তর দিকের চট্টগ্রাম মোগল সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত হয়। ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে দক্ষিণ চট্টগ্রামের নাফ নদীর উত্তর তীর অবধি মোগল সাম্রাজ্যর্ভুক্ত হয় (হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১১৯-১২০)। ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দে আরাকান বার্মার অন্তর্ভুক্ত হয়ে তার সুপ্রাচীন কালের স্বাধীন সত্তা চিরতরে হারিয়ে ফেলে। ১৮২৬ খ্রিস্টাব্দের ২৬ জানুয়ারী আরাকান ইংরেজ সাম্রাজ্যভুক্ত হয়। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর আরাকান বার্মার সমন্বয়ে বার্মা (বা মিয়ানমার) স্বাধীন রাজ্য প্রতিষ্ঠিত হয়। উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় শতকে চন্দ্রসূর্য বংশীয় প্রথম রাজা মগধাগত

সামন্তযুবক চন্দ্রসূর্য চট্টগ্রাম ও আরাকানের সমন্বয়ে যে অখণ্ড রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন সেই রাজবংশীয় রাজারা মাঝে মধ্যে বিরতি দিয়ে কমপক্ষে হাজারাধিক বছর শাসন করেছিলেন। চন্দ্রসূর্য ছিলেন বৌদ্ধ। অন্ধকারাচ্ছন্ন অনুন্নত ও অসংস্কৃত চট্টগ্রাম ও আরাকানবাসীকে তিনিই সর্বপ্রথম ভারতীয় সুসংস্কৃত সভ্যতায় দীক্ষা দিয়েছিলেন। এতদঞ্চলে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি প্রচারে তাঁর মুখ্য ভূমিকা ছিল। তিনি বৌদ্ধধর্মকে রাজকীয় ধর্ম রূপে ঘোষণা করেন। আরাকানে মহামুনি প্যাগোডা নির্মাণ করে তিনি তথায় মহামুনি বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার প্রসারে তাঁর পৃষ্ঠপোষকতা অবিস্মরণীয়। তাঁর পরবর্তী রাজারাও ছিলেন বৌদ্ধধর্মাবলম্বী; ফলে স্বাভাবিকভাবে তাঁরাও বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। সম্ভবত খ্রিস্টীয় সপ্তম শতকের প্রথম পাদে আরাকান রাজাদের আভ্যন্তরীণ কলহের কারণে চট্টগ্রাম আরাকান রাজ্যচ্যুত হয়ে সমতটের খড়্গদের শাসনাধীনে চলে আসে। ঢাকার ত্রিশ মাইল উত্তর-পূর্বস্থিত আশরাফপুরে প্রাপ্ত দু'টি তাম্রশাসন এবং কুমিল্লা থেকে এগার মাইল দূরে দেউলবাড়িতে প্রাপ্ত সর্বাণিমূর্তিলিপি থেকে জানা যায় খড়্গ বংশের প্রথম রাজা খড়্গোদ্যম, তাঁর পুত্র জাতখড়্গ, তাঁর পুত্র দেবখড়্গ এবং তাঁর পুত্র রাজভট্ট পর্যায়ক্রমে রাজত্ব করেন। খড়্গ বংশীয় রাজারা সকলেই ছিলেন বৌদ্ধধর্মের পরম ভক্ত ও অনুসারী। তাঁরা খ্রিস্টীয় আনুমানিক ৬৩০ অব্দ থেকে ৭০০ অব্দ পর্যন্ত স্বাধীনভাবে সমতটে রাজত্ব করেন। তখন চট্টগ্রামও সমতটের অঙ্গীভূত ছিল। তাঁদের রাজধানী ছিল বর্তমান কুমিল্লা জিলার বড়কামন্তা। চীনা পরিব্রাজক ইৎ সিঙ ও সেঙ চি ৬৭৩-৮৩ খ্রিস্টাব্দে সমতট ভ্রমণে আসনে, তখন সমতটে খড়্গ বংশীয় রাজভট্ট রাজত্ব করতেন। এর প্রায় ত্রিশ বছর পূর্বে প্রখ্যাত চীনা পর্যটক হিউয়েন সাঙ সমতটে দুহাজারাধিক বৌদ্ধ ভিক্ষু ও বহু বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য প্রত্যক্ষ করেছিলেন। সেঙ চি ত্রিশ বছর পরে সমতটে চার হাজারের অধিক বৌদ্ধভিক্ষু প্রত্যক্ষ করেন। সেঙ চি বলেন, রাজভট ছিলেন পরমোপাসক এবং ত্রিরত্নের প্রতি অত্যন্ত শ্রদ্ধাশীল। তিনি প্রত্যহ বুদ্ধের একলক্ষ মৃন্ময় মূর্তি নির্মাণ করাতেন, মহাপ্রজ্ঞাপারমিতা-সূত্রের এক লক্ষ শ্লোক পাঠ করতেন এবং একলক্ষ সদ্য চয়িত ফুল দিয়ে পূজা করতেন। দান-ধ্যানও ছিল তাঁর প্রচুর। মাঝে মাঝে তিনি বুদ্ধের সম্মানার্থে শোভাযাত্রা বের করতেন। সামনে থাকত অবলোকিতেশ্বরের একটি প্রতিমা, পেছনে সারি সারি চলতেন ভিক্ষু ও উপাসকেরা; সকলের পেছনে চলতেন রাজা (রায়, পৃঃ ৫০৪-৫)। গবেষকদের মতে, চট্টগ্রামও সাত শতকে সমতট রাজ্যভুক্ত ছিল (শরীফ, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৩)। চট্টগ্রামসহ সমতটে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক উন্নতি ও বিস্তৃতির কারণ খড়্গবংশীয় বৌদ্ধ রাজাদের সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতা ও সমর্থন।

খ্রিষ্টীয় অষ্টম শতকের প্রথম পাদে চট্টগ্রাম সম্ভবত সমতটের দেব রাজবংশের শাসনাধীনে ছিল। কুমিল্লার লাথলমাই পাহাড়ের শালবন বিহারে আবিষ্কৃত দুটি তাম্রশাসন সূত্রে জানা যায় এবংশের যথাক্রমে শান্তিদেব (আনু. ৭২০-৭৩৫ খ্রিঃ), তাঁর পুত্র বীরদেব (আনু ৭৩৫-

৭৫০ খ্রিঃ) তাঁর পুত্র আনন্দদেব (আনুঃ৭৫০-৭৭৫খ্রিঃ) এবং তাঁর পুত্র ভবদেব (আনুঃ৭৭৫-৮০০খ্রিঃ) স্বাধীনভাবে সমতটে রাজত্ব করেন। তাঁরাও ছিলেন বৌদ্ধ ধর্মের অনুসারী। এ সময়ে চট্টগ্রামে বহু বিহার ও চৈত্য নির্মিত হয়। সমতটে নির্মাণ করেন শালবন বিহারসহ বহু বৌদ্ধ বিহার ও চৈত্য।

উপরোক্ত সময়ে চট্টগ্রাম সমতটের অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ দ্বিমত পোষণ করেন। তবে ঐ সময়ে আরাকানের রাজাদের কোন্দলের কারণে চট্টগ্রাম একাধিকক্রমে অথবা বিচ্ছিন্নভাবে সমতটের অধিকারভুক্ত হয়। সম্ভবত অষ্টম শতকের মধ্যমভাগে চট্টগ্রাম পুনরায় আরাকান রাজ্যভুক্ত হয়।

বাংলার শক্তিশালী রাজা ধর্মপালের (৭৭০-৮১০ খ্রী.) রাজত্বকাল চট্টগ্রাম পালরাজ্যভূক্ত হয়। রাজা ধর্মপাল শাসিত বাংলার দক্ষিণ-পূর্ব উপকূলীয় অঞ্চলের রাজধানী রহমী বা রাহমা বৃহত্তর চট্টগ্রামের রামু পাল রাজাদের তাম্র শাসনে বর্ণিত তাঁদের 'সমুদ্রকুল উদ্ভূত' উক্তি থেকে আধুনিক গবেষকগণ মনে করেন যে, বৃহত্তর চট্টগ্রামের বঙ্গোপসাগরের তীরবর্তী রামু অঞ্চলেই বাংলার পালরাজ বংশের উৎপত্তি (হক চৌধুরী, আবদুল; *চট্টগ্রামের বড়ুয়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়: ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে*, দৈনিক আজাদী, ২৪-০৫-১৯৯১ইং)।

রাজা ধর্মপাল বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ ভক্ত ছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রচার-প্রসার ও উন্নয়নে তাঁর অবদান অবিস্মরণীয়। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের ভিতর পঞ্চাশটির অধিক বিহার প্রতিষ্ঠা করেন। তন্মধ্যে বিক্রমশীল, ওদন্তপুরী, সোমপুর, জগদ্দল, বিক্রমপুরী, পণ্ডিত বিহারগুলো ছিল এক একটি আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষা কেন্দ্র। এসব শিক্ষা কেন্দ্রে বৌদ্ধধর্ম দর্শনের সাথে বিভিন্ন পৌরাণিক, বৈদিক ও ব্রাহ্মণ্যধর্ম-শাস্ত্রসহ বৈষয়িক শাস্ত্র শিক্ষা দেওয়া হত। চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারও এক সময় আন্তর্জাতিক বলয়ে পরিচিতি লাভ করেছিল। এ প্রসঙ্গে ড: আহমদ শরীফ বলেন,

"এমনও অনুমিত হয় যে নালন্দা বিহারের গৌরব ও প্রভাব ম্লান হওয়ার কালে চট্টগ্রামই বৌদ্ধধর্ম, শিক্ষা ও সংস্কৃতির কেন্দ্র হয়ে ওঠে। এখানকার পণ্ডিত বিহারের খ্যাতিও ছিল আন্তর্জাতিক (চট্টগ্রামের ইতিহাস, পৃঃ ১২)।"

তিনি এ-ও মনে করেন যে, খ্রিস্টীয় তৃতীয় শতকেও চট্টগ্রামে বৌদ্ধশাস্ত্রসহ বিভিন্ন শাস্ত্র ও ধর্মদর্শনের ব্যাপক চর্চা হত (প্রাগুক্ত, পৃ.১২)। এতে অনুমান করা যায় যে, তৃতীয় শতক থেকে কিংবা তারও পূর্ব থেকে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক চর্চা শুরু হয়।

এই পণ্ডিত বিহার মহাযান বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের বিশেষ করে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মের শিক্ষা ও সংস্কৃতির একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্র হিসেবে দেশের সর্বত্র খ্যাতি লাভ করেছিল। ৮৪ সিদ্ধাচার্যের মধ্যে অনেকে এ শিক্ষায়তনের অধ্যাপক ও ছাত্র ছিলেন। এক সময় পণ্ডিত বিহার—বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান অধ্যক্ষ ছিলেন পটিয়া থানার চক্রশালা নিবাসী ব্রাহ্মণ সন্তান

তিলপাদ। তিনি দশম শতকের শেষ ভাগে রাজা মহীপালের (আনু. ৯৮৮-১০৩৩ খ্রিঃ) সময়ে জীবিত ছিলেন। প্রথম জীবনে তিনি ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন, পরবর্তীতে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে প্রজ্ঞাভদ্র নাম গ্রহণ করেন। প্রজ্ঞাভদ্র বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় স্ত্রীসহজসম্ভরাধিষ্ঠান, অচিন্তমহামুদ্রানাম, চণ্ডু চতুরেবপদেশ, প্রসন্নদীপ মহামুদ্রোপদেশ, ষড়ধর্মোপদেশ, দোহাকোষ প্রভৃতি মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। পণ্ডিত বিহারের সঙ্গে জড়িত পণ্ডিতদের মধ্যে লুইপা, অনঙ্গবজ্র, শবরীপাদ, অবদূতপাদ, নানাবোধ, জ্ঞানবজ্র, বুদ্ধজ্ঞানপাদ, অমোঘনাথ, ধর্মশ্রীমৈত্র প্রমুখের নাম উল্লেখযোগ্য (চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ৮)। দুর্ভাগ্যক্রমে এই ইতিহাসখ্যাত পণ্ডিত বিহারের অবস্থান সম্পর্কে এখনো স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব হয়নি। কোনো কোনো গবেষক মনে করেন পণ্ডিত বিহার চট্টগ্রামের পটিয়া থানার বড় উঠানের কাছে ঝিউরি (আনোয়ারা) গ্রামের সন্নিকটে দেয়াং পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। অপর কতিপয় গবেষক মনে করেন যে, পণ্ডিত বিহার চট্টগ্রাম শহরের আন্দরকিল্লার রঙমহল পাহাড় বা বর্তমান জেনারেল হাসপাতালের পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। অপর একটি অভিমত হচ্ছে এ বিহার পটিয়া থানার অন্তর্গত চক্রশালায় অবস্থিত ছিল। তখন এই স্থানের সামন্ত রাজা ছিলেন শ্রীজয়চন্দ্র; তাঁরই সক্রিয় প্রচেষ্টায় পণ্ডিত বিহার প্রতিষ্ঠিত হয়। আবার কারো কারো মতে পণ্ডিত বিহার সীতাকুণ্ডের চন্দ্রনাথ পাহাড়ে কিংবা মিরসরাইর পরাগলপুরে ছুটি খাঁর দীঘির সন্নিকটে অবস্থিত ছিল। তবে এটা নিঃসন্দেহ যে, পণ্ডিত বিহার চট্টগ্রামের কোনোও স্থানে অবস্থিত ছিল। যথাযথ প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালানো সম্ভব হলে এ ঐতিহ্যময় বিশ্ববিদ্যালয়ের অবস্থান জানা যাবে। এ বিহারে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন পণ্ডিত ও শিক্ষার্থীর সমাবেশ হত এবং ধর্ম-দর্শনসহ বিভিন্ন বিষয়ের গভীর চর্চা হত বলেই এটা 'পণ্ডিত বিহার' নামে খ্যাতি লাভ করে। খ্রিস্টীয় নবম শতকে পণ্ডিত বিহারের খ্যাতি দেশ বিদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল। এ থেকে প্রমাণিত হয় যে খ্রিস্টীয় নবম শতকে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টীয় নবম শতকে চট্টগ্রাম হরিকেল রাজ্যভুক্ত হয়। হরিকেলের তখনকার রাজধানী ছিল বর্ধমানপুর এবং বর্ধমানপুরের রাজা ছিলেন কান্তিদেব (আনুমানিক ৮৫০-৯৫০ খ্রীঃ)। কান্তিদেবের একটি তাম্রশাসন থেকে এ তথ্য জানা যায়। তাম্রশাসনটি পাওয়া গেছে পটিয়া থানার বড় উটান বা বড় উঠান গ্রামে। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক প্রমুখ মনে করেন, পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান প্রাচীন বর্ধমানপুর অভিন্ন। তবে অনেকে এমত সমর্থন করেন না। তাঁদের মতে, ইউ হে নামে জনৈক চীনা পর্যটক বলেছেন যে, হরিকেল রাজ্য সিংহল থেকে সমুদ্র পথে তিরিশ দিনের রাস্তা এবং নালন্দা থেকে একশত যোজন (৮০০ মাইল) দুরে অবস্থিত ছিল। চট্টগ্রামের পটিয়া থানার বর্তমান বড় উঠান গ্রামটি ইউ হের বর্ণিত দূরত্বের সাথে মিলে যায়। কাজেই বড় উঠানই প্রাচীন হরিকেল রাজ্যের রাজা কান্তিদেবের রাজধানী বর্ধমানপুর। বর্ধমানপুর বিবর্তিত রূপ বড় উঠান। বড় উঠানের দেয়াং পাহাড়ের কাছে বিশ্বমুড়া নামক পাহাড়ী এলাকায় ৭-৮ ফুট

মাটির নীচে একটি প্রাচীন পাকা ভবনের প্রশস্ত দেওয়ালের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। সেখানে কালো পাথরের একটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয়। এটা সম্ভবত হরিকেল রাজাদের প্রাসাদ ছিল (হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৪-১৫)। কান্তিদেব যে হরিকেল রাজ্যের চট্টগ্রামে রাজত্ব করতেন এটা অনেকের অভিমত। রাজা কান্তিদেবের রাজত্বকালেই চট্টগ্রামের পণ্ডিত বিহারের খ্যাতি ও গৌরব চরমে উঠেছিল। খড়্গ বংশীয় রাজগণ ও পাল বংশীয় রাজা ধর্মপালের পর চট্টগ্রাম ও সমতট খ্রিস্টীয় নবম শতকের শেষার্ধে আরাকানের চন্দ্র রাজাদের অধিকারে আসে। আরাকান রাজ সুলত ঈং চন্দ্র (চুড় সিংহ চন্দ্র) ৯৫৩ খ্রিস্টাব্দে নিজ অধিকৃত রাজ্যের উত্তরাংশ চট্টগ্রামের সুরতন বিদ্রোহ দমন করে বিজয় স্তম্ভ নির্মাণ করেন এবং স্তম্ভে 'চিৎ তৌৎ গৌং' (অর্থাৎ যুদ্ধ করা সমীচীন নয়) বাণী লিখেন। এ শব্দ পরবর্তীকালে বিবর্তিত হয়ে 'চট্টগ্রাম' শব্দের উৎপত্তি বলে গবেষকগণ ধারণা করেন। সমসাময়িককালে সমতটে চন্দ্র বংশীয় বৌদ্ধ রাজারা রাজত্ব করতেন। তখন সমতটের রাজা ছিলেন শ্রীচন্দ্র (৯২৯-৯৭৫)। গবেষকগণ মনে করেন যে, সমতটের চন্দ্ররা আরাকানের চন্দ্রদেরেই জ্ঞাতি ছিলেন। কারণস্বরূপ বলা যায়, যে আরাকানের চন্দ্ররাজদের মুদ্রা সমতটের ময়নামতিতে পাওয়া গেছে।

দশম শতকের শেষদিকে ত্রিপুরারাজ যেং থু ফা অল্প সময়ের জন্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন। খ্রিস্টীয় এগার শতকে ব্রহ্মদেশের পঁগারাজ আনোরহটা (অনরহট বা অনিরুদ্ধ বা অনোরথ, রাজত্বকাল খ্রিঃ ১০১০-১০৪৪ অব্দ, মতান্তরে খ্রিঃ ১০৪৪-১০৭৭ অব্দ) আরাকান, চট্টগ্রাম ও দক্ষিণ বঙ্গের এক বিস্তৃত অঞ্চল জয় করেন এবং পার্শ্ববর্তী পট্টিকেরার রাজাকে করদানে বাধ্য করেন। ব্রহ্মদেশীয় উপাদান থেকে অবগত হওয়া যায় যে, বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক সংস্কার ও উন্নতি সাধনে রাজা অনিরুদ্ধ বা আনোরহটার অবদান অত্যন্ত শ্রদ্ধার সাথে স্মরণযোগ্য। কথিত আছে তখন উত্তর ব্রহ্মে ভেকধারী বা নকল ভিক্ষুগণ বাস করতেন এবং তাঁরা ছিলেন তান্ত্রিক। তাঁরা দলবদ্ধভাবে বাস করতেন এবং নিজেদের বুদ্ধের শ্রাবকরূপে পরিচয় দান করতেন। তাঁরা প্রচার করতেন যে, তাঁদের তুষ্ট করতে পারলে তাঁরা সর্ব প্রকার পাপ থেকে মানুষকে মুক্ত করতে সক্ষম (Eliot, ibid, PP.53-54)। এ থেকে অনুমিত হয় যে, চট্টগ্রাম বা বাংলাদেশের মত আরাকানেও মহাযানের তন্ত্রযান প্রচলিত হয়েছিল।

ব্রহ্মদেশীয় ইতিবৃত্ত 'Glass Palace Chronicles' নামক গ্রন্থ থেকে জানা যায় অনিরুদ্ধের সময়কালে অরহন্ত স্থবির (সিন অরহন) নামে জনৈক বৌদ্ধ আচার্য নিম্নব্রহ্মের সুধম্মপুর (থাটন) হতে অরিমদ্দনপুর (পাগান) এসেছিলেন। অরহন্ত স্থবির উক্ত ভেকধারী ভিক্ষুদের প্রচারিত ধর্মের অসারতা প্রমাণ করে যথার্থ বুদ্ধদেশিত ধর্ম প্রচার করেন। তাঁর নিকট রাজা অনিরুদ্ধ এবং দেশের বহু ব্যক্তি বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। উপরন্তু অনিরুদ্ধ নিম্নব্রহ্মের শাসক মনোহারিকে আক্রমণ করে বহু বৌদ্ধশাস্ত্র ও চিতাভস্ম বত্রিশটি শ্বেতহস্তীর পৃষ্ঠে আরোহণ করিয়ে উত্তর ব্রহ্মে নিয়ে আসেন। এছাড়া সিংহল থেকে পিটকগ্রন্থ আনয়ন

করে তিনি বর্মী ভাষায় অনুবাদ করান (হালদার, পৃঃ ৩৭৩-৭৪)। এ সময়ে অনিরুদ্ধ আরাকানসহ চট্টগ্রামে প্রচলিত তান্ত্রিক বৌদ্ধমত উচ্ছেদ করেন এবং হীনযান বা থেরবাদী বৌদ্ধমত প্রচার করেন। চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা হীনযান বা থেরবাদী বৌদ্ধমতের অনুসারী (হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ৩৫-৩৬)।

আহমদ শরীফ সাহেবও এমত সমর্থন করেন। তিনি বলেন, "খ্রিস্টীয় চার-পাঁচ শতক অবধি আরাকান চট্টগ্রাম একক অঞ্চলরূপে ছিল। এবং দশশতক অবধি আরাকানে ও চট্টগ্রামে মহাযান (সর্বাস্তিবাদী বা বিজ্ঞানবাদী) মত চালু ছিল। তবে তখনো ব্রাহ্মণ্যবাদ ম্লান হয়নি, প্রবলই ছিল। অনোরহটার রাজত্বকালে পঁগায় রাজকীয় সমর্থন শিন অরহন গুরুবাদী মহাযান 'আরি' মত উচ্ছেদ করে হীনযানী থেরবাদ (গুরুবাদ) প্রবর্তন করেন। আনোরহটা (১০৪৪-৭৭) আরাকান ও চট্টগ্রামাদি অঞ্চল পট্রিকের-র সীমা অবধি জয় করে সেখানেও থেরবাদ চালু করেন (চট্টগ্রামের ইতিহাস, আগমনী প্রকাশনী, ঢাকা ২০০১, পৃঃ ২৯)।

অনিরুদ্ধের পুত্র কন্‌ঝিত্থও (কিয়নজিত্ত্বা) বৌদ্ধধর্মাবলম্বী ছিলেন। তাঁর রাজত্বকাল পালি সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে 'স্বর্ণযুগ' হিসেবে অভিহিত করা যায়। এসময়ে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক উন্নতি সাধিত হয়। তাঁর পরবর্তী শাসকগণও ছিলেন বৌদ্ধধর্মের অনুসারী। কাজেই তাঁদের সময়ে আরাকান ও চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার লাভ হয়েছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ যে, কনঝিত্থ বুদ্ধগয়ার পবিত্র মহামন্দিরটি পুনঃ সংস্কার করান এবং ভারতবর্ষের এক চোলরাজাকে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণে সাহায্য করেন (হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৫)।

খ্রিস্টীয় দশম শতক থেকে ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মাঝে মধ্যে বিরতি থাকলেও চট্টগ্রামের সমগ্র দক্ষিণাঞ্চল আরাকান রাজ্যভুক্ত ছিল। অর্থাৎ কর্ণফুলী নদীর দক্ষিণ তীর থেকে টেকনাফ পর্যন্ত ১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দ এবং শঙ্খ নদীর দক্ষিণ তীর থেকে টেকনাফ ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম অবিচ্ছিন্নভাবে আরাকান শাসকের অধীনে ছিল। সমতটের দেববংশীয় রাজা দামোদর দেব তের শতকের প্রথমার্ধে অল্পকালের জন্য চট্টগ্রামের উত্তরাংশ নিজরাজ্যভুক্ত করে শাসন করেন। ত্রয়োদশ শতকের মধ্যভাগে আরাকানরাজ অলংপিউ চট্টগ্রামসহ বঙ্গদেশের কিছু অংশ জয় করেন। এ শতকের শেষার্ধে আরাকান রাজ মেংদি তাঁর রাজ্য ব্রহ্মপুত্র তীর অবধি বিস্তার করেন। ত্রয়োদশ শতকের শেষদিকে তাতারের খান অল্পকালের জন্য চট্টগ্রাম অধিকার করেন। চৌদ্দ শতকের প্রথমদিকে চট্টগ্রাম পুনরায় আরাকান রাজ্যভুক্ত হয় (হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৬)।

খ্রিস্টীয় ১৩৪০ অব্দে স্বাধীন সোনার গাঁর সুলতান ফখরুদ্দীন মোবারক শাহর সেনাপতি কদর খাঁ (বা কদল খাঁ গাজী) চট্টগ্রাম অধিকার করে সর্বপ্রথম চট্টগ্রামকে সোনার গাঁ রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত করেন। এসময় থেকেই চট্টগ্রামের ইসলাম শাসনের আরম্ভ। চট্টগ্রামের প্রশাসক নিযুক্ত করা হয় শায়দা নামক এক দরবেশকে। এই ভণ্ড দরবেশ ফখরুদ্দীনের পুত্রকে হত্যার অপরাধে জনসাধারণ কর্তৃক নিহত হন। ফখরুদ্দীন মোবারক শাহই ছিলেন

চট্টগ্রাম বিজয়ী প্রথম মুসলিম সুলতান। তাঁর শাসনামলে বিখ্যাত পরিব্রাজক ইবন বতুতা ১৩৪৬ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম পরিভ্রমণে আগমন করেন। মোবারক শাহের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র ইখতিয়ারউদ্দিন গাজী শাহ (১৩৫০-৫২ খ্রিঃ) সোনার গাঁর সুলতান হন। তাঁকে হত্যা করে সুলতান শামসুদ্দীন ইলিয়াচ শাহ (১৩৫২-৫৮ খ্রিঃ) চট্টগ্রামসহ সোনার গাঁ অধিকার করেন এবং তা গৌড় রাজ্যভুক্ত করে সমগ্র বঙ্গদেশের প্রথম স্বাধীন সুলতান হওয়ার গৌরব অর্জন করেন (করিম; আবদুল, *বাংলার ইতিহাস, সুলতানী আমল,* ঢাকা, ১৯৭৭ পৃঃ ১৯৫)। এর পর তাঁর পুত্র ও পৌত্র যথাক্রমে সিকান্দর শাহ (১৩৫৯-১৩৮৯ খ্রিঃ) ও গিয়সুদ্দিন আজম শাহ (১৩৮৯-১৪০৯খ্রিঃ) গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন। গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের সময়ে আরাকান রাজ নরমিখলা বা মঙ সাউ মঙ (১৪০৪-১৪০৬ খ্রিঃ) ব্রহ্মরাজ কর্তৃক রাজ্যচ্যুত হয়ে ১৪০৬ খ্রিস্টাব্দে গৌড়রাজ গিয়াসুদ্দীন আজম শাহের আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত ২৪ বছর গৌড় রাজের আশ্রয়ে নির্বাসিত জীবন অতিবাহিত করেন। ইতোমধ্যে গৌড়ে রাষ্ট্রবিপ্লব সংঘটিত হয়। গণেশ নামে জনৈক প্রভাবশালী হিন্দু অমাত্য গিয়াসুদ্দীন আজম শাহকে হত্যা করে তাঁর পুত্র সাইফুদ্দীন হামজা শাহকে (১৪১০-১২ খ্রিঃ) গৌড়ের সিংহাসনে বসান। গণেশের ষড়যন্ত্রে ক্রীতদাস শিহাবুদ্দীন বায়েজিদ হামজা শাহকে হত্যা করে নিজে গৌড়ের সুলতান হন। পরে গণেশের চক্রান্তে বায়েজিদ শাহও (১৪১২-১৪১৪ খ্রিঃ) পদচ্যুত বা নিহত হলে গণেশ প্রথমবার (১৪১৪-১৪১৫ খ্রিঃ) সিংহাসনে আরোহণ করেন। পরবর্তী সময়ে গণেশ তাঁর পুত্র যদুকে ইসলামধর্মে দীক্ষিত করে সিংহাসনে বসান। যদুর নাম হয় জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহ। কিন্তু পরের বছর গণেশ পুত্রকে বন্দি করে নিজে পুনরায় (১৪১৬-১৮) সিংহাসন দখল করেন। গণেশের মৃত্যুর পর তাঁর দ্বিতীয় পুত্র মহেন্দ্রদেব (১৪১৮ খ্রিঃ) রাজা হন। তাঁকে পদচ্যুত করে যদু দ্বিতীয়বার সিংহাসন দখল করেন এবং পুনরায় ইসলামধর্ম গ্রহণ করে জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহ নাম ধারণ করে খ্রিস্টীয় ১৪১৮ অব্দ থেকে ১৪৩২ অব্দ পর্যন্ত গৌড়রাজ্য শাসন করেন। তাঁর মৃত্যুর পর পুত্র শামসুদ্দীন আহমদ শাহ (১৪৩৩ খ্রিঃ) গৌড়ের সুলতান হন। কিন্তু অল্পকালের মধ্যে তিনি আততায়ীর হাতে নিহত হন। অতঃপর ইলিয়াস শাহী বংশের এক রাজপুত্র নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহ (১৪৩৩-৫৮ খ্রিঃ) গৌড়ের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

ভারতীয় ঐতিহ্য মতে, আরাকানের নির্বাসিত রাজা নরমিখলার হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারের জন্য গৌড়ের সুলতান জালালুদ্দীন মোহাম্মদ শাহ যদু ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দে বহু গৌড় সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন এবং আরাকান রাজ্য পুনরুদ্ধার করে নরমিখলাকে সিংহাসনে বসান। বার্মার ইতিহাস সূত্রে জানা যায় যে, গৌড়ের সুলতান নাসিরুদ্দীন মাহমুদ শাহই ১৪৩৩-১৪৫৯ নরমিখলাকে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধারে সাহায্য করেছিলেন (হক চৌধুরী; প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৮,১২১; শরীফ; প্রাগুক্ত, পৃঃ ৩৪)।

নরমিখলা আরাকান রাজ্যে পুনরাভিষিক্ত হয়ে রাজধানী লঙ্গিয়েত থেকে চট্টগ্রাম

সীমান্তের আনুমানিক পঞ্চাশ মাইল দূরত্বের মধ্যে লেম্রানদীর তীরবর্তী ম্রোহং (Mrohaung) নামক স্থানে স্থানান্তরিত করেন; তখন থেকে নতুন রাজধানীর নাম অনুসারে নরমিখলা ও তাঁর পরবর্তী রাজবংশের নাম 'ম্রাউক রাজবংশ' নামে খ্যাতি লাভ করে। এ বংশের রাজারা ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৭৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত মোট তিনশ পঞ্চান্ন বছর রাজত্ব করেন।

নরমিখলার পুনর্বার সিংহাসনে আরোহণের পর বৌদ্ধ রাজারা নিজেদের বৌদ্ধ নামের সঙ্গে একটি মুসলমানী নামও গ্রহণ করতেন। ১৪৩০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৪৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত আরাকানের সতের জন রাজা নিজেদের আরাকানী বৌদ্ধ নামের সঙ্গে একটি মুসলমানী নাম উপাধি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। এই মুসলমানী উপাধি গ্রহণ করার কারণ সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না। গবেষকগণ মনে করেন, মুসলমানী উপাধি গ্রহণে কোনো বাধ্যতা ছিল না। আবার কোনো কোনো গবেষক মনে করেন যে, তাঁরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী ছিলেন। তবে এমতের ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। ম্রাউক বংশীয় রাজাদের অনেক মন্ত্রী ছিলেন মুসলমান, আবার অনেকে বাংলা সাহিত্য চর্চায় মুসলমান পণ্ডিতদের পৃষ্ঠপোষকতা করতেন। বস্তুতপক্ষে ম্রাউক বংশের রাজারা সকলেই বৌদ্ধ ছিলেন এতে কোনো সন্দেহ নেই। নরমিখলা দীর্ঘকাল মুসলমান সুলতানের আশ্রয়ে থেকে পরে তাঁদেরই সহযোগিতায় আরাকান পুনঃদখল করে সিংহাসনে আরোহণ করেছিলেন বলেই সম্ভবত তিনি মুসলমানদের প্রতি তথা ইসলামধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়েছিলেন; যার ফলশ্রুতিতে তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা বশত তিনি তাঁর বৌদ্ধ নামের সাথে একটি মুসলমান নামও পদবি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। একথা অনস্বীকার্য যে, নরমিখলা গৌড়ের সেনাবাহিনীর সাহায্যে আরাকান পুর্নদখল করার সময় তাদের সাহায্যকারী হিসেবে বহু সংখ্যক প্রতিবেশী চট্টগ্রামী মুসলমান আরাকানে গিয়ে স্থায়ীভাবে বসবাস শুরু করেছিল। আরাকানী রাজারাও তাদের প্রতি সদয় ও সহানুভূতিশীল ছিলেন। তাদের মধ্যে থেকে যোগ্য ব্যক্তিকে রাজকীয় উচ্চ পদে নিয়োগ দান করতেন। আরাকান অধিকৃত চট্টগ্রামের বিভিন্ন প্রশাসনিক গুরুত্বপূর্ণ পদে মুসলমান কর্মচারীকে নিয়োগ দেওয়া হত। তাঁদের বলা হত 'উজির'। মুসলিম শাসকগণ আরাকান রাজ্যের অধীনে সম্ভবত ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত উত্তর চট্টগ্রাম শাসন করেছিলেন। ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রামের অধিকার নিয়ে আরাকান ও ত্রিপুরা রাজের যে যুদ্ধ হয় তাতে চট্টগ্রামের উজির জালাল খান সম্ভবত কর্তব্য পালনে অবহেলা বা ত্রুটি করেছিলেন। তখন থেকেই আরাকানের রাজারা চট্টগ্রামের শাসনভার তাঁদের পুত্র, ভ্রাতা বা নিকট আত্মীয়ের উপর অর্পণ করতেন। উজিরকে তাঁর অধীনস্থ করেছিলেন (হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৩০-১৩৫)। বস্তুতপক্ষে আরাকানের এসকল রাজগণ অত্যন্ত উদার ও পরধর্ম্মমতে সহিষ্ণু ছিলেন বলেই নিজেরা বৌদ্ধ হয়েও ইসলাম ধর্মের এবং মুসলমানদের পৃষ্ঠপোষকতা ও সহযোগিতা করেছিলেন।

১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৫ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত একাধিকক্রমে চট্টগ্রাম আরাকানের শাসনাধীন ছিল। এসময়ে আরাকান রাজসভার বড় ঠাকুর, মাগন ঠাকুর, আশরাফ খাঁ,

সোলয়মান, নবরাজ মজলিশ, সৈয়দ মোহাম্মদ প্রমুখ মন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রীরা ছিলেন চট্টগ্রামী মুসলমান। শাসন বিভাগ পরিচালনা করতেন মুসলমান কাজী। সেনা বিভাগেও ছিল মুসলমান (হক চৌধুরী, প্রাগুক্ত, পৃঃ ১৫৫)। এতে প্রমাণিত হয় যে, আরাকানী বৌদ্ধ শাসকগণ মুসলমানদের প্রতি অতিশয় সদয় ছিলেন। এসময়ে বহু মুসলমান আরাকান রাজ্যে বিভিন্ন অঞ্চলে স্থায়ীভাবে বসতি স্থাপন করে। আরাকানী শাসনামলে বহু বৌদ্ধ এবং হিন্দু জনসাধারণও চাকুরী ও ব্যবসা বাণিজ্য উপলক্ষে আরাকানে গমন করেছিল এবং এখনো বহু বাঙালি হিন্দু-বৌদ্ধ সেখানে বসবাস করছে। এখানকার বাঙালি বৌদ্ধরা মূলত চট্টগ্রামী বড়ুয়া বৌদ্ধদের বংশধর।

ঐতিহাসিক যুগ থেকে চট্টগ্রাম আংশিক বা সম্পূর্ণভাবে ত্রিপুরার মহারাজাদের স্বল্পকালীন শাসনাধীন ছিল সাতবার এবং দীর্ঘকাল অর্থাৎ হাজার বছরেরও অধিক কাল আরাকান বৌদ্ধরাজাদের অধীনে ছিল। শেষ বার ১৫৮০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১৬৬৬ খ্রিষ্টাব্দ পর্যন্ত চট্টগ্রাম একাক্রমে আরাকানের সাথে যুক্ত ছিল। অবশ্য ১৫৮৫ খ্রিস্টাব্দে স্বল্পসময়ের জন্য চট্টগ্রাম মোগলদের হস্তগত হয়। ১৫৮৭ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ মেংফালোং চট্টগ্রাম জয় করেন। ১৬০৯-১০ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরারাজ বিজয় মানিক্যের পুত্র অমর মানিক্য আরাকানরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। আরাকানরাজ পর্তুগীজদের সাহায্যে চট্টগ্রাম নিজ দখলে রাখতে সক্ষম হন (চৌধুরী, সুকোমল, প্রাগুক্ত, পৃঃ১৪-১৫)।

ইতিহাসসূত্রে জানা যায় ১৫১২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্য আরাকান থেকে চট্টগ্রাম নিজ রাজ্যভুক্ত করেন। সে বছর প্রথমবার গৌড়ের সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ(১৪৯৩-১৫১৯ খ্রিঃ) চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৫১৩ খ্রিস্টাব্দে ধন্যমানিক্য (১৪৬৩-১৫১৫ খ্রিঃ) গৌড়বাহিনীকে বিতাড়িত করে উত্তর চট্টগ্রাম অধিকার করেন। এ বছরের শেষদিকে হোসেন শাহ পুনরায় উত্তর চট্টগ্রাম অধিকার করেন। ১৫১৪ খ্রিস্টাব্দে ধন্যমানিক্য পুনরায় চট্টগ্রাম দখল করেন। ১৫১৭ খ্রিস্টাব্দে চট্টগ্রাম তৃতীয়বারের মত হোসেন শাহের দখলে যায়। ১৫১৮ খ্রিস্টাব্দে আরাকানরাজ মঙরাজ যুবরাজ নসরত শাহকে বিতাড়িত করে চট্টগ্রাম অবধি দখল করেন। ১৫১৯ খ্রিস্টাব্দে সুলতান আলাউদ্দীন হোসেন শাহ পরলোক গমন করেন। তাঁর রাজত্বকালে উত্তর চট্টগ্রাম তিনবার গৌড়ের অধিকারভুক্ত হলেও আরাকানরাজ ও ত্রিপুরা রাজশক্তির দ্বিমুখী আক্রমণের ফলে তিনবারের কোনবারই তিনি উত্তর চট্টগ্রাম বা চট্টগ্রামকে এক বছরের অধিককাল তাঁর দখলে রাখতে সক্ষম হননি। রাজমালা, বার্মার ইতিহাস প্রভৃতি সূত্রে এই তথ্য জানা যায় (হক চৌধুরী, *চট্টগ্রামের ইতিহাস প্রসঙ্গ*, চট্টগ্রাম, ১৯৮২, পৃঃ ২৯)।

১৫২২ খ্রিস্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্যের পুত্র দেবমানিক্য চট্টগ্রামের তদানীন্তন রাজা গজাবদিকে পরাজিত করে চট্টগ্রাম অধিকার করেন। কিন্তু অল্পকাল পরে হুসেন শাহের পুত্র নসরত শাহ চট্টগ্রাম নিজ দখলে নিয়ে যান। ১৫৩৬ খ্রিস্টাব্দে দেবমানিক্যের জ্যেষ্ঠপুত্র বিজয়মানিক্য আবার চট্টগ্রাম দখল করেন। পরে এর আধিপত্য নিয়ে ত্রিপুরারাজ উদয়মানিক্যের

সঙ্গে মোগলদের যুদ্ধ হয়। ১৫০১ খ্রিষ্টাব্দে ত্রিপুরার রাজা ধন্যমানিক্য চট্টগ্রাম আক্রমণ করে বৌদ্ধ দেবতা মগধেশ্বরীকে উদয়পুরে নিয়ে আসেন এবং 'ত্রিপুরাসুন্দরী' নামে প্রতিষ্ঠা করেন। ১৬৩১ খ্রিস্টাব্দে চক্রশালার সামন্তরাজ মুকুট রায়ের নেতৃত্বে চট্টগ্রামের বৌদ্ধরা তাদের মগধেশ্বরী দেবীকে পুনরুদ্ধারের জন্য ত্রিপুরারাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এতে ত্রিপুরাসুন্দরীর প্রভূত ক্ষতি সাধিত হয় (চৌধুরী, সুকোমল; প্রাগুক্ত, পৃঃ১৫-১৬)।

১৬৬৬ খ্রিস্টাব্দে উত্তর চট্টগ্রাম মোগল শাসনধীন হলে বহু আরাকানী মঘ ভিটেবাড়ি ছেড়ে দক্ষিণ চট্টগ্রামে ও আরাকানে আশ্রয় গ্রহণ করে। এর কারণ সম্ভবত তাদের প্রতি শাসক শ্রেণীর সুদৃষ্টি ছিল না। পরবর্তীকালে ১৭৫৬ খ্রিস্টাব্দে সমগ্র চট্টগ্রাম মোগল সেনাপতির পুত্র আধু খাঁর পুত্র শের জামাল খাঁ কর্তৃক বিজিত হলে চট্টগ্রামে বৌদ্ধধর্মের চরম বিপর্যয় নেমে আসে। আরাকানী মঘ বা রাখাইন সম্প্রদায়ের অধিকাংশ তাদের একই ভাষা-কৃষ্টি-সংস্কৃতির অনুসারী আরাকান রাজ্যে আশ্রয় গ্রহণ করলেও বাঙালি বৌদ্ধরা কোথাও যেতে পারে নি। তাদের মধ্যে অধিকাংশ রাজনৈতিক ও আর্থ-সামাজিক কারণে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। আর স্বল্প সংখ্যক বাঙালি বৌদ্ধ যারা প্রতিকূল পরিবেশেও নিজেদের ধর্ম, কৃষ্টি ও সংস্কৃতি আকঁড়ে ধরে রেখেছিল তারাই বড়ুয়া বৌদ্ধ।

প্রাসঙ্গিক সূত্র নির্দেশ

১. মজুমদার, রমেশ চন্দ্র: *বাংলাদেশের ইতিহাস* (প্রাচীন যুগ), কলিকাতা, ১৯৮১।
২. রায়, নীহার রঞ্জন; *বাঙ্গালীর ইতিহাস,* কলিকাতা, ১৪০২ (বঙ্গাব্দ)।
৩. হালদার (দে), মনিকুন্তলা; *বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস,* কলিকাতা, ১৯৮৮।
৪. শরীফ, আহমদ; চট্টগ্রামের ইতিহাস, *আগামী প্রকাশনী,* ঢাকা, ২০০১।
৫. হক চৌধুরী, আবদুল; *চট্টগ্রামের সমাজ ও সংস্কৃতির রূপরেখা,* বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮।
৬. আলম, মাহবুবুল; *চট্টগ্রামের ইতিহাস (পুরানা আমল),* ঢাকা, ১৯৭৭।
৭. চৌধুরী, পূর্ণচন্দ্র; *চট্টগ্রামের ইতিহাস,* চট্টগ্রাম, ১৯২০।
৮. বড়ুয়া, (ডাঃ) রামচন্দ্র; *চট্টগ্রামে মঘের ইতিহাস,* কলিকাতা, ১৯০৫।
৯. করিম, আবদুল; *বাংলার ইতিহাস* (সুলতানী আমল), ঢাকা ১৯০৫।
১০. চৌধুরী, সুকোমল; *বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি,* কলিকাতা, ১৯৭৮।
১১. আলম, ওহিদুল; *চট্টগ্রামের ইতিহাস,* চট্টগ্রাম, ১৯৮২।
১২. মুচ্ছদ্দী, উমেশ চন্দ্র; *বড়ুয়া জাতি,* চট্টগ্রাম, ১৯৫৯।
১৩. মহাস্থবির, ধর্মাধার; *শাসনবংশ (অনু),* কলিকাতা, ১৯৬২।
১৪. স্থবির, ধর্মতিলক; *সদ্ধর্ম রত্নাকর,* রেঙ্গুন, ১৯৩৬।
১৫. বড়ুয়া দীপংকর শ্রীজ্ঞান ও বড়ুয়া, সুমঙ্গল; *দীপবংস (সানুবাদ),* চট্টগ্রাম, ২০০৩।
১৬. স্থবির প্রজ্ঞানন্দ; *মহাবগ্‌গ (অনু),* কলিকাতা, ১৯৩৭।
১৭. বড়ুয়া, দীপংকর শ্রীজ্ঞান; *বাংলাদেশে বড়ুয়া বৌদ্ধ: একটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা* (প্রবন্ধ), ইতিহাস অনুসন্ধান-১৫ কলিকাতা, ২০০১।
১৮. Eliot, Sir Charles; *Hunduism and Buddhism* vol. III. London, 1922.
১৯. E, Gaiger; *Mahavamsa* (ed); London, PTS, 1880.

আধুনিক যুগ

বাংলায় সদ্ধর্মের পুনরুত্থানে প্রধান আচার্যগণ

সংঘরাজ সারমেধ ও আচার্য পূর্ণাচার

ধর্মাধার মহাস্থবির*

উত্থান পতন জগতের অপরিহার্য নীতি। যে বৌদ্ধধর্ম ভারতব্যাপী প্রসারিত হইয়া কালক্রমে সমগ্র পৃথিবীতে প্রচারত হইয়াছিল সেই ধর্মই স্বীয় জন্মভূমিতে এক সময় নিষ্প্রভ হইয়া পড়ে এবং ক্রমশঃ দেশ হইতে তিরোহিত হয়। যে সকল মহাপুরুষ জীবন উৎসর্গ করিয়া সেই শোচনীয় অবস্থা হইতে সদ্ধর্মের পুনরুত্থানের প্রয়াস করিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে সংঘরাজ সারমেধ অন্যতম কর্ণধার।

পুণ্যশ্লোক সংঘরাজ সারমেধের নাম উচ্চারণ-বিপর্যয়বশতঃ বাংলা ভাষায় সারমিত্র হইয়াছে। প্রকৃতপক্ষে তাঁহার নাম— সারমেধ মহাথের।

খৃষ্টিয় অষ্টাদশ শতকের শেষপাদে আরাকান রাজবংশের দুই প্রতিদ্বন্দ্বী পক্ষের অন্তর্বিদ্রোহ আরম্ভ হয়। উহা কয়েক বৎসর চলিতে থাকে। এই সুযোগে স্বাধীন ব্রহ্মের সম্রাট বোধ-ফ্রা (১৭৮১-১৮১৯) ১৭৮৫ খৃষ্টাব্দে আরাকান আক্রমণ করেন। এই যুদ্ধে আরাকানবাসীরা নানাভাবে অত্যাচারিত হয়। শিশু-বৃদ্ধ নির্বিশেষে নির্যাতিত ও নিহত হয়। দীর্ঘদিন সংগ্রাম চলার ফলে দেশের অবস্থা শোচনীয় হইয়া উঠে। হাজার আরাকানী বাস্তুত্যাগ করিয়া চট্টগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করে। এই সময় রাজপরিবারের সম্পর্কিত কিছু লোক শ্রদ্ধেয় সারালঙ্কার মহাথেরের সহিত আসিয়া হাড়বাং অঞ্চলে উপনিবেশ স্থাপন করে। সেখানে ১৮০১ খৃষ্টাব্দে সংঘরাজ সারমেধের জন্ম হয়।

মাতা-পিতা অল্প বয়সে তাঁহাকে আচার্য সারালঙ্কার মহাথেরের নিকট শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষাদান করেন। এই নবদীক্ষিতের নাম রাখা হয় শ্রমণ সারমেধ। সারমেধ গুরুর সান্নিধ্যে থাকিয়া উত্তমরূপে ধর্ম-বিনয় ও প্রয়োজনীয় বিষয় শিক্ষালাভ করিলেন। যোগ্যতা অর্জিত হইলে সারালঙ্কার মহাথেরের উপাধ্যায়ত্বে ১৮২১ সালে তাঁহার শুভ উপসম্পদাকার্য সমারোহে সম্পাদিত হয়।

১৮২৬ খৃষ্টাব্দে ব্রহ্মরাজ বগিড ও বৃটিশ পক্ষে মধ্যে 'য়্যাণ্ডবো সন্ধি' স্থাপিত হয়। ইহার ফলে আরাকান ও চট্টগ্রামের মধ্যে যাতায়াতের বিশেষ সুবিধা হয়। এই সময় বহু সংখ্যক

---

* প্রয়াত পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, ত্রিপিটক বিশারদ, বহুগ্রন্থপ্রণেতা, পালিভাষায় পাণ্ডিত্যের জন্য রাষ্ট্রপতি কর্তৃক সম্মানিত, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অতিথি অধ্যাপক, নালন্দা পত্রিকার প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক এবং ভারতীয় সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার প্রথম সংঘরাজ। "সদ্ধর্মের পুনরুত্থান" গ্রন্থ থেকে পুনর্মুদ্রিত।

শরণার্থী চট্টগ্রাম হইতে পুনরায় আরাকানে ফিরিয়া যায়। আচার্য সারালঙ্কার মহাথেরও বৃদ্ধবয়সে তাঁহার শিষ্য সারমেধ ভিক্ষু সহ আকিয়াবে প্রত্যাবর্তন করেন। আকিয়াবের কয়েকজন দাতা ছেরাগ্যা নদীর দক্ষিণ তীরে গদুভাঙ্গা খাড়ির উপকূলে এক বিহার নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহাদিগকে দান করেন। ইহার নাম হয় 'সারালঙ্কার বিহার'। আচার্য সারালঙ্কার অধ্যক্ষ ও সারমেধ সহকারীরূপে বিহারের যাবতীয় কার্য নির্বাহ করিতেন। তাঁহাদের শিক্ষা ও চরিত্র মাধুর্যে আরাকান ধর্ম-বিনয়ে ক্রমশঃ উন্নত হইয়া এক আদর্শ বৌদ্ধরাষ্ট্রে পরিণত হয়। তদানীন্তন যুদ্ধ-বিধ্বস্ত, বিশৃঙ্খল আরাকানের মধ্যে তাঁহাদের চারিত্রিক দৃঢ়তার ফলে ধর্মীয় শৃংখলা স্থাপিত হইল। তাঁহাদের প্রতি জনগণের আকর্ষণ বৃদ্ধি পায়। এই সারালঙ্কার বিহার জনসমাজে অতিশয় পরিচিত হইয়া উঠে। ১৮৩৬ সালে আচার্য সারালঙ্কারের মৃত্যুর পর তাঁহার সুযোগ্য শিষ্য সারমেধ থের এই বিহারের অধ্যক্ষপদ লাভ করেন।

শ্রদ্ধেয় সারমেধ থের নূতন উদ্যমে সদ্ধর্মের উন্নতিকল্পে আত্মনিয়োগ করিলেন। তিনি চট্টগ্রাম ও আরাকানের সর্বত্র পর্যটন করিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। তখন সবেমাত্র বৃটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত, আকিয়াব সমগ্র আরাকানের প্রশাসনিক কেন্দ্রস্থলে পরিণত হইয়াছে। আমদানী রপ্তানীর প্রধান কেন্দ্র আকিয়াবের প্রতিপত্তিশীল নাগরিকবৃন্দ সরকারী কর্মচারী ও বণিককুলের সহায়তায় স্থানীয় ভিক্ষু-সংঘের চতুর্প্রত্যয়ও অনায়াসলব্ধ হইল। সকলের প্রতি সদ্ব্যবহার ও বিনয়াকূল আচরণের দরুণ আচার্য সারমেধের যশঃখ্যাতি ও প্রতিপত্তি দূর-দূরান্তরে-বৃটিশ সাম্রাজ্যের সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হইল।

আরাকানের প্রাচীন রাজন্যবর্গ সদ্ধর্মের উন্নতি ও দেশে শান্তি প্রতিষ্ঠার নিমিত্ত প্রতিষ্ঠবান মহাথেরদিগকে বিবিধ সম্মানজনক উপাধিতে বিভূষিত করিতেন। মহারাণী ভিক্টোরিয়া বৃটিশ সাম্রাজ্যের অভ্যন্তরে সকল সম্প্রদায়ের লোকদের নিজ নিজ ধর্মপালনের সমান অধিকার স্বীকার করিয়াছেন। রাজার প্রতি প্রজাপুঞ্জের আনুগত্য বৃদ্ধির নিমিত্ত আরাকানের তৎকালীন জিলা জজ উঃ ফা-তা-ঠোয়ে মহোদয় দিগন্তবিশ্রুত শাসনহিতকামী মহামান্য সারমেধ মহাথেরকে রাজকীয় উপাধিদানের প্রস্তাব করেন। বৃটিশ সরকার ইহাতে সাগ্রহে সম্মত হন। ১৮৪৬ সালের ফাল্গুনী-পূর্ণিমায় এক বিরাট সমারোহে পণ্ডিতাগ্রগণ্য সারমেধ মহাথেরকে নিম্নোক্ত রাজকীয় উপাধিসমন্বিত সীলমোহর প্রদত্ত হয়ঃ

"সারমেধালঙ্কারাভি-তিসাসনধর
মহাধম্মরাজাধিরাজগুরু।"

এই সময় আরাকান ও বঙ্গদেশ একই সরকার শাসিত হওয়ায় এবং গমনাগমনের সুব্যবস্থা থাকায় শ্রদ্ধেয় রাজাধিরাজগুরু সারমেধ মহাথেরের খ্যাতি বাংলার প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। আরাকানীরা চট্টগ্রাম ও পূর্ববঙ্গের নানাস্থানে বাণিজ্য-ব্যপদেশে বসবাস করিতেন। বাংলা তথা চট্টগ্রামের লোকেরাও আরাকানে গিয়া ব্যবসা-বাণিজ্য করিতেন। পূর্ব-চট্টগ্রামে চাক্‌মা বৌদ্ধগণ বাস করিতেন। তাঁহারা নিজেদের শাক্যবংশসম্ভূত বংশধর বলিয়া দাবী

করেন। তাঁহাদের দক্ষিণে ও উত্তরে আরাকানীবংশসম্ভূত 'বোমাং' ও 'মান' সম্প্রদায়ের বাস। শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাথের মহোদয় স্বজাতিদের নিকট সময় সময় আসিয়া ধর্মপ্রচার করিতেন। তখন বড়ুয়া ও চাকমা সমাজের মধ্যে তাঁহার প্রভাব তেমন ছিল না। কারণ তাঁহাদের ধর্মগুরু ছিলেন তখনকার 'তান্ত্রিক-রাউলী' সম্প্রদায়।

১৮৫৬ সালের চৈত্র মাসে মাননীয় রাজগুরু সারমেধ সশিষ্য তীর্থভ্রমণ উপলক্ষে সীতাকুণ্ডে আগমন করেন। সেখানে শ্রদ্ধেয় রাধু মাথের সহিত তাঁহাদের সাক্ষাৎ ঘটে। তাঁহার আত্মজীবনীর ১০ম পৃষ্ঠায় আরাকানী অক্ষরে ও ভাষায় লিখিত আছেঃ " তথায় ভরুআ রা-উ-লী রাধারাম তাঁহাদিগকে অভ্যর্থনা করেন।" আত্মজীবনী-সম্পাদক উহার পার্শ্বে বন্ধনীর মধ্যে লিখিয়াছেনঃ 'BARUA RAULI'। চাকমা সমাজের পুরোহিতগণকে যেমন "চাক্‌মা-রাউলী" বলা হয়, তদ্রূপ বড়ুয়া সমাজের পুরোহিতগণও তখন "বড়ুয়া-রাউলী" নামে পরিচিত ছিলেন।

সংঘরাজ মহোদয় সদলবলে রাধু মাথের সহিত সীতাকুণ্ড হইতে চক্রশালা হইয়া মহামুনি মেলায় উপনীত হন। মহামুনি বাংলার চাক্‌মা, বড়ুয়া, মান, বোমাং প্রভৃতি সকলশ্রেণীর বৌদ্ধদের মিলনতীর্থ। তাঁহার ধর্ম-সংস্কারের আলোচনায় সকলেই সন্তুষ্ট হন। তাঁহার জন্য শাক্যমুনি মন্দিরের পার্শ্বে এক পর্ণকুটির নির্মিত হয়। তাহাতে তিনি প্রায় দুই বৎসরকাল যাপন করেন। এই সময় তিনি বড়ুয়া ও চাক্‌মা সমাজের সর্বত্র বিচরণ করিয়া তান্ত্রিকমতের অসারতা, বিশেষতঃ দেব-দেবীর পূজায় পশুবলির বিরুদ্ধে প্রচারকার্য চালান। ইহার ফলে প্রায় বৌদ্ধ-জমিদারদের বাড়ী হইতে কালী, দুর্গা, শিব প্রভৃতি পূজা তিরোহিত হয়।

এই সময় বৃটিশের সামন্তরূপ চাক্‌মা রাজারাই চট্টগ্রামের পূর্বাঞ্চল শাসন করিতেন। ইহারা মোগল ও আরাকান রাজাদের সময় কখনও স্বাধীন, কখনও করদ মিত্ররূপে রাজত্ব করিতেন। এই বংশের অধিরাণী পুণ্যশীলা কালিন্দী রাণী মহোদয়া তখন রাজ্যের শাসনকর্ত্রী। ভারতেশ্বরী মহারাণী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণানুযায়ী তিনি হিন্দু ও মুসলমান প্রজাদের জন্য যথাক্রমে কালীমন্দির ও মস্‌জিদ নির্মাণ করিয়া উহাদের সেবা-পূজার নিমিত্ত দেবোত্তর সম্পত্তির ব্যবস্থা করিয়া দিয়াছেন। তাঁহার প্রাসাদের পার্শ্বে বৌদ্ধবিহার বিদ্যমান। উহার সেবা পূজার ব্যয়ভার রাজসরকার বহন করে। সারমেধ মহাথেরকে তিনি রাজপ্রাসাদে আমন্ত্রণ করেন। সংঘরাজের উপদেশে ও ব্যবহারে তিনি শ্রদ্ধাভিভূতা হইয়া পড়েন। 'বৌদ্ধবন্ধু পত্রিকা'[১] বলে— "রাণী মহোদয়া সংঘরাজের শুভাগমনের পরেই তাঁহা কর্তৃক বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিতা হইয়াছেন।" প্রকৃতপক্ষে রাণী মহোদয়া তান্ত্রিক-বৌদ্ধ হইতে থেরবাদ-বৌদ্ধে পরিবর্তিত হইয়াছেন মাত্র।

শ্রদ্ধাপরায়ণা রাণী অতিশয় প্রসন্ন হইয়া ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দের শেষভাগে রাজকীয় পুণ্যাহ উপলক্ষে মহাসমারোহে শ্রদ্ধেয় সারমেধ মহাথেরকে আরাকানী ভাষায় উপাধিযুক্ত সীল-মোহর প্রদানের দ্বারা সম্মানিত করেন। উহার অর্থ এই—

"1219 A. E. The Seal of Arakanese
Sangharaja and Vinayadhara."

তাঁহার পক্ষে ইহা দ্বিতীয়বার রাজকীয় উপাধিলাভ। তদবধি তিনি সংঘরাজরূপেই প্রসিদ্ধ হন এবং তাঁহার সারালঙ্কার বিহার সংঘরাজ বিহারে পরিণত হয়। পুণ্যশীলা কালিন্দী রাণীর প্রদত্ত উপাধি লাভ করিয়া তিনি আকিয়াব ফিরিয়া যান। তাঁহার এই পর্যটনে গৃহী বৌদ্ধরা কিছুটা সংস্কৃত হইলেন। কিন্তু তখন পর্যন্ত চট্টগ্রামের 'রাউলী পুরোহিতগণ' থেরবাদ অনুসারে সমগ্র ভাবে উপসম্পদা গ্রহণে সম্মত হইতে পারেন নাই।

চট্টগ্রামের তদানিন্তন ভিক্ষু শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা মহানগর বিহারে অবস্থান করিতেন। এই সময় জরীপ বিভাগের উচ্চপদস্থ জনৈক ইংরেজ কর্মচারী মিঃ পল [Mr. Paul] সিংহল হইতে বদলী হইয়া কলিকাতায় আগমন করেন। তিনি বৌদ্ধধর্মে সুপণ্ডিত ছিলেন। ভিক্ষু চন্দ্রমোহন তাঁহার নিকট 'ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ' অধ্যয়নকালে বুঝিতে পারিলেন যে চট্টগ্রামের ভিক্ষুরা যথার্থ বিনয়ধর্ম মানিয়া চলেন না। তাঁহারা ভিক্ষু নহেন, কারণ তাঁহাদের অনেকেই ২০ বৎসরের কম বয়সেই উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছেন। চন্দ্রমোহন নিজেও ১৬ বৎসর বয়সে উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছেন। অতএব তাঁহার উপসম্পদাও শুদ্ধ নহে। ইহাতে তিনি বিচলিত হইয়া পড়েন এবং বার্মা কিংবা সিংহলে গিয়া পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ ও ধর্ম-বিনয় শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। আরাকানে বৃটিশ সরকার ও চট্টগ্রামে কালিন্দী রাণী কর্তৃক সম্মানিত সংঘরাজ আচার্য সারমেধ মহাথেরের বিষয় শুনিয়া তিনি যথার্থ উপসম্পদা গ্রহণের মানসে ১৮৬০ সালে আকিয়াব গমন করেন। তথাকার সংঘরাজ বিহারে উপনীত হইয়া কয়েক মাস বিনয়-ধর্ম চর্চা করেন। আর তথাকথিত পূর্ব-উপসম্পদা ত্যাগ করিয়া সংঘরাজের উপাধ্যায়ত্বে স্থানীয় ভিক্ষু-সংঘ কর্তৃক 'উদক-উক্ষেপ সীমায়' পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করেন। ইহার দুই মাস পরে চট্টগ্রাম ফিরিয়া আসেন এবং রোগের দরুণ ভিক্ষুত্ব ত্যাগ করিতে বাধ্য হন।

এই ঘটনায় বাংলার ভিক্ষুদের ভুল ধরা পড়িল এবং অনেকের মধ্যে থেরবাদ মতে প্রকৃত উপসম্পদা গ্রহণের আগ্রহ জন্মিল। তজ্জন্য তাঁহারা সংঘরাজ সারমেধ মহাথেরকে চট্টগ্রাম আগমনের আহ্বান জানাইলেন। তিনি ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে বিনয়কর্মের উপযোগী ভিক্ষুগণ সমভিব্যাহারে জলপথে চট্টগ্রাম আগমন করেন। তাঁহারা পাহাড়তলী আসিয়া তাঁহার জন্য পূর্বনির্মিত বিহারেই উঠিলেন। এখানে বিনয় সম্বন্ধে আলোচনার পর সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত হইল যে, চট্টগ্রামের "বড়ুয়া রাউলীরা" পুনরায় উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া দেশে থেরবাদের অনুগামী প্রকৃত ভিক্ষুসংঘ প্রতিষ্ঠা করিবেন। যথাসময়ে উপসম্পদার আয়োজন হইল। মহামুনির পূর্বপার্শ্বে 'হাঞ্চাওরঘোণা'-য় এক পার্বত্যছড়ায়—সংঘরাজের স্বীয় ভাষায় "নদী সীমায়"—শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার (লালমোহন ঠাকুর) প্রমুখ সাতজন মহাযানী পুরোহিত সর্বপ্রথম নূতনভাবে থেরবাদসম্মত উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। এইবারও শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ

এক বৎসর চট্টগ্রামে অবস্থান করিয়া ভিক্ষুদিগকে বিনয় শিক্ষা দিলেন। ইতিমধ্যে আরও অনেক সাথে সশিষ্যে তাঁহার নিকট উপসম্পন্ন হইলেন। এতদিনে মহাযানের তান্ত্রিক পুরোহিতদিগের মধ্যে প্রকৃত উপসম্পদা প্রতিষ্ঠিত হইল। নব উপসম্পন্ন ভিক্ষুসংঘের নাম হইল 'সংঘরাজ নিকায়'ঃ কিন্তু কতিপয় প্রাচীনপন্থী মাথে কল্পিত মর্যাদাহানির ভয়ে সংঘরাজের নিকট উপসম্পদা গ্রহণের পূর্বসিদ্ধান্ত ত্যাগ করিয়া পৃথক রহিয়া গেলেন। তাঁহারা হইলেন— 'মাথের দল'-এর ভিক্ষু। সংঘরাজ নানাস্থানে ধর্মপ্রচার করিয়া আকিয়াব চলিয়া গেলেন।

দ্বিতীয় বৃটিশ-বার্মা যুদ্ধের (১৮৫২-৫৩) পর নিম্ন-বার্মা বৃটিশের অধিকারভুক্ত হয়। এই অবস্থাতেও ব্রহ্মরাজ মিন্‌ডন্ মিন্ বৌদ্ধধর্মের স্থিতি ও উন্নতির জন্য বহু প্রয়াসে নিবিষ্ট। তিনি ১৮৬০ হইতে ১১ বৎসর ব্যাপী মান্দালয়-এ সমগ্র ত্রিপিটক পাষাণফলকে উৎকীর্ণ করান। শেষের দিকে ভিক্ষুসংঘ কর্তৃক সদ্ধর্ম-সংগায়ণের ব্যবস্থা করেন। ইহাই ইতিহাস প্রসিদ্ধ পঞ্চম বা 'শিলালিপি' সংগীতি।

এই পঞ্চম সংগীতির অধিবেশনকালে ১৮৬৬ খৃষ্টাব্দে স্বাধীন ব্রহ্মের মহামান্য সংঘরাজ জ্ঞেয়ধর্ম্মাভিবংশ শ্রীপ্রবরালঙ্কার ধর্মসেনাপতি মহাধর্মরাজাধিরাজগুরু মহোদয় দেহত্যাগ করেন। তিনি সর্বজনমান্য কোন ধর্ম-উত্তরাধিকারী রাখিয়া যান নাই। সেই কারণে আর কাহাকেও সংঘরাজ করা হয় নাই। এখানেই প্রাচীন সংঘরাজপ্রথার অবসান ঘটে। তখন ধর্মীয় কার্যাদি সম্পাদনের নিমিত্ত বিভিন্ন অঞ্চলের রাজগুরু উপাধিপ্রাপ্ত ৮জন প্রতিনিধিস্থানীয় মহাথেরকে নিয়োগ করা হয়। তাঁহাদের সম্মিলিত নেতৃত্বে সংগীতি ও শাসনকার্য পরিচালিত হইতে থাকে।

ধর্মরাজ মিন্‌ডন বৃটিশ সরকারের মাধ্যমে আরাকানের নায়ক মহাথেরকে সংগীতিতে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানান। ভারত সরকার মাননীয় সংঘরাজ ও তাঁহার শিষ্য উঃ অগ্‌গ মহাথেরকে প্রতিনিধি নির্বাচিত করিয়া তথায় প্রেরণ করেন। ১৮৬৮ খৃষ্টাব্দে বর্ষাবাসের পূর্বে সংঘরাজ সশিষ্যে মান্দালয় উপনীত হন। পাহাড়তলীর নিত্যানন্দ মুচ্ছদ্দীও তাঁহার সেবকরূপে তখন মান্দালয় গমন করেন। বর্মরাজ মিন্‌ডন তাঁহাদিগকে মহাসমারোহে অভ্যর্থনা করিলেন। ত্রিপিটক পাষাণফলকে উৎকীর্ণ করিবার পূর্বে প্রতিশোধককার্য সমাধা করিবার ভার সসম্মানে তাঁহাকে অর্পণ করা হয়। তিনি এক বর্ষায় এই মহান কর্তব্য দক্ষতার সহিত সম্পাদন করিলেন। এই সহযোগিতার জন্য সন্তুষ্ট হইয়া ধর্মরাজ মিন্‌ডন এক সভায় তাঁহাকে উপাধি ও সীলমোহর দিয়া সম্মানিত করিলেনঃ

"সারমেধাভি-তিসাসনধজ
মহাধম্ম-রাজাধি-রাজগুরু।"

ইহা তাঁহার পক্ষে তৃতীয়বার রাজকীয় সম্মান ও উপাধিলাভ। তিনি সৌজন্য সহকারে রাজদত্ত সম্মান অনুমোদন করিলেন। অতঃপর সংঘরাজ আরাকন প্রত্যাবর্তনের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাজা মিন্‌ডন্ ধর্মপ্রচারে সহায়তাকল্পে ২৫জন বর্মী মহাথেরকে সংঘরাজের

সঙ্গে প্রেরণ করিলেন। তাঁহারা আকিয়াব পৌঁছাবার কয়েকমাস পরে চাক্‌মা রাজ্যেশ্বরী কালিন্দী রাণীর আহ্বানলাভ করেন। তিনি ১৮১৯ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে রাজানগর সীমাপ্রতিষ্ঠায় যোগদান করেন। ঐ সীমার 'চিং' নাম তাঁহারই প্রদত্ত।

শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধ ত্রিমুকুটধারী হইয়া আরও তের বৎসর জীবিত ছিলেন। তাঁহার সমগ্র জীবন পরিয়ত্তি, প্রতিপত্তি ও প্রতিবেধ এই ত্রিবিধ সদ্ধর্মের উন্নতি ও প্রচারকল্পে অতিবাহিত হয়। তিনি 'বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়' সারাজীবন ধর্মচর্চায় রত ছিলেন। তাঁহার অসাধারণ গুণাবলী ও বিচিত্র কর্মপ্রতিভার বিষয় ভাষায় বর্ণনা করিয়া শেষ করা যায় না। ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে ৮১ বৎসর বয়সে ৬১তম উপসম্পদাবর্ষে এই মহাপুরুষ গুণমুগ্ধ সকলকে শোকসাগরে ভাসাইয়া ইহলোক সংবরণ করেন। আরাকানের তথা বৃটিশ বৌদ্ধ ভারতের গৌরবরবি অস্তমিত হইল। শ্রদ্ধেয় সংঘরাজের আচার, বিনয়-নম্র ব্যবহার ও কার্যপ্রণালী ভাবীজনগণের হৃদয়ে আদর্শস্থানীয় হইয়া রহিবে।

আচার্য্য পুণ্ণাচার

সদ্ধর্মের পুনরুত্থানে সংঘরাজ সারমেধের পরে যাঁহার নাম করিতে হয় তিনি হইলেন আচার্য পুণ্ণাচার। তিনি ১১৯৭ মগাব্দের (১৮৩৭ খৃঃ) ৫ই আষাঢ় বৃহস্পতিবার পূর্বভাদ্রপদ নক্ষত্র যোগে কৃষ্ণ পক্ষের নবমী তিথিতে রাত্রি ১০ ঘটিকার সময় চট্টগ্রাম জেলার অন্তর্গত পটিয়া থানার উনাইনপুরা গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন কবিরাজ শ্রীমধুরাম বড়ুয়া ও মাতা শ্রীমতী কাঞ্চনকুমারী দেবী। শৈশবে তাঁহার নামকরণ করা হয় চন্দ্রমোহন। তাঁহার আরও দুই ভ্রাতা ও দুই ভগ্নী ছিলেন।

কয়েক বৎসর গত হইলে বালক চন্দ্রমোহন যথারীতি গুরুগৃহে ভর্তি হইয়া মাতৃ-ভাষা শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার অন্তরে ধর্মভাব ও বৈরাগ্যের বীজ অঙ্কুরিত হয়। বালক স্বহস্তে মাটির বুদ্ধ-মূর্তি নির্মাণ করিয়া ভক্তিভরে পূজা করিতে আরম্ভ করিতেন আর বাড়ী হইতে কিছু দূরে কোন নিভৃত স্থানে উপবিষ্ট হইয়া ভগবৎ চিন্তায় নিমগ্ন থাকিতেন। পিতা-মাতা তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া চিন্তিত হইলেন। তাঁহাকে নিবৃত্ত করিবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু কিছুতেই ইহার প্রতিকার সম্ভব হইল না। এইরূপে পূর্বজন্মার্জিত সংস্কারসমূহ তাঁহার হৃদয়ে নূতন প্রেরণার সঞ্চার করে। ক্রমে চন্দ্রমোহন ষোড়শ বর্ষে পদার্পণ করিলেন। এই সময় তিনি সংসার ত্যাগের নিমিত্ত ধার্মিক মাতা-পিতার অনুমতি প্রার্থনা করিলে উদারচেতা মাতা-পিতা পুত্রের অভিলাষ জানিয়া স্বচ্ছন্দে তাঁহাকে বিদায় দিলেন।

১২১৩ মগাব্দের শুভ মাঘীপূর্ণিমা মেলার সময় চন্দ্রমোহন প্রব্রজ্যা গ্রহণের সংকল্প করিলেন। ঠেগরপুণি গ্রামে সুপ্রসিদ্ধ বুড়া গোঁসাইর চৈত্যাঙ্গনে তিনি শ্রদ্ধেয় শ্রীমোহনলাল মহাথেরের নিকট শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হইলেন। তৎপর তিনি মনোযোগের সহিত শ্রমণোচিত রীতিনীতি ও ধর্ম বিনয় শিক্ষায় আত্মনিয়োগ করেন। এই রূপে কিছু দিন গত হইবার পর

কড়ৈলডেঙ্গা গ্রামের পূর্বপার্শ্বে ভাণ্ডালজুরি নদীর 'উদক উক্ষেপ সীমায়' উপসম্পদা গ্রহণ করিয়া তিনি উনাইনপুরা বিহারেই অবস্থান করিতে থাকেন। পরবর্তী আশ্বিন মাসে তাঁহার গুরু দেহত্যাগ করিলেন। ইহাতে তাঁহার দুঃখ বৃদ্ধি পাইল। একদিকে গুরুর তিরোধান অন্যদিকে তাঁহার ধর্মবিনয় শিক্ষায় অন্তরায় উভয়ই তাঁহাকে বিচলিত করিয়া তুলিল।

অতঃপর তিনি ১২১৫ মগাব্দে বেলখাইন নিবাসী মহাথের মধুচরণ ঠাকুরের নিকট গিয়া শিক্ষা লাভ করিতে থাকেন। সেখানে তিনি বাংলা, পালি ও পালির আরাকানী ভাষার অনুবাদ কিছু কিছু আয়ত্ত করেন। এই স্থানে দুই বৎসর অবস্থানের পর তাঁহার শিক্ষাভিলাষ উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাইল। উচ্চ শিক্ষা লাভের উদ্দেশ্যে তিনি কলিকাতায় গমনের সঙ্কল্প করিলেন।

সেই সময় কলিকাতা যাইবার নিমিত্ত বাষ্পীয় জলযান কিংবা স্থলযানের সুবিধা ছিল না। সেই কারণে নৌকাযোগে তিনি কলিকাতা অভিমুখে যাত্রা করিলেন। জলপথও বিপদসঙ্কুল ছিল। নানা বাধা বিপত্তির মধ্য দিয়া এক মাস পরে তিনি কলিকাতা পৌছিলেন। এখানে ওয়ারিস বাগান বিহারে বসবাস করিয়া তিনি উপযুক্ত গুরুর সন্ধানে প্রবৃত্ত হইলেন। ঘটনাক্রমে একদিন সদ্ধর্মপরায়ণ মিঃ পল (Mr. Paul) নামক জরীপ বিভাগের উচ্চপদস্থ একজন ইংরেজের সঙ্গে তাঁহার সাক্ষাৎ হইল। তিনি ইংরেজী, পালি, হিন্দি প্রভৃতি তেরটি ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন। লংকা দ্বীপ হইতে বদলী হইয়া কলিকাতা আসিয়াছেন। শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন পল সাহেবের নিকট ত্রিপিটক শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। ভিক্ষু-প্রাতিমোক্ষ অধ্যয়ন কালে তিনি জানিতে পারিলেন যে বিশ বৎসরের কম বয়সের ব্যক্তি প্রকৃত উপসম্পদা গ্রহণের অধিকারী নহেন। উপসম্পদা গ্রহণ করিলেও শাস্ত্রানুসারে তিনি অভিক্ষুই থাকিবেন। ইহা শুনিয়া তাঁহার হৃদয় কম্পিত হইল। সেই সময় বর্তমানের ন্যায় দেশে শাস্ত্রালোচনা ছিল না বলিয়া ষোল বৎসর বয়সে তিনি উপসম্পদা গ্রহণ করিয়াছিলেন। চন্দ্রমোহন এত বিচলিত হইলেন যে অচিরেই লঙ্কা কিংবা ব্রহ্মদেশে গিয়া উপসম্পদা গ্রহণের জন্য মনস্থির করিলেন। ইতিমধ্যে পল সাহেবের মৃত্যু ঘটিল।

তখন শ্রদ্ধেয় চন্দ্রমোহন ভিক্ষু কলিকাতা ত্যাগ করিয়া স্বদেশে ফিরিয়া আসেন। তাঁহার জন্মভূমি উনাইনপুরা গ্রামে তিনি কশ্যপবুদ্ধ ও গৌতমবুদ্ধের দ্বারা বোধিবৃক্ষরূপে স্বীকৃত বট ও অশ্বত্থবৃক্ষ সমারোহের সহিত রোপন করিলেন। এই উপলক্ষ্যে ভিক্ষুসংঘ ও বহু নরনারীকে প্রচুর দানীয় বস্তুদান করিলেন। তৎপর তিনি রোগাক্রান্ত হইয়া পড়েন। বৎসরাধিক সময় পরে সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া তিনজন জুমিয়ার সঙ্গে তিনি নৌকা যোগে আরাকান যাত্রা করিলেন। সেখানে পৌঁছিয়া তাঁহারা শ্রদ্ধেয় সংঘরাজ সারমেধের বিহারে উঠিলেন এবং সংঘরাজকে তাঁহার সঙ্কল্পের বিষয় নিবেদন করিলেন। তখন তথাকথিত পূর্ব উপসম্পদা ত্যাগ করিয়া চন্দ্রমোহন সমুদ্রের চরে 'উদক উক্ষেপ সীমায়' সংঘরাজের উপাধ্যায়ত্বে পুনঃ উপসম্পদা গ্রহণ করিলেন। তৎপর দুই মাস বাস করার পর হঠাৎ রোগাক্রান্ত হওয়ায় তিনি বাথুয়ানিবাসী শ্রদ্ধেয় রাধাচরণ ভিক্ষুর সঙ্গে নৌকা যোগে জন্মভূমিতে ফিরিয়া

আসিলেন। ক্রমে রোগ যন্ত্রণা অসহ্য হওয়ায় কবিরাজদের পরামর্শে তিনি চীবর ত্যাগ করিলেন। তখন তাঁহার বয়স পঁচিশ বৎসর। চিকিৎসার ফলে রোগমুক্ত হইয়া তিনি স্বীয় পিতার নিকট কবিরাজী শিক্ষা আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে পিতা-মাতা তাঁহাকে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করিবার বিশেষ চেষ্টা করিয়াও বিফল হইয়াছেন। কারণ ভাগ্যদোষে চন্দ্রমোহন গৃহী হইতে বাধ্য হইলেও তাঁহার অন্তরে বৈরাগ্যবীজ সুনিহিত ছিল।

১২২৩ মগাব্দের আশ্বিন মাসে চন্দ্রমোহন জীবিকার সন্ধানে কলিকাতা আসিয়া খরু মেথরের লেনে এক গৃহে হিতৈষীদের সাহায্যে কবিরাজী আরম্ভ করেন। তখন লঙ্কানিবাসী দুইজন ভিক্ষু, তিনজন শ্রামণের এবং তিনজন সেবক ব্রহ্মদেশের মান্দালা যাইবার ইচ্ছায় কলিকাতা আগমন করেন। স্বর্গীয় পল সাহেবের বাড়ীতে উক্ত ভিক্ষুগণের সহিত উপাসক চন্দ্রমোহনের সাক্ষাৎ ঘটে। পরস্পর আলোচনায় চন্দ্রমোহনের সাধুতার পরিচয় পাইয়া যাত্রী ভিক্ষুগণ তাঁহাকে মান্দালা যাইবার আহ্বান জানান। তিনি সাগ্রহে তাঁহাদের সঙ্গী হইলেন। তাঁহারা পৌষ মাসে স্টিমার যোগে রেঙ্গুন পৌঁছন। সেখানে মাসেক কাল দর্শনীয় ও পূজনীয় স্থানগুলি দর্শন করিয়া ব্রহ্মরাজের স্টিমার যোগে মান্দালা পৌঁছিয়া রাজগুরু সঙ্ঘরাজের বিহারে উপস্থিত হইলেন। এই সময় চন্দ্রমোহন রাজগুরু ও স্বাধীন ব্রহ্মরাজ মিণ্ডন্ মিন মহোদয়কে বাংলা দেশের বৌদ্ধদের দুরবস্থার কথা জ্ঞাপন করিলেন। রাজগুরু তাঁহার নির্মল স্বভাব দর্শন করিয়া ও বিনয়ধর্মের প্রতি নিষ্ঠা দেখিয়া মহারাজের বদান্যতায় তাঁহাকে শ্রামণের পদে দীক্ষা দিয়া আষাঢ় মাসে মহাসমারোহে উপসম্পদা দান করিলেন। শুধু তাহাই নহে সঙ্ঘসভার সদস্যগণ তাঁহাকে "পুন্নাচার ধম্মধারী" উপাধি প্রদান করেন। তাহার পর হইতে চন্দ্রমোহন পুন্নাচার নামেই পরিচিত; সেখানে এক বর্ষা শিক্ষা করিয়া লঙ্কাবাসী ভিক্ষুগণের সঙ্গে তিনি লঙ্কা যাত্রা করিলেন। রেঙ্গুনস্থিত বড় লাট ফেয়ারের তত্ত্বাবধানে তাঁহারা নিরাপদে রেঙ্গুন হইয়া পেগুর ইতিহাস প্রসিদ্ধ কল্যাণী সীমায় পৌঁছিলেন। সেখানে পঁচাত্তর জন বিনয়ধর মহাস্থবিরের নিকট দ্বিতীয় কর্মবাক্য শ্রবণ করিয়া তাঁহারা লঙ্কাভিমুখে যাত্রা করিলেন। রেঙ্গুন হইতে ষ্টিমার যোগে মাদ্রাজ হইয়া যথাসময়ে তাঁহারা লঙ্কার গালে নগরে বিজয়ানন্দ বিহারে উপনীত হইলেন। সিংহলে আসিয়া তাঁহারা সিংহলের অন্যান্য ভিক্ষুদের সহিত ধর্ম ও আমিষ সম্ভোগ না করিয়া স্বতন্ত্র রহিলেন। ক্রমে তাঁহারা সংখ্যায় পুষ্ট হইয়া চারি বৎসর পরে সেখানে "রামঞ্‌ঞ নিকায়' নামে এক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করিলেন। পরবর্তীকালে এই নিকায়ের ভিক্ষুগণ শিক্ষা-দীক্ষা ও চারিত্রিক উৎকর্ষতায় লঙ্কায় বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছে।

রামঞ্‌ঞ নিকায় প্রতিষ্ঠা করিয়া পুন্নাচার সিংহলের নানা তীর্থস্থান পরিদর্শনে বাহির হইলেন। একে একে কলম্বোর সন্নিকটে কল্যাণী চৈত্য, কাণ্ডির দন্তধাতু চৈত্য, অনুরাধাপুরের প্রাচীন চৈত্য সমূহ, সম্রাট অশোকের কন্যা ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা কর্তৃক আনীত মহাবোধি বৃক্ষ, পোলনারোয়ার প্রাচীন কীর্তি, সমন্তকূট পর্বতে বুদ্ধের পদচিহ্ন প্রভৃতি পূজনীয় স্থানগুলি তিনি দর্শন করেন। অতঃপর তিনি স্বদেশে প্রত্যাগমনের ইচ্ছায় আচার্য ও সতীর্থগণ হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

পাঁচ বৎসর পরে ১২২৮ মগাব্দের আশ্বিন মাসে লঙ্কানিবাসী একজন ভিক্ষু ও একজন উপাসক সঙ্গে করিয়া শ্রদ্ধেয় পুণ্ণাচার চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসেন। দেশবাসী তাঁহাকে সাগ্রহে অভিনন্দন জানাইলেন। ইহার দুই বৎসর পূর্বে আরাকানের সংঘরাজ সারমেধ মহোদয় বাংলাদেশের কতিপয় ভিক্ষুকে থেরবাদ উপসম্পদা দিয়া যেই বিশুদ্ধ নিকায় প্রতিষ্ঠা করেন শ্রদ্ধেয় পুণ্ণাচার সেই পবিত্র নিকায়েই যোগদান করিলেন। নব গঠিত সঙ্ঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুসঙ্ঘ তাঁহাকে সগৌরবে আচার্যপদে বরণ করিয়া লইলেন। তখন হইতে তিনি দলমত নির্বিশেষে সকল বৌদ্ধের সদ্ধর্ম শিক্ষাদানের ভার গ্রহণ করিলেন। ক্রমশঃ তিনি সর্বত্র 'আচারিয়' নামে প্রসিদ্ধ হইলেন। তৎপূর্বে বঙ্গদেশের ভিক্ষুরা আরাকানিজ ভিক্ষুদের উচ্চারণ অনুকরণ করিতে গিয়া পালি ভাষার উচ্চারণ বিকৃতভাবে শিখিয়াছিলেন। ইহাতে অর্থ হৃদয়ঙ্গম করা দুঃসাধ্য ছিল। আচার্য পুণ্ণাচারই বঙ্গদেশে পালি ভাষার প্রকৃত উচ্চারণ শিক্ষা দিয়াছেন। তিনি বাংলা, পালি, হিন্দি, বার্মা ও সিংহলী প্রভৃতি ভাষায় প্রচুর অভিজ্ঞতা অর্জন করিয়াছেন। পাঁচটি ভাষায় তিনি অনর্গল ধর্মদেশনা করিতে পারিতেন।

উত্তর প্রদেশে বর্তমান কুশীনগর আবিষ্কৃত হইবার পূর্বে স্থানীয় বৌদ্ধদের ধারণা ছিল যে চন্দ্রনাথ পর্বতশীর্ষে ভগবান বুদ্ধ পরিনির্বাণ লাভ করিয়াছেন। বাংলার বৌদ্ধদের প্রাচীন হস্তলিপিত পুঁথি 'মঘা খম্মৌজা' গ্রন্থে উল্লেখ আছে যে দ্রোণ নামক ব্রাহ্মণ তথায় বুদ্ধের পূতাস্থি বিবদমান ভক্তদের মধ্যে বিতরণ করিয়াছেন। এই কারণে আচার্য চন্দ্রমোহন ভিক্ষুকে কুশীনারাবাসী বলে অনেকে মনে করিতেন। তিনি ইহার সত্যতা যাচাই করিবার নিমিত্ত দুইজন ভিক্ষুসহ চন্দ্রনাথ, সীতাকুণ্ড, বারবকুণ্ড, সহস্রধারা প্রভৃতি দর্শন করেন। শাস্ত্রানুসারে এই সকল স্থানে কোথাও কুশীনগরের কোন নিদর্শন তিনি দেখিতে পান নাই। তৎপর তিনি বুদ্ধগয়া দর্শন মানসে কলিকাতা আসেন। সেখানে কয়েক দিন ধর্মপ্রচার করিয়া যথাসময়ে গয়ায় উপস্থিত হইলেন। তখন বুদ্ধগয়া মন্দিরের উত্তর পার্শ্বে কিঞ্চিৎ দূরে অবস্থিত শিব মন্দিরকেই লোকে বুদ্ধগয়ার মন্দির মনে করিতেন। আচার্য মহোদয় তাহা মানিয়া লইতে পারেন নাই, কারণ শাস্ত্রানুসারে সেখানে সপ্ত মহাস্থান থাকিবারই কথা, কিন্তু ইহাতে তাহার কোন নিদর্শন নাই। তিনি ভাবিলেন বোধিমণ্ডপ নিশ্চয় কোথাও থাকিবে। একদিন ভগবানের গুণাবলী স্মরণ করিয়া রাত্রে শয়ন করিলে আচার্য পুণ্ণাচার বোধিবৃক্ষ সহ অশোক নির্মিত মন্দির স্বপ্নে দেখিতে পাইলেন। স্বপ্নে দেখিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া তিনি প্রভাতে ইতস্ততঃ সেই স্থান অন্বেষণ করিবার সময় স্থানীয় একজন পাণ্ডার নিকট জানিলেন যে তাঁহাদের দক্ষিণে ভূতস্থান বলিয়া এক জায়গা আছে। উহা জঙ্গলপূর্ণ। ভয়ে কেহ সেখানে যায় না। তখন আচার্য মহোদয় তাহাকে দুই আনা পয়সা বকসিস্ দিয়া তাহার সঙ্গে সেই স্থানে উপনীত হইলেন। তাঁহারা দেখিলেন যে মন্দির ও বোধি বৃক্ষের অর্ধাংশ মাটির নীচে রহিয়াছে। মন্দিরের উপরাংশের এক মূর্তিকে দেবী মনে করিয়া স্থানীয় লোকেরা পশু বলি দিয়া পূজা করেন। তিনি শাস্ত্রানুসারে বুদ্ধগয়া আবিষ্কার করিলেন। তখন ১২২৮ মগাব্দের শেষ সময়। ইহার পর ভারত সরকারের সুদৃষ্টিতে খনন কার্যের ফলে সমগ্র বুদ্ধগয়া মন্দির উদ্ধারপ্রাপ্ত হয়।

তৎপর পুনরায় চট্টগ্রামে ফিরিয়া আসিয়া পুন্নাচার সশিষ্যে বোমাং রাজ্যে ধর্মপ্রচারার্থ গমন করেন। তথা হইতে চৈত্র সংক্রান্তির সময়ে চাকমা রাজ্যের রাজধানী রাঙ্গুনীয়ার রাজানগরে উপস্থিত হইলেন। সেই সময় ভূতপূর্ব রাজা ধরমবক্স রায়ের পতিব্রতা পত্নী কালিন্দী রাণী সিংহাসনে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। আচার্যদেবের উপদেশে রাণী শ্রদ্ধান্বিতা হইলেন এবং অনেক স্বজাতি ও পাত্র-মিত্র সহ তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। তথা হইতে ফিরিয়া আচার্য বাক্‌খালি বিহারে (১২২৯মগী) বর্ষাবাস করেন। এই সময় তিনি বঙ্গদেশের বৌদ্ধধর্মের অভ্যুদয়ের নিমিত্ত একটি ভিক্ষুসীমা নির্মাণ বিষয়ে চিন্তা করিলেন। বর্ষাবাসের পর তিনি শ্রদ্ধাবতী উপাসিকা কালিন্দী রাণীকে তাঁহার সংকল্পের বিষয় জ্ঞাপন করিলেন। রাণী মহোদয়া সাগ্রহে সম্মত হইলেন। তজ্জন্য আয়োজন আরম্ভ হইল। রামু ও আরাকান হইতে সংঘরাজ সারমেধ সহ পঁচিশজন শীলবান মহাথের ইহাতে যোগদান করিলেন। চট্টগ্রামের প্রায় সকল ভিক্ষুদিগকে সম্মিলিত করিয়া প্রথমত ইছামতী নদীর উদক-উক্ষেপ সীমায় কর্মবাক্য শোনাইয়া পরিশুদ্ধ করিয়া লইলেন। তৎপর সকলে একত্রে ইতিহাস খ্যাত সীমা প্রস্তুত করিলেন। এই উপলক্ষে আচার্য মহোদয় রাজগুরুরূপে বহু ভিক্ষুশ্রমণ সহ রাজবিহারে প্রায় তিন বৎসর বাস করেন। এই সময় রাঙ্গুনীয়া ও পার্বত্য চট্টগ্রামের অনেক প্রাচীনপন্থী ভিক্ষু তাঁহার নেতৃত্বে সংঘরাজ নিকায়ভুক্ত হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পিতৃব্য উনাইনপুরা লংকারাম অধিপতি শ্রদ্ধেয় সূদন মাথে ও দক্ষিণ অঞ্চলের কতিপয় মাথে (মহাথের) তখন পর্যন্ত সংঘরাজ নিকায়ে যোগদান করেন নাই। ইহাতে তাঁহার অন্তরে অব্যক্ত ক্ষোভের সঞ্চার হয়। ১২৩২ মগাব্দের কার্তিক মাসে আচার্যের পিতৃ-বিয়োগ হয়। পিতার অন্ত্যেষ্টি ও শ্রাদ্ধাদি সমাধা করিয়া তিনি দীর্ঘকালের জন্য বিদেশ যাত্রা করিলেন।

এই সালের পৌষ মাসে তিনি পুনর্বার আরাকান গমন করেন। তথাকার তীর্থ ভ্রমণ করিয়া রেঙ্গুনে উপনীত হইলেন। তৎপর ব্রহ্মের তদানীন্তন রাজধানী মান্দালায় তাঁহার উপাধ্যায়ের বিহারে গিয়া অভিধর্ম ও ব্রহ্ম ভাষা শিক্ষায় নিবিষ্ট হইলেন। এই সময়েই তিনি রাজগুরু পদ লাভ করেন। সেখানে চারি বৎসর অবধি শিক্ষা করিয়া কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি সংগ্রহ করিয়া পুনরায় তিনি লংকাভিমুখে গমন করেন। সমুদ্রপথে ঝড়-বৃষ্টি ও উত্তাল তরঙ্গের দরুণ তাঁহাকে অনেক বিপদে পড়িতে হয়। অবশেষে অতি কষ্টে লঙ্কার গালে নগরের বিজয়ানন্দ বিহারে উপনীত হইলেন। সেখানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা ও নব প্রতিষ্ঠিত 'রামঞ্‌ঞ নিকায়ের' অভিবৃদ্ধির নিমিত্ত আত্মনিয়োগ করেন। এইরূপে সেখানে আট বৎসর অতিবাহিত হয়।

এই দিকে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে সঙ্ঘরাজ সারমেধ মহাথের দেহত্যাগ করেন। তখন স্বাভাবিক নিয়মে শ্রদ্ধেয় জ্ঞানালঙ্কার সংঘরাজ দলের দায়িত্বভার গ্রহণ করিবার নিমিত্ত আচার্যদেবকে স্বদেশে আগমনের অনুরোধ জানাইলেন। এতদিনে জীবনের শেষ অবস্থায় তাঁহার পিতৃব্য শ্রদ্ধেয় সূদন মাথের মনেরও পরিবর্তন হইয়াছে। তিনিও ভ্রাতুষ্পুত্রকে শেষ সময়ে দেখার নিমিত্ত সাদর আহ্বান জানাইলেন।

প্রায় বার বৎসর বিদেশে অতিবাহিত করিয়া আচার্য পুন্নাচার মহাথের রামঞ্‌ঞ নিকায়ের মহানায়ক শ্রীইন্দাসভ বরঞ্ঞাণ মহাথের সমভিব্যাহারে তীর্থ ভ্রমণ উদ্দেশ্যে ১৮৮২ খৃষ্টাব্দের বৈশাখ মাসে ভারতে আগমন করেন। বুদ্ধগয়া, সারনাথ, কুশীনগর, লুম্বিনী প্রভৃতি তীর্থক্ষেত্র পরিদর্শন করিয়া তাঁহারা কলিকাতা আগমন করেন। তথা হইতে লঙ্কার মহানায়ক সদলবলে ব্রহ্মদেশে যাত্রা করিলেন। কয়েকদিন পর শ্রদ্ধেয় পুন্নাচার মহাথের স্বদেশে উপনীত হইলেন। চট্টলবাসীরা দীর্ঘ-কাল পর্যন্ত তাঁহার শুভাগমন প্রতীক্ষা করিতেছিলেন। সেই বৎসর তিনি স্বগ্রামে বর্ষাবাস করিলেন এবং সেখানে একটি মন্দির নির্মাণ করাইয়া উহাতে বুদ্ধের পদচিহ্ন স্থাপন করিয়া ফাল্গুনী পূর্ণিমায় বার্ষিক মেলার সূত্রপাত করিলেন। অদ্যাবধি উহা 'আচারিয়ার মেলা' নামে তাঁহার জন্মভূমির গৌরব বর্ধন করিতেছে। এই সময় সংঘরাজ নিকায়ের ভিক্ষুসংঘ তথায় সম্মিলিত হইয়া শ্রদ্ধেয় আচার্য মহোদয়কে স্বনিকায়ের মহানায়ক পদে অভিষিক করেন। সেই সভায় শ্রদ্ধেয় সূদন মহাথের ও সমমতালম্বী অপর মহাথেরগণকে পুনঃ উপসম্পদা দিয়া সংঘরাজ নিকায়ের অন্তর্গত করা হয়। তৎপর চট্টগ্রামের দক্ষিণ অঞ্চলে সংঘরাজ নিকায় ক্রমশঃ বিস্তার লাভ করে।

সংঘরাজ ভিক্ষুসংঘ ও পাহাড়তলীবাসীর উদ্যোগে ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দে মহামুনি মন্দির প্রাঙ্গণে এক পালি বিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়। উহার প্রতিষ্ঠাতা ও অধ্যক্ষ হইলেন শ্রদ্ধেয় পুন্নাচার মহাস্থবির মহোদয়। এই বিদ্যালয়ে দল নির্বিশেষে ভিক্ষু শ্রমণ ও জাতি-ধর্ম-নির্বিশেষে গৃহীগণ পালি শাস্ত্র অধ্যয়নের সুযোগ লাভ করেন। এই সময় হইতে বাংলার বৌদ্ধদের মধ্যে পালি ভাষার মাধ্যমে ত্রিপিটক শাস্ত্র চর্চার সূত্রপাত হয়। বহু শিক্ষার্থী তাঁহার নিকট শিক্ষা লাভ করিয়া উচ্চ গবেষণার নিমিত্ত বিদেশে গমন করেন। অনেকে স্বদেশে বিদ্যালয় মহাবিদ্যালয়ে অধ্যাপনার সুযোগ লাভ করেন। এই সময় তাঁহার প্রেরণায় বিনয় কর্মের সুবিধার নিমিত্ত শাক্যমুনি মন্দির পার্শ্বে ভিক্ষুসীমা প্রতিষ্ঠিত হয়। মহামুনি ও বিভিন্ন গ্রামে ভিক্ষুদের পরিশুদ্ধির নিমিত্ত পরিবাস ব্রতের প্রবর্তন করা হয়।

কয়েক বৎসর পর এই বিদ্যালয় রাজানগর রাজবিহারে স্থানান্তরিত হয়। সেই স্থানেও কয়েক বৎসর তিনি রাজগুরুরূপে থাকিয়া বহু শিক্ষার্থীদের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার ও ধর্ম প্রচারে অতিবাহিত করেন। তখন শ্রদ্ধেয় গুণামেজু মহাথেরের মৃত্যুর পর তিনি চট্টগ্রামে বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি নির্বাচিত হন। কিছুদিন পরে তিনি তাঁহার শিষ্য শ্রদ্ধেয় অমরসিংহ স্থবিরকে রাজগুরুরূপে রাখিয়া রাজানগর হইতে চলিয়া আসেন এবং পালি বিদ্যালয়টিও আবার পটিয়া থানার পূর্ব সাতবাড়িয়া রত্নাঙ্কুর বিহারে স্থানান্তরিত করেন। তখন দক্ষিণ অঞ্চলের বিদ্যার্থীদের শিক্ষালাভের সুযোগ বৃদ্ধি পায়। তাঁহার পিতৃব্য সূদন মহাথেরের লোকান্তরের পর রত্নাঙ্কুর বিহারে শ্রদ্ধেয় তেজোবন্ত স্থবিরকে রাখিয়া তিনি নিজের জন্মভূমির লঙ্কারামে আসিয়া পৌঁছিলেন। জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি এই বিহারে ছিলেন। এই সময়ও তাঁহার সঙ্গে বহু বিদ্যার্থী থাকিতেন। জীবনের শেষের দিকে তিনি সিংহল হইতে

শিল্পী আনাইয়া লঙ্কারামে তের হাত উচ্চ এক বিরাট বুদ্ধমূর্তি নির্মাণ করান। স্বদেশে ইহা তাঁহার তৃতীয় ও শেষ কীর্তি চিহ্ন। ১২৭০ মগাব্দের মধ্যভাগে এই মূর্তির জীবন্ন্যাস বা প্রাণ প্রতিষ্ঠা করা হয়।

এইভাবে আচারিয় পুন্নাচার সারাজীবন সদ্ধর্মের সাধনা, গবেষণা ও প্রচারে নিবিষ্ট ছিলেন। তখনকার সময়ে বাংলার বৌদ্ধ সমাজে এত বহু ভাষাবিদ্ ও অনেক বৌদ্ধ দেশের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন লোক আর কেহ ছিলেন না। বৃদ্ধ বয়সে তাঁহাকে দর্শন মানসে ব্রহ্মদেশের মৌলমেনস্থ বৈজয়ন্ত বিহারাধিপতি অগ্রমহাপণ্ডিত উঃ সাগর মহাথের চট্টগ্রাম আসিয়াছিলেন। আরাকানের অনেক থের বিশেষতঃ সুবর্ণচৈত্য বিহারাধিপতি উঃ তেজারাম মহাথের কয়েকবার তাঁহার দর্শনে আসিয়াছেন। সিংহলের কোন কোন মহাথেরও তাঁহার দর্শনার্থ চট্টগ্রাম আসিতেন। এইরূপে স্বদেশে-বিদেশে তাঁহার খ্যাতি ছিল। দেশ-বিদেশে তাঁহার অন্তেবাসী ও ধর্মান্তেবাসীর সংখ্যা অপরিমেয়। বঙ্গদেশে তাঁহার নিকট শিক্ষা-দীক্ষা প্রাপ্ত ভিক্ষুদের মধ্যে সর্বজন শ্রদ্ধেয় পাহাড়তলীর জ্ঞানালঙ্কার মহাস্থবির, বিনাজুরীর ধর্মকথিক মহাস্থবির, গহিরার নবচন্দ্র মহাস্থবির, রামমণি মহাস্থবির, বরজ্ঞান মহাস্থবির, হোয়ারাপাড়ার অগ্রসার মহাস্থবির, নয়াপাড়ার ধর্মজ্যোতি মহাস্থবির, ডাবুয়ার কৈলাসচন্দ্র মহাস্থবির, ধর্মচারী মহাস্থবির, আধারমাণিকোর গুণালঙ্কার প্যারী মহাস্থবির, রঘুনন্দন মহাস্থবির, রাঙ্গুনীয়ার সাধক ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, জ্ঞানরত্ন কবিধ্বজ গুণালঙ্কার মহাস্থবির, পরিব্রাজক কালীকুমার মহাস্থবির, জ্ঞানানন্দ স্বামী, মির্জাপুরের ধর্মানন্দ মহাস্থবির, সাতবাড়িয়ার সমাজকর্মী তেজোবন্ত মহাস্থবির, উনাইনপুরার জগৎচন্দ্র মহাস্থবির, কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির, করলের প্রজ্ঞালঙ্কার মহাস্থবির, তালসারার পণ্ডিত প্রজ্ঞাতিষ্য মহাস্থবির, বৈদ্যপাড়ার বসন্ত মহাস্থবির, অগ্রমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, অগ্রমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির, জোবরার ধর্মরশ্মি মহাস্থবির, কড়ৈয়ানগরের বসন্ত মহাস্থবির প্রভৃতি তাঁহার সাক্ষাৎ শিষ্য ছিলেন। ইহাদের প্রত্যেকেই বঙ্গদেশে বৌদ্ধ ধর্ম ও সমাজোন্নতির এক একজন দিক্‌পালবিশেষ। বর্তমান ভিক্ষুগণ পুন্নাচারেরেই শিষ্য-প্রশিষ্য-পরম্পরা মাত্র।

এই নশ্বর জগতে কিছুই চিরস্থায়ী নহে। কর্মনিবন্ধন প্রাণীদের জন্ম ও মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। পরমারাধ্য সঙ্ঘরাজ আচার্য পুন্নাচার মহাস্থবির মহোদয় মাত্র তিন দিনের সামান্য জ্বররোগে আক্রান্ত হইয়া ভক্তমণ্ডলীকে শোক সাগরে ভাসাইয়া ১২৭০ মগাব্দের ২২শে মাঘ, বৃহস্পতিবার মাঘী পূর্ণিমা দিবসে অপরাহ্ণ ৪ঘটিকা ৫৫ মিনিটের সময় ৭৩ বৎসর ৭ মাস বয়সে দেহত্যাগ করিয়া সাধনোচিত ধামে প্রস্থান করিলেন।

উনিশ শতকে বাঙালির বুদ্ধচর্চার একটি খসড়া

বারিদবরণ ঘোষ*

ভাষার উদ্ভবের ইতিহাস আলোচনা করলেই বাংলা এবং বুদ্ধদেবের সম্পর্ক সহজেই ধরা পড়ে যায়। বুদ্ধ যে মগধের সন্তান, সেই মগধের আঞ্চলিক ভাষা মাগধী প্রাকৃত থেকেই বাংলাভাষার উৎপত্তি। অবশ্য বুদ্ধের আবির্ভাবের অনেক পরে পালরাজারা যখন খ্রিস্টীয় অষ্টম শতকের মাঝামাঝি সময়ে বাংলার সিংহাসনে আসীন তখনই বঙ্গদেশে বৌদ্ধধর্মের পরম বিকাশ ঘটে। তাঁরা ধর্মে বৌদ্ধ ছিলেন। পালবংশের প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বাঙালি জাতিও আত্মপ্রতিষ্ঠ হল। ঘটনাক্রমে পাল-রাজারা মগধেরও অধীশ্বর ছিলেন। এর আগে থেকেই বাঙালিরা অবশ্য বুদ্ধ-বিষয়ে অনুরাগী হয়ে পড়েছিলেন। সপ্তম শতকের বাঙালি বৌদ্ধ আচার্য শীলভদ্র তার অন্যতম উদাহরণ।

দশম শতকে বাঙালির সৃজমান সাহিত্যে আমরা পেয়েছি 'বুদ্ধনাটকে' র কথা, পেয়েছি বৌদ্ধধর্মের সারবাণী— 'করুণা মেহ নিরন্তর করিহা'। চর্যাগীতি বুদ্ধসম্পর্কের ব্যাপারে বাঙালির প্রথম সাহিত্য-নিদর্শন। মধ্যযুগের ভারতে এই সম্পর্ক রাজনৈতিক-রাষ্ট্রনৈতিক এবং অনেকটা ধর্মীয় ঘাত-প্রতিঘাতে কিছুটা ব্যাহত হয়ে পড়েছিল।

উনিশ শতকে বাঙালির মননশীলতায় যে সার্বিক জাগরণ সম্ভূত হয়, তাতে বিবুধ বাঙালির বুদ্ধ-চিন্তাতেও একটা প্রবল ঢেউ জাগে। এই তরঙ্গমালার প্রথম তরঙ্গ রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-১৮৯১)। ভারতীয় পুরাতত্ত্বের এই জীবিত জ্ঞানকোষ এশিয়াটিক সোসাইটিতে যোগ দেবার দশ বছর আগে প্রিন্সেপ অশোক লিপির পাঠ-উদ্ধার করে যে নতুন বিদ্যার প্রবর্তন করেন—তাতে রাজেন্দ্রলাল দীক্ষিত হন। 'বিবিধার্থ-সংগ্রহ' প্রকাশ ও সম্পাদনা করে তিনি বুদ্ধচর্চাকেও তার আলোচ্যসূচিতে গ্রহণ করেন। বহুসংখ্যক সংস্কৃত পুথির বিবরণ-সম্বলিত যে Descriptive Catalogue তিনি প্রকাশ করেন তাতে প্রাচীন ভারতীয় ব্রাহ্মণ্য সাহিত্যের সঙ্গে বহুতর বৌদ্ধ সাহিত্য-ধর্ম-সমাজের তথ্যও পঞ্জীকৃত হয়েছে। পরে তিনি উড়িষ্যা ও বুদ্ধগয়ার পুরাতত্ত্ব বিষয়ে ইংরেজিতে গ্রন্থরচনা করেন। কিন্তু তিনি বিখ্যাত হয়ে আছেন তাঁর An Introduction to the Lalitavistara বা The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal (১৮৯২) গ্রন্থের জন্যে। এই গ্রন্থই রবীন্দ্রনাথকে পরবর্তীকালে চণ্ডালিকা, মালিনী, নটীর পূজা, কথা ও কাহিনীর নানা কবিতা রচনার উপকরণ সরবরাহ করেছে। ঘটনাচক্রে তাঁর সমস্ত বুদ্ধচর্চাই ইংরেজিভাষায় গৃহীত হয়েছিল। তবুও তিনিই

---

* অধ্যাপক বারিদবরণ ঘোষ বিশিষ্ট লেখক ও প্রবন্ধকাররূপে সুপরিচিত।

আধুনিক বাঙালি যিনি বুদ্ধচর্চার পথিকৃৎ হয়ে আছেন। সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ সঙ্গত কারণেই তাঁর 'বুদ্ধদেব' (১৯০৪) গ্রন্থের ভূমিকায় লিখে গেছেন—"ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র, সি, আই, ই, মহোদয় বোধ হয় এদেশে সর্বপ্রথমে বৌদ্ধধর্মের আলোচনার দ্বার সম্যক উদ্‌ঘাটিত করেন।' রাজেন্দ্রলাল অবশ্য বৌদ্ধধর্মকে আপন কোনও বিশেষ ভাবনার আলোকে আলোকিত করে দেখার চেষ্টা করেননি—তথ্য উদ্ধার এবং শাস্ত্রোদ্ধারই তাঁর প্রধান লক্ষ্য ছিল।

সেদিক থেকে ('বৌদ্ধরঞ্জিকা'র কথা মনে রেখেও) বাংলা ভাষায় বুদ্ধচর্চার প্রথম পথিকৃতের সম্মান দিতে হয় সাধু অঘোরনাথ গুপ্তকে (আমাদের মনে আছে ১২৫২ বঙ্গাব্দের 'মঘা খমুজা' বইটির কথাও)। কিন্তু অঘোরনাথের বুদ্ধচর্চা বাঙালির একটা ধর্মআন্দোলনের ফসল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন ধর্মসম্প্রদায়ের মধ্যে আন্তরিক মিলন ঘটানোর উদ্দেশ্যে কেশরচন্দ্র সেন তাঁর অনুবর্তী কয়েকজনকে বিভিন্ন ধর্মশাস্ত্র ও ধর্মসাহিত্যচর্চার ভার অর্পণ করেন। খ্রিস্টানশাস্ত্র আলোচনার ভার দিলেন প্রতাপচন্দ্র মজুমদারকে, ইসলাম আলোচনার দায়িত্ব পান ভাই গিরিশচন্দ্র সেন, ভাই গৌরগোবিন্দ উপাধ্যায় নিমগ্ন হলেন হিন্দুধর্মের আলোচনায় এবং সাধু অঘোরনাথ গুপ্তকে দায়িত্ব দিলেন বুদ্ধচর্চার জন্য। তারই ফসল তাঁর 'শাক্যমুনিচরিত ও নির্বাণতত্ত্ব' বইটি। রাজেন্দ্রলাল এবং রামদাস সেনের বুদ্ধভাবনা তাঁকে নিরন্তর উদ্বোধিত রাখল। রাজেন্দ্রলালের ললিতবিস্তারকে সঙ্গে নিয়েই তিনি ১৮৮১ খ্রিস্টাব্দে প্রচারের উদ্দেশ্যে পঞ্জাব রওনা হন এবং এসময়েই এই গ্রন্থরচনার সূত্রপাত। যাবার পথে পর্যটন করলেন কয়েকটি বৌদ্ধতীর্থ। গ্রন্থরচনার পর পাণ্ডুলিপি পাঠিয়েছেন ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের কাছে অনুমোদনের জন্যে। কিন্তু অনুমোদন আসার আগেই অঘোরনাথের মৃত্যু হল মাত্র ৩৮ বছর বয়সে দুরন্ত কলেরা রোগে (৯ ডিসেম্বর ১৮৮১) প্রবাসে—লখ্‌নৌতে। পরে কেশবচন্দ্রের উদ্যোগে এবং গৌরগোবিন্দ রায়ের সম্পাদনায় গ্রন্থটি প্রকাশ পেল পরপর তিনখণ্ডে ১৮০৪-১৮০৫ শকাব্দে।

অঘোরনাথের বইটি লেখা হয়েছিল এমন একটা সময়ে যখন আমাদের দেশে মহাবোধি সোসাইটি বা বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। প্রবল শ্রদ্ধাবোধমিশ্রিত এই গ্রন্থের সূচনায় তাঁর মনে প্রশ্ন জেগেছিল—

> যে মহাত্মা দুই সহস্রাধিক বৎসর হইল, নশ্বরদেহ ত্যাগ করিয়া ইহলোক হইতে অবসৃত হইয়াছেন, তিনি এখন কোথায়? বাস্তবিক তিনি কি মরিয়াছেন? তিনি এখন নির্বাণ সাগরে ডুবিয়া আছেন। সেই অমরাত্মা নির্বাণ-জলধি দেবদেব, আদিদেব বিরাজমান রহিয়াছেন। আমি তাঁহার গুণে মুগ্ধ হইয়াছি, আমি তাঁহার নির্বাণরসের অমৃত পান করিয়া কৃতার্থ হইয়াছি। সেই মুনিরত্ন আমার আত্মার ভূষণ। (প্রস্তাবনা)

অঘোরনাথের আলোচনার মুখ্য উপকরণ ছিল ললিতবিস্তর। তাঁর মতে 'ললিতবিস্তরেই শাক্যমুনির জীবন, সাধন প্রণালী ও মত পরিষ্কাররূপে বিবৃত হইয়াছে।' বুদ্ধের করুণা-দয়া তাঁকে অভিভূত রেখেছিল—

'যিনি রাজপুত্র হইয়াও ভিক্ষুরূপে পথে পথে নগরে নগরে দয়ার্দ্রচিত্তে জীবগণের মুক্তি ও দুঃখ নির্বাণ করিবার জন্য ভ্রমণ করিলেন, যিনি রাজসিংহাসন ছাড়িয়া তরুতলে বাস করিলেন, তাঁহার এরূপ দয়া ও বৈরাগ্যের কথা মনে হইলে হৃদয় বিগলিত হয়, অশ্রুবেগ সংবরণ করা দুরূহ হইয়া পড়ে। এমন মহানুভবের প্রতি হৃদয় চিরকৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারে না। সেই কৃতজ্ঞতা স্বরূপ আমি এই গ্রন্থখানি প্রকাশ করিতে বাধ্য হইলাম।'

বুদ্ধদেবের জীবনকে তিনি জীবনীর রসে যেমন বিবৃত করেছেন তেমনি নির্বাণতত্ত্বের আলোকে বুদ্ধদেবকে দেখে বৌদ্ধতত্ত্বকে পাঠকের কাছে সহজে পৌঁছে দিয়েছেন। বুদ্ধ বলেছিলেন—

নত্থি ঝানং অপ্‌এঞএঞস স পঞ্‌এঞা নত্থি অঝায়তো।
যম্‌হি ঝানঞ্চ পঞ্‌এঞং চ সবে নিব্বাণ সন্তিকে।

—'যার প্রজ্ঞা বা সত্যজ্ঞান নেই, তার ধ্যানও নেই। যার ধ্যানও নেই, তার প্রজ্ঞাও নেই। ধ্যান এবং প্রজ্ঞা যার আছে, সে নির্বাণের নিকটেই আছে।' অঘোরনাথের মধ্যে ধ্যান ও প্রজ্ঞা দুই-ই বর্তমান ছিল—তাই নির্বাণতত্ত্ব সহজেই অধিগত করতে পেরেছিলেন। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও প্রসারের একটি সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্তও দিয়েছেন। কিন্তু বৌদ্ধধর্মের অবনতি বিষয়ে কিছু বলেননি। সম্ভবত এটি বিবৃত করা তাঁর পক্ষে কষ্টকর ছিল। এই শ্রদ্ধাবোধের কারণেই ইউরোপীয় পণ্ডিতদের বুদ্ধচর্চার সীমাবদ্ধতা তাঁকে পীড়িত করেছিল। তিনি লিখেছেন—'আমি বিশ্বাস করি যে তাঁহারা অনেকেই সেই মহাত্মার প্রতি অবিচার ও অসঙ্গত মত প্রকাশ করিয়াছেন।' অবশ্য হড্‌সন, বিল ও বুর্নফের বৌদ্ধচর্চার প্রতি তিনি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি অশোকের ভূমিকাকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে বিচার করেছেন। বৌদ্ধ সঙ্গীতি সমূহের ফলাফলও মূল্যায়ন করেছেন তদগতচিত্তে। বুদ্ধের সর্বত্যাগী জীবন থেকে প্রাপ্ত শিক্ষাসমূহকে সাধকদের কাছে মূল ভাষণাদি সম্মুখস্থ রেখে প্রদান করেছেন।

প্রসঙ্গত, প্রত্যক্ষভাবে না হলেও অশোকচর্চার মাধ্যমে বুদ্ধভাবনাকে পাঠকদের কাছে উপস্থাপিত করেছিলেন বাংলাভাষায় যিনি, তিনি উক্ত কেশবচন্দ্র সেনের অনুজ, ইণ্ডিয়ান মিরর, সানডে মিরর এর সম্পাদক কৃষ্ণ বিহারী সেন (১৮৭৪—১৮৯৫)। তিনিও অবশ্য বুদ্ধদেবের জীবনী, 'বুদ্ধচরিত', রচনা করেছিলেন। কিন্তু ১৮৯২ সালে প্রকাশিত 'অশোকচরিত' তাঁকে খ্যাতি এনে দিয়েছিল। প্রিন্সেপ, বুর্নফ, দ্বীপবংশ, বিশপ বিগানডেট প্রভৃতির আলোচনা থেকে উপকরণ সংগ্রহ করে তিনি তাঁর গ্রন্থ রচনা করেছিলেন। তিনি কোনও ভাবে ঐতিহাসিক ছিলেন না, কিন্তু তাঁর ইতিহাসবোধ ছিল তীক্ষ্ণ। তাই বৌদ্ধভারতের বর্ণনা, হিন্দু-বৌদ্ধধর্মের তৌল আলোচনা, পালিভাষার ইতিবৃত্ত, গ্রিক ও ভারতীয়দের সংঘাতকে তিনি নিপুণভাবে এনে বুদ্ধচর্চার দিঙ্‌নির্দেশ করে দিতে সমর্থ হয়েছেন।

অঘোরনাথের পর আমরা একটি বই পেয়েছি 'মহাপুরুষজীবনী'—বুদ্ধদেবের জীবনীনির্ভর

সহজভাষায় লেখা। এর আখ্যাপত্রে না আছে রচয়িতার নাম, না আছে প্রকাশকাল। তবে এটা ১৮৮০ সালে কেনা হয়েছিল। বইয়ে ছাপা বেঙ্গল লাইব্রেরির সিলে এমনতর উল্লেখ থাকায় বোঝা যায় যে এটি ১৮৮০ সাল বা তার কাছাকাছি কোনও বছরে ছাপা হয়েছিল।

কৃষ্ণকুমার মিত্র (১৮৫২—১৯৩৬) যদিও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ভুক্ত ছিলেন— তবুও তিনি গৌণত কেশবচন্দ্র সেনের পরোক্ষ প্রেরণায় একদা 'মহম্মদ-চরিত' লিখে যেমন ইসলামীয় পন্থাকে অনুধাবনের চেষ্টা করেছিলেন, তেমনি 'বুদ্ধচরিত ও বৌদ্ধধর্মের সংক্ষেপ বিবরণ' (১৮৮৩) লিখে বাঙালি বুদ্ধদেবকে কিভাবে দেখতে চাইছিল সে সময়ে—তার একটা আভাস দিয়েছেন। প্রসঙ্গত, স্কুলে পড়ার সময় তিনি গিরিশচন্দ্র সেনের ছাত্র ছিলেন। অঘোরনাথের মতো এই ধারাবাহিক সুবিন্যস্ত জীবনচরিত্রটির উৎস 'ললিত বিস্তর' গ্রন্থটিই। কৃষ্ণকুমার অবশ্য নিজে পালি ও বৌদ্ধ-সংস্কৃত ভাষায় পারদর্শী ছিলেন। সেজন্যে তাঁর পক্ষে সুত্তনিপাত, মহাপরিনির্বাণসুত্ত, ধম্মপদ, ক্ষুদ্দক পাঠ প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থ থেকেও উপকরণ সংগ্রহ সম্ভব হয়েছিল। বৌদ্ধনীতি, বৌদ্ধ সমাজ, বৌদ্ধকাহিনি এবং বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও অবনতিকে উদার ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে দেখেছেন সৎ ঐতিহাসিকের মতই। সেজন্য আপনগ্রন্থের মূলরচনাকে প্রাঞ্জল করতে বহুতর পাদটীকার ব্যবহার করেছেন। ষষ্ঠ অধ্যায়ের পাদটীকায় তিনি 'বোধিদ্রুম' বৃক্ষ সম্পর্কে লিখেছেন— 'এই বোধিদ্রুমের অঙ্কুর জাত বৃক্ষ এখনও বর্তমান আছে। খৃষ্ট পূর্ব তৃতীয় শতাব্দীতে বোধিদ্রুমের একটি শাখা সিংহলের অনুরাধপুরে নীত হইয়া প্রোথিত হয়, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান আছে। এই বৃক্ষই পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। ৫০০ খৃষ্টাব্দে অমরসিংহ বুদ্ধগয়ার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া দেন। তাহার ভগ্নাবশেষের উপর বর্ত্তমান মন্দির প্রতিষ্ঠিত।' ভারত থেকে একসময়ে বৌদ্ধধর্ম 'অন্তর্হিত' হলেও, কৃষ্ণকুমার বিশ্বাস করতেন—'যতকাল সৃষ্টি থাকিবে বুদ্ধদেবের প্রেমশাস্ত্র কেহ বিলুপ্ত করিতে সক্ষম হইবে না।'

পুরাতত্ত্ববিদ্ রামদাস সেন (১৮৪৫—১৮৮৭) বহুকাল ধরে বুদ্ধচর্চা করে গেছেন। বঙ্গদর্শন, ভারতী প্রভৃতি পত্রিকাতে তিনি বুদ্ধবিষয়ক প্রচুর প্রবন্ধ রচনা করে গেছেন। 'ভারতী'তে লিখেছিলেন কপিলবস্তু নগরের উৎপত্তি, শাক্যবংশের উৎপত্তি, শাক্যসিংহের উদ্যানযাত্রা, শাক্য সিংহের কৌমার জীবনের একটি কথা, শাক্যসিংহের মগধবিহার প্রভৃতি প্রবন্ধ নিচয়। তাঁর বুদ্ধচর্চার শ্রেষ্ঠ ফসলটি অবশ্য তাঁর 'বুদ্ধদেব: তাঁহার জীবন ও ধর্মনীতি' গ্রন্থটি (১৮৯২)। এই বই কোনও ইংরেজি বইয়ের অনুবাদ যেমন নয়, তেমনি কিংবদন্তী-আশ্রয়ীও নয়। রবীন্দ্রনাথ বইটির সমালোচনা প্রসঙ্গে লিখেছিলেন—"রামদাসবাবুর রচনার প্রধান গুণ এই যে ইহাতে কোথাও গায়ের জোরে কথা বলা হয় নাই, পাঠকের সম্মুখে তিনি যাবতীয় ঘটনা এবং বিবিধ কাহিনী উপস্থিত করিয়া স্বাধীনভাবে চিন্তা অবসর করিবার দিয়াছেন।'

রামদাস সেন কোনও তথ্য বা প্রবাদকে বিচার না করে গ্রহণ করেননি। 'বুদ্ধদেব না কি বেদ-নিন্দা করেছিলেন'— এই শোনা কথার সঙ্গে বুদ্ধজীবনের কোনও সঙ্গতি তিনি দেখতে

পাননি বলে তাঁর মত উল্লেখ করে কালীবর বেদান্তবাগীশ লিখতে পেরেছিলেন—'তাঁহার পবিত্রজীবনে উক্ত নিন্দাবাদের লেশমাত্রও দেখিতে পাই নাই।' তবে একথাও তিনি বলতে বাধ্য হয়েছেন—'তিনি ব্রাহ্মণদিগের ন্যায় বেদের অভ্রান্ততা স্বীকার করিতেন কি-না তাহা এখন স্থির বলা যায় না।' তিনি জয়দেবের গীতগোবিন্দে বুদ্ধাবতার বিচার প্রসঙ্গেও বলেছেন জয়দেবও 'নিশ্চিত বুঝিয়াছিলেন বুদ্ধদেব সমুদয় বেদের নিন্দা করেন নাই।'

এর পরে পরেই বুদ্ধদেবের জীবনী অবলম্বন করে দুটি বই রচিত হয়েছিল। একটির নাম 'বুদ্ধদেব-চরিত'— সম্ভবত ১৮৯৮ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত — লেখকের নাম নেই। অন্যটি উপেন্দ্রকুমার ঘোষ রচিত 'বুদ্ধদেব-চরিত'। প্রাচীন সাধুবাংলায় লেখা এই জীবনীগ্রন্থের প্রকাশকাল ১৩০১ বঙ্গাব্দ অর্থাৎ ১৮৯৪ খ্রিস্টাব্দ। সাধারণ জীবনী—লেখকেরা নির্দিষ্ট কোনও মতামত প্রকাশ করেননি।

ব্রাহ্মসমাজ কমিটির একতম অধিবেশনে আল্‌বার্ট হলে দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর যে প্রবন্ধটি পড়ে শুনিয়েছিলেন, সেটিই পরে 'আর্য্যধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের পরস্পর ঘাত-প্রতিঘাত ও সঙ্ঘাত' নামে ১৩০৬ বঙ্গাব্দে মুদ্রিত হয়ে প্রচারিত হয়। দ্বিজেন্দ্রনাথের ধর্মীয় বোধ আর পাঁচজন সাধারণ বাঙালি থেকে একটু স্বতন্ত্র ছিল। প্রাপ্তির চেয়ে প্রক্রিয়ার উপর তিনি জোর দিয়েছেন বেশি। আত্ম-উত্তরণ ও আত্মশুদ্ধির প্রক্রিয়ার সঙ্গেই তিনি তাঁর ঈশ্বরোপাসনাকে মিলিয়ে দিয়েছেন। বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কেও তিনি এই ভারসাম্যটি বজায় রেখেছেন—

> বুদ্ধদেব অহিংসা, ক্ষমা, দয়া, সত্যপরায়ণতা, শুদ্ধাচার ইত্যাদি নানাপ্রকার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সম্বলিত সাধর্ম জনসমাজে প্রচার করিলেন, কিন্তু ঈশ্বর প্রসাদের প্রতি উপেক্ষা করিয়া আত্মপ্রবাহের প্রশ্রয় দিলেন **এত বেশী** যে, তাঁহার মৃত্যুর পরবর্তীকালে তাঁহার পক্ষাবলম্বী সাধকদিগের মনে এইরূপ একটা অসংগত বিশ্বাস ক্রমে বল করিয়া উঠিল, যে বীজ বা অস্ফুট চক্ষু মনুষ্যের আত্মার অন্তরে প্রচ্ছন্ন রহিয়াছে—বিশিষ্ট রূপ সাধন দ্বারা কেবল ফুটাইয়া তুলিবার অপেক্ষা। তাহা হইলেই মনুষ্য সর্বজ্ঞ হইতে পারে।'

(স্থূলরেখ শব্দ দ্বিজেন্দ্রনাথ-নির্দেশিত)। ঠিক এই ভাবনা দ্বারাই সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরিচালিত ছিলেন না। সে প্রসঙ্গে আসবার আগে লক্ষ্য করতে চাই—এই কালপর্বে বাঙালি অন্য মাধ্যমে কিভাবে বুদ্ধচিন্তার সামিল হয়েছিলেন। তার একটা খসড়া রচনা করে নিতে চাইছি এই অবকাশে।

আমরা আগেই বলেছি অশোক-বিষয়ে প্রথম গ্রন্থরচনার কৃতিত্ব কৃষ্ণবিহারী সেনের। তাঁর 'অশোক-চরিত' রচনার সমকালেই তিনি একটি নাটক লেখেন—'অশোক চরিত নাটক'। দুই অঙ্ক নয় গর্ভাঙ্ক সম্বলিত এই নাটকে বুদ্ধকে 'ভগবৎ' নামে নামাঙ্কিত করা হয়েছে। নাটকের শেষে মহারাজ অশোক মন্ত্রী রাধগুপ্তকে বলছেন—'সমস্ত সসাগরা পৃথিবী আমি ভগবতের ধর্মপ্রচারার্থ... দান করিলাম'। বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জয়গানে—নাটকের সমাপ্তি ঘটেছে।

১২৯৫ সালে সুত্তনিপাত-অবলম্বনে একটি নাটক লেখেন শরচ্চন্দ্র দেব 'শাক্যসিংহ প্রতিভা বা বুদ্ধচরিত' নাম দিয়ে। স্বয়ং গিরিশচন্দ্র ঘোষ 'অশোক' নাটক রচনা করেন ১৯১১ সালে। তিনি এর অনেক আগেই ১২৯৪ বঙ্গাব্দে (১৮৮৭) এডুইন্ আর্নল্ড এর লাইট অফ এশিয়া গ্রন্থের নাট্যানুবাদ করেন 'বুদ্ধদেব চরিত' নামে। নাটকটি তিনি এড্‌ইনকেই উৎসর্গ করেন। গৈরিশছন্দে রচিত এই সুপরিচিত নাটকটি পঞ্চাঙ্ক সম্বলিত। তাঁর 'চৈতন্যলীলা'র অভিনয়ে দেশবাসী যেমন ভাবাপ্লুত হয়েছিল 'বুদ্ধচরিত' অভিনয়ে তেমনি শান্তরসের উৎসার ঘটেছিল। এই নাটকের 'জুড়াইতে চাই কোথায় জুড়াই, কোথা হ'তে আসি কোথা ভেসে যাই' গানটি গিরিশচন্দ্রকে অমর করে রেখেছে। রামকৃষ্ণদেবের পরমপ্রিয় গান ছিল এটি। গানটি গাইতে গাইতে স্বামী বিবেকানন্দ আত্মহারা হয়ে যেতেন বলে মহেন্দ্রনাথ দত্ত জানিয়েছেন।

সুখ্যাত বৌদ্ধ কাহিনি—পুত্রহারা রমণী কর্তৃক বুদ্ধের কাছে পুত্রের জীবনভিক্ষার প্রসঙ্গ নিয়ে বুদ্ধ যখন শোকাতুর রমণীকে বোঝালেন মৃত্যুর হাত থেকে কারও নিস্তার নাই, তখন জননীর উত্তর—'পিতা তব উপদেশে—

ধৈর্যের বন্ধন দিব প্রাণে।
কিন্তু নয়ন—আনন্দ ছিল নন্দন আমার!'

সেকালের দর্শকদের উন্মাদ করে তুলত। বাঙালির ভাবাবেগের সঙ্গে বুদ্ধজীবনকে একীকৃত করে দেখতে চেয়েছিলেন গিরিশচন্দ্র।

নাটকের মতই কাব্যের আধারেও বাঙালি বুদ্ধদেবকে ভাবতে চেয়েছিলেন। এর প্রথম এবং সার্থক উদ্যোগ করেছিলেন কবিবর নবীনচন্দ্র সেন। ১৮৯৫ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছিল তাঁর সুখ্যাত 'অমিতাভ' কাব্যটি। কাব্যটি রচনার প্রেরণা সম্পর্কে নবীনচন্দ্র নিজেই লিখেছেন— 'বুদ্ধদেবের এবং বৌদ্ধধর্মের লীলাভূমি বেহার দর্শন করিয়া এবং সেখানে বহু বৌদ্ধ-গ্রন্থ পাঠ করিয়া আমি বুদ্ধদেবের ও বৌদ্ধধর্মের মহিমায় অভিভূত হইয়াছিলাম।' তিনি এডুইন আর্নল্ড এর রচনায় যে 'অতিরঞ্জিত' বুদ্ধকে দেখতে পেয়েছিলেন— তার পরিবর্তে চেয়েছিলেন 'রক্তমাংসের' বুদ্ধদেবকে দেখতে। ' যেভাবে বুদ্ধদেবকে চক্ষের উপরে দেখিতে পাই, তাঁহাকে ধারণা করিতে পারি, সে ভাবে চিত্র করাই আমার উদ্দেশ্য।' আনন্দকুমার স্বামী যেমন লিখেছিলেন— 'It is certain that in the third century B.C., it was believed that the Buddha had lived as a man amongst men' নবীনচন্দ্রও তেমনি বুদ্ধদেবকে 'man amongst men' রূপে 'অমিতাভ' কাব্যে আপন অনুভূতির রসে জারিত করে অঙ্কন করেছেন। অর্থাৎ এখানে মানব-বুদ্ধের ছবি এঁকেছেন। সেকারণেই কাব্যের বৈরাগ্য নামক সপ্তম সর্গে সিদ্ধার্থের মনে সংসার-সুখ ও মানব-দুঃখ—এই দুই বিরুদ্ধ ভাবের দ্বন্দ্ব-বিক্ষোভ দেখিয়েছেন। দশমসর্গে 'মহানিষ্ক্রমণ' অংশে শেষবারের মত পত্নীপুত্রের মুখ দর্শনকালে সিদ্ধার্থের মনে মায়াসিক্ত সংসারের বেদনারহস্যটুকু নীরবে ব্যক্ত হয়েছে:

এবার সিদ্ধার্থ-বক্ষ কাঁপিল না আর,
কেবল দুইটি বিন্দু অশ্রু দুনয়নে
আসিল; ভাসিল ধীরে,— মায়ার চরণে
সিদ্ধার্থের সুশীতল শেষ উপহার।

ঠিক এই কারণেই তিনি সিদ্ধার্থের মহানির্বাণকে অলৌকিকতায় আচ্ছন্ন করে দেখেননি। বুদ্ধদেব তাঁর কাছে 'অতিমানব' নন—মহামানব।

১৯০১ খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয় সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত গ্রন্থ 'বৌদ্ধধর্ম'। ঠাকুর পরিবারে বুদ্ধচর্চার সূত্রপাত করেন স্বয়ং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনি পুত্র সত্যেন্দ্রনাথ এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রকে নিয়ে সিংহলে গেছিলেন। সেখান থেকে সংগ্রহ করে আনেন বৌদ্ধধর্মের প্রাণবাণী। তারই প্রেরণাতে সত্যেন্দ্রনাথের এই গ্রন্থরচনা। ইতিহাস এবং তত্ত্ব উভয়কে সাঙ্গীকৃত করে এই বই রচিত। সুধাংশু বিমল বড়ুয়া এই লক্ষণ লক্ষ্য করে মন্তব্য করেছেন—'তিনি হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্মের মধ্যে সমন্বয় সাধনের জন্য বৌদ্ধ মতের উপর কোন প্রকার হিন্দুমত আরোপের প্রয়াস করেননি, বৌদ্ধধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি বরাবর লক্ষ্য রেখেছেন।' বুদ্ধজীবনের নানা প্রসঙ্গ—তাঁর নীতি, উপদেশ, ধর্মচক্র; ব্রাহ্মণ্য আধিপত্যের কুফল, স্ত্রী-পুরুষের আচরণ, প্রাত্যহিক ও প্রচারকের জীবন—সবই বীজাকারে আলোচনা করেছেন। তাতে বুদ্ধের জীবনচরিতের পাশে তাঁর ধর্মচক্র এবং প্রতিষ্ঠিত সঙ্ঘের একটি অনুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। স্বভাবতই তিনিও ইউরোপীয় বুদ্ধচর্চার কাছে ঋণী, কিন্তু তাদের মধ্যে যে বিপুল মতভেদ আছে—তাকেও তিনি বিচার করে একটা নির্ভুল তত্ত্বে পৌঁছবার চেষ্টা করেছেন।

বাঙালির বুদ্ধচর্চার যে সূত্রপাত হয়েছিল উনিশ শতকের শেষার্ধের প্রায় অন্তিমলগ্নে তাকে বেগবান করে বুদ্ধদেবকে ও তাঁর প্রবর্তিত ধর্মনীতিকে বাঙালি যে শ্রদ্ধা করে চলেছিল সারা উনিশশতক জুড়ে— তার একটা খসড়া আমরা রচনা করলাম। প্রকৃতপক্ষে সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বইটি দিয়েই বিশশতকে বাঙালির বুদ্ধভাবনার সূত্রপাত ঘটেছিল। এই ধারাটিই ক্রমাগত সমৃদ্ধ হয়ে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, শরৎকুমার রায়, চারুচন্দ্র বসু, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, কালীবর বেদান্তবাগীশ, অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রমথনাথ তর্কভূষণ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, শরচ্চন্দ্র দাস, বিমলাচরণ লাহা, নলিনাক্ষ ভট্টাচার্য, হীরেন্দ্রনাথ দত্ত, বিমানবিহারী মজুমদার, সুজিতকুমার মুখোপাধ্যায়, শ্রীধরচন্দ্র বড়ুয়া, নলিনীনাথ দাশগুপ্ত, প্রবোধচন্দ্র সেন, অমূল্যচন্দ্র সেন প্রমুখের রচনায় বেগবান হয়ে উঠেছিল। এদের মধ্যমণি হয়ে আছেন রবীন্দ্রনাথ। এই পর্বের আলোচনা আমার প্রবন্ধসীমার অন্তর্ভুক্ত নয়। কিন্তু হিন্দুধর্মের প্রবল তগ্রাসিঞ্চুতার মধ্যে বুদ্ধদেবের জন্যে একটা বিশিষ্ট স্থান বাঙালির হৃদয়ে বরাবরই রয়ে গেছে। চৈতন্যদেব বুদ্ধনাটকে অভিনয় করেছিলেন যে আবেগ ও বোধে—তারই আবেগে রচিত হয়েছে বিভূতিভূষণের গল্প, হর প্রসাদ শাস্ত্রীর উপন্যাস। এমনকি বিংশ শতাব্দীর শেষপাদে মৈত্রেয় জাতক। নিরীশ্বর বাদী বুদ্ধ তাই ঈশ্বরবাদী বাঙালির কাছেও উপাস্য দেবতা হয়ে উঠেছেন।

রবীন্দ্রদৃষ্টিতে বুদ্ধ

সুধাংশু বিমল বড়ুয়া*

মানবমহিমার শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ হয়েছে বুদ্ধের মধ্যে। সেজন্য রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে জগতের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে অভিহিত করেছেন। বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের আন্তরিক অনুরাগ ও শ্রদ্ধার নিদর্শন তাঁর জীবন ও সাহিত্যে সমভাবে উজ্জ্বল হয়ে আছে। বস্তুত রবীন্দ্রনাথের অনুপম শ্রদ্ধা ও ঐতিহাসিক সত্যনিষ্ঠার আলোকে বুদ্ধমহিমা যে অপরূপ দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। ১৩৪২ সালের ৪ জ্যৈষ্ঠ কলকাতার শ্রীধর্মরাজিক চৈত্যবিহারে বৈশাখী পূর্ণিমা উপলক্ষে ভাষণদানের শুরুতেই তিনি বললেন—

আমি যাঁকে অন্তরের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ মানব বলে উপলব্ধি করি আজ এই বৈশাখী পূর্ণিমায় তাঁর জন্মোৎসবে আমার প্রণাম নিবেদন করতে এসেছি। এ কোনো বিশেষ অনুষ্ঠানের উপকরণগত অলঙ্কার নয়, একান্তে নিভৃতে যা তাঁকে বার-বার সমর্পণ করেছি সেই অর্ঘ্যই আজ এখানে উৎসর্গ করি।[১]

বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এই শ্রদ্ধা আজীবন অক্ষুণ্ণ ছিল। তাই জীবনের শেষপ্রান্তে এসেও রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে অন্তরের অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন—

কাল প্রাতে মোর জন্মদিনে
এ-শৈল-আতিথ্যবাসে
বুদ্ধের নেপালী ভক্ত এসেছিল মোর বার্তা শুনে।
ভূতলে আসন পাতি
বুদ্ধের বন্দনামন্ত্র শুনাইল আমার কল্যাণে—
গ্রহণ করিনু সেই বাণী।

বুদ্ধদেবের পুণ্যস্মৃতিবিজড়িত বুদ্ধগয়া, সারনাথ প্রভৃতি তীর্থ সম্বন্ধেও রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করতেন। বুদ্ধের প্রতি আন্তরিক শ্রদ্ধা ও অনুরাগবশত রবীন্দ্রনাথ জীবনে একাধিকবার বুদ্ধগয়ায় গমন করেন। সেখানে গিয়ে তিনি শান্তি পেয়েছেন, অনন্তকারুণিক বুদ্ধের পুণ্যস্পর্শ উপলব্ধি করেছেন। বুদ্ধগয়ার মন্দিরদর্শনে কবির মনে এই ভাব জেগেছে—

যাঁর চরণস্পর্শে বসুন্ধরা একদিন পবিত্র হয়েছিল তিনি যেদিন সশরীরে এই গয়াতে

---

* প্রয়াত অধ্যাপক ডঃ সুধাংশু বিমল বড়ুয়া। তাঁর গবেষনা গ্রন্থ 'রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি'র একটি অধ্যায় থেকে সংক্ষিপ্তাকারে পুনর্মুদ্রিত।

ভ্রমণ করেছিলেন, সেদিন কেন আমি জন্মাই নি, সমস্ত শরীর মন দিয়ে প্রত্যক্ষ তাঁর পুণ্যপ্রভাব অনুভব করি নি?[২]

বুদ্ধগয়ায় বুদ্ধমূর্তির সম্মুখে দাঁড়িয়ে কবির অন্তরে যে প্রণাম জ্ঞাপনের আকুলতা জেগেছিল সেকথা পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে। আর শুধু বুদ্ধগয়াতে কেন, শ্যামে ব্রহ্মে জাভায় গিয়েও বুদ্ধদেবের স্মারকচিহ্নসমূহ দেখে রবীন্দ্রনাথ গভীর শ্রদ্ধা ও বিস্ময়ে ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। বোরোবুদুরের পাষাণস্তূপের সম্মুখে দাঁড়িয়ে কবির মনে বারবার এই ধ্বনি গুঞ্জরিত হয়ে উঠেছে—'বুদ্ধের শরণ লইলাম'।[৩] কবির আপন ভক্তহৃদয়ের প্রণতি জ্ঞাপনের আকুলতা এই একটি মাত্র চরণকে অবলম্বন করে প্রকাশ পেয়েছে। 'নটীর পূজা'য় দাসী শ্রীমতীর সংগীতনৃত্যময় জীবনারতির মধ্যে দিয়েও বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের সীমাহীন শ্রদ্ধা এক অপূর্ব ব্যঞ্জনায় প্রকাশ লাভ করেছে—

আমায় ক্ষমো হে ক্ষমো, নমো হে নম
তোমায় স্মরি, হে নিরুপম,
নৃত্যরসে চিত্ত মম
উছল হয়ে বাজে।

আমার সব চেতনা সব বেদনা
রচিল এ যে কী আরাধনা,
তোমার পায়ে মোর সাধনা
মরে না যেন লাজে।

তোমার বন্দনা মোর ভঙ্গিতে আজ
সংগীতে বিরাজে।[৪]

প্রাণের চরম আবেগঢালা এই সংগীতনৃত্যের মধ্য দিয়ে কবির সমগ্র হৃদয়তনুর আকুলতা যেন ভগবান বুদ্ধের চরণে প্রণাম হয়ে লুটিয়ে পড়েছে। কবি যথার্থই তাঁর 'সব চেতনা সব বেদনা' দিয়ে এই 'আরাধনা' সংগীত রচনা করেছেন; শ্রীমতীর সঙ্গে সংগীতের ভঙ্গিতে কবি নিজেকেও বন্দনায় নিয়োজিত করেছেন।

বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধা রবীন্দ্রনাথের কর্মজীবনের মধ্যে অন্যভাবেও প্রকাশ পেয়েছে। বুদ্ধপূর্ণিমা উপলক্ষে রচিত 'হিংসায় উন্মত্ত পৃথ্বি...' গানটি স্মরণীয়। রবীন্দ্র-সংগীতের মধ্যে এই সর্বজনপ্রিয় গানটির একটি বিশেষ স্থান আছে। বিষয়গৌরবে, প্রকাশভঙ্গিতে ও আন্তরিক আবেগের মহিমায় এই গানটি সহজেই মর্মস্পর্শ করে। আজকের পৃথিবীর হিংসা, লোভ ও রক্তক্ষয়ী সংঘাতের দিনে শান্তিকামী নিখিল মানবের ক্রন্দনধ্বনি যেন এর সুরে অনুরণিত হয়েছে—

হিংসার উন্মত্ত পৃথ্বি, নিত্য নিঠুর দ্বন্দ্ব,
ঘোরকুটিল পন্থ তার, লোভজটিল বন্ধ।
নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।

বুদ্ধ এখানে শুধু করুণাঘন নন, জগতের হিংসা দ্বন্দ্ব থেকে তিনি মানুষের ত্রাণকারী। কবি বিশ্বাস করেন, ভগবান বুদ্ধের দক্ষিণ হস্তের কল্যাণস্পর্শে ধরণীর সকল গ্লানি দূরীভূত হবে, পৃথিবী আবার শুচিশুভ্র হবে।

বৈশাখী পূর্ণিমাতে বুদ্ধকে উদ্দেশ করে রবীন্দ্রনাথ আরো একটি গান রচনা করেন। এখানেও কবি মহাসংকটের দিনে সকল দুর্গতিভয় বিনাশকারী বুদ্ধদেবের শরণ নিয়েছেন।—

সকল কলুষতামস হর',
জয় হোক তব জয়।
অমৃতবারি সিঞ্চন কর'
নিখিলভুবনময়।
মহাশান্তি, মহাক্ষেম,
মহাপুণ্য, মহাপ্রেম!
জ্ঞানসূর্য-উদয়-ভাতি
ধ্বংস করুক তিমিররাতি,
দুঃসহ দুঃস্বপ্ন ঘাতি
অপগত কর' ভয়। ...

'সকলকলুষতামসহর' কথাটি বুদ্ধদেবের প্রতি রবীন্দ্রনাথ সার্থকভাবে প্রয়োগ করেছেন। বুদ্ধ একদিকে যেমন সমগ্রবিশ্বের ঘনীভূত করুণার ভাবমূর্তি আবার অন্যদিকে তিনি সকল কলুষ ও তামসের অপনোদন করে নিখিলভুবনকে অমৃতবারিতে অভিসিঞ্চিত করেন। এখানেও সকল দুর্গতিভয় হরণ করবার জন্য কবি যে ব্যাকুলকণ্ঠে করুণাময় বুদ্ধের শরণ কামনা করেছেন, এর থেকে বুদ্ধের প্রতি ঐকান্তিক শ্রদ্ধা ও নির্ভরতার পরিচয় পাওয়া যায়।

ভগবান বুদ্ধের শান্তসমাহিত করুণামূর্তিটি রবীন্দ্রসাহিত্যে কত বিচিত্ররূপেই না প্রকাশ পেয়েছে! অজন্তা-ইলোরার সাধক-শিল্পীরা একদিন নীরস পাথরের গায়ে যে বুদ্ধদেবের প্রাণপ্রতিষ্ঠা করেছিলেন, সে চিত্রও যেন এর কাছে ম্লান হয়ে যায়।—

বসেছেন পদ্মাসনে প্রসন্ন প্রশান্ত মনে,
নিরঞ্জন আনন্দমুরতি।

দৃষ্টি হতে শান্তি ঝরে স্ফুরিছে অধর-'পরে
করুণার সুধাহাস্যজ্যোতি।
সুদাস রহিল চাহি— নয়নে নিমেষ নাহি,
মুখে তার বাক্য নাহি সরে।[৫]

এই পংক্তিগুলি পড়লে পাঠকের মনও নির্বাক বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে দেখে শুধু সেই 'আনন্দমুরতি'। কিংবা—

নির্বাক সে সভাঘরে ব্যথিত নগরী-'পরে
বুদ্ধের করুণ আঁখি দুটি
সন্ধ্যাতারাসম রহে ফুটি।[৬]

বহুকাল পরে শ্যামদেশে গিয়েও কবির মানসপটে ভগবান বুদ্ধের এই অনুপম করুণসুন্দর রূপটি ভেসে ওঠে।—

পদ্মাসন আছে স্থির,
ভগবান বুদ্ধ সেথা সমাসীন
চিরদিন—
মৌন যাঁর শান্তি অন্তহারা,
বাণী যাঁর সকরুণ সান্ত্বনার ধারা।[৭]

এসকল বর্ণনায় বুদ্ধদেবের যে অপরূপ চিত্র ফুটে উঠেছে, সৌন্দর্য ও কমনীয়তায় সমগ্র বাংলাসাহিত্যে বুদ্ধপ্রশস্তি রচনায় এর তুলনা বিরল।

বুদ্ধের অন্তহীন করুণার আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে তার পরিচয় রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগেই সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। আরো লক্ষ্য করবার বিষয় হল, বুদ্ধকে 'করুণাঘন' 'করুণাময়' বলে সম্বোধন করতেই রবীন্দ্রনাথের বেশি আগ্রহ। বুদ্ধের সর্বব্যাপী করুণার সম্বন্ধে তিনি বলেছেন—

বুদ্ধদেবের করুণা সন্তানবাৎসল্য নহে, দেশানুরাগও নহে—বৎস যেমন গাভীমাতার পূর্ণস্তন হইতে দুগ্ধ আকর্ষণ করিয়া লয়, সেইরূপ ক্ষুদ্র অথবা মহৎ কোনো শ্রেণীর স্বার্থপ্রবৃত্তি সেই করুণাকে আকর্ষণ করিয়া লইতেছে না। তাহা জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে আপনাকে নির্বিশেষে সর্বলোকের উপরে বর্ষণ করিতেছে।[৮]

আর এই করুণার স্বরূপ বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ বহুবার এই বুদ্ধবাণী উল্লেখ করেছেন।—

মাতা যথা নিযং পুত্তং
আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে
এবম্পি সব্বভূতেসু
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।

মেত্তঞ্চ সব্বলোকস্মিং
মানসং ভাবয়ে অপরিমাণং।
উদ্ধং অধো চ তিরিয়ঞ্চ
অসম্বাধং অবেরমসপত্তং।[৯]

—মা যেমন একটি মাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন সমস্ত প্রাণীতে সেই-প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে। ঊর্ধ্বে অধোতে চার-দিকে সমস্ত জগতের প্রতি বাধাহীন হিংসাহীন শত্রুতাহীন অপরিমিত মানস এবং মৈত্রী রক্ষা করবে।

বুদ্ধের করুণার জয়গানে রবীন্দ্রনাথ স্বতই উল্লসিত হয়ে উঠেছেন। তার থেকে এই আদর্শের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অকৃত্রিম অনুরাগ সহজেই অনুমান করা যায়।

রবীন্দ্রসাহিত্য অহিংসা ও করুণার বাণীতে পরিপূর্ণ। বুদ্ধের অন্তহীন করুণার কথা বলতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ যে উক্তি করেছেন, রবীন্দ্রসাহিত্য সম্বন্ধেও তা প্রয়োগ করা যায়। রবীন্দ্রসাহিত্যের এই অহিংসা ও করুণার বাণীও 'জলভারাক্রান্ত নিবিড় মেঘের ন্যায় আপনার প্রভূত প্রাচুর্যে' আমাদের হৃদয়মন অভিষিক্ত করে দেয়। এই করুণাধারায় অভিসিঞ্চিত হয়েছে রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগ; তাঁর কাব্য, উপন্যাস, নাটক ও সংগীতধারায় এর অজস্র পরিচয় পাওয়া যায়।

জীবঘাতী বীভৎসাকে রবীন্দ্রনাথ আজীবন ধিক্‌কার হেনেছেন। তাই শেষ-জীবনে তিনি নানা প্রতিকূলতা সত্ত্বেও পশুবলি-বিরোধী আন্দোলনকে প্রকাশ্যে সমর্থন করেন। এ প্রসঙ্গে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। ১৯৩৫ সালে জয়পুরনিবাসী ব্রাহ্মণ যুবক রামচন্দ্র শর্মা কালীঘাটের কালীমন্দিরে পশুবলি বন্ধ করার জন্য অনশন ধর্মঘট করলে রবীন্দ্রনাথ এই সাহসী যুবকের মহান সংকল্পকে অভিনন্দন জানিয়ে তাঁর উদ্দেশে এক কবিতা রচনা করেন। এর জন্য রক্ষণশীল হিন্দুসমাজ কবির উপর মোটেই সন্তুষ্ট হতে পারেন নি।[১০] কিন্তু অন্যায় ও অসত্যের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথ কারো ভ্রূকুটি দেখে কোন দিন নিরস্ত হন নি। তা ছাড়া প্রাণিহত্যাবিরোধী মনোভাবের জন্য রবীন্দ্রনাথ একাধিকবার নিরামিষ আহারেও প্রবৃত্ত হয়েছিলেন।

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা যায়, রবীন্দ্রনাথ একসময়ে শিলাইদহের চরে পাখি মারা নিষেধ করে দিয়েছিলেন।[১১] আর শান্তিনিকেতন আশ্রম অঞ্চলে অদ্যাপি প্রাণিহত্যা নিষিদ্ধ।

নিখিলমানবের দুঃখমোচনের সংকল্প নিয়ে বুদ্ধদেব রাজ্য-সংসার সব ত্যাগ করেছিলেন। এই ত্যাগের দ্বারা তিনি মানবহৃদয়ে যে স্থায়ী আসন লাভ করলেন কপিলবাস্তুর সিংহাসন তার কাছে তুচ্ছ হয়ে গেল। রবীন্দ্রনাথ এক জায়গায় যথার্থই বলেছেন, "বুদ্ধই পৃথিবী জয় করেছিলেন, আলেকজাণ্ডার করেন নি।[১২]

বুদ্ধদেব ত্যাগের দ্বারা প্রেমের দ্বারা যে পৃথিবী জয় করেছিলেন, তা-ই সত্যকারের জয়। আর আলেকজাণ্ডার লোভের বশবর্তী হয়ে অস্ত্রের দ্বারা যে ভূখণ্ড অধিকার করেছিলেন

তা সত্যকারের জয় নয়। রবীন্দ্রসাহিত্যে এই ত্যাগের আদর্শ উজ্জ্বলভাবে চিত্রিত হয়েছে। বস্তুত 'তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথাঃ'—উপনিষদের এই অমৃতবাণীকে রবীন্দ্রনাথ জীবনের অন্যতম মূলমন্ত্র হিসাবে গ্রহণ করেছেন। তাই কবির কণ্ঠে সেই অমোঘ বাণী দৃঢ় প্রত্যয়ের সঙ্গে ঘোষিত হয়েছে। —

উদয়ের পথে শুনি কার বাণী,
'ভয় নাই, ওরে ভয় নাই;
নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান
ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই''।[১৩]

আজ লোভের দ্বারা জগতের মধ্যে যে হিংস্র বিভীষিকার সৃষ্টি হয়েছে তা দেখে কবির মনে ধিক্‌কার জাগে। এই লোভের দ্বারা মানুষের শ্রেয়বোধ আচ্ছন্ন। মানুষে মানুষে জাতিতে জাতিতে যে স্বার্থের সংঘাত সিদ্ধির স্পর্ধায় মানুষ যেভাবে ন্যায়বোধ ধর্মবোধকে অনায়াসে পদদলিত করতে পারে, তার ভয়াবহ দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। মানবাত্মার এই চরম গ্লানির দিনে কবির মানসপটে ভেসে ওঠে সেই সর্বত্যাগী রাজপুত্রের দিব্যমূর্তি, গভীর নৈরাশ্যের মধ্যেও কবির অন্তরে ভরসার সঞ্চার হয়।—

হেনকালে জ্বলি উঠে বজ্রাগ্নি-সমান
চিত্তে তাঁর দিব্যমূর্তি, সেই বীর রাজার কুমার
বাসনারে বলি দিয়া বিসর্জিয়া সর্ব আপনার
বর্তমানকাল হতে নিষ্ক্রমিলা নিত্যকাল-মাঝে
অনন্ত তপস্যা বহি মানুষের উদ্ধারের কাজে
অহমিকা-বন্দীশালা হতে। —ভগবান বুদ্ধ তুমি,
নির্দয় এ লোকালয়, এ ক্ষেত্রই তব জন্মভূমি।
ভরসা হারাল যারা, যাহাদের ভেঙেছে বিশ্বাস,
তোমারি করুণাবিত্তে ভরুক তাদের সর্বনাশ,—
আপনারে ভুলে তারা ভুলুক দুর্গতি।—আর যারা
ক্ষীণের নির্ভর ধ্বংস করে, রচে দুর্ভাগ্যের কারা
দুর্বলের মুক্তি রুধি, বোসো তাহাদেরি দুর্গদ্বারে
তপের আসন পাতি; প্রমাদবিহ্বল অহংকারে
পড়ুক সত্যের দৃষ্টি; তাদের নিঃসীম অসম্মান
তব পুণ্য আলোকেতে লভুক নিঃশেষ অবসান।[১৪]

ত্যাগের পরাকাষ্ঠা হিসাবে বুদ্ধকে সম্বোধন করে রবীন্দ্রনাথ অন্যত্রও বলেছেন —

এসো দানবীর, দাও ত্যাগকঠিন দীক্ষা —
মহাভিক্ষু, লও সবার অহংকারভিক্ষা।[১৫]

এর থেকেও অনুমান করা যায়। বুদ্ধের ত্যাগের আদর্শ রবীন্দ্রনাথকে কত গভীরভাবে আকর্ষণ করেছে। রবীন্দ্রনাথের 'কথা' কাব্যগ্রন্থের অন্তর্গত শ্রেষ্ঠভিক্ষা, মস্তকবিক্রয়, পূজারিনী, মূল্যপ্রাপ্তি, নগরলক্ষ্মী প্রভৃতি কবিতায়ও বুদ্ধদেবের দ্বারা অনুপ্রাণিত ত্যাগের মহিমা যে অপরূপ দীপ্তিতে প্রকাশ পেয়েছে তার তুলনা বিরল।

নিখিলমানবের প্রতি মৈত্রী ও প্রেমের বিস্তারেই ত্যাগের চরম সার্থকতা। ত্যাগের দ্বারা মানুষের হৃদয়ের প্রসার ঘটে, তখন বুদ্ধের বাণী মূলত এই বিশ্বমৈত্রীর সুরেই বাঁধা; তাই বুদ্ধদেবের সাধনালব্ধ সামগ্রী একদিন সকল মানুষের হয়েছিল। বস্তুত বুদ্ধের এই অখণ্ড মৈত্রীর আদর্শ জগতে যেভাবে কল্যাণপ্রসূ হয়েছে-মানব ইতিহাসে তার তুলনা কোথায়! রবীন্দ্রনাথের জীবন এবং বাণীতেও এই বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ সমুজ্জ্বল হয়ে আছে। এদিক্ থেকে রবীন্দ্রনাথ ভগবান বুদ্ধের সার্থক উত্তরসাধক।

সর্বমানবের ঐক্যসাধনই বিশ্বমৈত্রীর মূল লক্ষ্য। বুদ্ধের বিশ্বমৈত্রীর আদর্শ মানুষের সঙ্গে মানুষের কৃত্রিম ব্যবধান ঘুচিয়ে দিয়ে সর্বজনগণে এক মহান ঐক্যবন্ধনে বেঁধে দিয়েছে। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই উপলব্ধি করেছেন—

> বুদ্ধদেব জাতিবর্ণ ও শাস্ত্রের সমস্ত ভাগবিভাগ অতিক্রম করে বিশ্বমৈত্রী প্রচার করেছিলেন। এই বিশ্বমৈত্রী যে মুক্তি বহন করে সে হচ্ছে অনৈক্য-বোধ থেকে মুক্তি।[১৬]

এই ঐক্যতত্ত্বকে রবীন্দ্রনাথ কিরূপ প্রাধান্য দিয়েছেন তা রবীন্দ্রসাহিত্যের প্রতিটি বিভাগেই দৃষ্টিগোচর হবে। এক অখণ্ড জীবনসত্যের পূজারী রবীন্দ্রনাথ। জীবন ও জগতের কোনরকমের খণ্ডতা বা বিচ্ছিন্নতা কবির পক্ষে মর্মান্তিক পীড়াদায়ক। তাই যেখানে ঐক্যের সাধনা প্রকাশ পেয়েছে সেখানেই কবির দৃষ্টি নিবদ্ধ। ভারতীয় সংস্কৃতির মধ্যেও রবীন্দ্রনাথ লক্ষ্য করেছেন এক মহান ঐক্যের সাধনা।

কবি ভারততীর্থ সঙ্গমে দেখেছেন চারিদিক হতে দুর্বার স্রোতে এখানে কত অমর জীবনের ধারা মিলিত হয়েছে।—

> হেথা একদিন বিরামবিহীন মহা-ওঙ্কারধ্বনি
> হৃদয়তন্ত্রে একের মন্ত্রে উঠেছিল রনরনি।
> তপস্যাবলে একের অনলে বহুরে আহুতি দিয়া
> বিভেদ ভুলিল, জাগায়ে তুলিল একটি বিরাট হিয়া।[১৭]

আর ভারতীয় ঐক্যতত্ত্বের শ্রেষ্ঠতম বিকাশ হয়েছে তথা বৌদ্ধধর্মের মধ্য দিয়ে। 'আত্মার অমৃত-অন্ন' দান করে বুদ্ধ দূরবাসী অনাত্মীয়জনকেও এক নিবিড় ঐক্যবন্ধনে বেঁধে দিয়েছিলেন। এই ঐক্যসূত্রে ভারতবর্ষের সঙ্গে প্রায় সমগ্র এশিয়া বাঁধা পড়ল।[১৮] পৃথিবীর ইতিহাসে এত বড় ঐক্যবন্ধন এর পূর্বে বা পরে আর দেখা যায় নি। এই ঐক্যবন্ধনের মূলে রাজ্যজয় বা বাণিজ্য বিস্তারের আকাঙ্ক্ষা ছিল না, শুধু ছিল এক মহান কল্যাণ প্রেরণা। আর এই প্রেরণার উৎস ছিলেন ভগবান বুদ্ধ। সংহতি শক্তির উপাসক রবীন্দ্রনাথ শ্যামদেশে গিয়েও একথা গভীর অনুরাগের সহিত স্মরণ করেছেন—

সে মন্ত্র ভারতী
দিল অস্খলিত গতি
কত শত শতাব্দীর সংসারযাত্রারে—
শুভ আকর্ষণে বাঁধি তারে
এক ধ্রুবকেন্দ্র-সাথে
চরম মুক্তির সাধনাতে,
সর্বজনগণে তব এক করি একাগ্র ভক্তিতে—
এক ধর্ম, এক সংঘ, এক মহাগুরুর শক্তিতে।[১৯]

ভারতবর্ষ একদিন নিখিলমানবকে ঐক্যতত্ত্ব দান করেছিল; কিন্তু সেই ভাবধারা আজ ভারতবর্ষের আপন সীমার মধ্যে অনৈক্য ও বিভেদের মরুদৈন্যে বিলীনপ্রায়। এই অনৈক্যের মূলে রয়েছে প্রধানত আমাদের দেশের দুই সামাজিক ব্যাধি—জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা। এ আমাদের দেশের এক অক্ষয় কলঙ্কের কারণ, এর অভিশাপে সমস্ত দেশ পঙ্গু হয়ে আছে। আমাদের দেশে মানুষের প্রতি মানুষের ব্যবহারে যে নিষ্ঠুর অবজ্ঞা ও ঘৃণা, পদে পদে মনুষ্যত্বের যে বীভৎস অপমান তা রবীন্দ্রনাথ নানা ভাবে লক্ষ্য করেছেন। এর ফলে স্পর্শকাতর কবিচিত্ত বারবার পীড়িত হয়েছে। এমনি ভাবে যারা 'মানুষের পরশেরে' ঘৃণায় দূরে সরিয়ে রেখেছে, বিধাতার রুদ্ররোষ থেকে তাদের মুক্তি নেই। তাই সাবধানবাণী উচ্চারণ করে কবি বারবার একথাই বলতে চেয়েছেন—

মানুষকে ঘৃণা করা যে দেশে ধর্মের নিয়ম, প্রতিবেশীর হাতে জল খাইলে যাহাদের পরকাল নষ্ট হয়, পরকে অপমান করিয়া যাহাদিগকে জাতিরক্ষা করিতে হইবে, পরের হাতে চিরদিন অপমানিত না হইয়া তাহাদের গতি নাই। তাহারা যাহাদিগকে ম্লেচ্ছ বলিয়া অবজ্ঞা করিতেছে সেই ম্লেচ্ছের অবজ্ঞা তাহাদিগকে সহ্য করিতেই হইবে।[২০]

তুলনীয়—

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে,
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।[২১]

প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এক সময়ে রবীন্দ্রনাথ মহাত্মা গান্ধীর অস্পৃশ্যতাবিরোধী আন্দোলনকে অকুণ্ঠভাবে সমর্থন করেছিলেন।[২২]

বুদ্ধ জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে মানুষের মুক্তি ঘোষণা করেছেন। সমাজের তথাকথিত অন্ত্যজ—অস্পৃশ্য মানুষ এতদিন বর্ণাশ্রমের জাঁতাকলে নিষ্পিষ্ট হয়েছিল। বুদ্ধের উদার ধর্মমত মানবীয় অধিকার হতে বঞ্চিত এসকল মানুষকেও আভিজাত্য দান করেছে। বুদ্ধ মানুষের জন্মগত শ্রেষ্ঠত্বকে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, সাধারণ বংশে জন্মগ্রহণ করলেও মানুষ স্বীয় কর্মফলে শ্রেষ্ঠত্ব অর্জন করতে পারে। বুদ্ধের এই সীমাহীন মহত্ত্ব মানবতার পূজারী রবীন্দ্রনাথকে কম মুগ্ধ করে নি।

সর্বমানবের সমতার ভিত্তিতেই রবীন্দ্রনাথের জীবনবেদ রচিত। তাই যে ব্রাহ্মণ জন্মগত পার্থক্যকে প্রাধান্য দিয়ে আমাদের দেশে বিভেদমূলক কৃত্রিম সমাজ-ব্যবস্থা গড়ে তুলেছে, রবীন্দ্রনাথ তার মনকে অশুচি বলতেও দ্বিধা করেন নি।—

এসো ব্রাহ্মণ, শুচি করি মন ধরো হাত সবাকার —
এসো হে পতিত, করো অপনীত সবঅপমানভার।[২৩]

কবি দেশমাতৃকার অভিষেকে ব্রাহ্মণ-শূদ্র-নির্বিশেষে সকলকে আহ্বান করেছেন। 'সবার-পরশে-পবিত্র করা তীর্থনীরে'ই দেশজননীর অভিষেক সার্থক হবে।

বুদ্ধের প্রতি রবীন্দ্রনাথের এক অসীম নির্ভরতা। যখনই কোন দুঃখ অশান্তি বা অমঙ্গল আশঙ্কা দেখা দিয়েছে, তখন বারে বারে তিনি ভগবান বুদ্ধকে স্মরণ করেছেন। স্বদেশের দুঃখদৈন্যের দিনেও বুদ্ধের কল্যাণ-সুন্দর রূপটি কবির মানসপটে ভেসে ওঠে, তিনি অন্তরে ভরসা লাভ করেন। বুদ্ধের আদর্শকেই তিনি বারবার জাতির সম্মুখে তুলে ধরেছেন। বুদ্ধের বাণীতে একদিন ভারতবর্ষ নিজের মধ্যে সার্থকতা অনুভব করেছে; আবার ভারতের মহিমা বিস্তার লাভ করেছে সমগ্র পৃথিবীতে। বর্তমানের চরম দুর্গতির দিনেও কবি বিশ্বাস করেন, অমিতায়ু অভিতাভের বোধনমন্ত্র আত্মবিস্মৃত জাতির মৃতপ্রায় চিত্তে আবার নূতন প্রাণসঞ্চার করবে। তাই নবভারত রচনার স্বপ্নদ্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধকে সম্বোধন করে বলেছেন—

চিত্ত হেথা মৃতপ্রায়, অমিতাভ, তুমি অমিতায়ু,
আয়ু করো দান।
তোমার বোধনমন্ত্রে হেথাকার তন্দ্রালস বায়ু
হোক প্রাণবান্।
খুলে যাক রুদ্ধদ্বার, চৌদিকে ঘোষুক শঙ্খধ্বনি
ভারত অঙ্গনতলে আজি তব নব আগমনী,
অমেয় প্রেমের বার্তা শত কণ্ঠে উঠুক নিঃস্বনি—
এনে দিক অজেয় আহ্বান।[২৪]

স্বদেশের দুঃখদৈন্যের দিনে যেমন রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধদেবকে স্মরণ করেছেন তেমনি জগতের হিংসা লোভ ও সংঘাতের দিনে তাঁরই বাণীকে আকুলভাবে কামনা করেছেন। পরস্পরের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষে মানবসভ্যতা আজ এক মহাসঙ্কটের সম্মুখীন। দুই দু'টি মহাযুদ্ধের ক্রূর বীভৎস অমানুষিকতা কবি আপন জীবনে প্রত্যক্ষ করেছেন। দেখেছেন রণোন্মাদ জাতিসমূহ ললাটে রক্ততিলক ধারণ করে নরমেধযজ্ঞের অনুষ্ঠানে রত। কিন্তু এতদ্সত্ত্বেও কবি বিশ্বাস করেন, আজকের হিংসায় উন্মত্ত পৃথিবীতে বুদ্ধের বাণীই মানুষের মুক্তিপথের সন্ধান দিতে পারে। তাই এই ভয়াবহ যুদ্ধনিনাদের মধ্যে কবি আকুলভাবে বুদ্ধের পুনরাবির্ভাব কামনা করেছেন। —

নূতন তব জন্ম লাগি কাতর যত প্রাণী,
কর' ত্রাণ মহাপ্রাণ, আন' অমৃতবাণী,
বিকশিত কর' প্রেমপদ্ম চিরমধুনিষ্যন্দ।
শান্ত হে, মুক্ত হে, হে অনন্তপুণ্য,
করুণাঘন, ধরণীতল কর' কলঙ্কশূন্য।[২৫]

রবীন্দ্রনাথ চিরদিন মহতের পূজারী। জগতে যত মহৎ আছে সবার কাছে তিনি আপনাকে নত করেছেন। কিন্তু মানব-ইতিহাসের মধ্যে বুদ্ধদেবের মহত্ত্ব তাঁকে যেমন আকৃষ্ট করেছে তেমন আর কারো নয়। তাই কবির অন্তরের বেদীতে ভগবান বুদ্ধ চিরদিন অম্লানদীপ্তিতে বিরাজমান। আর রবীন্দ্রসাহিত্যে বুদ্ধমহিমা যেভাবে প্রকাশ পেয়েছে, বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে তার তুলনা বিরল। আধুনিক বাংলা তথা ভারতীয় সাহিত্যে অনেকেই বুদ্ধদেব সম্বন্ধে গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং বুদ্ধচরিতকে কাব্য-নাটকের উপজীব্য করেছেন। কিন্তু কাব্য নাটক ও মননের সর্বক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথ বুদ্ধমহিমাকে যে বিশিষ্টতা দান করেছেন তার তুলনা নেই। আমাদের জাতীয় চিত্তে ভগবান বুদ্ধের পুনঃপ্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে রবীন্দ্রনাথের দান অপরিসীম।

গ্রন্থপঞ্জী ঃ

১। 'বুদ্ধদেব'
২। 'বুদ্ধদেব', পৃ. ১-২
৩। বোরোবুদুর, 'পরিশেষ'
৪। 'নটীর পূজা', রচনাবলী (প-ব সরকার) ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৯১৭-১৮
৫। মূল্যপ্রাপ্তি (২৬ আশ্বিন ১৩০৬), 'কথা'
৬। নগরলক্ষ্মী (২৭ আশ্বিন ১৩০৬), 'কথা'
৭। সিয়াম— প্রথম দর্শনে (১১ অক্টোবর ১৯২৭), 'পরিশেষ'
৮। উৎসবের দিন, 'ধর্ম'
৯। মেত্তা সুত্ত, 'সুত্তনিপাত'
১০। 'রবীন্দ্রজীবনী' ৪র্থ খণ্ড (১ম সং), পৃ. ৩৩
১১। প্রভাত গুপ্ত, 'মা নিষাদ'। বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত 'রবীন্দ্রস্মৃতি' গ্রন্থে সংকলিত, পৃ. ৯৯
১২। 'ঘরে বাইরে', রচনাবলী ৯ম খণ্ড, পৃ. ৫০১ (মাস্টারমশায়ের প্রতি নিখিলেশের উক্তি)
১৩। সুপ্রভাত, 'শেষলেখা' (পরিশিষ্ট)
১৪। প্রার্থনা (২৯ জুলাই ১৯৩৩), 'পরিশেষ' (সংযোজন)
১৫। বুদ্ধজন্মোৎসব, 'পরিশেষ'

১৬। 'ভারতপথিক রামমোহন', রচনাবলী (প: ব: সরকার) ১১শ খণ্ড, পৃ. ৪০৩,

১৭। ভারততীর্থ, 'গীতাঞ্জলি'

১৮। স্মরণীয়-গোত্র-দেবতা গর্তে পুঁতিয়া
এশিয়া মিলাল শাক্যমুনি। — সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, জাতির পাঁতি

১৯। সিয়াম (প্রথম দর্শনে) 'পরিশেষ'

২০। ব্যাধি ও প্রতিকার (১৯০৭), 'সমূহ'

২১। অপমানিত, 'গীতাঞ্জলি'

২২। 'ভারতপথিক রবীন্দ্রনাথ', পৃ. ৬৫

২৩। ভারততীর্থ, 'গীতাঞ্জলি'

২৪। বুদ্ধদেবের প্রতি (২৪ অক্টোবর ১৯৩১, সারনাথে মূলগন্ধকুটি বিহার প্রতিষ্ঠা-উপলক্ষে রচিত)

২৫। বুদ্ধজন্মোৎসব (১৯২৭) 'পরিশেষ'।

বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ

আশিস গঙ্গোপাধ্যায়*

স্বামী বিবেকানন্দ তথাগত বুদ্ধের জীবন ও কর্মে অত্যন্ত প্রভাবিত হয়ে তাঁকে জগতের শ্রেষ্ঠ লোকগুরু বলেছেন। বুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর অন্তরের শ্রদ্ধা যে কত গভীর ছিল, বিভিন্ন বক্তৃতায় বিবেকানন্দের অজস্র উক্তিই সে কথা প্রমাণ করে।

তিনি বলেছেন, "Light of Asia" এডুইন আরনল্ডের একটি বিখ্যাত গ্রন্থ। যাঁরা ভীষণ গোঁড়া খ্রীষ্ট ধর্মাবলম্বী, তাঁরাও এ গ্রন্থ পাঠ করে গৌতম বুদ্ধের উপর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে যান, যে বুদ্ধ কখনো ঈশ্বরের কথা বলেননি, আত্মত্যাগ ছাড়া আর কোন কিছু প্রচার করেননি।

বিবেকানন্দের কথায় একমাত্র বুদ্ধদেবই কর্মযোগের শিক্ষা সম্পূর্ণরূপে কার্যে পরিণত করেছিলেন। তিনি ছাড়া জগতের অন্যান্য মহাপুরুষরা সকলেই বাহ্য প্রেরণার বশে নিঃস্বার্থ কর্মে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। কেউ বলেছেন, তাঁরা ঈশ্বরের অবতার। আবার কেউ বলেছেন, তাঁরা ঈশ্বরের প্রেরিত বার্তাবহ। কেবল বুদ্ধই বলেছেন যে ঈশ্বর সম্পর্কে ভিন্ন ভিন্ন মত শুনে লাভ নেই। আত্মা সম্পর্কীয় সূক্ষ্ম মতবাদ বিচার করাও অর্থহীন। ভাল হওয়া এবং ভাল কাজ করাই আসল কথা। সেটাই মানুষের মুক্তির পথ।

ইতিহাসে বুদ্ধ এমন একটি চরিত্র, যিনি নিজগুণেই সকলের উর্দ্ধে বিরাজ করেছেন। তিনি একদিকে শ্রেষ্ঠ দর্শন প্রচার করেছেন, আবার ক্ষুদ্রতম প্রাণীর জন্যও গভীর সহানুভূতি প্রকাশ করেছেন। বুদ্ধ কোন রকম অভিসন্ধি ছাড়াই কেবল সৎ কর্ম করে গেছেন এবং আশা প্রকাশ করেছেন, মানুষ এমন ভাবে কর্ম করতে পারলে সেও বুদ্ধ হবে এবং জগতের রূপ পরিবর্তিত করতে পারবে। বিবেকানন্দ বলেছেন, "বুদ্ধ আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর। তাঁহার ঈশ্বরবাদ নাই,—তিনি নিজে ঈশ্বর, আমি খুব বিশ্বাস করি।" সমস্ত জীবন, কিসে অপরের কল্যাণ হয়, এটাই ছিল তাঁর চিন্তা। সে কারণেই তাঁর জীবনীকাররা সঠিকভাবেই লিখেছেন "বহুজন হিতায়, বহুজন সুখায়" তাঁর জন্ম। বনে গিয়ে ধ্যান করেছেন। তাও নিজের মুক্তির জন্য নয়। কেন মানুষের এত দুঃখ? এর উত্তর খুঁজতেই তাঁর যত আকুতি। কশাঘাত করে মানুষের কর্মতৎপরতা বাড়াতেই তাঁর আবির্ভাব। তিনি বলেছেন সৎ হতে, রিপুগুলি দমন করতে। তাহলেই মানুষ জানতে পারবে দ্বৈত বা অদ্বৈত দর্শনের কোনটা সত্য। বিবেকানন্দের মতে যে ধর্ম উপনিষদে জাতিবিশেষে আবদ্ধ হয়েছিল, বুদ্ধদেব সে অর্গল খুলে তাকে বিশ্বময় ছড়িয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর প্রচারিত ধর্মে যে সমস্ত উচ্চ ভাবনার গুরুত্ব বেদে তা প্রায় সমস্তই আছে। নেই শুধু সেই মহামানবের বুদ্ধি আর হৃদয়।

---

* প্রাবন্ধিক ও গ্রন্থকার। তাঁর 'বুদ্ধ ও বিবেকানন্দ' গ্রন্থ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে পুনর্মুদ্রিত।

বিবেকানন্দ বলেছেন যে তিনি বুদ্ধের পদানত, কারণ তিনিও বুদ্ধের মত কর্ম অর্থাৎ পরোপকার ছাড়া বাকি সমস্ত কিছুকেই কুকর্ম বলে মনে করেন। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে বুদ্ধর পর থেকেই ভারতবর্ষে তাঁর প্রচারিত ত্যাগ ব্রত, বৈরাগ্য এবং বিষয়বিতৃষ্ণাই ধর্মের চরম লক্ষ্য বলে বিবেচিত হয়েছে। বৌদ্ধ ধর্মের ত্যাগ, বৈরাগ্য হিন্দু ধর্ম নিজের মধ্যে গ্রহণ করেছে।

ভারতবর্ষে যে সমস্ত সন্ন্যাসীদের মঠ ইত্যাদি দেখা যায়, সেগুলো প্রায় সবই আসলে ছিল বৌদ্ধদের। বুদ্ধের হাতেই প্রকৃত সন্ন্যাসাশ্রমের সূত্রপাত হয়েছিল। তিনিই সন্ন্যাসাশ্রমের মৃতকল্পে প্রাণ সঞ্চার করেছিলেন। মনুষ্যজাতির মধ্যে তিনিই জগৎকে প্রথম সর্বাঙ্গসম্পন্ন নীতি বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়েছিলেন। সকলের মঙ্গলের জন্যই তিনি মঙ্গলময় জীবন যাপন করেছেন, মানুষকে ভালবাসার জন্যই তিনি তাদের ভালবাসতেন, তাছাড়া তাঁর অন্য কোন উদ্দেশ্য ছিল না। বুদ্ধের জন্মের আগে দেশে না ছিল কোন বিদ্যালয়, মহাবিদ্যালয়। জনসাধারণের জন্য হাসপাতাল, পশু চিকিৎসালয় প্রভৃতির তো প্রশ্নই ওঠে না। স্থাপত্য বিদ্যারও তেমন কোন প্রসার তখন ঘটেনি। এসব তাঁরই প্রত্যয়। তাঁর জন্মের আগে দেশে ছিল তালপাতার পুঁথিতে বাঁধা কিছু ধর্মতত্ত্ব, সেটাও মুষ্টিমেয় কিছু মানুষের আওতায়। বুদ্ধ মানুষের দৈনন্দিন জীবনে তা কেমন করে কাজে লাগাতে হবে, সেটাই দেখিয়ে দিলেন। সেদিক থেকে দেখতে গেলে বেদান্তের যথার্থ স্ফূরণমূর্তি তিনিই। দেহধারীদের মধ্যে বিবেকানন্দ বুদ্ধকেই একমাত্র প্রকৃত জ্ঞানী মনে করেছেন। এ সব কিছুরই মূল কারণ, বিবেকানন্দ বুদ্ধের জীবন ও কর্মের মধ্যেই খুঁজে পেয়েছিলেন তাঁর অভিষ্ট লক্ষ্য। তিনিও তথাগত বুদ্ধের মত মনে করতেন প্রত্যেক মানুষই তাঁর সুকর্মের দ্বারা মহামানবে পরিণত হতে পারেন। সে কারণেই তিনি বলেছেন, "Perfection does not come from belief or faith. Perfection comes through the disinterested performence of action."

গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যেমন সকল মানুষের জন্য ধর্মের প্রবেশ দ্বার উন্মুক্ত করার কথা বলেছিলেন, পরবর্তীযুগে মহামানব বুদ্ধ তেমন ভাবেই ধর্মের পথে সকলেরই প্রবেশাধিকারের কথা ঘোষণা করেছিলেন। এ কারণে বিবেকানন্দের কাছে বুদ্ধের স্থান ছিল স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণেরই মত। বুদ্ধ সম্পর্কে তিনি বলেছিলেন, "জগতের আচার্যগণের মধ্যে একমাত্র তাঁহারই কার্যে কোনরূপ বাহিরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্যান্য মহাপুরুষগণ সকলেই নিজদিগকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন, আর ইহাও বলিয়া গিয়াছেন, আমাকে যাহারা বিশ্বাস করিবে, তাহারা স্বর্গে যাইবে। কিন্তু ভগবান বুদ্ধ শেষ নিঃশ্বাসের সহিত কি বলিয়াছিলেন? তিনি বলিয়াছিলেন, কেহই তোমাকে মুক্ত করিতে সাহায্য করিতে পারে না, নিজের সাহায্য নিজে কর, নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজের মুক্তি সাধন কর।"

হিন্দু ধর্মের মূল কথাই ঈশ্বর আর ভক্তি। সুতরাং এ দুটিকে বাদ দিয়ে হিন্দু ধর্মের অস্তিত্ব কল্পনা করা যায় না। অথচ বুদ্ধ প্রচারিত ধর্মে ঈশ্বর বা আত্মার বিশেষ স্থান নেই।

সেখানে আছে শুধু সৎ কর্ম। বিবেকানন্দ কিন্তু ঈশ্বর এবং আত্মার অস্তিত্ব স্বীকারকে, মহামানব বুদ্ধের যে মূল শিক্ষা—কর্মই আসল—তার পরিপন্থী বলে মনে করেননি। তাঁর মতে, বুদ্ধ দেখেছিলেন, যে ঈশ্বর সম্পর্কিত প্রচলিত মনোভাব সাধারণ মানুষকে দুর্বল এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে তোলে। "সব কিছুর জন্য যদি ঈশ্বরের কাছেই প্রার্থনা করবে, তা হলে কে আর কর্ম করতে বেরোচ্ছে বলো? যারা কর্ম করে, ঈশ্বর তাদের কাছে আসেন। যারা নিজেদের সাহায্য করে, ভগবান তাদেরই সাহায্য করেন। বুদ্ধের শিক্ষা—পূজা প্রার্থনার কোন দরকার নেই। প্রতি শ্বাস-প্রশ্বাসে তুমি ভগবানেরই উপাসনা করছ। আমি যে কথা বলছি, এও এক উপাসনা। আর তোমরা যে শুনছ, সেও এক রকম পূজা।....সব ক্রিয়াই তাঁর নিরন্তর উপাসনা।"

মহামানব বুদ্ধের প্রতি স্বামী বিবেকানন্দের যে আকর্ষণ তার আর একটি অন্যতম প্রধান কারণ সমস্ত জীবের প্রতি বুদ্ধের বিস্ময়কর ভালবাসা। "..... যে ভালবাসা সাধারণের দুঃখ মোচন ভিন্ন অপর কোন কিছুরই অপেক্ষা রাখে না।" " মানুষ ভগবানকে ভালবাসছিল, কিন্তু মনুষ্য ভ্রাতাদের কথা ভুলেই গিয়েছিল।.... এই সর্বপ্রথম তারা ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে ফিরে তাকালো। মানুষকে ভালবাসতে হবে। সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ—সত্য ও বিশুদ্ধ জ্ঞানের এই প্রথম তরঙ্গ, যা ভারতবর্ষ থেকে উত্থিত হয়ে ক্রমশঃ উত্তর-দক্ষিণ-পূর্ব—পশ্চিমের নানা দেশকে প্লাবিত করেছে।"

মহামানব বুদ্ধের ভাবাদর্শের উপর স্বামী বিবেকানন্দের ঐকান্তিক শ্রদ্ধা শুধু মুখের কথায় সীমাবদ্ধ থাকেনি, বিবেকানন্দের সমস্ত জীবনে এবং চিন্তাধারায় তা প্রতিফলিত হয়েছে। বুদ্ধের চিন্তাধারায় ছিল গভীর মানবতাবোধ এবং সমস্ত মানুষের জন্য কল্যাণ চিন্তা। তিনি কোন বিশেষ পরিমণ্ডলের কথা ভাবেননি;— ভাবেননি চৈতন্যস্বরূপ অথবা অন্যকোন রূপ বিশিষ্ট পরম সত্যের চরিতার্থের কথা। সমস্ত মানব জাতির কল্যাণের ব্রতকে চরিতার্থ করাই ছিল তাঁর উদ্দেশ্য। আর এই উদ্দেশ্যই বিবেকানন্দের কর্মে এবং চিন্তায় প্রতিফলিত হয়েছে। তাছাড়া অন্ধ ধর্মীয় আচরণ এবং কুসংস্কারের বিরুদ্ধে বুদ্ধের আপোষহীন সংগ্রামও বিবেকানন্দের চিন্তাধারায় এবং কর্মময় জীবনে সর্বতোভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

বুদ্ধের উপদেশে যে ঈশ্বর নয়, কর্মের প্রতিই অগাধ আস্থা, পাশ্চাত্যে—
বিবেকানন্দের বিভিন্ন বক্তৃতায় তারই প্রতিফলন দেখতে পাই।

দীক্ষান্তে মার্গারেট নোবেল হয়েছিলেন ভগিনী নিবেদিতা। তখন তাঁকে স্বামী বিবেকানন্দ প্রথমেই নির্দেশ দিলেন ভগবান বুদ্ধকে প্রণাম করতে এবং তাঁকে জানতে।— তাছাড়া তাঁর যে বক্তৃতাগুলি পাশ্চাত্যে ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে আলোড়ন তুলেছিল তা বুদ্ধ জীবন ও দর্শনেরই নির্যাস। তথাগত বুদ্ধের জীবন, কর্ম ও বাণী স্বামী বিবেকানন্দকে যে কতটা আকর্ষণ ও প্রভাবিত করেছিল তা আমরা বুঝতে পারি পাশ্চাত্যের বিভিন্ন অঞ্চলে তাঁর দেওয়া বক্তৃতায়। ১৮৯৩ সালের ২৬ শে সেপ্টেম্বর শিকাগোর ধর্মমহাসভায় তিনি

বলেছিলেন যে হিন্দু ধর্মের দুটো ভাগ—কর্মকাণ্ড ও জ্ঞান কাণ্ড। সন্ন্যাসীরাই জ্ঞানকাণ্ডের আলোচনা করেন। এই জ্ঞানকাণ্ডে কোন জাতিভেদ নেই। ভারতবর্ষে উঁচু নীচু সব বর্ণের মানুষই সন্ন্যাসী হতে পারেন। সন্ন্যাস ধর্মে জাতিভেদের কোন স্থান নেই। জাতিভেদ কেবলই সামাজিক ব্যবস্থা। গৌতম বুদ্ধ সন্ন্যাসী ছিলেন। তাঁর হৃদয় এত উদার ছিল যে বেদের মধ্য থেকে লুকানো সত্যকে বের করে সেগুলো তিনি সমস্ত পৃথিবীর লোকের মধ্যে ছড়িয়ে দিয়েছিলেন—এখানেই তাঁর গৌরব। পৃথিবীতে তিনিই প্রথম ধর্ম প্রচারের প্রবর্তক।

সকলের বিশেষ করে অজ্ঞান ও দরিদ্রের উপর তাঁর যে অসাধারণ সহানুভূতি সেটাই তাঁকে গৌরবের আসনে প্রতিষ্ঠিত করেছে। তাঁর শিষ্যদের মধ্যে ব্রাহ্মণ, অব্রাহ্মণ সবাই ছিলেন। তাঁর আমলে সংস্কৃত ভারতের কথ্য ভাষা ছিল না। সেটা ছিল তখন সাধারণ পুঁথি-পুস্তকের ভাষা। বুদ্ধের কোন কোন ব্রাহ্মণ শিষ্যরা তাঁর উপদেশগুলি সংস্কৃত ভাষায় অনুবাদ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু স্বয়ং বুদ্ধদেবের ছিল তাতে আপত্তি। তিনি বলেছিলেন "আমি দরিদ্রের জন্য, জনসাধারণের জন্য আসিয়াছি, আমি জনসাধারণের ভাষাতেই কথা বলিব।" সে কারণে প্রায় সমস্ত উপদেশ সে সময়কার কথ্যভাষা "পালি"তে লিপিবদ্ধ।

বক্তৃতা প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ বললেন হিন্দুধর্ম ও বৌদ্ধধর্ম পরস্পরের পরিপূরক —" Hinduism can not live without Buddhism, nor Buddhism without Hinduism. Then realise what the separation has shown to us, that the Buddhist can not stand without the brain and philosophy of the Brahmins, nor the Brahmin without the heart of the Buddhist. This separation between the Buddhists and the Brahmins is the cause of the downfall of India.

....

....

Let us then join the wonderful intellect of the Brahmin with the heart, the noble soul, the wonderful humanising power of the Great Master."

১৮৯৪ সালের ১৯ শে মার্চ আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের ডেট্রয়েট শহরে বক্তৃতা প্রসঙ্গে বিবেকানন্দ বললেন বুদ্ধ পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ অবতার। তিনি কারও নিন্দে করেননি। নিজের জন্য কিছু দাবীও করেননি। প্রত্যেককে নিজ নিজ চেষ্টায় মুক্তিলাভ করতে হবে, এটাই ছিল তাঁর বিশ্বাস এবং উপদেশ। প্রয়াণ শয্যায় তিনি বলেছিলেন, "কাহারও উপর নির্ভর করিও না। নিজের মুক্তি নিজেই সম্পাদন কর।"

বক্তৃতায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে বুদ্ধ পৃথিবীর সমস্ত মানুষের উপর মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছেন। তিনি ছিলেন এমন একজন ব্যক্তি যাঁর সম্পর্কে কি শত্রু, কি মিত্র—কেউ কখনো বলতে পারেননি যে সকলের হিতের জন্য ছাড়া তিনি কখনো নিঃশ্বাস নিয়েছেন বা একটুকরো রুটি মুখে দিয়েছেন।

বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্ব কখনো প্রচার করেন নি। তাঁর শিষ্যেরা তাঁকে জিজ্ঞেস করেছিল, "আমরা সৎ কেন হব?" বুদ্ধ উত্তরে বলেছিলেন "কারণ তোমরা উত্তরাধিকার সূত্রে সদ্ভাব পেয়েছ। তোমাদেরও উচিত পরবর্তীদের জন্য কিছু সদ্ভাব রেখে যাওয়া।"

মানুষ ও মানুষে এবং মানুষে ও প্রাণীতে অসাম্যের বিরুদ্ধে বুদ্ধ ছিলেন মূর্ত প্রতিবাদ। তিনি বলতেন সকল প্রাণীই সমান। তাঁর শিক্ষা সৎ হও, সৎ কাজ কর, যদি ঈশ্বর থাকেন, সাধুতার দ্বারা তাঁকে লাভ কর। যদি ঈশ্বর না থাকেন, তথাপি সাধুতাই শ্রেষ্ঠ লক্ষ্য। মানুষের সমস্ত দুঃখের জন্য সে নিজেই দায়ী। তার সমস্ত সদাচারণের প্রশংসাও তারই প্রাপ্য। বিবেকানন্দ ঐ সভায় বলেছিলেন,

"Listen to Buddha's message–a tremendous message. It has a place in our heart. Says Buddha, Root out selfishness and every thing that makes you selfish. Have neither wife, child, nor family. Be not of the world; become perfectly unselfish."

ডেট্রয়েট শহরের ঐ বক্তৃতা সভায় তিনি আরো বলেছিলেন যে বৌদ্ধধর্মে নিষ্কাম কর্মের ভাবই বেশী প্রবল। তখনকার অবিরত দার্শনিক বিচার, জটিল অনুষ্ঠান পদ্ধতি, বিশেষ করে জাতিভেদের উপর তিনি অত্যন্ত বিরক্ত ছিলেন। তিনি এমন এক ধর্ম প্রচার করেছিলেন যাতে সকাম ভাবের লেশমাত্র ছিল না। তাছাড়া দর্শন এবং ঈশ্বর সম্বন্ধে নানারকম প্রচলিত মতবাদ সম্বন্ধেও তিনি আলোচনা করতে চাইতেন না। সে বিষয়ে সম্পূর্ণ অজ্ঞেয়বাদী ছিলেন তিনি। ঈশ্বর আছেন কি না—এ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "ওসব আমি কিছু জানি না"। মানুষের প্রকৃত কর্তব্য সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, "ভাল কাজ করো এবং ভাল হও।"

একবার তাঁর কাছে পাঁচজন ব্রাহ্মণ এসে তাঁকে তাঁদের তর্কের মীমাংসা করে দিতে বললেন। একজন বললেন, "আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁকে পাবার উপায় সম্পর্কে এই সমস্ত কথা আছে।" অপরজন বললেন, "না, না, ও কথা ভুল। কারণ আমার শাস্ত্রে ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁকে লাভ করবার অন্য রকম সাধনার কথা বলা হয়েছে।" এভাবে অন্য ব্রাহ্মণরাও ঈশ্বরের স্বরূপ এবং তাঁকে লাভ করবার উপায় সম্পর্কে যাঁর যাঁর শাস্ত্রের দোহাই দিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রকাশ করতে শুরু করলেন। বুদ্ধ প্রত্যেকের কথাই মন দিয়ে শুনে তাঁদের এক এক করে জিজ্ঞেস করলেন যে কোন শাস্ত্রেই কি বলেছে যে ঈশ্বর ক্রোধী, প্রতিহিংসাপরায়ণ বা অপবিত্র। ব্রাহ্মণেরা সকলেই বললেন যে না, সব শাস্ত্রেই লেখা আছে ঈশ্বর শুদ্ধ ও কল্যাণ। বুদ্ধ তখন সমস্ত ব্রাহ্মণদের শুদ্ধ, পবিত্র ও কল্যাণকারী হতে বললেন যাতে তাঁরা নিজেরাই ঈশ্বরের স্বরূপ বুঝতে পারেন।

বিবেকানন্দ বলেছেন যে জগতের আচার্যদের মধ্যে একমাত্র বুদ্ধের কাজে কোন রকম বাইরের অভিসন্ধি ছিল না। অন্য মহাপুরুষরা সকলেই নিজেদের ঈশ্বরাবতার বলে ঘোষণা

করেছেন। কিন্তু বুদ্ধ সবসময়েই বলেছেন। "কেউ তোমাকে মুক্ত হতে সাহায্য করতে পারে না। নিজের সাহায্য নিজে কর। নিজের চেষ্টার দ্বারা নিজের মুক্তি সাধন কর।" তিনি ছিলেন সবরকম কামনা ও অভিসন্ধিবর্জিত। তিনি সব রকম জাগতিক সুখ জলাঞ্জলি দিয়ে ভারতের পথে পথে ভিক্ষা করে ক্ষুধানিবৃত্তি করতেন। তিনিই একমাত্র মহাপুরুষ, যিনি যজ্ঞে পশুহত্যা নিবারণের জন্য পশুদের বদলে নিজের জীবন বিসর্জনে সব সময় প্রস্তুত ছিলেন।

বিবেকানন্দের মতে বুদ্ধ ছিলেন কর্মযোগীর আদর্শ। তিনি সৎ কাজের দ্বারা যে উচ্চমার্গে আরোহণ করেছিলেন, তেমনি সৎ কাজ দিয়ে প্রত্যেকমানুষই আধ্যাত্মিকতার চরম শিখরে আরোহণ করতে পারে। এ বিশ্বাস বিবেকানন্দের ছিল।

অনেকের পক্ষে একজন ঈশ্বরে বিশ্বাস করতে পারলে সাধনার পথ সহজ হয়। কিন্তু বুদ্ধের জীবনালোচনায় স্পষ্টই প্রতীত হয় যে কোন ব্যক্তি যদি আদৌ ঈশ্বরে বিশ্বাসী না হয়, সে যদি কোন সম্প্রদায়ভুক্ত না হয় অথবা কোন মন্দির ইত্যাদিতে না যায়, এমন কি প্রকাশ্যে নাস্তিক বা জড়বাদীও হয় তবু সে চরম অবস্থা লাভ করতে পারে তার সৎ কর্মের দ্বারা।

ঐ বছরেই অক্টোবর মাসে ট্রুম্যান ভাইয়েরা "প্রাণবন্ত ধর্ম" সম্বন্ধে এক বক্তৃতামালার আয়োজন করেছিলেন। স্বামী বিবেকানন্দ ছিলেন প্রধান বক্তা। ঐ সভায় বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেন যে গৌতম বুদ্ধের জন্মের সময় ভারতবর্ষে সামাজিক অসাম্য পৃথিবীর যে কোন অঞ্চল থেকে হাজার গুণ বেশী ছিল। পুরোহিত সম্প্রদায় ছিলো প্রায় সর্বেসর্বা। তাদের খেয়াল খুশীই সমাজকে চালিত করত। বিবেকানন্দের মতে বুদ্ধই একমাত্র মহাপুরুষ যিনি নিজের দিকে কিছুমাত্র না তাকিয়ে সমস্ত উদ্যম পরহিতে নিয়োগ করেছিলেন। মানুষের দুঃখ কষ্টের কারণ অনুসন্ধানের জন্য তিনি জীবনের সমস্ত সুখভোগ বিসর্জন দিয়েছিলেন। যে যুগে পণ্ডিত এবং পুরোহিতরা ঈশ্বরের স্বরূপ নিয়ে বিতর্কে ব্যপ্ত, বুদ্ধ তখন কেউ যা খেয়াল করেনি, জীবনের সেই বিপুল বাস্তব সত্য আবিষ্কার করলেন— দুঃখের অস্তিত্ব। আমরা প্রত্যেকে অপরকে ডিঙিয়ে যেতে চাই, কারণ আমরা স্বার্থপর আর সমস্ত অনিষ্টের কারণও এই স্বার্থপরতা। মানুষ নিঃস্বার্থ হলেই সকল অশুভ দূরীভূত হবে। হিংসা দিয়ে হিংসা জয় করা যায় না। ভালোবাসা আর নিঃস্বার্থপরতা দিয়েই সকল অশুভ জয় করা সম্ভব।

এথিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ডঃ হেন্‌সের অনুরোধে ১৮৯৫ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারী স্বামী বিবেকানন্দ প্রকৃত বৌদ্ধ ধর্ম সম্পর্কে বক্তব্য রাখতে গিয়ে বললেন যে বৌদ্ধ ধর্ম বুঝতে হলে, যে ধর্ম থেকে তার উদ্ভব সেটা প্রথমে বুঝতে হবে। বৈদিক গ্রন্থগুলির দুটো ভাগ। প্রথম কর্মকাণ্ড। যাতে যাগযজ্ঞের কথা আছে। দ্বিতীয় বেদান্ত যা যাগযজ্ঞের নিন্দা করে, দান ও প্রেম শিক্ষা দেয়। মৃত্যুকে বড় করে দেখায় না। বেদ বিশ্বাসী সম্প্রদায়

বেদের যে অংশে প্রীত, সে অংশই গ্রহণ করেছে। অবৈদিকদের মধ্যে চার্বাকপন্থী বা ভারতীয় জড়বাদীরা বিশ্বাস করত যে সব কিছুই জড়। স্বর্গ, নরক, আত্মা বা ঈশ্বর বলে কিছু নেই। অপর একটি সম্প্রদায় জৈনরাও নাস্তিক, কিন্তু অত্যন্ত নীতিবাদী। তারা ঈশ্বরের ধারণাকে অস্বীকার করলেও আত্মার অস্তিত্বকে মানত। এই দুই সম্প্রদায়কে বলা হত অবৈদিক। তৃতীয় একটি সম্প্রদায় বৈদিক হলেও ব্যক্তি ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করত না। তাদের মতে বিশ্বজগতের সব কিছুর জনক পরমাণু বা প্রকৃতি।

এভাবে দেখা যায়, বুদ্ধের আবির্ভাবের আগে ভারতের চিন্তাজগতও ছিল বিভক্ত। জাতিভেদ প্রথায় তখন সমস্ত সমাজ আচ্ছন্ন। পৌরোহিত্য শাসন সমস্ত জাতির কাঁধে ভর করে দাঁড়িয়ে আছে। বুদ্ধের আবির্ভাব সেই সময়েই। তাঁর প্রবর্তিত ধর্মকে ধর্মবিষয়ক ও সামাজিক সংস্কারের একটি চরম প্রয়াস রূপে আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। তিনি সকলকে বললেন, ‘‘কলহ বন্ধ করো, পুঁথিপত্র তুলে রাখ, নিজের পূর্ণতাকে বিকাশ করে তোল।’’ জাতি বিভাগের মূল তথ্যটির প্রতিবাদ বুদ্ধ কখনো করেন নি কারণ ওটা সমাজ জীবনের একটি স্বাভাবিক প্রবণতার অভিব্যক্তি এবং সব সময়েই মূল্যবান কিন্তু যা বংশগত বিশেষ সুবিধা দাবী করে, বুদ্ধ সেই অবনত জাতি প্রথার বিরুদ্ধেই যুদ্ধ করেছিলেন।

পরবর্তীকালে বুদ্ধের শিক্ষা লোকে বিস্মৃত হয়। ভারতবর্ষের বাইরে এমন অনেক দেশে এই ধর্ম প্রচারিত হয়, যেখানকার অনেক অধিবাসীদের এই মহান ধর্মের মূলকথা গ্রহণের যোগ্যতাই ছিল না। এই সমস্ত জাতির বিভিন্ন কুসংস্কার এবং কদাচারের সাথে মিশে বুদ্ধ বাণী ভারতে ফিরে আসে এবং কিম্ভূতকিমাকার সব মতামতের জন্ম দেয়।

ঐ সভায় বিবেকানন্দ আরো বলেছিলেন যে বুদ্ধের ত্যেকটি বাণী বেদান্তের উপর প্রতিষ্ঠিত। বেদান্তের লুকানো সত্যগুলোকে যাঁরা সকলের সামনে আনতে চেয়েছিলেন, বুদ্ধ তেমনই একজন সন্ন্যাসী। কিন্তু বিবেকানন্দের মতে জগৎ ঐ সকল সত্যের জন্য প্রস্তুত নয়। মানুষ চায় ধর্মের নিম্নতর অভিব্যক্তি, যেখানে ব্যক্তি ঈশ্বরের উপদেশ আছে। সে কারণেই মৌলিক বৌদ্ধধর্ম বেশীদিন মানুষের চিত্তকে ধরে রাখতে পারে নি। বৌদ্ধ ধর্মই পৃথিবীতে প্রথম মূক, ইতর প্রাণীদের প্রতি সহানুভূতি ঘোষণা করে মানুষে মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী আভিজাত্য প্রথাকে ভেঙে দিয়েছিল।

বুদ্ধের জীবনের কয়েকটি চিত্র উপস্থিত করে বিবেকানন্দ তাঁর বক্তৃতা শেষ করেছিলেন। তাঁর ভাষায় বুদ্ধ ছিলেন এমন একজন মহাপুরুষ যাঁর জীবনের সমস্ত চিন্তা এবং কাজই মানুষের হিত সাধনের উদ্দেশ্যে চালিত হত। প্রসঙ্গক্রমে তিনি বললেন বুদ্ধ জনৈক রাজার যজ্ঞে বলিদানের উদ্দেশ্যে আনীত মেষযূথকে বাঁচাবার জন্য নিজেকে যূপকাষ্ঠে নিক্ষেপ করার প্রস্তাবের কথা, দুঃখ সন্তপ্ত মানুষের ক্রন্দনে ব্যাথিত এই মহাপুরুষ কিভাবে নিজের স্ত্রী-পুত্রকে ত্যাগ করেন সে কথা এবং পরিশেষে তথাকথিত নিচুজাত চুন্দের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে তাঁর দ্বারা পরিবেশিত শূকর মদ্দব আহার করে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন, সে বৃত্তান্ত।

ক্যালিফোর্ণিয়ার শেকস্‌পীয়র ক্লাবে ১৯০০ সালের ২রা ফেব্রুয়ারী এক ধর্মালোচনায় স্বামী বিবেকানন্দ বলেছিলেন যে বৌদ্ধধর্মই জগতের সার্বভৌম ধর্মের প্রথম অভিব্যক্তি। বৌদ্ধধর্মের পূর্বেও ভারতে এবং অন্যত্র নানা ধর্মের আবির্ভাব হয়েছে। কিন্তু সেগুলি মোটামুটি নিজ নিজ জাতির পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। হিন্দু, ইহুদী, পারসী প্রভৃতি প্রাচীন জাতির প্রত্যেকেরই মহান ধর্ম ছিল। কিন্তু সে সবই মোটের উপর জাতি বিশেষের নিজস্ব ধর্ম। সার্বভৌম ধর্ম নয়। বৌদ্ধ ধর্মের অভ্যুত্থান ধর্ম জগতে প্রথম এক বিপুল বৈপ্লবিক পরিবর্তন। সে ধর্মের জন্মলগ্নের কয়েক শতাব্দীর মধ্যে বৌদ্ধ শ্রমণগণ নগ্নপদে ও মুণ্ডিতমস্তকে তৎকালীন সভ্যজগতের প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে পড়েছিল। বুদ্ধের জন্মের অল্প কয়েক শতাব্দীর মধ্যেই ভারতবর্ষের বাইরের নানা দেশ ছাড়াও মূল ভারত ভূখণ্ডে বৌদ্ধ ধর্ম এক সময়ে দেশের প্রায় দুই তৃতীয়াংশ মানুষকে সম্পূর্ণভাবে প্রভাবিত করেছিল।

বিবেকানন্দের মতে বৌদ্ধ ধর্মের রাজনৈতিক এবং সামাজিক দিক তার ধর্ম এবং আচার আচরণের থেকে অনেক বেশী আকর্ষণীয়। বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে তিনি সেই মহান ধর্মগুরু বুদ্ধের আবির্ভাবের সময় ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে কিঞ্চিত আলোকপাত করেছেন।

সেদিনের ভারতবর্ষে এক বহুবিস্তৃত বিরাট ধর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। সে ধর্মের সুসম্বন্ধ শাস্ত্রগ্রন্থ বেদ। এক বিপুল সাহিত্য সংগ্রহ। সেই মহান শাস্ত্রকার ঈশ্বরের কাছ থেকেই ঐ সাহিত্য বংশ পরম্পরায় সাধারণ মানুষের কাছে এসে পৌঁছেছিল। সে কারণে ভারতবর্ষের শাস্ত্রবিষয়ক ধারণা ছিল অত্যন্ত প্রাচীন পন্থী এবং স্বাভাবিক ভাবেই গোঁড়ামিতে পরিপূর্ণ। হিন্দুদের ভিতর বৃত্তির উপরই জাতি নির্ভরশীল। কর্মকারের পুত্রকে লোহার কাজ আর সূত্রধরের পুত্রকে কাঠের কাজই করতে হবে—তা সে পছন্দ করুক, আর নাই করুক। প্রসঙ্গক্রমে তিনি নিজের মত ব্যক্ত করে বললেন যে স্বাধীনতাই মূল কথা। দেহে, মনে ও আত্মায় পূর্ণ মুক্তি, পূর্ণ বন্ধন-হীনতাই তাঁর আজীবন কামনা। এই বন্ধন-হীনতাতেই বুদ্ধের সাথে তার একাত্মতা।

জীবনের আদি থেকে অন্ত পর্যন্ত সর্বক্ষণ ও সর্বমুহূর্তে নিয়মাধীন হয়ে থাকার প্রণালী অনন্তকাল ধরে চলে আসছিল।

যে কোন দেশেই হোক, আত্মার পূর্ণ মহিমার উপলব্ধি ব্যক্তিত্বের চরমোৎকর্ষের উপর নির্ভর করে এবং সে উৎকর্ষ সমাজ বন্ধনের মধ্যে উপলব্ধি করা যায় না। বিকাশোন্মুখ ব্যক্তিত্ব সমাজ বন্ধনের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করে। সেই বন্ধনকে সে ছিন্ন করে ফেলতে চায়। যদি কোন সমাজ বাধাস্বরূপ হয়, তবে তাকে চূর্ণ—বিচূর্ণ করে সে নিজেকে বিকশিত করতে চেষ্টা করে।

এই দুই বিপরীত শক্তির মাঝখানেই একটি সহজ পন্থা শেষ পর্যন্ত আবিষ্কৃত হল। সংসার ত্যাগ করলে যা কিছু প্রচার করা এবং শিক্ষা দেবার অধিকার থাকবে।

ফলে অসাধারণ ব্যক্তিত্বসম্পন্ন কিছু মানুষের উদ্ভব তখন সম্ভব হয়েছিল। সেই মুণ্ডিত মস্তক— গৈরিক বসনধারী সন্ন্যাসীরা উপস্থিত হলে রাজাও তাঁর আসন ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াতেন। সমাজের সকল স্তরের মানুষের সাথেই তাঁদের মেলামেশা ছিল। রাজপ্রাসাদ থেকে দরিদ্রের পর্ণ কুটীর সবই ছিল তাঁদের কাছে সমান। পুরাতনের গণ্ডি অতিক্রম করে নতুনের সন্ধানে বিভিন্ন দেশে তাঁরা যেতেন। কিন্তু নিয়মাবদ্ধ সমাজে সকলে চাইত পুরাতন গণ্ডীতে আবদ্ধ থাকতে, যদিও তাদের সে প্রচেষ্টা সফল হয়নি। যদি হতো তাহলে মানুষ জড়ত্ব প্রাপ্ত হতো। চিন্তা জগতে তাদের হতো মৃত্যু। সেই নিয়মবদ্ধ সমাজে ক্ষমতা ছিল পুরোহিত শ্রেণীর হাতে। সমাজের স্তর বিন্যাসে—-বর্ণশ্রেষ্ঠ যাঁরা তাঁদের মধ্য থেকেই পুরোহিতরা নির্বাচিত হতেন। প্রথম দিকে এ ব্যবস্থার একটা সুফল থাকলেও পরবর্তীকালে পুরোহিতদের মধ্যে ভোগ-পিপাসা জাগ্রত হল এবং তাঁরা হয়ে উঠলেন "Money-grablers."

প্রাচীন বেদে আবার তিনটে স্তর বিভাগ ছিল। প্রথমে কর্ম তারপর উপাসনা এবং শেষে জ্ঞান। কর্ম এবং জ্ঞান দিয়ে নিজেকে পরিশুদ্ধ করলেই ঈশ্বর মানুষের অন্তরে প্রতিভাত হন। কর্ম ও উপাসনার দ্বারাই মন পরিশুদ্ধ হতে পারে। মুক্তি তখন করায়ত্ত হয়। সুতরাং কর্ম, উপাসনা ও জ্ঞান—এই তিনটিই মুক্তির সোপান। ব্রাহ্মণদের ক্ষেত্রে কর্মের অর্থ ছিল বিস্তৃত উৎসবানুষ্ঠান। গো, মহিষ, ছাগ প্রভৃতি পশুবলি অথবা অন্যান্য প্রাণীদের যজ্ঞাগ্নিতে আহুতি প্রদান, কিন্তু জৈন ধর্মাবলম্বীরা এ সব কর্মের বিরুদ্ধে কঠিন মত প্রকাশ করত, তাদের মতে এ সব কর্ম, কর্মই নয়। অন্যকে আঘাত দেওয়া কখনো সৎকর্ম হতে পারে না। তাদের মতে এসব যদি বেদের নির্দেশ হয় তবে বেদ মিথ্যা, সেটি কেবল পুরোহিতদের তৈরী একটি পুস্তক মাত্র। কারণ, কোন মহৎ গ্রন্থের পক্ষে প্রাণীহত্যার নির্দেশ অবিশ্বাস্য। সে কারণে পশুবলির প্রথা বেদের নির্দেশ বলে যা বলা হয়েছে, তা আসলে ব্রাহ্মণদেরই রচনা। কারণ সেগুলো তাদের স্বার্থের অনুকূল, অর্থাগমের সহায়ক।

জৈনদের আর একটি মত, ঈশ্বরের কোন অস্তিত্ব নেই। মানুষের বিশ্বাস উৎপাদনের জন্য আর সেই সূত্রে ধনরত্ন সংগ্রহ করার জন্যই পুরোহিতদের সৃষ্টি— এই ঈশ্বর। এ সবই ধাপ্পা। অস্তিত্ব কেবল প্রকৃতির, অস্তিত্ব শুধু আত্মার। আর সবই অবাস্তব, অস্তিত্বহীন। আরেক একটি ব্যাপারে তারা ছিল খুবই কঠোর। তা হল কৃচ্ছ্রসাধন। বস্তুত জৈনরাই ছিল কৃচ্ছ্রসাধনার পথিকৃৎ। তাছাড়া অহিংসা ব্যাপারটা এঁদের কাছে এমন পর্যায়ে গিয়েছিল যে স্নানের সময় শরীর মার্জনা করলে অসংখ্য অদৃশ্য জীবাণু ধ্বংস হবে মনে করে এরা স্নানই করত না। এদেরই সমসাময়িক কালে আরো বিভিন্ন কৃচ্ছ্রসাধনপরায়ণ সম্প্রদায়ের উদ্ভব হয়েছিল। সেই সঙ্গে নানা বিক্ষুব্ধ সম্প্রদায়। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মানুষ তাদের দাবী দাওয়া নিয়ে সরব হল। সন্দেহ আর বিদ্বেষের সেই মহাসন্ধিক্ষণেই আবির্ভাব হয়েছিল জগতের এক ইতিহাস স্বীকৃত মহাপুরুষ তথাগত বুদ্ধের। স্বামী বিবেকানন্দ আরো বললেন যে বুদ্ধের ঐতিহাসিকতা

সম্পর্কে সকলেই নিঃসন্দেহ। শত্রু ও মিত্র সকলেই তাঁর কথা লিখে গেছেন। তাছাড়া মহাপুরুষদের জীবনের সঙ্গে যত কাহিনী, যত অলৌকিক গল্প ও-উপাখ্যানজড়িত হয়, সেগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে বাইরের কাহিনীগুলোর অন্তরালে প্রত্যেকেরই একটা নিয়ম সত্তা, একটা আভ্যন্তরীণ স্বকীয়তা থাকে। কিন্তু বুদ্ধের জীবনে কোন স্তরে, কোন সময়ে স্বকীয় প্রয়োজনে কোন প্রয়াস দেখা যায় নি।

জন্মলগ্ন থেকেই বুদ্ধ ছিলেন এত পবিত্র, এত নির্মল যে তাঁর শ্রীমুখ দর্শন যে লোক করেছে, সেই আনুষ্ঠানিক ধর্ম পরিত্যাগ করে সন্ন্যাসধর্ম গ্রহণ করে পরিত্রাণ লাভ করেছে, পরবর্ত্তীকালে যে সব চিন্তাশীল মণীষী অজ্ঞেয়বাদী বলে পরিচিত, তাঁদের কাছে বুদ্ধের মতবাদের একটি বিশেষ আবেদন ছিল। বিশ্বভ্রাতৃত্বের মহান প্রবক্তা ছিলেন বুদ্ধ। তাঁর কথাই ছিল যে আর্য-অনার্য নির্বিশেষে প্রতিটি মানুষেরই অধিকার রয়েছে ধর্মের উপর, স্বাধীনতার উপর। তাই সে অধিকারের ক্ষেত্রে সকলকেই তিনি আহ্বান করেন। বাস্তববুদ্ধি সম্পন্ন হতেই তিনি সকলকে উপদেশ দিতেন। একবার পাঁচজন তরুণ ব্রাহ্মণ একটি প্রশ্নের মীমাংসা করতে তাঁর কাছে উপস্থিত হয়েছিল। সত্যলাভের কি পথ? এই ছিল তাদের প্রশ্ন। তাদের প্রত্যেকেই যার যার পূর্ব পুরুষের শিক্ষা অনুসারে সত্যলাভের পথ সম্পর্কে বিভিন্ন মতের কথা বলে কোনটি আসল সে সম্পর্কে জানতে চাইল। বুদ্ধ তখন প্রত্যেককে আলাদাভাবে বললেন যে সবাই সত্যলাভের জন্য আলাদা পথের নির্দেশ দিয়েছে, কিন্তু তারা বা তাদের পূর্বপুরুষেরা কেউ কি ঈশ্বর দর্শন করেছে? কিন্তু সকলেরই মুখে একই উত্তর, তারা কেউ ঈশ্বর দর্শন করেনি।

যে ঈশ্বরকে সেই তরুণদের পূর্বপুরুষরাও কখনো দর্শন করেননি, সেই ঈশ্বরের অস্তিত্ব নিয়েই তারা পরস্পরের সঙ্গে অকারণ তর্ক করছে। লজ্জিত তরুণেরা বুদ্ধকে তাদের করণীয় সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন যে, সকলেরই উচিৎ সৎ হওয়া, এবং অপরকে ভালোবাসাই ঈশ্বর লাভের চিরন্তন পথ। বুদ্ধের যে বৈশিষ্ট্য বিবেকানন্দের মতে তাঁকে সব থেকে বেশী আকৃষ্ট করেছিল, তা হল তাঁর দৃঢ়তা, মহত্ত্ব এবং স্বচ্ছ চিন্তাশক্তি। তাঁর মস্তিষ্কে ছিল না কোন জটিলতা। যখন পৃথিবীর সকল ঐশ্বর্য তাঁর পাদমূলে, তখনও তাঁর মধ্যে কোন পরিবর্তন দেখা দেয়নি। সব সময়েই তিনি নিজেকে সাধারণ মানুষ বলে মনে করতেন।

বুদ্ধের শেষ অক্ষয় বাণী ছিল যে কোন শাস্ত্র গ্রন্থই প্রামাণ্য হিসাবে ধরে নেবার কোন কারণ নেই তা সে যতই প্রাচীন হোক, শুধু পূর্বপুরুষদের উক্তি বলে কোন কথা বিশ্বাস করা অথবা দশজন লোক বিশ্বাস করে বলে কোন মতবাদ গ্রহণ করা, কোনটাই উচিত নয়। প্রত্যেকটি জিনিস পরীক্ষা করে বা উপযুক্তভাবে যাচাই করেই গ্রহণ করা উচিত। তা ছাড়া যদি কোন কিছু বহুজনের হিতকর বলে মনে হয়, তা হলে সেটি সকলের মধ্যে বিতরণ করাই সঠিক।

বুদ্ধকে পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ প্রাজ্ঞবান দার্শনিক হিসাবে অভিহিত করে বিবেকানন্দ বলেছেন যে তিনি দেবতা নন, দানব নন, দেবদূতও নন। তিনি কেবল একজন দৃঢ়চিত্ত প্রাজ্ঞ ব্যক্তি—যাঁর মস্তিষ্কের প্রতিটি কোষই নিখুঁত, পরিপুষ্ট এবং জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত সতেজ ও ক্রিয়াশীল। কোন মোহ নেই, নেই কোন ভ্রান্তি, যা নাকি বুদ্ধের প্রকৃত স্বরূপ। প্রবল ব্রাহ্মণ্যশক্তির অত্যাচারের কাছে তিনি কখনো মাথা নত করেন নি। সর্বত্রই সহজ ও স্বাভাবিক। দুঃখীর দুঃখে তিনি দুঃখী, তাঁদের সাহায্যে তিনি মুক্ত হস্ত। আবার সঙ্গীত সভায় তিনি গীতজ্ঞ। শক্তিমানের মধ্যে তিনি মহাশক্তিমান। সর্বত্রই সেই এক প্রাজ্ঞ মণীষী। এক সবল শক্তিমান পুরুষ।

বক্তৃতায় বিবেকানন্দ উপস্থিত শ্রোতাদের বুদ্ধের কর্মপন্থা এবং সংগঠন সম্পর্কে বলতে গিয়ে বললেন যে গীর্জা সম্পর্কে এবং ধর্মসংস্থা সম্পর্কে তাদের যে মত ও ধারণা গড়ে উঠেছে সেটাও বুদ্ধের চরিত্র থেকেই নেওয়া। বুদ্ধ সন্ন্যাসী শিষ্যবর্গকে একত্র করে নূতন একটি সংঘ গঠন করেছিলেন। যীশুখৃষ্টের জন্মের সাড়ে পাঁচশ বছরের আগে সেই সংঘে ভোটপত্রের মাধ্যমে নিজেদের মতামত জানাবার প্রথা পর্যন্ত গৃহীত হয়েছিল। গণতান্ত্রিকভাবে গঠিত সেই সংঘ ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী যা দেশ বিদেশের বিভিন্ন সেবামূলক কাজের উৎসে পরিণত হয়েছিল।

যীশুখৃষ্টের জন্মের দুশ বছর আগে আবির্ভাব হয়েছিল সম্রাট অশোকের। পাশ্চাত্যের ঐতিহাসিকেরা তাঁকে 'দেবোপম সম্রাট' বলে আখ্যাত করেছিলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে বুদ্ধের মতবাদ গ্রহণ করে সে সময়কার পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসাবে নিজেকে প্রতিপন্ন করেছিলেন। মহামতি সম্রাট অশোক চিকিৎসালয় স্থাপন করেছিলেন শুধু মানুষের জন্য নয়, পশুদের জন্যও। যা ছিল পৃথিবীতে প্রথম। তাঁর নির্দেশ ছিল যখন কোন গৃহপালিত পশু বৃদ্ধ ও অকর্মণ্য হয়ে যাবে এবং তার মনিব যদি সেই পশুটিকে আর প্রতিপালন করতে না পারে, তখন তাকে পশু চিকিৎসালয়ে পাঠিয়ে দিতে হবে। কোন মতেই হত্যা করা চলবে না।

জীবের প্রতি এই ভালোবাসাও সম্রাট, বুদ্ধের উপদেশ থেকেই গ্রহণ করেছিলেন। সভায় স্বামী বিবেকানন্দ একথা বলেই তাঁর ভাষণ শেষ করলেন যে বৌদ্ধ ধর্ম ছাড়া পৃথিবীতে আর কোন ধর্মই রক্তপাত না করে এক পাও অগ্রসর হতে সক্ষম হয়নি। কেবলমাত্র মস্তিষ্ক দিয়ে সহস্র লক্ষ মানুষকে ধর্মান্তর করানো অন্য কোন ধর্মের পক্ষেই সম্ভব হয়নি।

১৯০০ সালের১৮ই মার্চ সানফ্রান্সিসকোতে ভাষণ প্রসঙ্গে স্বামী বিবেকানন্দ ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে বৌদ্ধ ধর্মের এক বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ অবস্থানের কথা বললেন। বিভিন্ন ধর্ম সম্প্রদায়ের মধ্যে বৌদ্ধরাই প্রথম নিজ ধর্মের সীমাবদ্ধ পরিধির মধ্যে সন্তুষ্ট না থেকে দূর দূরান্তে ছড়িয়ে পড়েছিলেন। পূর্ব-পশ্চিম উত্তর-দক্ষিণ সর্বত্রই তাঁরা ভ্রমণ করেছেন। তমসাচ্ছন্ন তিব্বত থেকে শুরু করে চীন, জাপান, কোরিয়া, ব্রহ্ম, শ্যাম, পূর্বভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ হয়ে সুদূর রাশিয়া, পোল্যাণ্ড এবং আরো অনেক পাশ্চাত্য ভূখণ্ডেও তাঁরা গিয়েছিলেন ধর্ম

প্রচারের জন্য। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের শিক্ষার ফলে কুসংস্কার এবং পুরোহিতদের অপকৌশলগুলিও দূর হতে সাহায্য করেছিল।

বুদ্ধের ছিল মেধা, শক্তি ও উন্মুক্ত আকাশের মত অনন্ত হৃদয়। পুরোহিতদের অপকর্মের বিহিত করতে তিনি উদ্যোগী হয়েছিলেন। কারও ওপর কোন আধিপত্য বিস্তার না করে তিনি মানুষের মানসিক ও আধ্যাত্মিক সব রকম বন্ধনকে চূর্ণ করতে চাইলেন। লোকের কেন এত দুঃখ তা তিনি জেনেছিলেন, আর এই দুঃখ নিবৃত্তির উপায়ও তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সব কিছুর সমাধান করে নির্বিচারে সকলকেই উপদেশ দিয়ে তিনি বোধিলব্ধ শক্তি উপলব্ধি করতে তাদের সাহায্য করেছিলেন। বিবেকানন্দের ভাষায় এই মহাপুরুষই মহামানব বুদ্ধ।

ধর্মের বাড়াবাড়ির মুলোচ্ছেদ করে অতিশয় স্পষ্ট সত্যকে বুদ্ধ প্রকাশ করেছিলেন। তাঁর সমস্ত উপদেশাবলীর মধ্যে মানব-মৈত্রীই অন্যতম। তিনি ছিলেন সাম্যের আচার্য। মানুষের জীবনে এত দুঃখ কেন ? কারণ সে অত্যন্ত স্বার্থপর। সে শুধু নিজের কথাই ভাবে। নিজের জন্যই সব কিছু বাসনা করে। আত্ম বিসর্জনই এ থেকে নিষ্কৃতি লাভের উপায়। 'অহং' বলে কিছু নেই। জীবন মৃত্যুর গতাগতির 'আত্মারও কোন স্থান নেই। আছে শুধু চিন্তা প্রবাহ, একটির পর আর একটি সংকল্প। এই চিন্তা বা সংকল্পের কর্তা কেউ নেই। দেহ অনুক্ষণ পরিবর্তিত হচ্ছে। মন এবং বুদ্ধিও পরিবর্তিত হচ্ছে। সুতরাং 'অহং' নিছকই ভ্রান্তি। যত স্বার্থপরতা তা এই মিথ্যা অহং'কে নিয়েই। বুদ্ধের মতে আচার অনুষ্ঠান সবই ভুল। জগতে আদর্শ মাত্র একটাই। সব মোহকে বিনষ্ট করা। যা সত্য, কেবল তাই থাকবে। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ হলেই অহং এর বিনাশ ঘটবে।

বিবেকানন্দ বলেছিলেন হিন্দুরা তাদের ঈশ্বর ছাড়া আর সব কিছুই ত্যাগ করতে পারে। ভক্তি ও ঈশ্বরকে তারা আঁকড়ে থাকবেই। আর বুদ্ধের শিক্ষায় ঈশ্বর বলে কেউ নেই। আত্মা কিছু নয়। শুধু কর্ম। কিসের জন্য ? অহং-এর জন্য নয়, কেন না তাও এক ভ্রান্তি। এই ভ্রান্তি দূর হলেই মানুষ তার নিঃস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারবে। পৃথিবীতে এমন লোক কীভাবে বেশী হবে যারা এতটা উঁচুতে উঠে কেবল কর্মের জন্যই কর্ম করবে।

তথাপি এটা সম্ভব হয়েছিল কারণ এই ধর্মের বিস্ময়কর ভালবাসা, যা মানব ইতিহাসে সর্বপ্রথম একটি মহৎ হৃদয়কে বিচলিত করেছিল। এবং তা শুধু মানুষের সেবায় নয়, সমস্ত প্রাণীর সেবায় যা নিবেদিত হয়েছিল, ভালোবাসা সাধারণের দুঃখ মোচন ছাড়া অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে নি।

মানুষ ঈশ্বরকে ভালবাসত। কিন্তু মনুষ্য-ভ্রাতাদের কথা ভুলে গেল। ঈশ্বরের জন্য সে নিজের জীবন পর্যন্ত বলি দিত, আবার ঘুরে দাঁড়িয়ে ঈশ্বরের নামে সে নরহত্যাও করত। এই ছিল তখন জগতের অবস্থা। ঈশ্বরের মহিমার জন্য তারা পুত্র বিসর্জন দিত। দেহ লুণ্ঠন করত। অজস্র জীব হত্যা করত এবং এই পৃথিবীকে রক্তস্রোতে প্লাবিত করত ঈশ্বরেরই

জয়ধ্বনি দিয়ে। কিন্তু বুদ্ধই তাদের ঈশ্বরের অপর মূর্তি মানুষের দিকে ফিরে তাকাতে শেখালেন। তিনি বললেন মানুষকেই ভালবাসতে হবে। সেই হল সর্বশ্রেণীর মানুষের জন্য গভীর প্রেমের প্রথম প্রবাহ। সত্য, শুদ্ধ জ্ঞানের প্রথম তরঙ্গ যা ভারতবর্ষের হৃদয় থেকেই উদয় হয়ে ক্রমশঃ পূর্ব-পশ্চিম, উত্তর-দক্ষিণের নানা দেশকে প্লাবিত করেছিল।

সত্য যেন সত্যেরই মতো ভাস্বর থাকে, এটিই ছিল বুদ্ধের কাম্য। কোন আপসের প্রয়োজন নেই। কোন রাজা, পুরোহিত বা ক্ষমতা সম্পন্ন লোকের তোষামোদ করার আবশ্যক নেই। কোন কুসংস্কার মূলক আচারের কাছে, তা সে যতই প্রাচীন হোক মাথা নত করবার দরকার নেই। যুক্তিহীন শাস্ত্রগ্রন্থ এবং ধর্মীয় মন্ত্র তন্ত্র তিনি অস্বীকার করেছেন, যাতে তাঁর অনুগামীরা সংস্কৃত ভাষার সঙ্গে সংযুক্ত ভাষার সংস্কারগুলি কোন ভাবে গ্রহণ করতে না পারে।

বুদ্ধের শিক্ষা ছিল—ঈশ্বর বলে কিছু নেই, মানুষই সব। ঈশ্বর সম্পর্কে প্রচলিত সমস্ত মনোভাবকে তিনি অস্বীকার করেছিলেন। তাঁর মতে এই মনোভাব মানুষকে দুর্বল ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন করে। মানুষ যদি সব কিছুর জন্যেই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করবে তা হলে আর কর্ম করবে কখন? যারা কর্ম করে, ঈশ্বর তাঁদের কাছেই আসেন। যারা নিজেদের সাহায্য করে, ঈশ্বর তাদেরই সাহায্য করেন। ঈশ্বর সম্পর্কে অন্য ধারণা মানুষের মনকে দুর্বল করে তোলে, করে তোলে পরনির্ভরশীল। মানুষ যদি মনে করে কতগুলো শব্দই হচ্ছে পূজা, তা হলে সে পূজা অর্থহীন। তাতে কোনই ফল পাওয়া যায় না।

প্রার্থনা মানে কোন যাদু মন্ত্র নয়। কোন রকম পরিশ্রম না করে তা শুধু উচ্চারণ করলেই ফল পাওয়া যায় না। সকলকেই পরিশ্রম করতে হবে। একজন কঠোর শ্রম করবে আর একজন শুধু কয়েকটি কথা বারবার উচ্চারণ করে ফল লাভ করবে— তা কখনো সত্য হতে পারে না।

বৌদ্ধধর্ম ছিল মূলতঃ সংস্কার মূলক। ধর্ম-বিপ্লব আনার জন্য বুদ্ধকে অনেক নাস্তিবাচক শিক্ষাও দিতে হয়েছিল। বিবেকানন্দ বলেছেন যে সেখানেই ছিল বিপদের বীজ। কারণ কোন ধর্ম যদি নাস্তিভাবের দিকে বেশী জোর দেয়, তার সম্ভাব্য বিলুপ্তির আশঙ্কাও থাকে সেখানেই। শুধুমাত্র সংশোধনের দ্বারা কোন সংস্কারমূলক সম্প্রদায় টিকে থাকতে পারেন না—সংগঠনী উপাদানই তার আসল প্রেরণা। পরবর্ত্তীকালে বুদ্ধের অনুগামীরা তাঁর নাস্তিভাবমূলক উপদেশগুলির প্রতি বেশী আকৃষ্ট হবার ফলে সত্যের অস্তি ভাবমূলক দিকটা চাপা পড়ে যায়। বক্তৃতায় তিনি বললেন যে সারা জীবন তিনি বুদ্ধের অনুরাগী। সমস্ত চরিত্রের চেয়ে বুদ্ধের প্রতিই তাঁর শ্রদ্ধা বেশী। সবাই নিজের জন্য ঈশ্বরকে খুঁজছে। কিন্তু বুদ্ধ নিজের জন্য সত্যলাভের চেষ্টা করেন নি। তিনি সত্যের সন্ধান করেছেন মানুষের দুঃখে কাতর হয়ে। তাঁর কোন ভাবাবেগ ছিল না। ছিল না কোন কুসংস্কার। তিনি বারংবার নিজেকেই সত্যানুসন্ধান করতে বলেছেন, বলেছেন নিজেকে অনুভব করতে। তারপর তা বহুজনের পক্ষে কল্যাণকর মনে হলে মানুষের মধ্যে বিতরণ করতে। চিত্ত নির্মল এবং স্বচ্ছ

হলেই সত্য প্রতিভাত হবে। বিবেকানন্দ সেই সভায় পাশ্চাত্যের কুসংস্কারতা সম্পর্কেও কটাক্ষ করে বললেন যে সে দেশে সবাই নিজেদের শিক্ষিত, সভ্য এবং কুসংস্কারের উর্দ্ধে বলে মনে করে। অথচ কেবল মাত্র হিন্দু বলেই এক অনুষ্ঠানে তাঁকে বসতে আসন দেওয়া হয়নি। বুদ্ধের জীবন যেমন মহৎ, তাঁর পরিনির্বাণও তেমনি মহৎ। শেষ সময়ে তিনি এমন একটি লোকের দেওয়া খাদ্য গ্রহণ করেছিলেন, উচ্চবর্ণের হিন্দুরা যাদের স্পর্শও করে না। শিষ্যদের সে খাদ্য খেতে নিষেধ করে নিজে তা গ্রহণ করে বলেছিলেন যে চুন্দ এক মহৎ কর্তব্য পালন করেছে। সে বুদ্ধকে দেহ-মুক্ত হতে সাহায্য করেছে। জনৈক শিষ্যকে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে বুদ্ধ বললেন "এ কি? আমার এত উপদেশের এই ফল? কোন মিথ্যা বন্ধনে তোমরা জড়িত হয়ো না, আমার উপর কিছু মাত্র নির্ভর করো না, এই নশ্বর শরীরটার জন্য বৃথা গৌরবের প্রয়োজন নেই, বুদ্ধ কোন ব্যক্তি নন, তিনি উপলব্ধি স্বরূপ। নিজেরাই নিজেদের নির্বান লাভ কর।"

বক্তৃতার শেষ পর্যায়ে বিবেকানন্দ বললেন যে বুদ্ধ এমনকি অন্তিম কালেও নিজের প্রতিষ্ঠার জন্য কোন দাবী করেন নি। তিনি ছিলেন উপলব্ধির এক নামান্তর। লোক শিক্ষকদের মধ্যে তিনি মানুষকে আত্মবিশ্বাসী হতে সবচেয়ে বেশী শিক্ষা দিয়েছেন। কেবল মিথ্যা 'অহং' এর বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তির উপায়ের কথা বলেন নি, অদৃশ্য ঈশ্বরের উপর নির্ভরতা থেকেও মুক্তির কথা বলেছেন। মুক্তির সেই অবস্থা যাকে তিনি নির্বাণ বলতেন তা লাভ করার জন্য প্রত্যেককেই আহ্বান করেছেন। একদিন সে অবস্থায় সকলেই উপনীত হবে, এবং সেই নির্বাণে উপনীত হওয়াই মনুষ্য-জীবনের চরম সার্থকতা।

ঈশ্বর নয়, সুকর্মের প্রতিই বুদ্ধের অগাধ আস্থা। আর এখানেই বিবেকানন্দ বুদ্ধে সমর্পিত প্রাণ। " Do good and Be good" যাঁর প্রচারিত তত্ত্বের মূল কথা, এ যুগের এক শ্রেষ্ঠ সন্তান বিবেকানন্দের তাঁর সাথে একাত্ম হওয়াই স্বাভাবিক।

তাছাড়া বুদ্ধের প্রেম এবং ক্ষমতাশীলতায়ও বিবেকানন্দ মুগ্ধ। তিনি বলেছেন বৌদ্ধধর্মই পৃথিবীতে প্রথম প্রচারশীল ধর্ম যা প্রচার করতে কোন রক্তপাত হয়নি। উপরন্তু চীনদেশে প্রথম দিকে যখন বৌদ্ধ প্রচারকেরা নির্যাতিত হয়েছিলেন, এমনকি নিহতও হয়েছিলেন, তখনো তাঁরা ছিলেন ক্ষমাশীল। পরে যখন সম্রাট উৎপীড়ণকারীদের উপর প্রতিশোধ নেবার বাসনা প্রকাশ করলেন তখনো সম্রাটকে নিবৃত্ত করেছিলেন সেই মুণ্ডিত মস্তক বৌদ্ধ ভিক্ষুরাই। কর্ম, ত্যাগ আর প্রেমের যে বাণী খ্রীঃ পূর্ব যুগের এক মহান সন্তান গৌতম বুদ্ধ আমাদের জানিয়েছিলেন, আড়াই হাজার বছর পরে ভারতের আর এক সুসন্তান স্বামী বিবেকানন্দ সেই বাণীর সাথেই নিজেকে যুক্ত করেছেন কথায় কাজে। এখানেই তথাগত বুদ্ধের সাথে স্বামী বিবেকানন্দের একাত্মতা।

বুদ্ধের প্রতি স্বামীজীর অগাধ শ্রদ্ধার যে চরমতম প্রকাশ ঘটেছিল তা বুদ্ধ সম্পর্কে তাঁর কয়েকটি উক্তি থেকে উপলব্ধ হয়: "আমি বৌদ্ধ নই, তথাপি একভাবে আমি বৌদ্ধ"। "আমি বুদ্ধের দাসানুদাসেরও দাস।" "বুদ্ধদেব আমার ইষ্ট, আমার ঈশ্বর।"

ঐতিহাসিক উপন্যাস ও বৌদ্ধবিদ্যা চর্চায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী

ভিক্ষু সুমনপাল*

উনবিংশ শতাব্দীর বাংলার মনীষীসমাজের অনেকেরই মধ্যে অনন্যসাধারণ ব্যক্তিত্ব শ্রদ্ধেয় শাস্ত্রী মহাশয়। লেখক-গবেষক জীবনের শুরু থেকে শেষ অবধি শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধবিদ্যা চর্চায় নিবিষ্ট থেকেছেন। তাঁর এই আগ্রহের সূত্রপাত হয়েছিল বঙ্গদর্শনের অগ্রজ লেখকদের প্রভাবে, বিশেষ করে রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ও রামদাস সেনের রচনা থেকে বৌদ্ধবিদ্যা চর্চার গুরুত্ব সম্পর্কে তিনি সচেতন হয়ে উঠেন। তাছাড়া তাঁর জীবনব্যাপী বৌদ্ধবিদ্যা চর্চা ও গবেষণার প্রধান বিষয় হয়ে উঠার মূলে যাঁর অন্যতম অবদান তিনি হচ্ছেন শ্রদ্ধেয় রাজেন্দ্রলাল মিত্র। বাংলা উপন্যাসে বৌদ্ধযুগের পরিবেশ ও বৌদ্ধ ভাবধারা বিস্তৃত আলোচনার কার্যে প্রথম অগ্রসর হয়েছিলেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। বৌদ্ধ যুগের প্রতিবেশে তিনিই প্রথম সার্থক বাংলা উপন্যাসের জন্মদান করেন।[১] হরপ্রসাদের দুটি ঐতিহাসিক উপন্যাসের প্রথমটি কাঞ্চনমালা বঙ্গদর্শন পত্রিকায় আটটি সংখ্যায় ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়েছিল—১২৮৯ বঙ্গাব্দের আষাঢ় থেকে মাঘ সংখ্যা অব্দি। রচনাটি বই আকারে প্রকাশিত ১৩২২ বঙ্গাব্দে (১৯১৫ খৃঃ)। ক্ষেমেন্দ্র বিরচিত বোধিসত্ত্বাবদান কল্পলতা[২] গ্রন্থের 'কুণালাবদান'-এর কাহিনী অবলম্বনে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'কাঞ্চন মালা' উপন্যাস প্রণয়ন করেছেন। অবদানে কাঞ্চন মালিকা বা কাঞ্চনমালাই কুণালপত্নী। কাঞ্চনমালায় শাস্ত্রী মহাশয় কাহিনীর কেন্দ্রে রেখেছেন এমন নারী চরিত্র যে রূপবতী এবং রূপ দিয়ে সম্মোহিত করে অসাধ্য সাধন করতে পারে। এ তার দৃঢ় প্রত্যয়। সে ক্ষৌরকারের ঘরে অর্থাৎ সমাজের নিচু ধাপে জন্মে স্বপ্ন দেখত রাজরাণী এবং অসামান্যা হবে। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি এবং সংকল্পের অটলতায় রূপবতী তিষ্যরক্ষিতা মহারাজ অশোক পত্নী হল। কিন্তু তার জীবন পিপাসা, তার তীব্র সংরাগ আর এক পরীক্ষায় তাকে লিপ্ত করে। অশোকের অন্য মহিষী অসন্ধিমিত্রার, মতান্তরে পদ্মাবতীর সন্তান, সৎ ছেলে কুশালের চোখের সৌন্দর্যে, রূপের টানে তিষ্যরক্ষিতা উন্মনা হয়ে তাঁর প্রতি আসক্ত হয়েছিলেন। কিন্তু কুনালের নিকট প্রত্যাখ্যাত হয়ে তাঁর সুন্দর চোখের অহংকার নাশের জন্য প্রতিজ্ঞা করেন[৩]। রাজা অশোক তক্ষশীলার অধিপতি কুঞ্জরকর্ণকে জয় করার জন্য কুশালকে তক্ষশীলায় প্রেরণ করেন। শাস্ত্রীর 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে এটি তিষ্যরক্ষিতার ষড়যন্ত্র, অবদানে এটি রাজার সাম্রাজ্য-বৃদ্ধি ও বিদ্রোহ দমন। কিন্তু কুশালের সঙ্গে রাজা কুঞ্জরকর্ণের যুদ্ধ হয়নি। কুঞ্জরকর্ণ রাজার সৈন্যবাহিনী দেখে কুণালের নিকট আত্মসমর্পণ করেন।

---

* গবেষক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়। অনোমা ২০০৩ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

অবদানানুসারে, 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে তিষ্যরক্ষিতার উপস্থিত বুদ্ধি এবং অক্লান্ত সেবা অশোককে কঠিন অসুখ হতে ভাল করে তুলল। কৃতজ্ঞ অশোক বর দিতে চাইলে সাতদিন সাম্রাজ্য শাসনের অধিকার চেয়ে নিল (মতান্তরে এক বৎসর)।

তিষ্যরক্ষিতা রাজ-সিংহাসনের অধিকার লাভ করেই কুণালের চোখ উপড়িয়ে দিতে আদেশ দিয়েছেন। অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ উপলক্ষে ললিতবিস্তর অভিনয় এবং কাঞ্চনমালার দেহে বোধিসত্ত্ব অবলোকিতশ্বরের আবির্ভাব ছিল লেখকের নিজস্ব পরিকল্পনা। অবদানে কাঞ্চনমালাও কুণালের সঙ্গে তক্ষশীলায় এসেছিল। উপন্যাসে স্বামীর খোঁজে ভিক্ষুণী বেশে পাটলিপুত্র থেকে তার তক্ষশীলায় যাত্রাপথের বিচিত্র অভিজ্ঞতার বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। সে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাঞ্চনমালার মত সেবাপরায়ণ কিনা জানা যায় না, তবে পতিভক্তিপরায়ণা। উপন্যাস শেষ হয় অনেকটা অলৌকিকভাবে। অবদানে সত্যক্রিয়া বলে কুনাল চোখ ফিরে পায়। কিন্তু হরপ্রসাদের 'কাঞ্চনমালা' উপন্যাসে বৌদ্ধ চন্ডালের চোখ কুণালের চোখের কোটরে বসিয়ে দৃষ্টি ফিরিয়ে দেয়। পুণ্যবান চন্ডালও সত্যকথা বলায় নিজের চোখ ফিরে পায়। তাঁর 'কাঞ্চনমালা' বৌদ্ধ শান্তি ও সেবার মূর্ত প্রতীক এবং কুণাল ক্ষমা ও তিতিক্ষার জীবন্ত বিগ্রহ। বৌদ্ধধর্ম অনুধ্যানের ফলে এঁরা যে গভীর অন্তর্দৃষ্টি ও ঔদার্য লাভ করেছিলেন তার কাছে জগতের কোন বস্তু, এমন কি দৈহিক সুখ-দুঃখও প্রহীন হয়েছে। প্রাণের গভীরতম অনুভূতির আনন্দে ক্ষমার অযোগ্য শত্রুকেও তারা ক্ষমা করেছেন।

ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে এই উপন্যাসে বৌদ্ধধর্ম ও ব্রাহ্মণ্যধর্মের সংগ্রাম সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে।[৪] তিনি গ্রন্থটিকে ঐতিহাসিক উপন্যাসের মর্যাদা প্রদান করে লিখেছেন- কাঞ্চনমালা একটি ঐতিহাসিক উপন্যাস। অর্থাৎ ইতিহাসের মূল বিষয়বস্তুকে কাঠামো করিয়া কল্পনাবলে, তাহাকে রক্ত মাংস, বেশ ভূষা ও অলঙ্কারে সুশোভিত করা, যাহাতে বিষয়বস্তু হৃদয়গ্রাহী হয়, কিন্তু ঐতিহাসিক সত্যতাই কাঞ্চনমালা উপন্যাসের বড় কথা নহে[৫]। কাঞ্চনমালা বিষয়ভাবনার দিক থেকে তাৎপর্যপূর্ণ রচনা। হরপ্রসাদ সৎ ছেলের প্রতি তিষ্যরক্ষিতার প্রেমের এ গল্প লেখায় মনে কোনও বাধা পাননি—এটাও মনে রাখার মত। অবশ্য শেষ পর্যন্ত উপন্যাসে কুশাল-কাঞ্চনমালার দাম্পত্য প্রেমের মহিমা এবং এই দম্পতির ধার্মিকতা প্রতিপন্ন করেছেন শাস্ত্রী মহাশয়। আধুনিকতর পাঠক তিষ্যরক্ষিতা চরিত্রে নারী ব্যক্তিত্বের, নারীর ইচ্ছাশক্তির অসামান্যতার দৃষ্টান্তটিকেই মনে করতে পারেন এ উপন্যাসের শক্ত শিরদাঁড়া[৬]। বস্তুতঃ কাঞ্চনমালা উপন্যাসে হরপ্রসাদের সৃজনীপ্রতিভার স্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

কাঞ্চনমালার ছত্রিশ বছর পরে নারায়ণ পত্রিকায় দ্বিতীয় উপন্যাস 'বেণের মেয়ে' লেখা শুরু করেন। ১৩২৫ বঙ্গাব্দের কার্তিক থেকে ১৩২৬ এর অগ্রহায়ণ অব্দি ধারাবাহিক প্রকাশিত হয়। ১৯১৯ খ্রিস্টাব্দেই এটি বই আকারে প্রকাশিত হয়[৭]। কাঞ্চনমালায় বৌদ্ধধর্মের প্রতিষ্ঠার ইঙ্গিত ছিল, বেণের মেয়ে উপন্যাসে বৌদ্ধ ধর্মের বিলুপ্তিকথা, বিশেষত বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতিতে। নানা দিক থেকে বাংলার উপন্যাসে শাস্ত্রী মহাশয়ের বেণের মেয়ে উপন্যাসটি অনবদ্য রচনা।

শাস্ত্রী মহাশয় তাঁর শ্রেষ্ঠ উপন্যাস 'বেণের মেয়ে'র[৮] ভূমিকায় লিখেছেন—"বেণের মেয়ে ইতিহাস নয়, সুতরাং ঐতিহাসিক উপন্যাসও নয়। বেনের মেয়ে একটা গল্প মাত্র[৯]। 'বেনের মেয়ে' খ্রি. দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর পটভূমিকায় রচিত সহজিয়াতন্ত্রের উপন্যাস। এই উপন্যাসে হরপ্রসাদ সহজযানী বাংলার এক মনোরম ছবি এঁকেছেন। সে যুগের বাংলায় হিন্দু-বৌদ্ধ জীবন ধারার মধ্যে বহু বৈচিত্র্য থাকা সত্ত্বেও বাঙালীর মূল জীবনসাধনায় তার নিষ্ঠা ও বিশ্বাসের ক্ষেত্রে, শিক্ষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক সমন্বয়ধর্মী ঐতিহ্যই মূর্ত হয়ে উঠেছিল। শাস্ত্রী মহাশয়, মানুষের সামগ্রিক জীবনাচারণের তথ্যকেই প্রকৃত ইতিহাসের উপাদান মনে করেছেন। বাংলার সামাজিক ইতিহাসের বিভিন্ন স্তর সম্পর্কে গবেষণায় তিনি পথিকৃৎ ও প্রাণ পুরুষ বাঙালির যথার্থ ইতিহাসের প্রাথমিক বহু উপাদান তাঁরই আবিষ্কার। সেই সব উপাদান ব্যবহার করে বেণের মেয়ে উপন্যাসে তিনি বাংলার প্রাচীন সমাজের সজীব প্রত্যক্ষ পরিচয় পরিস্ফূট করে তুলেছেন।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, তুর্কী আক্রমণের আগের বাংলার সমাজসংস্কৃতির বিষয়ে গবেষণার পথ দেখিয়েছিলেন। তিনিই সহজিয়া বৌদ্ধদের লেখা আদিমতম বাংলা কবিতার সংগ্রহ চর্যাপদ আবিষ্কার করেন। বাংলার ধর্ম কর্মে, আচার-অনুষ্ঠানে, সাংস্কৃতিক জীবনে বৌদ্ধ উপাদান অঙ্গাঙ্গিভাবে মিশে আছে- সে বিশ্লেষণ তাঁর গবেষণাতেই প্রতিপন্ন হয়েছিল। বেণের মেয়ে উপন্যাসে বাংলার অবসিত এক সামগ্রিক চিত্র ফুটে উঠেছে। গল্প ছাপিয়ে সমগ্র একটা কালপর্বে গোটা জীবন প্রবাহের বাঁক ফেরার বাস্তবতা পাঠকের মন জুড়ে থাকে, বেণের মেয়েকে তাই বলা যায় উপন্যাসের মহাকাব্যিক অবয়বের দৃষ্টান্ত[১০]।

কাঞ্চনমালায় রয়েছে জীবনাদর্শ প্রতিষ্ঠার প্রবণতা আর বেনের মেয়ে নিছক এক জীবনচিত্র। ইতিহাসের দিক থেকে উপন্যাসে আছে বৌদ্ধ রাজা রূপা বাগদির রাজ্য লোপ এবং হিন্দু হরিবর্মার রাজ্য প্রতিষ্ঠা, এই রাজনৈতিক পালা বদলের ঘটনা। প্রাচীন বাংলার বাণিজ্যকেন্দ্র সপ্তগ্রামের সমাজে বণিক-শ্রেষ্ঠ বিহারী দত্ত এক মর্যাদাময় চরিত্র। শাস্ত্রী মহাশয় বিহারীর পরিচয় দিচ্ছেন 'বিহারীর ধর্ম কী ছিল, তাহা ঠিক বুঝানো যায় না। শুধু বিহারী কেন ?-সেকালের বেণেদের ধর্ম কী ছিল, ঠিক বলা যায় না, তাহারা ব্রাহ্মণ দিয়েও দশকর্ম করাইত, আবার বুদ্ধের মন্দিরে ধুপ-ধুনাও দিত। তাহারা ব্রাহ্মণ আসিলে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার করিয়া পায়ের ধূলা লইত, বৌদ্ধ ভিক্ষু আসিলেও তাহাকে দন্ডবৎ নমস্কার করিত[১১]।' এই সমাজে হিন্দু আর বৌদ্ধ যেন নিজের নিজের ধর্ম কর্ম নিয়ে মিলে মিশে যায়।

' বেণের মেয়ে' উপন্যাসের রূপাবয়বের মধ্যে লেখক বৌদ্ধ সহজিয়া সাধকদের ধর্মতত্ত্বের বৈশিষ্ট্য, তাঁদের ব্যক্তি সম্পর্কাশ্রিত গুহ্যসাধন-জীবন এবং সমসাময়িক কালে শ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মনীষীদের জীবনস্মৃতির যুগচিত্র উপস্থাপিত করেছেন। উপন্যাসের শুরু সাতগাঁয়ের বাগদি রাজার গুরু লুইসিদ্ধা লুই পাদের অভ্যর্থনার আয়োজনের বর্ণনায়। ইনিই বাংলার সেই প্রথম কবি, যিনি লিখেছেন—

কা আ তরুবর পঞ্চবি ডাল[১২]

চঞ্চল চী-এ পইঠে কাল।।

পদটি বাংলা ভাষার প্রথম কবিতা 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে রাজার ছেলেকে লুইপাদ গোপনে আনয়ন করে সহজ সঙ্ঘের শিষ্যভুক্ত করে নিলেন। এদিকে বেণে বিহারী দত্তর মেয়ে অল্প বয়সে বিধবা হল। মায়াকে ভিক্ষুনী সঙ্ঘে প্রবেশ করাবার জন্যও বৌদ্ধদের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা শুরু হয়ে যায়। মহাযান, বজ্রযান সকলেরই এক চেষ্টা মায়াকে নিজ দলে পেতে হবে। কারণ মায়াকে ভিক্ষুনী করতে পারলে মায়া ও তার পিতা বিহারীর স্থাবর অস্থাবর সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যাবে। সহজাচার্যদের নিকট সুগতের আদর্শে ইন্দ্রিয়দমন বুদ্ধত্ব লাভ। নির্বাণ ইত্যাদি মূল্যহীন ও নিষ্প্রয়োজন রূপে বিবেচিত হত। তাঁদের মতে নির্বাণ যদি শূন্যতাই হয় তবে তার আর আবশ্যকতা কি? সুখ-দুঃখ ধর্মাধর্মের অতীত, জ্ঞানবুদ্ধির অগম্য, 'শূন্য' হওয়া কি প্রয়োজন? নির্বাণকে তাঁরা মানতে প্রস্তুত নন। তাঁদের মহাসুখই সারবস্তু। এদের শূন্যতা দেবী, সাধক ভৈরব। সাধক আর সাধিকা দুই-এ জলেলবণে মিশে অনন্তকাল মহাসুখের অধিকারী হবেন-ইহাই সহজধর্ম। বৌদ্ধদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্য ছিল না। মহাযানীরা অন্য কোন যানকে শ্রদ্ধা করতেন না, প্রত্যেক যানই স্ব-স্ব-উন্নতির ও স্বার্থের বিষয়ে ব্যস্ত থাকত। শ্রীফলবজ্র লুই সিদ্ধার উপর আবার লুই সিদ্ধা নাড় পণ্ডিতেরা অসন্তুষ্ট ছিলেন। অবশ্য উপন্যাসে রূপারাজার বিরুদ্ধে ব্রাহ্মণ জাগরণে সকল বৌদ্ধই মনের বিষ চেপে রেখে সহজিয়া বৌদ্ধ উপাসক রূপারাজার পক্ষ অবলম্বন করলেন। 'বেণের মেয়ে' উপন্যাসে খৃঃ দশম-দ্বাদশ শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ে উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ বিহার সঙ্ঘারামের পরিণতির চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে।

বাংলাদেশে বৌদ্ধ মননচিন্তার পুষ্টি ও ঋদ্ধির পটভূমিকায় হরপ্রসাদের এই শ্রেষ্ঠতম উপন্যাসের বিকাশ ঘটেছে। অষ্টম-দশম শতাব্দীর বৌদ্ধ বাঙ্গালীর জীবনালোক পুরাতাত্ত্বিক হরপ্রসাদকে আকর্ষণ করেছিল এতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার মাটির স্বাদ মেশানো এক আশ্চর্য ভাষায় লেখা হয়েছে বেণের মেয়ে। সেকালের জীবনপ্রবাহের অতলস্পর্শতায় অবগাহন করে, এই যুগের অনুসন্ধিৎসুদের দাবীকে লেখক চরিতার্থ করেছেন এবং ইতিহাসপ্রজ্ঞা ও বৈজ্ঞানিক বিচারবুদ্ধি যুক্ত করে উপন্যাসটিকে স্বকীয়তা দান করেছেন শাস্ত্রী মহাশয়।

সব্যসাচী হরপ্রসাদ সংগ্রহ ও গবেষণা দুই কার্যেই সমান সিদ্ধকাম পুরুষ। শাস্ত্রী মহাশয় নেপাল দরবারের পুঁথিশালা হতে হাজার বছরের প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের নিদর্শন আবিষ্কার করে ১৯১৬[১৩] খৃঃ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ হতে 'বৌদ্ধগান ও দোহা' নামে প্রকাশ করেন। এই কাজ দ্বারা বাংলা সাহিত্যের ঊষালগ্নে বাঙালীর সাহিত্যমানসও বৌদ্ধ চিন্তাধারা দ্বারা প্রভাবিত ছিল তাও নিঃসংশয়ে প্রমাণিত হয়। তিনি রাজেন্দ্রলাল মিত্রকে তাঁর নেপালী বৌদ্ধ-সংস্কৃত সাহিত্য প্রণয়নেও সাহায্য করেছিলেন[১৪]। বৌদ্ধবিদ্যা বিষয়ে তাঁর জীবনের

প্রথম প্রবন্ধ 'ব্রাহ্মণ ও শ্রমণ' তিনি বঙ্গদর্শনেই (শ্রাবণ ১২৮৪ বঙ্গাব্দে) লেখেন[১৫]। এই প্রবন্ধের আলোচনায় লেখকের দ্বন্দ্বের নিষ্পত্তির মানসপ্রবণতা ফুটে উঠেছে। তাঁর মতে ধর্মপ্রচারে বৌদ্ধদের অবলম্বিত পন্থা: উৎসব, ভক্তি, শাস্ত্র, ব্রাহ্মণদের পুরাণ প্রচার, বিদেশে কার্যক্ষম প্রচারক দল প্রেরণ, আর্থিক সম্প্রদায় এবং আভ্যন্তরীণ কলহ ইত্যাদি কারণে ব্রাহ্মণদের কাছে বৌদ্ধগণ পরাজিত হয়েছিলেন। শঙ্করাচার্যের আবির্ভাব এই পরাজয়কে সম্পূর্ণ করে দিয়েছে।

'বৌদ্ধধর্মের অধঃপাত' প্রবন্ধে লেখেন—'এক-একবার মনে হয় তিন-চারি শত বৎসর ধরিয়া বৌদ্ধেরা ইন্দ্রিয়াসক্ত, কুকর্মান্বিত ও ভূতপ্রেতের উপাসক হইয়া যে নিজেও অধঃপাতে গিয়াছিল এবং দেশটাকে শুদ্ধ অধঃপাতে দিয়াছিল, মুসলমানদের আক্রমণ তাহারই প্রায়শ্চিত্ত, বিধাতা যেন তাহাদের পাপের ভার সহ্য করিতে না পারিয়া তাহাদিগকে সমূলে উচ্ছেদ করিবার জন্য মুসলমানদের এদেশে পাঠাইয়াছিলেন।... পরিণামে তাহাদিগকে বঙ্গদেশ চিরকালের জন্য ছাড়িতে হইল[১৬]।'

'কুশীনগর' প্রবন্ধে শাক্যসিংহের মহাপরিনির্বাণ স্মৃতিবিজড়িত কুশীনগরের সন্ধান, আবিষ্কার ও সংরক্ষণের তথ্য পরিবেশিত হয়েছে। লেখক গল্পচ্ছলে ইতিহাসের সাথে পরিচিত করে দিয়েছেন। অনেক ঐতিহাসিক স্থানের নামও উল্লেখ করেছেন। 'পাষাণের কথায়', প্রত্নতাত্ত্বিক হরপ্রসাদ বৌদ্ধ স্তুপের পাথরের কথা উপলব্ধি করার জন্য আহ্বান জানিয়েছেন। 'বঙ্গে বৌদ্ধ ধর্ম,' বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মের উৎপত্তি, প্রসার ও পরিণতির পরিচয়বাহী প্রবন্ধ। বৌদ্ধ বাংলার অধিবাসী, নগর, দেবদেবী এবং বাংলায় বৌদ্ধধর্মের শেষ পরিণাম ধর্ম ঠাকুরের পূজা সহজবোধ্য ভাষায় আলোচনা করেছেন। হরপ্রসাদের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল, 'বাংলা দেশ প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ[১৭]। ১৮৯৭ সালে লেখা 'ডিস্কভারি অফ লিভিং বুদ্ধিজম ইন বেঙ্গল' প্রবন্ধে সিদ্ধান্ত করেন, ধর্মঠাকুরের পূজাই বৌদ্ধ ধর্মের শেষ। বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রচুর তথ্য পরিবেশন করে লেখক ধর্মঠাকুরকে বুদ্ধের আসনে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছেন।

'হিন্দু ও বৌদ্ধে তফাৎ' (১৩৩৯ বঙ্গাব্দ) প্রবন্ধে হরপ্রসাদ হিন্দু ও বৌদ্ধ জীবনাচরণ, ভাবনাচিন্তায় তফাৎ ঠিক কোথায় তা বিশদভাবে আলোচনা করেছেন। ধর্মকর্ম-আচার-আচরণ-রাজনীতি-সমাজ-শাসন-দার্শনিকমত এসব তুলনা করে শেষে পৌঁছেছেন প্রতিদিনের কৃত্যের-ক্ষৌরকার্য, বিছানা, পোশাক, মুখ ধোওয়া, কাপড় কাচা ও তেলমাখা এবং দশবিধ সংস্কারের তুলনায়। শুধু পুঁথিপড়া বিদ্যায় এমন একটা সজীব জীবনচিত্র ফোটানো যায় না। মানুষের মধ্যে যেতে হয়। নজর করে দেখতে হয় প্রতিদিনের জীবনযাপনে মানুষ কেমন ভাবে নিজস্ব জীবনবোধ, ধ্যানধারণা প্রকাশ করে ঐতিহ্যের কোন বুনিয়াদে প্রতিষ্ঠা পেয়ে এক একটি জনপদের মানুষ বিশিষ্ট সংস্কৃতি নির্মাণ করে। এ গবেষণায় জীবনে জীবন যোগ করার দায় থাকে। 'বুদ্ধদেব কোন ভাষায় বক্তৃতা করিতেন' প্রবন্ধটি প্রাচীন ভারতীয় ভাষার প্রথম সার্থক গবেষণাপূর্ণ আলোচনা। এটি লেখকের সংস্কৃত, প্রাকৃত ও পালি ভাষার ইতিহাস-

এ অসমান্য বৈদগ্ধ্যের নিদর্শন। এই প্রবন্ধসমূহ ছাড়া শাস্ত্রী মহাশয়, "বৌদ্ধ ধর্ম[১৮]" নামে (১৩৪৪ বঙ্গাব্দ) একটি নাতিবৃহৎ গ্রন্থ প্রণয়ন করেন।

দর্শনের অনেক কূট প্রশ্নও হরপ্রসাদ অত্যন্ত সহজ ও সাবলীল ভাষায় আলোচনা করেছেন। সমস্ত বিষয়টিকে তিনি উপস্থাপন করেছেন সামাজিক ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে। বিশেষ করে মহাযানী বৌদ্ধধর্মের পটভূমিকায় 'বৌদ্ধধর্ম' গ্রন্থ রচিত। উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের প্রাধান্য বিষয়ে হরপ্রসাদ কোনো গোঁড়ামির পরিচয় দেননি। স্পষ্টই বলেছেন-ভৌগোলিক ভাবে দক্ষিণী ও উদীচ্য বৌদ্ধধর্মের কোনো অবিমিশ্র স্বাতন্ত্র্য ছিল না। মহাযান বৌদ্ধধর্মের দার্শনিক ভিত্তি রচনা করে দিয়েছিলেন দুজন দক্ষিণেরই মনীষী-নাগার্জুন এবং আর্যদেব। বহুকাল ধরে বহু দেশ জুড়ে যেসব ধ্যানধারণা প্রভাব বিস্তার করে চলে তার বিভিন্ন শাখার মধ্যে পারস্পরিক প্রভাব অনিবার্য। বৌদ্ধধর্মের শাখা-প্রশাখার মধ্যে এমন মেলামেশা চলে এসেছে। হীনযানের মধ্যে ১৮টি ভিন্ন ভিন্ন মত ছিল। মহাসাংঘিকদের প্রভাব যে দক্ষিণ ভারতেও ছিল, কার্লো ও অমরাবতীর প্রত্ননিদর্শন থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যায়। মহাসাংঘিকদের ভেতর থেকেই বুদ্ধকে দেবতারূপে পুজোর প্রচলন হয়! ঐতিহাসিক মানুষ বুদ্ধ দেবতার মর্যাদায় উন্নীত হলেন। তাঁকে নিয়ে বহু অলৌকিক আখ্যান রচিত হল। তাঁর জন্মজন্মান্তরবাহিত অবতারত্ব কল্পনা করে জাতক-কাহিনী রচিত হল। মহাবস্তু অবদান-এর মতো বুদ্ধপুরাণ সৃষ্টি হল। বুদ্ধিমার্গে নির্বাণসাধনার তত্ত্ব রূপান্তরিত হয়ে গেল: ব্যক্তিগত নির্বাণ নয়, লোক সাধারণের প্রতি করুণা ও মৈত্রীর তত্ত্ব বড় হয়ে উঠল। হীনযানের কঠোর আচরণ-বিধি, বুদ্ধিমার্গে সাধনার জায়গায় ভক্তিবাদ এল বৌদ্ধধর্মে এবং এই ভক্তির ধারায় বৌদ্ধধর্ম ব্যাপক জনসাধারণের মধ্যে ছড়িয়ে গেল। মহাযানে তেমনি অনেক স্থানীয় ধর্মাচার প্রবেশ করে। এরই ফলে সহজযান এবং সহজযানের নানা শাখার উৎপত্তি হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মের ভিত্তিস্বরূপ দার্শনিক তত্ত্ব ক্রমে লোপ পেয়ে আসে[১৯]।

' বৌদ্ধ ধর্ম কোথা হতে আসিল', বৌদ্ধধর্ম কোথায় গেল', 'এখনও একটু আছে উড়িষ্যার জঙ্গলে' প্রবন্ধ সমূহে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব সম্বন্ধে প্রচলিত মত এবং বুদ্ধের উপর য়ুরোপিয়জাতির প্রভাব সম্পর্কীয় মতকে তিনি যুক্তির দ্বারা খন্ডন করে নিজ মত প্রতিষ্ঠা করেছেন। বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিণতি-ইন্দ্রিয়াসক্তি, দেবতা, যক্ষরক্ষ পূজা, ভূত-প্রেত উপাসনা, অশ্লীল ও যথেচ্ছাচার প্রধান ক্রিয়াকর্ম ইত্যাদি পরিণাম রূপে আলোচনা করেছেন[২০]।'

বিভিন্ন ইংরেজী পত্রপত্রিকায় বৌদ্ধ বিদ্যা সম্পর্কে হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর লেখা প্রকাশিত হয়েছে। এই সব প্রবন্ধের মধ্যে নিম্নলিখিতগুলো বিশেষ উল্লেখযোগ্য:

1. The Northem Buddhism (The Indian Historical Quarterly, 1925.)
2. The Buddhist in Bengal (the Dacca Review, 1921)
3. Discovery of the Remnance of Buddhism in Bengal (Proceedings of the Asiatic Society of Bengal, 1894)

4. Buddhism in Bengal since the Mohammedan Conquest (Journal of the Asiatic Society of Bengal, 1895)

5. English Translatien of Bhaktisatak with Sanskrit Text (The Journal of the Buddhist Text Society)

হরপ্রসাদ বৌদ্ধবিদ্যা ছাড়াও ইতিহাস চর্চায় পারঙ্গম ছিলেন। এর মধ্যে জাতিভেদ প্রবন্ধটি উল্লেখযোগ্য। রাজেন্দ্রলাল মিত্রের হাত ধরে এশিয়াটিক সোসাইটিতে প্রবেশের আগে থেকেই লিপিতত্ত্ব, পুরাতত্ত্ব, প্রাচীন ভূগোল এসব বিষয় নিয়ে কাজ শুরু করেছিলেন। ক্রমে হরপ্রসাদ প্রত্নবিদ্যা লিপিবিদ্যার চর্চায় নিজেকে নিয়োজিত করেছিলেন[২২]।

বৌদ্ধযুগের সার্থক বাণীবাহক হরপ্রসাদের ধ্যানপূত জীবনে বৌদ্ধ ভারত ও বাংলার শিক্ষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সূর্যালোক প্রতিভাত হয়েছে। সেই দীপ্যমান আলোক শিখায়, ঊনবিংশ শতাব্দীর বাঙালী বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি সম্পর্কে সর্বপ্রথম সম্যক্ জ্ঞান লাভ করতে সমর্থ হয়েছে। Buddhist Text and Research Society-র সম্পাদকরূপে ১৮৯৫ খৃঃ তিনি প্রাচীন বৌদ্ধযুগের ঐতিহ্যের গবেষণায়ও সহায়তা করেছিলেন[২৩]।' বাংলার সামাজিক ইতিহাস নিয়ে কোনো কাজ করতে গেলে হরপ্রসাদের রচনার সাহায্য নিতেই হয়। বিশেষত তিনি যে পদ্ধতিতে মানুষের দৈনন্দিন জীবন যাপনের, নিত্যকর্ম পদ্ধতির খুঁটিনাটি বিশ্লেষণ করেন, জীবনের ও সমাজের বাস্তবতা বুঝবার সেই পদ্ধতি সমাজবিদ্যার চর্চায় একটা অনুসরণযোগ্য ও শিক্ষণীয় 'আদর্শ' হয়ে আছে। পরিশেষে বলা যায়, শাস্ত্রী মহাশয় বৌদ্ধবিদ্যা ও ঐতিহাসিক উপন্যাস সৃষ্টির এক সার্থক সব্যসাচী পুরুষ।

তথ্যসূত্র ঃ

১. দাশ, আশা-বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতি ১৯৬৯ পৃ. ৪২৫।

২. অনু-দাস শরচ্চন্দ্র-বোধিসত্ত্বাদারন কল্পলতা (৩য় খণ্ড) কুণালাবদান পৃ.৫১৭ ড. দাশ, আশা বাংলাসাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ১৯৬৯।

৩. সম্পাদিত চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার হরপ্রসাদ রচনাবলী ২য় সম্ভার, পৃ. ৩০৭।

৪. চট্টোপাধ্যায়, সুনীতি কুমার-রচনা সম্ভার ২য় কাঞ্চনমালা, মুখবন্ধ পৃ.৩০০।

৫. ঐ পৃ. ২৯৬।

৬. চৌধুরী, সত্যজিৎ-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী পৃ. ৪৭।

৭. চৌধুরী, সত্যজিৎ ও সরকার বিজলী-নির্বাচিত হরপ্রসাদ সাহিত্য ও সংস্কৃতি চিন্তা ভূমিকা পৃ. ১৯।

৮. চৌধুরী, সত্যজিৎ, ও সেনগুপ্ত নিখিলেশ্বর-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী রচনাসংগ্রহ, ১, ১৯৮৯।

৯. হরপ্রসাদ গ্রন্থাবলী, বসুমতী ১৯১৯, মুখপত্র।

১০. চৌধুরী, সত্যজিৎ-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ. ৫১।

১১. চৌধুরী, সত্যজিৎ-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, পৃ. ৫৪-৫২।

১২. মজুমদার, অতীন্দ্র-চর্যাপদ, চর্যা-১, পৃ. ৯৭।

১৩. সেনগুপ্ত, সুবোধ চন্দ্র, বসু অঞ্জলি-সংসদ বাঙালী চরিতাভিধান সাহিত্য সংসদ, পৃ. ৬১২-১৩।

১৪. The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal, 1882, Introduction P, XIII ।

১৫. চৌধুরী, সত্যজিৎ-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-পৃ. ৮৪

১৬. প্রাগুক্ত-রচনা সংগ্রহ ৩, পৃ. ৩৮১-৮২।

১৭. ডঃ দাশ, আশা-বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ১৯৬৯ পৃ. ২১৫ বিষয় -বৌদ্ধধর্ম, করুণা প্রকাশনী, ২০০২।

১৮. রচনা সংগ্রহ-৩, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ। ডঃ দাশ, আশা-বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম, সংস্কৃতি, ১৯৬৯, পৃ. ২৯৫।

১৯. চৌধুরী, সত্যজিৎ-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

২০. ডঃ দাশ, আশা-বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, ১৯৬৯।

২১. চৌধুরী, সত্যজিৎ-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-নির্বাচিত রচনাপঞ্জী।

২২. চৌধুরী, সত্যজিৎ-হরপ্রসাদ শাস্ত্রী-নির্বাচিত রচনাপঞ্জী।

২৩. দে, সুশীল-নানা নিবন্ধ, পৃ. ৩০১, ডঃ দাশ, আশা-বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, পৃ. ২৯৭।

বাংলার চিত্রকলায় বুদ্ধ

কমল সরকার*

সুপ্রাচীন কাল থেকে ভারতশিল্পের প্রধান বিষয় বুদ্ধের জীবন কাহিনী। মথুরা, গান্ধার ও সারনাথের মূর্তিকলার বিষয় বোধিসত্ত্বের রূপকল্প। অমরাবতীর অনুপম ভাস্কর্যকলায় নান্দনিক ছন্দে উৎকীর্ণ করা হয়েছে জাতক ও বুদ্ধ কাহিনী। ভারহূত ও সাঁচীস্তূপের প্রাচীরে খোদিত প্রতীকী শিলাচিত্রগুলিও বুদ্ধের মহানুভবতা প্রচারের প্রাচীন নিদর্শন। অজন্তা ও বাগ এর ভাস্কর্য ও চিত্রকলায়ও বুদ্ধের রূপারোপের সেই একই প্রতিচ্ছবি।

ভারতশিল্পের ধ্রুপদী ঐতিহ্যের ওই ধারা আজ অবশ্য বিলুপ্ত। সময়ের পালাবদলের সঙ্গে সঙ্গে রূপদক্ষ সে রূপকারেরাও আজ অন্তর্হিত। কিন্তু বুদ্ধের মহাজীবনকে অবলম্বন করে অব্যাহত আছে সৃজনশীল রূপকল্পের ধারা আজও। প্রাচীন শৈলী ও রীতিনীতির সঙ্গে একালের শিল্পরচনার প্রভেদ যে বিস্তর সেকথা সকলেরই জানা। তা সত্ত্বেও অস্বীকারের উপায় নেই যে প্রাচীনকালের মত এখনও বুদ্ধের ত্যাগ, তিতিক্ষা, করুণা আর মৈত্রীর শাশ্বত আবেদনে-অনুপ্রাণিত হয়ে একালের শিল্পীরাও তাঁর নানা রূপ রচনা করেছেন।

আধুনিক বাংলার চিত্রকলায় বুদ্ধদেবের রূপারোপের এক উল্লেখযোগ্য নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া যায় 'ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও'র লিথোগ্রাফে। বলা নিষ্প্রয়োজন, শতাধিক বছরের পুরনো বুদ্ধদেবের এ চিত্রটি এখন দুষ্প্রাপ্য।

স্বনামধন্য শিল্পী অন্নদাপ্রসাদ বাগচি চারজন সহযোগী শিল্পীকে নিয়ে উনিশ শতকে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও (১৮৭৮)। নবকুমার বিশ্বাস, ফণিভূষণ সেন, কৃষ্ণচন্দ্র পাল এবং যোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় ওই চার সহযোগী শিল্পী। চিত্রশালাটি প্রতিষ্ঠার দু'বছর পরে কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে প্রধান শিক্ষকের চাকরি পাওয়ায় অন্নদাপ্রসাদ আর্ট স্টুডিওর স্বত্ব তুলে দেন তাঁর চার সহযোগীর হাতে।

ক্যালকাটা আর্ট স্টুডিও থেকে উনিশ শতকে প্রকাশিত হয়েছিল নানা লিথো চিত্র। মুখ্যত হিন্দু দেবদেবীর রূপারোপই ছিল আর্ট স্টুডিও প্রকাশিত লিথোচিত্রগুলির বিষয়। সেযুগে প্রভূত জনপ্রিয়ও হয়েছিল আর্ট স্টুডিওর পৌরাণিক চিত্রগুলি। আর্টস্টুডিও থেকে যে চিত্রমালা প্রকাশিত হয় তারই অন্তর্ভুক্ত ছিল বুদ্ধের আলোচ্য ছবিটি।

আর্ট স্টুডিও প্রচারিত চিত্রে বিল্বদল পদ্মের আসনে ধ্যানীর ভঙ্গিমায় আঁকা হয়েছে

---

* শিল্পকলা বিষয়ে বিশেষজ্ঞ লেখক। জগজ্জ্যোতি ১৯৯৫ সংখ্যা থেকে পুনর্মুদ্রিত।

তথাগতকে। যোগাসনে সমাসীন তাঁর চোখ দুটি অর্ধ উন্মীলিত। ডান হাতে তাঁর অভয়ের চিরন্তন প্রতিশ্রুতি। মাথায় চূড়াকৃতির জটা গুপ্তযুগের বুদ্ধমূর্তির কথা স্মরণ করায়। অঙ্গে তাঁর গৈরিক বর্ণের চীবর। চিত্রের পশ্চাৎ দেশের সমতা রক্ষার জন্যে আঁকা হয়েছে ত্রিপত্রাকৃতির পাথরের খিলান।

এ শতকে বুদ্ধ ও তাঁর অনুগামী ভিক্ষু ও পরিব্রাজকের রূপারোপে আকৃষ্ট হন যে শিল্পীরা তাঁদের অগ্রদূত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর। কৃষ্ণ, বুদ্ধ, যীশু ও চৈতন্যের নানা রূপকল্প তাঁর চিত্রকলার সম্পদ। তাঁর বুদ্ধ শ্রদ্ধার্ঘের শ্রেষ্ঠ নিবেদন 'বুদ্ধ ও সুজাতা'। 'অশোক মহিষী তিষ্যরক্ষিতা ও বোধিবৃক্ষ' নামে পরিচিত অবনীন্দ্রনাথের একটি চিত্র সংগ্রহ করেছিলেন পঞ্চম জর্জ-মহিষী রাণী মেরি। তিষ্যরক্ষিতার চিত্রটি তাঁকে উপহার দেন শিল্পী (১৯১১)।

পরিব্রাজক ভিক্ষু হিউয়েন সাঙ-এরও রূপকল্প আছে অবনীন্দ্রনাথের চিত্রকলায়। বেশ কয়েক বছরের ব্যবধানে পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ-এর দুটি চিত্র তিনি আঁকেন।

অবনীন্দ্র যুগের অন্যতম খ্যাতকীর্তি শিল্পী যামিনীপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়। বয়সে অবনীন্দ্রনাথের পাঁচ বছরের ছোট যামিনীপ্রকাশ অবনীন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পুত্র। জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়িতেই তাঁর জন্ম হয়। একই ইংরেজ শিল্পী-শিক্ষকের কাছে তাঁর ও অবনীন্দ্রনাথের চিত্রাঙ্কন অনুশীলন শুরু হলেও ওঁদের চিত্রাঙ্কনী রীতিনীতির ধারা ছিল সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। যামিনীপ্রকাশের চিত্রগুলি মূলত তেলরঙের। ইউরোপীয় কলাকশৌলের প্রতি তন্নিষ্ঠ হয়ে যামিনীপ্রকাশ বিশালাকার পটে পাহাড়, পাহাড়ী নদী, পদ্মা, সূর্যোদয় অথবা সূর্যাস্তের সঙ্গে বহু বিশিষ্ট মানুষের চিত্রও অঙ্কন করেন।

আবার বুদ্ধের জীবন অবলম্বনেও এঁকেছিলেন তিনি একাধিক চিত্র। তেলরঙের আঁকা তাঁর বুদ্ধচিত্রের এক অনন্য নিদর্শন দ্বারভাঙ্গা পুরস্কার-এ সম্মানিত হয়েছিল দার্জিলিং ফাইন আর্টস একজিবিশানে (১৯০৬)। তাঁর তপস্যারত 'বুদ্ধ'-র ওই চিত্রটি ছাপাও হয়েছিল সে যুগের পত্র পত্রিকায়।

পরবর্তী সময়ে সিদ্ধার্থের বৈরাগ্যের দৃশ্যও তুলে ধরেন তিনি বৃহৎ এক পটে। 'রিনানসেয়িশান অব সিদ্ধার্থ' নামে পরিচিত চিত্রে দেখা যাবে প্রায়-নির্বাপিত এক চিতার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন শাক্যসিংহ। নশ্বর মানুষের পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যাওয়া প্রত্যক্ষ করার পর তাঁর মনে যে বৈরাগ্য দেখা দেয় সেটিই তুলে ধরেছেন শিল্পী ওই চিত্রে। শাক্যসিংহের পাশে দাঁড়ানো সারথি সঙ্গী ছন্দক বিচলিত হয়ে সিদ্ধার্থের ভাবান্তর লক্ষ্য করছেন।

'রিনানসিয়েশান অব সিদ্ধার্থ' দেখে মুগ্ধ হয়েছিলেন নাটোরের মহারাজা জগদীন্দ্রনাথ রায়। প্রদর্শনী থেকে চিত্রটি কিনে নিয়ে রেখেছিলেন তিনি তাঁর ল্যান্সডাউন রোডের বাড়িতে।

অবনীন্দ্রনাথ ও যামিনীপ্রকাশের সমকালীন শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদ বর্মা। 'পাটনা পেন্টার' গোষ্ঠীর শিল্পী ঈশ্বরীপ্রসাদকে কলকাতার সরকারী আর্ট স্কুলে শিক্ষকের চাকরি করে দেন

অবনীন্দ্রনাথ। নন্দলাল বসু, সুরেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলী, অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত ও ক্ষিতীন্দ্রনাথ মজুমদারের তিনি শিক্ষক।

চিত্রকলার বিভিন্ন শাখায় অবাধ যাতায়াত ছিল ঈশ্বরীপ্রসাদের। সিল্কের কাপড় আর হাতির দাঁতের পাতের ওপর চিত্রাঙ্কনে তাঁর মুনশীয়ানা ছিল অসামান্য। আবার লিথোগ্রাফিতেও ছিলেন কুশলী। ঈশ্বরীপ্রসাদের সিল্কের ওপর আঁকা 'বুদ্ধ ইন মেডিটেশন' এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। 'বুদ্ধ অ্যান্ড দি ডটার অব মার' নামেও তাঁর আরও একটি চিত্রের কথা মনে পড়ে এ পটভূমিকায়।

স্বামী বিবেকানন্দের বাল্যবন্ধু প্রিয়নাথ সিংহের নামও এ প্রসঙ্গে স্মর্তব্য। 'বুদ্ধ ও দেবদত্ত' এবং 'বুদ্ধ ও সুজাতা' নামে আঁকা তাঁর দুটি চিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। অগ্রজপ্রতিম প্রিয়নাথ সিংহই নন্দলাল বসুকে প্রাচীন বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দেন।

বুদ্ধবিষয়ক চিত্রাঙ্কনের অন্যতম কৃতী শিল্পী নন্দলাল বসু। প্রথম জীবনে অবনীন্দ্রনাথের 'বুদ্ধ ও সুজাতা' এবং 'বজ্রমুকুট' চিত্র দুটি দেখে মনে মনে গুরু রূপে বরণ করেছিলেন তিনি অবনীন্দ্রনাথকে।

পরে প্রিয়নাথ সিংহের সঙ্গে নন্দলাল পরিভ্রমণ করেন উত্তর ভারত। সে সময়ে নালন্দা, সারনাথ, রাজগৃহ, বুদ্ধগয়া, পাটলিপুত্র ও মথুরা ভ্রমণ করেন। বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্যকলার প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা হয় তাঁর ওই সময়ে। বৌদ্ধ শিল্প ও সংস্কৃতির এই অভিজ্ঞতাই তাঁকে অনুপ্রাণিত করেছিল গৌতম বুদ্ধের বিবিধ রূপরচনায়।

পরে ভগিনী নিবেদিতার নির্দেশে গিয়েছিলেন তিনি অজন্তায়। ইংরেজ শিল্পী সি জে হেরিংহ্যামের সহযোগী হয়ে তিনি ও অসিতকুমার হালদার, সমরেন্দ্রনাথ গুপ্ত, কে ভেংকটাপ্পা, সৈয়দ আহমেদ ও ফজলউদ্দিন কাজি অজন্তার গুহাচিত্র অনুলিপি করেন। নন্দলালের অনুলিপি করা অজন্তার দেয়ালচিত্রের কয়েকটি নিদর্শন সংগৃহীত আছে কলকাতা ও বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ে। লণ্ডনের ইণ্ডিয়া সোসাইটি প্রকাশিত 'অজন্তা ফ্রেসকোস' গ্রন্থেও সংকলিত হয় নন্দলালের অনুলিপির নিদর্শন।

অজন্তার অনুলিপি পর্বের পরে বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের সহযাত্রী হয়ে চীনেও গিয়েছিলেন নন্দলাল(১৯২৪)।ওঁদের সঙ্গে ছিলেন লেনার্ড এলমহার্স্ট, ক্ষিতিমোহন সেন ও ডঃ কালিদাস নাগ।

চীন ভ্রমণের সময় চীনসম্রাট ও তাঁর দুই মহিষীকে কবি উপহার দেন তাঁর কয়েকটি গ্রন্থ ও শাঁখা। নন্দলাল দিয়েছিলেন তাঁর কয়েকটি ছবি। প্রীতি উপহার হিসেবে প্রতিদানে চীনসম্রাট কবিকে দেন একটি দুর্লভ বুদ্ধমূর্তি ও একটি চীনদেশীয় চিত্র।

চীন ভ্রমণের সময় হ্যাংচৌ-এর প্রাচীন বৌদ্ধমন্দির ও পুরাকীর্তিও দেখতে গিয়েছিলেন নন্দলাল। ওই সময়েই 'ঘাইমাসু' অর্থাৎ হোয়াইট হর্স মনাস্ট্রি-ও দেখে আসেন নন্দলাল ও তাঁর সহযাত্রীরা। প্রায় দুহাজার বছর আগে এখান থেকেই বুদ্ধের বাণী প্রথম প্রচার করা হয়েছিল।

নন্দলালের বুদ্ধচিত্রের সঠিক সংখ্যা অনির্ণীত হলেও নিঃসন্দেহে বলা চলে বুদ্ধের জীবনাদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে এঁকেও ছিলেন তিনি নানা চিত্র। তাঁর 'বুদ্ধ ও মেষশাবক' নামক চিত্রের চারটি সংস্করণের কথা জানা যায়। বুদ্ধ ও মেষশাবকের একটি অনুপম নিদর্শন রক্ষিত আছে বেলুড় মঠে।

যশোধরা ও রাহুল, বুদ্ধের অসুস্থ শ্রমণের সেবা, আনন্দ ও প্রকৃতি এবং সঙ্ঘমিত্রা নন্দলালের বুদ্ধ শ্রদ্ধার্ঘ্যের স্মরণীয় নিবেদন। এছাড়া টেম্পেরার মাধ্যমে এক চিত্রমালায় বুদ্ধের জন্ম, গৃহত্যাগ, বুদ্ধ ও সুজাতা, বুদ্ধ ও আম্রপালী এবং মহাপরিনির্বাণের রূপও রচনা করেন নন্দলাল।

বোলপুরের ব্রহ্মচর্যাশ্রমের ছাত্র মুকুল দে বৌদ্ধ শিল্পকলার প্রত্যক্ষ অনুশীলন করেন অজন্তা ও বাগ গুহায়। স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে একা অজন্তার দেয়ালচিত্র অনুলিপি করতে গিয়ে হঠাৎ সেখানে আবিষ্কার করেন জাপানি শিল্পী কাম্পো আরাই-কে। মুকুল দের আগে থেকে কাম্পো আরাই ও তাঁর সহযোগী জাপানি শিল্পীরা অজন্তার চিত্র অনুলিপি করছিলেন তখন।

নিজের অনুলিপি করা অজন্তার চিত্র বিক্রি করে মুকুল দে সংগ্রহ করেছিলেন ইংল্যান্ড যাবার পাথেয়। অজন্তা আর বাগ গুহা ভ্রমণের অভিজ্ঞতা নিয়ে তিনি লিখেছিলেন 'মাই পিলগ্রিমেজেস টু অজন্তা অ্যান্ড বাগ' (লন্ডন, ১৯২৫)।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথের আমন্ত্রণে জোড়াসাঁকোর বিচিত্রা-য় চারুকলার শিক্ষক হয়ে এসেছিলেন কাম্পো আরাই। ওই সময়ে সহযোগী সেনত্যারো সোয়মুরা ও আরও কয়েকজন জাপানি বৌদ্ধের সঙ্গে অজন্তা ও সিংহল ভ্রমণ করেন কাম্পো। বৌদ্ধ শিল্পকলা ও তীর্থস্থানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অর্জনের উদ্দেশ্যেই কাম্পো আরাই-এর ওই ভ্রমণ।

বাংলার বাইরে প্রবাসীর জীবনযাপন করে খ্যাতিমান হন শিল্পী সারদাচরণ উকিল। সমকালীন শিল্পকলার ইতিহাসে তাঁর যে খ্যাতি তা তিনি পেয়েছিলেন দিল্লিতে বসে। শিল্পকলার স্বনামধন্য পৃষ্ঠপোষক বরদাচরণ ও শিল্পী রণদাচরণ উকিল তাঁরই দুই কনিষ্ঠ সহোদর।

হায়দ্রাবাদ সালার জং মিউজিয়াম, মহীশূরের জগমোহন প্যালেস চিত্রমালা, কলকাতার অ্যাকাডেমি অব ফাইন আর্টস, ত্রিবান্দ্রমের শ্রীচিত্রালয়ম আর্ট গ্যালারি, দিল্লির আইফ্যাক্স আর ন্যাশনাল গ্যালারি অব মর্ডান আর্টে সংগৃহীত আছে তাঁর চিত্রকলার নিদর্শন।

সারদাচরণের চিত্রকলায়ও আছে গৌতম বুদ্ধের রূপারোপ। বুদ্ধদেবের 'মহাপরিনির্বাণ' তাঁর স্মরণীয় কীর্তি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, সিদ্ধার্থের চিত্রাঙ্কনই শুধু নয়, তাঁর পিতা শুদ্ধোদনের রূপারোপও তিনি করেন। স্যার এডুইন আরনল্ড রচিত 'দি লাইট অব এশিয়া' অবলম্বনে গৃহীত ওই একই নামের চলচ্চিত্রেও অভিনয় করেছিলেন সারদাচরণ উকিল। 'দি লাইট অব এশিয়া' চলচ্চিত্রে কপিলাবস্তুর রাজা শুদ্ধোদনের ভূমিকায় অবতীর্ণ হন তিনি (১৯২৫)। মাত্র পঞ্চাশ বছর বয়সে দিল্লিতে সারদাচরণ পরলোক গমন (১৯৪০) করেন।

নন্দলাল বসুর কৃতী ছাত্রদের অন্যতম ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা। আবাল্য যোগ তাঁর বিশ্বকবি

ও শান্তিনিকেতনের সঙ্গে। বিশ্বভারতীর কলাভবনে চারুকলা অনুশীলনের পর ইংল্যান্ডের 'ইন্ডিয়া হাউস'-এ দেয়ালচিত্র অঙ্কনের জন্যে ভারত সরকার তাঁকে মনোনীত করেন। প্রাক স্বাধীনতা যুগে ললিতমোহন সেন, রণদাচরণ উকিল ও সুধাংশু চৌধুরীর সঙ্গে লন্ডনে গিয়ে তিনি 'ইন্ডিয়া হাউস'-এ দেয়ালচিত্র অঙ্কন করেন।

'ইন্ডিয়া হাউস'-এ ধীরেনকৃষ্ণ অঙ্কিত দেয়ালচিত্রের মধ্যে বৌদ্ধধর্ম প্রচার বিষয়ক একটি মনোজ্ঞ চিত্র আছে। ওই দেয়ালচিত্রটির নাম 'অশোককন্যা সঙ্ঘমিত্রা ও পুত্র মহেন্দ্রর বুদ্ধধর্ম প্রচারে সিংহল গমন'।

ধীরেনকৃষ্ণের সমসাময়িক ব্রহ্মচর্যাশ্রমের আর এক আশ্রমিক মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত। শিল্পী ও গ্রন্থকার মণীন্দ্রভূষণ প্রথম জীবনে কলম্বোর আনন্দ কলেজে কয়েক বছর চারুকলার অধ্যাপনা করেন। ফলে, সিংহলের বৌদ্ধশিল্প ও সংস্কৃতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ পরিচয়ের সুযোগও হয়েছিল তাঁর। বুদ্ধজীবন অবলম্বনে আঁকা তাঁর চিত্রগুলির অন্যতম 'নেটিভিটি অব লর্ড বুদ্ধ'।

একইভাবে, এঁদের মত বুদ্ধবিষয়ক চিত্রে মনোনিবেশ করেন প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়, পুলিনবিহারী দত্ত, বীরেশ্বর সেন, উপেন্দ্র মহারথী প্রমুখ কৃতী শিল্পীরা।

'গোপা ও সিদ্ধার্থ', 'বোধিসত্ত্ব' এবং 'অম্বপালী' প্রমোদকুমার চট্টোপাধ্যায়ের স্মরণীয় রচনা।

বোম্বাই প্রবাসী পুলিনবিহারী দত্তের 'ধ্যানী বুদ্ধ' এবং 'অশোক ও উপগুপ্ত' চিত্র দুটির নামও এ প্রসঙ্গে মনে পড়ে।

ইন্ডিয়ান সোসাইটি অব ওরিয়েন্টাল আর্টের ছাত্র বীরেশ্বর সেন ইংরেজির অধ্যাপনা ত্যাগ করে চারুকলা শিক্ষকের চাকরি নিয়েছিলেন লখনৌর সরকারি আর্ট স্কুলে। ছাত্রবয়সে আঁকা তাঁর যে প্রথম চিত্রটি প্রকাশিত হয়েছিল প্রবাসী পত্রিকায় সেটির নাম 'বোধিবৃক্ষতলে বুদ্ধ' (১৯১০)। পরবর্তী সময়ে অঙ্কিত তাঁর অপর চিত্রকল্পটির নাম 'বুদ্ধ ক্যারিইং দি ক্রিপলড গোট'।

উপেন্দ্র মহারথী ওড়িশার মানুষ। কিন্তু তাঁর চারুকলা অনুশীলন কলকাতার গভর্নমেন্ট আর্ট স্কুলে। অহিংসার অনুরাগী উপেন্দ্র গান্ধীজির প্রাণনাশের পরের দিন বৌদ্ধমতাদর্শকে জীবনের পরম মন্ত্ররূপে গ্রহণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে তিনি জাপানও ভ্রমণ করেন। জাপানে বৌদ্ধশাস্ত্র অনুশীলন ও বৌদ্ধভিক্ষুদের জীবনযাত্রা বৌদ্ধ শিল্পকলা সম্পর্কে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করেন। পাটনায় তাঁর গৃহ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মিলনস্থল ছিল। বুদ্ধের জীবন সম্পর্কিত প্রচুর ছোট বড় চিত্রাঙ্কনও করেন তিনি।

গৌতম বুদ্ধের উদ্দেশ্যে রচিত চিত্রের তালিকায় আছে আরও বহু শিল্পীর নাম। ওই শিল্পীদের প্রধান প্রতিনিধি পূর্ণচন্দ্র চক্রবর্তী। কৃষ্ণ, বুদ্ধ আর চৈতন্যের বহু মনোজ্ঞ চিত্র তিনি আঁকেন। 'বুদ্ধের প্রলোভন' এবং 'মার ও ভগবান বুদ্ধ' তাঁর প্রসিদ্ধ চিত্র। চিত্রাঙ্কনের সঙ্গে গ্রন্থকার রূপেও তিনি পরিচিত। বৌদ্ধ স্থাপত্য ও ভাস্কর্য এবং চিত্রকলাকে নিয়ে রচিত তাঁর উল্লেখ্য গ্রন্থটির নাম 'যুগে যুগে ভারত শিল্পী'। স্বরচিত ওই গ্রন্থটি পূর্ণচন্দ্রের স্বহস্তাঙ্কিত অজস্র চিত্রে সমৃদ্ধ।

পালি ত্রিপিটক ও বাংলায় তার অনুবাদ

বেলা ভট্টাচার্য*

বুদ্ধের আবির্ভাবের ২৫৫০ বৎসর পূর্ত্তি উপলক্ষ্যে যে নির্দ্ধারিত বিষয়টি লেখার দায়িত্ব আমার উপর পড়েছে তা হল পালি সাহিত্য। সিদ্ধার্থ গৌতম ঊনত্রিশ বছর বয়সে সমস্ত রাজৈশ্বর্য ভোগ বিলাস ত্যাগ করে সন্ন্যাস জীবন গ্রহণ করেন এবং বুদ্ধগয়ায় বোধিতরুমূলে দীর্ঘ দু'বছর তপস্যান্তে পরম সত্যজ্ঞান লাভ করে জগতের মানুষের দুঃখমুক্তির উপায় উদ্ভাবন করেন ও বোধিজ্ঞান লাভ করে বুদ্ধ নামে খ্যাত হলেন। তারপর দীর্ঘ ৪৫ বছর বিভিন্ন স্থানে ধর্ম প্রচার করেছেন।

সম্ভবতঃ বুদ্ধের জীবদ্দশায় ত্রিপিটকের কোন গ্রন্থ রচিত হয়নি। সিংহলী ঐতিহ্য অনুসারে বৌদ্ধশাস্ত্র প্রথম লেখা হয়েছিল পালি ভাষায় আর সমগ্র পালি বৌদ্ধশাস্ত্র বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় থেকে অশোকের সময় পর্যন্ত এই তিনশ বছরের মধ্যেই রচিত হয়েছিল।

সমন্ত-পাসাদিকা, সুমঙ্গল-বিলাসিনী, অত্থসালিনী প্রভৃতি বুদ্ধঘোষের অর্থকথা গ্রন্থের ভূমিকা অংশে পালি বা বুদ্ধবচনের বিভিন্ন শ্রেণীবিভাগ আমরা দেখতে পাই ঃ

(১) উপদেশ ও আদেশ অনুসারে বুদ্ধবচন দুই প্রকার, ধর্ম ও বিনয় ;

(২) কাল পর্যায়ক্রমে তিনপ্রকার—প্রথম, মধ্যম ও পশ্চিম (অন্তিম) ;

(৩) পিটক অনুসারে তিন প্রকার—সুত্ত (সূত্র), বিনয় ও অভিধম্ম (অভিধর্ম) ;

(৪) নিকায় বা আগম অনুসারে পাঁচ প্রকার—দীঘ-নিকায় বা দীঘাগম (দীর্ঘাগম), মজ্ঝিম-নিকায় বা মজ্ঝিমাগম (মধ্যমাগম), সংযুক্ত নিকায় বা সংযুত্তাগম (সংযুক্তাগম), অঙ্গুত্তর-নিকায় বা একুত্তরাগম (একোত্তরাগম), খুদ্দক-নিকায় বা খুদ্দকাগম (ক্ষুদ্রকাগম) ;

(৫) অঙ্গ বা শ্রেণী অনুসারে নয় প্রকার—সুত্ত (সূত্র), গেয্য (গেয়), বেয্যাকরণ (ব্যাকরণ), গাথা, উদান, ইতিবুত্তক (ইত্যুক্তক), জাতক, অদ্ভুত ধম্ম (অদ্ভূত-ধর্ম্ম), বেদল্ল (বেদল্য);

(৬) পাঠ বা পরিচ্ছেদ-গণনা অনুসারে চতুরশীতি সহস্র ধর্ম্মস্কন্ধ বা ৮৪০০০ ধর্মখণ্ড।

বুদ্ধের মুখনিঃসৃত বাণী, আদেশ ও উপদেশ বুদ্ধবচন। বুদ্ধ তাঁর শিষ্যগণের যে সকল

---

* ডঃ বেলা ভট্টাচার্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের অধ্যাপিকা এবং বহু প্রবন্ধ রচয়িতা। তাঁর "পালি ত্রিপিটক" বৃহৎ প্রবন্ধ থেকে সংক্ষিপ্তাকারে সংকলিত।

উপদেশ ও আলোচনাদি অনুমোদন করেছিলেন তাহাও বুদ্ধবচনের অন্তর্গত। বুদ্ধত্ব লাভের পর ধ্যান ভঙ্গ হলে সিদ্ধার্থের মুখ হতে যে অমৃতবাণী নিঃসৃত হয়েছিল সেটিই প্রথম বুদ্ধ-বচন নামে খ্যাত। তবে কোন্ বিশিষ্ট উক্তিটি প্রথম বুদ্ধ-বচন সেটি নিয়ে মতপার্থক্য দেখা যায়। মহাপরিনিব্বাণের পূর্বে বুদ্ধ সমাগত শিষ্যদিগকে যে উপদেশ দিয়েছিলেন সেটিই পশ্চিম বা অন্তিম বুদ্ধবচন নামে পরিগণিত হয়। বুদ্ধের শেষ মুখ নিঃসৃত বাণীটি হল— "হন্দ' দানি ভিক্খবে আমন্তযামি বো বযধম্মা সংখারা, অপ্পমাদেন সম্পাদেথা তি।" প্রথম ও শেষে উক্তি ব্যতীত দীর্ঘ ৪৫ বৎসর ব্যাপিয়া ভগবান বুদ্ধ যে সকল অমৃতময় ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন তাহাই মধ্যম বুদ্ধবচন নামে খ্যাত। বুদ্ধ তাঁর জীবিতকালে অনেক উপদেশ ও শিক্ষা দেন কিন্তু কখনও তা সংগ্রহ বা লিপিবদ্ধ করার প্রয়োজন হয়নি। তবে সদ্ধর্মের স্থায়িত্ব সম্পর্কে বুদ্ধের নিজেরই বেশ আশঙ্কা ছিল যথা ভিক্ষুদিগের শৈথিল্য, তাঁদের চরিত্রগত অধঃপতন, ভিক্ষুণী সংসর্গ, সঙ্ঘের মধ্যে ঐক্যের অভাব ইত্যাদি। এগুলি সদ্ধর্মের গতিপথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে।

যাইহোক্, ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর প্রায় শতাব্দীকাল বুদ্ধের শিষ্য ভিক্ষুগণ সংঘবদ্ধ ছিলেন এবং ঐক্যমত পোষণ করতেন। ছোট ছোট বিরোধ থাকলেও মিটিয়ে ফেলা হত। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সাধারণ শিষ্যমণ্ডলী যেমন শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল অপরপক্ষে তেমনই সুভদ্র নামক প্রব্রজিত ভিক্ষু শোকাকুল ভিক্ষুদিগকে সম্বোধন করে সান্ত্বনাপ্রদানছলে বললেন, "বন্ধুগণ, তোমরা অকারণ শোক ও বিলাপ করিও না। ভগবানের পরিনির্বাণে আমরা মহাশ্রমণের শাসন হইতে মুক্ত হইয়াছি ; ইহা করা তোমাদের উচিত, ইহা করা তোমাদের অনুচিত ইত্যাদি বাক্যে আমরা উত্যক্ত হইয়াছি, ইদানীং আমরা যাহা ইচ্ছা তাহা করিতে পারিব এবং যাহা ইচ্ছার বিরুদ্ধ তাহা করিব না।" স্থবির মহাকাশ্যপ ঐ ভিক্ষুদিগকে বললেন, "বন্ধুগণ, তোমরা শোক ও বিলাপ করিও না। তোমরা কি জাননা যে, ভগবান পূর্বেই উপদেশ দিয়াছেন—সকল প্রিয় এবং মনোজ্ঞ বস্তু হইতে নানা-ভাব, বিনাভাব ও অন্যথা-ভাব হইবেই। যাহা জাত, ভূত, কৃত ও বিলোপধর্মী তাহা লুক্কায়িত না হইয়া পারে না।"

যথাসময়ে মহাকাশ্যপ সুভদ্র ভিক্ষুর স্বেচ্ছাচারিতাসূচক বাক্য স্মরণ করে তিনি সদ্ধর্মের স্থায়িত্ব রক্ষা করার জন্য ধর্মবিনয় আবৃত্তি ও সংগ্রহ করবেন—স্থির করলেন। অনতিকাল মধ্যেই পাঁচশত অর্হত্বপ্রাপ্ত স্থবির রাজগৃহে সপ্তপর্ণী গুহায় মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় বুদ্ধশাসনের স্থায়িত্ব বিধানের উদ্দেশ্যে প্রথম বৌদ্ধ মহাসভার বা সঙ্গীতির অধিবেশন হল। এই অধিবেশনে ভিক্ষু উপালির বিনয় সংক্রান্ত এবং ভিক্ষু আনন্দের ধর্মবিষয়ক উত্তরগুলি নিয়ে, যে ধর্ম ও বিনয় সংগ্রহ প্রস্তুত হল তা স্থবিরবাদ নামে পরিচিত হল।

প্রায় একশো বছর পরে বৌদ্ধসংঘের মধ্যে বিরোধ ক্রমশঃ প্রকট হয়ে পড়ে এবং তা মেটাবার জন্য দ্বিতীয় বৌদ্ধ সংগীতি আহ্বানের প্রয়োজন হয়েছিল। বৈশালীর বালুকারামে কাকন্তক পুত্র স্থবির যশ প্রভৃতির উদ্যোগে এবং কালাশোকের সময় এই সভার অধিবেশন হয় এবং সাতশত সদস্য ইহাতে যোগদান করেন। এই সঙ্গীতির কার্য শেষ হতে আট মাস সময় লেগেছিল।

বিনয় চুল্লবগ্গ এবং সিংহলী কাহিনী অনুসারে (বজ্জিপুত্তক) ভিক্ষুদের আচরিত দশটি বিনয় বিরোধী আচরণ (দসবত্থুনি) বন্ধ করবার উদ্দেশ্যে এই সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এই সম্মেলনে বৃজিপুত্রীয়দের ঐ সকল আচরণ বিনয়-বিরোধী বলে ঘোষণা করা হয় এবং তাঁদের নিগৃহীত করে বহিষ্কৃত করা হয়। সিংহলী ঐতিহ্যমতে দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রত্যাখ্যাত হয়ে বৃজিপুত্ররা অন্য একটি সম্মেলন আহ্বান করেন এবং বিপুল সংখ্যক ভিক্ষু এই সম্মেলনে যোগদান করেন। সেজন্য ইহা মহাসঙ্গীতি নামে খ্যাত এবং যাঁরা মহাসঙ্গীতিতে যোগদান করেছিলেন তাঁরা মহাসাংঘিক নামে পরিচিত হলেন। আর প্রাচীনপন্থী রক্ষণশীল ভিক্ষুগণ থেরবাদী বা স্থবিরবাদী নামে অভিহিত হলেন। এইভাবে যে বৌদ্ধসংঘ ঐক্যবদ্ধ ছিল তা দুভাগে বিভক্ত হল—স্থবিরবাদ ও মহাসাংঘিক। স্থবিরবাদীরা হীনযান ও মহাসাংঘিকরা মহাযান নামে পরিচিত হল। মহাসাংঘিকদের শাস্ত্র প্রাকৃতবহুল সংস্কৃত বা মিশ্র সংস্কৃত ভাষা।

দ্বিতীয় সঙ্গীতির প্রায় একশ বছর পর সম্রাট অশোকের সময় পাটলিপুত্রে মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌সের (মৌদ্‌গলিপুত্র তিষ্য) সভাপতিত্বে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। প্রায় এক হাজার ভিক্ষু এই অধিবেশনে যোগদান করেন। প্রথম ও দ্বিতীয় সঙ্গীতিতে আলোচিত ও সংগৃহীত ধর্ম ও বিনয় পুনরায় আলোচিত ও গৃহীত হয়। অভিধম্ম (অভিধর্ম) নামে যে আর একটি পিটকের অস্তিত্ব এই সম্মেলনেই প্রথম প্রচারিত হয়। মোগ্‌গলিপুত্ত তিস্‌স এই সম্মেলনেই অভিধম্মপিটকের অন্যতম গ্রন্থ 'কথাবত্থু' সংকলন করেন। সিংহলী ঐতিহ্যানুসারে এই সময় থেকেই বুদ্ধবচন তিনভাগে বিভক্ত হয়। সম্রাট কণিষ্কের সময় কাশ্মীরে চতুর্থ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল। পরে আরোও কয়েকটি সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

পালি সাহিত্য আলোচনা করার পূর্বে ত্রিপিটক কথাটির অর্থ পরিষ্কাররূপে জ্ঞাত হওয়া আবশ্যক। পালি ত্রিপিটক বা পালি বৌদ্ধশাস্ত্র বলতে আমরা থেরবাদী শাস্ত্রকেই বুঝি। পিটক শব্দের সাধারণ অর্থ ভাণ্ড, ভাজন বা ঝুড়ি। যেমন—'কুদ্দাল' পিটকং, "কোদাল ও পেড়া"। পিটক অর্থ এখানে মাটি বহন করার ঝুড়ি বিশেষ। প্রাচীন ভারতে শাস্ত্র গুরু শিষ্য পরম্পরায় প্রচলিত ছিল। খননকার্যের সময় মাটি স্থানান্তরিত করার জন্য শ্রমিকেরা যেমন ঝুড়ি ব্যবহার করে, শাস্ত্রের গূঢ়তত্ত্ব তেমনই গুরুর কাছ থেকে শিষ্যের কাছে চলে এসেছে। কারও মতে পিটক শব্দের অর্থ ঝুড়িতে রক্ষিত পুঁথি। বৌদ্ধ পারিভাষিক অর্থে পিটক

'পরিযত্তি ভাজন', 'পর্য্যাপ্তিভাজন' বা 'গ্রন্থাধার'। এখানে আধার—যে আধারে বংশানুক্রমে পারিবারিক সম্পদ্‌সমূহ রক্ষিত থাকে এবং আধেয় উভয় অর্থই সূচনা করে। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে সুত্তন্তিক অর্থাৎ সূত্রের আবৃত্তিকারী, ধম্মকথিক অর্থাৎ ধর্মতত্ত্বের প্রচারক এবং বিনয়ধর অর্থাৎ বিনয় নিয়মাবলী সম্পর্কে বিশারদ ছিলেন। এই বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ সমস্ত সূত্র কণ্ঠস্থ করতেন। বার বার আবৃত্তি করতেন, ব্যাখ্যা করতেন, যাতে সকলেই বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় হৃদয়ঙ্গম করতে পারেন। বর্ষাবাসের সময় বহু পণ্ডিত ভিক্ষু বিহারে সমবেত হতেন। তখন ভিক্ষুগণ ধর্ম বিনয়ের জটিল অংশগুলি তাদের সঙ্গে আলোচনা করে সমাধান করার ও হৃদয়ঙ্গম করার সুযোগ পেতেন। এই পণ্ডিত ভিক্ষুদের সম্পর্কে বলা হয়েছে—বহুস্‌সুতা আগতাগমা ধম্মধরা বিনয়ধরা মাতিকাধরা অর্থাৎ বহুশ্রুত, শাস্ত্র বিশারদ, ধর্ম বিশারদ, বিনয় বিশারদ ও মাতৃকা বিশারদ। ধর্ম ও বিনয় নিয়মাবলী সম্পর্কিত সংক্ষিপ্ত রূপকে মাতিকা বলা হয়। সিংহলের রাজা বট্টগামনীর নির্দেশে পালি ত্রিপিটক (তিপিটক) খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে প্রথম লিপিবদ্ধ করা হয়।

ত্রিপিটকের প্রধানতঃ তিনটি ভাগ। বিনয়পিটক, সূত্রপিটক ও অভিধর্ম পিটক। বিনয় পিটকে আছে ভিক্ষু ভিক্ষুণীদের আচার আচরণ সংক্রান্ত নিয়মাবলী, সূত্র পিটকে বুদ্ধের ধর্ম ও বাণী এবং অভিধর্ম পিটকে রয়েছে বুদ্ধের আধ্যাত্মিক ও দার্শনিক চিন্তাধারা। 'ত্রিপিটক' বহুদিন ধরে রচিত হয়েছিল। বারাণসীর সারনাথের মৃগদাবে যেদিন বুদ্ধ প্রথম পঞ্চবর্গীয় ভিক্ষুর নিকট তাঁর প্রথম দেশনা দান করেন সেদিনই সূচনা হয়েছিল ত্রিপিটকের বা বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থের। সংক্ষেপে আমরা বলতে পারি যে সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ পঞ্চম শতক থেকে খৃঃ পূঃ প্রথম শতকের মধ্যেই এই শাস্ত্রগ্রন্থ সংকলনের কাজ সম্পন্ন হয় যদিও সিংহলে বট্টগামনির সময় 'বুদ্ধবচন' প্রথম লিপিবদ্ধ করে এর একটা স্থায়ী ও সামগ্রিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা চলে।

ত্রিপিটক গ্রন্থের একটি চিত্ররেখা এবং বাংলায় অনুবাদের একটি তালিকা নিম্নে প্রদত্ত হল।

ত্রিপিটক
বিনয় পিটক
৫টি গ্রন্থ
সুত্ত পিটক
অভিধম্ম পিটক
৭টি গ্রন্থ
সুত্ত বিভঙ্গ
খন্ধক
পরিবার
মহাবগ্গ
চুল্লবগ্গ
মহাবিভঙ্গ
ভিক্ষুণী বিভঙ্গ
ধম্মসঙ্গণি
বিভঙ্গ
ধাতুকথা
পুগ্‌গল
পঞ্‌ঞত্তি
কথাবত্থু
যমক
পট্‌ঠান
৫টি নিকায়
দীঘনিকায়
মজ্‌ঝিম নিকায়
সংযুত্ত নিকায়
অঙ্গুত্তর নিকায়
খুদ্দক নিকায়
১৫টি গ্রন্থ
খুদ্দকপাঠ
ধম্মপদ
উদান
ইতিবুত্তক
সুত্তনিপাত
বিমানবত্থু
পেতবত্থু
থেরগাথা
থেরীগাথা
জাতক
নিদ্দেস
পাটিসম্ভিদামগ্গ
অপদান
বুদ্ধবংস
চরিয়াপিটক
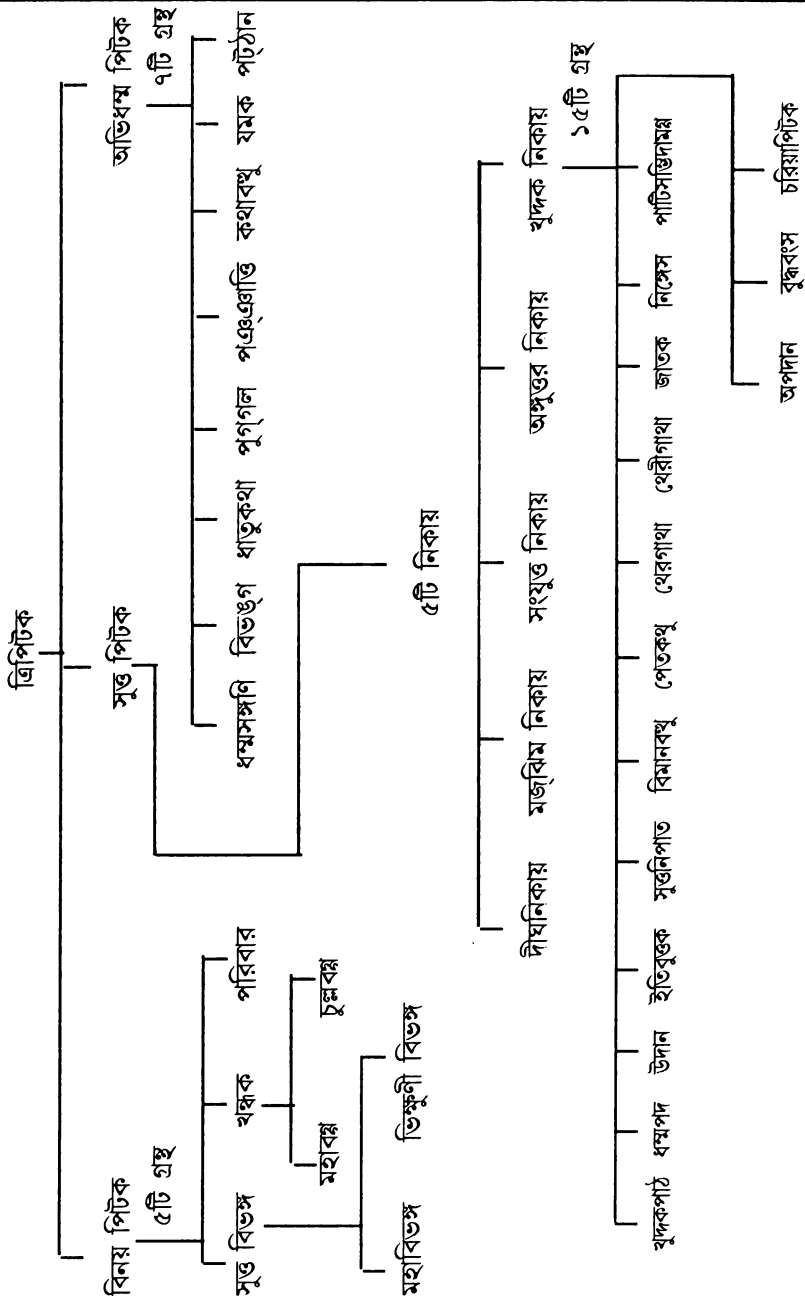
ত্রিপিটক বঙ্গানুবাদের গ্রন্থ তালিকা

১। ভিক্ষুণীবিভঙ্গ, প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির—বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, ২০০৫।

২। মহাবর্গ, প্রজ্ঞানন্দ মহাস্থবির---- যোগেন্দ্র রুপসীবালা, ত্রিপিটক ট্রাষ্ট বোর্ড, ১৯৩৭।

৩। মহাবর্গ পরিক্রমা, ভিক্খু জে. প্রজ্ঞাবংশ মহাথেরো, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ১৯৯৭

৪। ভিক্ষু ও ভিক্ষুণী প্রাতিমোক্ষ, বিধুশেখর ভট্টাচার্য, কলিকাতা, ১৩২৩ বাংলা

৫। ভিক্ষু প্রাতিমোক্ষ, প্রজ্ঞাবংশ মহাস্থবির, বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ, ২০০৫

৬। চুল্লবর্গ, সত্যপ্রিয় মহাস্থবির, বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, ২০০৩

৭। দীঘ নিকায়, ভিক্ষু শীলভদ্র, (তিনটি খণ্ড)

৮। দীঘ নিকায়, ধর্মরত্ন মহাথেরো, রাঙ্গুনিয়া (সীলক্খন্ধ বগ্গ) পূঃ পাকিস্তান, ১৯৬২

৯। মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ধর্মরত্ন মহাস্থবির, চট্টগ্রাম, ১৯৪১

১০। মহাসতিপট্‌ঠান সুত্তন্ত, বেণীমাধব বড়ুয়া, কলিকাতা, ১৯১৪, ২০০৬

১১। মধ্যমনিকায় (মজ্‌ঝিম নিকায়), ১ম খণ্ড, বেণীমাধব বড়ুয়া, যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড, চট্টগ্রাম, ১৯৪০, মধ্যমনিকায় (মজ্‌ঝিমনিকায়), ২য় খণ্ড, ধর্মাধার মহাস্থবির রাজেন্দ্র সিরিজ-১, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার,
মধ্যমনিকায় (মজ্ ঝিমনিকায়), ৩য় খণ্ড, বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী

১২। সংযুত্ত নিকায় (১ম খণ্ড), ১৪০০ বাংলা, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী ২য় খণ্ড— ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৯৬।

১৩। কোশল ও মার সংযুক্ত, সুকোমল বড়ুয়া, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২

১৪। অঙ্গুত্তর নিকায় (প্রথম খণ্ড), সুমঙ্গল বড়ুয়া, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, ১৯৯৪, ২০০৪

১৫। অঙ্গুত্তর নিকায় (৪র্থ খণ্ড), সুমঙ্গল বড়ুয়া, বনভন্তে প্রকাশনী, রাঙ্গামাটি, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ২০০৫

১৬। খুদ্দক পাঠ, সাসন সেবক সঙ্ঘ, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ, ১৯৮৮

১৭। মঙ্গলতত্ত্ব, শীলানন্দ ব্রহ্মচারী, মধ্যমগ্রাম, কোলকাতা, ১৯৮৯

১৮। ধর্ম্মপদং, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও ভিক্ষু অনোমদর্শী, প্রজ্ঞালোক প্রকাশনী, নালন্দা বিদ্যাভবন, কোলকাতা, ১৯৫৩

১৯। ধম্মপদ, চারুচন্দ্র বসু, মহাবোধি সোসাইটি, কোলকাতা, ১৯৬০

২০। ধর্মপদট্‌ঠকথা (১ম খণ্ড), শীলালঙ্কার মহাস্থবির, রাজবনবিহার, রাঙ্গামাটি, বাংলাদেশ, ১৯৯৫

২১। উদানং, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, রেঙ্গুন, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩০
২২। সুত্তনিপাত, ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি সোসাইটি, কোলকাতা, ১৩৮৩ বাংলা
২৩। বিশুদ্ধ সুত্তনিপাত, সাধনকমল চৌধুরী, করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৪০৯ বাংলা
২৪। বিমানবত্থু, 'বুদ্ধ এডুকেশানেল ফাউণ্ডেশান' ১১, আর, ডি, ফ্লোর, ৫৫ নং হাংচাও এস. রোড, সেকশান নং ১, তাইপেই, তাইওয়ান
২৫। প্রেতকাহিনী, 'বুদ্ধ এডুকেশানেল ফাউণ্ডেশন', তাইওয়ান (ঐ)
২৬। থেরগাথা, প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ছদ্মনাম স্থবির,
২৭। থেরীগাথা, ভিক্ষু শীলভদ্র, মহাবোধি সোসাইটি, ১৩৫৭ বাংলা
২৮। জাতক, ঈশানচন্দ্র ঘোষ, (৬ খণ্ড), কলকাতা
২৯। জাতক নিদান, ধর্মপাল ভিক্ষু, বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহার, ১৩৬৯
৩০। ইতিবুত্তক, আশা দাশ
৩১। বুদ্ধবংস, ধর্মতিলক স্থবির, রেঙ্গুন, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩৪
৩২। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ স্বরূপ দীপনী—সত্যপ্রিয় মহাস্থবির—রামু, চট্টগ্রাম, ১৯৯৪
৩৩। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ বা সংক্ষিপ্তসার অভিধর্ম—করুণা প্রকাশনী, কোলকাতা, ২০০৪
৩৪। অভিধর্মার্থ সংগ্রহ—সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, ১৯৯১
৩৫। ধাতুকথা, সিতাংশু বিকাশ বড়ুয়া, চট্টগ্রাম, ১৯৯০
৩৬। পট্‌ঠান (১ম খণ্ড), সুকোমল চৌধুরী, ধর্মাধার বৌদ্ধগ্রন্থ প্রকাশনী, কোলকাতা, ১৯৯৭

এপার-ওপার বাংলার বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকা
একটি চুম্বকীয় সমীক্ষা
শিমুল বড়ুয়া*

সমাজ গঠনে বিকাশে সাময়িকী তথা পত্র-পত্রিকার ভূমিকা অনস্বীকার্য। সাময়িকীতে প্রকাশিত সমকালীন বিভিন্ন সংবাদ, ঘটনাপঞ্জী, বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ, গল্প, ছড়া-কবিতা, ভ্রমণ কাহিনী, জীবনীর মাধ্যমে সমাজের মানসচিত্র প্রতিফলিত হয়। লেখক- গবেষক-সাহিত্যিক সৃষ্টিতে রাখে অনন্য অবদান। সাময়িক পত্র সামাজিক, রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক চেতনার মান বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এতে জাতি-গোষ্ঠী/ সম্প্রদায়ের পুনরুজ্জীবন ঘটে। পত্র-পত্রিকাগুলো বিশেষ কোন লক্ষ্য অর্জনে জনমত সংগঠিত করতেও অবদান রাখে। ভালো সাময়িকী সমাজ মানুষের অগ্রগতিতে দিকদর্শকের-সংগঠকের ভূমিকা পালন করে। এক্ষেত্রে সাময়িক পত্র সম্পর্কে লেখক-গবেষক-শিক্ষাবিদ মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম-এর সংশয়হীন বক্তব্য হলো: 'কেবলমাত্র তাৎক্ষণিকতার দাবি মিটিয়েই সাময়িক পত্রের প্রয়োজন নিঃশেষিত হয়ে যায় না। এর সার্থকতা আরো গভীরে। উত্তরকালের অঙ্গন পর্যন্ত তা সম্প্রসারিত। সমকালীন প্রত্যক্ষ বিচিত্র প্রয়োজনে সাড়া দিয়েও সাময়িক পত্র-পত্রিকা সমাজ মানুষের মানস ভাবনা এবং তৎসহ তার ইতিহাসকে ধারণ করে থাকে। সে কারণে সামাজিক ইতিহাস নির্মাণের স্বার্থে মূল্যবান উপকরণ সংগ্রহের আকর উৎস হিসেবে সাময়িকপত্রের গুরুত্ব অপরিসীম' (সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত)। তাই কোন জাতি-গোষ্ঠী-সম্প্রদায়ের সমাজ ইতিহাস তথা সমাজের অগ্রগতি-অবনতি জানতে বিশ্লেষণ করতে সমকালীন সাময়িক পত্রগুলো নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন পরিলক্ষিত হয়।

অবিভক্ত বাংলায় ১৭৮০ সালে জেম্‌স অগাস্টস হিকি'র সম্পাদনায় ইংরেজী ভাষায় প্রকাশিত প্রথম সংবাদপত্র 'বেঙ্গল গেজেট অব ক্যালকাটা জেনারেল এডভার্টাইজার' সংক্ষেপে 'বেঙ্গল গেজেট'। প্রথম বাংলা সাময়িকপত্র হচ্ছে শ্রীরামপুর ব্যাপটিস্ট মিশনের উদ্যোগে ১৮১৮ সালে জন ক্লার্ক মার্সম্যান (১৭৯৪—১৮৭৭) এর সম্পাদনায় প্রকাশিত মাসিক 'দিগদর্শন'। জন ক্লার্ক মার্সম্যানের সম্পাদনায় একই বছরের ২৩শে মে প্রকাশিত 'সমাচার দর্পণ' প্রথম বাংলা সাপ্তাহিক। একই সালে জুন মাসে গঙ্গা কিশোর ভট্টাচার্য ও হরচন্দ্র রায়ের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'বঙ্গাল গেজেটি -বাঙালি সম্পাদিত প্রথম সাময়িক পত্র। ১৮১৮ সালটি বাংলা সাময়িক পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে অবিস্মরণীয়। তারপর থেকে বর্তমান পর্যন্ত অসংখ্য সংবাদ-সাময়িক পত্র প্রকাশের মধ্য দিয়ে সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য চর্চার

* কলেজ শিক্ষক, প্রাবন্ধিক, অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মহাসচিব, চট্টগ্রাম, বাংলাদেশ।

স্রোতধারা ক্রমবিকাশমান। পূর্ববঙ্গে তথা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমায় প্রকাশিত প্রথম সাময়িকপত্র হচ্ছে সাপ্তাহিক 'রঙ্গপুর বার্তাবহ,', পত্রিকাটি ১৮৪৭ সালের আগস্ট মাসে প্রথম প্রকাশ পায়। আবার এসব সাময়িক পত্রগুলোর সংকলন ও মূল্যায়ন নিয়ে এ পর্যন্ত বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ রচিত হয়েছে। যেমন কেদারনাথ মজুমদারের 'বাংল সাময়িক সাহিত্য' (১৯১৭) , ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায়ের 'বাংলা সাময়িক পত্র' (প্রথম খণ্ড ১৩৭৯, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৮৪, কলকাতা), 'সংবাদপত্রে সেকালের কথা' (প্রথম খণ্ড ১৩৭৭, দ্বিতীয় খণ্ড ১৩৮০, কলকাতা) , বিনয় ঘোষের 'সাময়িক পত্রে বাংলার সমাজচিত্র' (চার খণ্ড ১৯৬২, ১৯৬৩, ১৯৬৪, ১৯৬৬, কলকাতা) উপরোক্ত এসব গ্রন্থে বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে তথা কলকাতা কেন্দ্রিক সাময়িক পত্রগুলো গুরুত্ব পেয়েছে। ফলে পূর্ববঙ্গ থেকে বিশেষ করে মুসলমান সম্পাদিত সংবাদ সাময়িক পত্র নিয়ে দু'টো গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ প্রকাশিত হয়- আনিসুজ্জামানের 'মুসলিম বাংলার সাময়িকপত্র' (১৯৬৯, ঢাকা) এবং মুস্তাফা নূর-উল ইসলামের 'সাময়িকপত্রে জীবন ও জনমত' (১৯৭৭, ঢাকা)। আর পূর্ববঙ্গ তথা বাংলাদেশের ভৌগোলিক সীমানায় প্রকাশিত সাময়িকপত্র নিয়ে সামগ্রিক ও মৌলিক কাজঋদ্ধ গ্রন্থ হচ্ছে মুনতাসীর মামুনের 'উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র' (নয় খন্ড, ১৯৮৫ ঢাকা)।

উনিশ শতকে দিগ্‌দর্শন, সমাচার দর্পণ, সম্বাদ কৌমুদী, সংবাদ প্রভাকর, সংবাদ সুধাকর, সমাচার সভারাজেন্দ্র, জ্ঞানোদয়, তত্ত্ববোধিনী, বঙ্গদর্শন, ভারতী, আজীজন নেহার ইত্যাদি অসংখ্য সাময়িকপত্রের মাধ্যমে বাংলায় নব জাগরণ ত্বরান্বিত হয়। এ নব জাগরণ প্রায় ক্ষেত্রে স্ব স্ব সম্প্রদায়ের জাগরণ হিসেবে চিহ্নিত। ফলে উনিশ শতকের এ জাগরণকে সত্যিকার 'রেনেসাঁ' বলতে অনেকে কুণ্ঠবোধ করেন। এ সময় হিন্দু মধ্যবিত্ত শ্রেণী পরিপূর্ণভাবে বিকশিত; তারা শিক্ষা-দীক্ষায়, রাজনীতি-অর্থনীতিতে, সাময়িকপত্র প্রকাশনায় প্রাগ্রসর। ইতিহাসবিদ মুনতাসীর মামুনের মতে- 'এ সময় মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার স্বল্পতা স্পষ্টত চোখে পড়ে। এই দীর্ঘ পঞ্চাশ বছরে মুসলমান সম্পাদিত পত্রিকার সংখ্যা ছিল মাত্র পনেরটি এবং এর অধিকাংশ ছিল মাসিক। সুতরাং কোন রকম উপাত্ত ছাড়াই বলা যায় অর্থনৈতিক, সামাজিক সর্বক্ষেত্রেই বাংলাদেশের মুসলমানরা ছিল অনেক পিছিয়ে। মুসলমান মধ্যশ্রেণী তখনও অপরিণত এবং দেখা যাচ্ছে সম্প্রদায়গতভাবে সমাজে তার কোন প্রভাব ছিল না' (উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ-সাময়িকপত্র)। এক্ষেত্রে উনিশ শতকে উভয় বাংলায় সংখ্যালঘু বৌদ্ধদের আর্থ সামাজিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক অবস্থান যে পিছিয়ে পড়াদের পিছনে তা' কোন রকম উপাত্ত ছাড়াই বলা যায়। মধ্যবিত্ত শ্রেণীর অঙ্কুরোদ্‌গম হয়েছে কিনাও প্রশ্ন সাপেক্ষ ব্যাপার। কেন না ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রাচ্য-পাশ্চাত্য মনীষীদের গবেষণায়, প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনাদির মাধ্যমে সবে প্রমাণিত হচ্ছে-বাংলায় বৌদ্ধধর্মের অস্তিত্বের কথা, শৌর্য বীর্যের কথা। যার ফলে সমাজ-সংস্কৃতি, শিক্ষা-দীক্ষা, মেধা-মননের মাপকাঠিরূপ সাময়িক পত্রের সংখ্যা ঊনবিংশ শতকে মাত্র একটি।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধরা অস্তিত্বের সংকটকাল অতিক্রমের জন্য নানান উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। বৌদ্ধ মন্দির ও পালি টোল স্থাপন, বৌদ্ধ মেলার প্রবর্তন, থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শনের প্রচলন, বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন বিষয়ক গ্রন্থ প্রকাশ, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি ও বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা প্রতিষ্ঠার কথা উল্লেখ করতে হয়। আবার বিংশ শতাব্দীতে বৌদ্ধদের সমাজ গঠনে মানস গঠনে ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়। বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনের জন্য মনন-সৃজন ঋদ্ধ কর্মকাণ্ডেও বৌদ্ধরা কিছুটা প্রসারতা লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। পরিপূর্ণভাবে সার্বজনীন সাহিত্য-সংস্কৃতি নির্ভর না হলেও বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্যচর্চা বিষয়ক বেশ কিছু সাময়িকপত্র বিংশ শতাব্দী ব্যাপী প্রকাশিত হয়েছে। যা পিছিয়ে পড়া বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের চেতনার মান বৃদ্ধিতে জীবনবোধ জাগরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। বিংশ শতাব্দীর কয়েকটি সাড়া জাগানো সাময়িক পত্র-পত্রিকা হলো: সবুজপত্র, কল্লোল, মোহাম্মদী, সওগাত, কালি ও কলম, শিখা, সমকাল, কণ্ঠস্বর, লোকায়ত ইত্যাদি।

১৮৮৪ সালে উভয় বাংলার মধ্যে বৌদ্ধ অধ্যুষিত বৃহত্তর চট্টগ্রামে বৌদ্ধদের প্রথম সাময়িকপত্র 'বৌদ্ধ বন্ধু' র আত্মপ্রকাশ ঘটে। সম্পাদক ছিলেন সমাজ ধর্ম ও সাহিত্যসেবী 'কালিকিঙ্কর মুৎসুদ্দী'। ঊনিশ শতকের বাকী ১৬ বছর আর কোন বৌদ্ধ সম্পাদিত পত্রিকা প্রকাশ পেয়েছে কিনা তার প্রমাণ নেই। বৌদ্ধ বন্ধু প্রকাশনার একশত বাইশ বছরের মধ্যে এ পর্যন্ত উভয় বাংলা মিলে অনেক বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকা প্রকাশিত হয়েছে। আবার 'সেগুলি তেমন গুরুত্বপূর্ণ না হওয়ায়' (মুনতাসীর মামুন) উপরোক্ত গ্রন্থগুলোর আলোচনায়ও স্থান পায়নি। কম গুরুত্বপূর্ণ হলেও এসব বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকাগুলো আমাদের সমাজ ইতিহাসের জঙ্গমতার প্রতীক, প্রাণের ধন। আমাদের অগ্রগতি মূল্যায়নের স্বার্থে এ ব্যাপারে আমাদেরকে উদ্যোগী হয়ে গবেষণা করতে হবে। কিন্তু জানা মতে, এ সমস্ত সাময়িক পত্র থেকে সংকলনের মাধ্যমে বৌদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে সাময়িকপত্রের ভূমিকা, বৌদ্ধ সমাজের মুক্তি বুদ্ধিভিত্তিক জীবন ও মানস ভাবনার বিবর্তন, আর্থসামাজিক, রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক অগ্রগতি কতটুকু সেই অগ্রগতি আপামর জনগণের হয়েছে নাকি মুষ্টিমেয় উচ্চ শ্রেণীর বৌদ্ধদের হয়েছে তা নির্ণয়ের জন্য এ পর্যন্ত কোন গবেষণাধর্মী অভিসন্দর্ভ রচিত হয়নি।

কিন্তু উভয় বাংলায় একশত বছরের বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকার ইতিহাসে গবেষণার যে অনেক তথ্য উপাত্ত উপকরণ ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে তা তরুণ লেখক-গবেষককে, স্বসমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি অনুরাগীকে জানানোর জন্য, এ কাজে গবেষণায় উদ্বুদ্ধ করার জন্য ১৮৮৪ সাল থেকে আজ পর্যন্ত বৌদ্ধ সম্পাদিত যে সকল সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছে, হচ্ছে সেইগুলো সম্পর্কে তথ্যভিত্তিক, বিশ্লেষণধর্মী নয়, একটা চুম্বকীয় ধারণা নিম্নে উপস্থাপন করা হলো।

বৌদ্ধ বন্ধু :

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বৌদ্ধ-ধর্ম-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণ ঘটতে থাকে। ধর্ম-দর্শন,

সংস্কৃতি, ইতিহাস, ঐতিহ্যচর্চায় বৌদ্ধদের উজ্জীবিত করার মানসে ১৮৮৪ সালে 'বৌদ্ধ বন্ধু' পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে। বৌদ্ধ নব জাগরণের অবিসংবাদিত নেতা, চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি'র (বর্তমানে বাংলাদেশ বৌদ্ধ সমিতি) প্রতিষ্ঠাতা কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী (নাজির কৃষ্ণ নামে সুপরিচিত)'র উদ্যোগে কালিকিঙ্কর মুৎসুদ্দী সম্পাদিত মাসিক বৌদ্ধ বন্ধু পত্রিকাটি এক বছর প্রকাশিত হওয়ার পর বন্ধ হয়ে যায়।

নাজির কৃষ্ণের সম্পাদনায় ১৮৮৭ সালে বৌদ্ধ বন্ধু পুনঃপ্রকাশিত হয়। এ সময় বৌদ্ধ বন্ধুর বাংলা-ইংরেজী সংস্করণ প্রকাশিত হতো। এক বছর পরে আবার প্রকাশনা বন্ধ হয়ে যায়। ১৯০৬ সালে ডা. ভগীরথ চন্দ্র বড়ুয়ার উদ্যোগে ও সতীশচন্দ্র বড়ুয়ার সম্পাদনায় বৌদ্ধ বন্ধু পুনর্বার প্রকাশ পায়। পত্রিকাটি সম্পর্কে মনীষী ড. বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন, "বৌদ্ধ পত্রিকা'র কঠোর মন্তব্য টিপ্পনীর ঠেলায় স্থানীয় বৌদ্ধ সমিতি সতীশ কাকার (সর্বজনপ্রিয় সতীশ চন্দ্র বড়ুয়া) সম্পাদকত্বে সমিতির পূর্ব মুখপত্র ' বৌদ্ধ বন্ধু' কে পুনর্জীবিত করিতে বাধ্য হইলেন। .... বৌদ্ধ বন্ধু বহুবার মরিয়া বহুবার বাঁচিয়াছে। প্রতিদ্বন্দ্বী 'বৌদ্ধ পত্রিকা'র সঙ্গে মরিয়া বহুদিন পরে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার মুখপত্ররূপে প্রকাশিত দীর্ঘকাল স্থায়ী 'জগজ্জ্যোতি' র প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে পুন্নানন্দ সামীর সম্পাদকত্বে পুনর্জীবিত (১৯১৫) হইয়া আবার অন্তর্ধান করে বিপক্ষের সঙ্গে সঙ্গে। পাঁচ ছয় বৎসর পর তাহা আবার জয়দ্রথ চৌধুরী ও প্রফুল্ল কুমার বড়ুয়ার যুক্ত সম্পাদকত্বে (১৯৩৯ সালে) পুনর্জীবন লাভ করে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতি (কলকাতা) পরিচালিত 'জাগরণী'র প্রতিদ্বন্দ্বিরূপে এবং বর্ষকালের মধ্যেই পুনরায় অস্তমিত হয় 'জাগরণী'কে মোহনিদ্রা বিভোর করিয়া এমনকি অধ্যাপক প্রকৃতি রঞ্জন বড়ুয়ার সুলিখিত 'লোভাতুর' গল্পটি সহ'। (বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান)। ঊনিশ শতকের একমাত্র বৌদ্ধ পত্রিকা 'বৌদ্ধ বন্ধু' কার সম্পাদনায় কত বছর ও কয়টি সংখ্যা প্রকাশিত হয় তার সঠিক চিত্র উদ্‌ঘাটনের জন্য যথাযথ গবেষণার প্রয়োজন। তদুপরি এ পত্রিকার সম্পাদকীয়, লেখা ও লেখক মূল্যায়নের মাধ্যমে ঊনিশ ও বিংশ শতকের প্রথম অর্ধ পর্যন্ত বৌদ্ধ পুনর্জাগরণ কতটুকু হয়েছে তা জানা যাবে। তাই এ সাময়িকীর দুর্লভ সংখ্যাগুলো সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য বৌদ্ধ সমাজ ধর্ম অনুরাগী গবেষকের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

বৌদ্ধ পত্রিকা:

পাঁচরিয়ার অঙ্কশাস্ত্রজ্ঞ বিপিন মাস্টারের (বিপিন চন্দ্র বড়ুয়া) সম্পাদনায় ১৯০৬ সালে মাসিক 'বৌদ্ধ পত্রিকা' প্রকাশ পায়। পত্রিকাটি পরে সম্পাদনা করেন অন্যায়বিরোধী-স্পষ্টবাদী, কবি ও মোক্তার সর্বানন্দ বড়ুয়া (১৮০৭—১৯০৮)। এ সময় বৌদ্ধ পত্রিকায় এডুইন আর্নল্ড রচিত The Light of Asia- র সর্বানন্দকৃত বাংলা অনুবাদ 'জগজ্জ্যোতি' নামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশ পেত। 'জগজ্জ্যোতি' কবি নবীন চন্দ্র সেন, ড. বেণীমাধব বড়ুয়া

কর্তৃক বহুল প্রশংসিত। 'বৌদ্ধ পত্রিকা'র পরমায়ু দুই বছর। এ দু'বছরে 'বৌদ্ধ পত্রিকা' ও 'বৌদ্ধ বন্ধু' পত্রিকার মধ্যে যে প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা বিরাজ করত তা ড. বেণীমাধবের পূর্বোক্ত বক্তব্য থেকে উপলব্ধি করা যায়। নিঃসন্দেহে বলা যায় এ প্রতিযোগিতা-প্রতিদ্বন্দ্বিতা পাঠক সমাজ বেশ উপভোগ করতেন। ড. বেণীমাধব বড়ুয়ার মতে "বৌদ্ধ পত্রিকা'য় প্রকাশিত সর্বানন্দের মন্তব্য টিপ্পনীতে বৌদ্ধগণের চমকভাঙ্গিয়াছিল, সকলেই যেন ঔৎসুক্য ও উৎকণ্ঠার সহিত অপেক্ষা করিত-না জানি এবার কাহার পালা। "লাল দীঘির পাড়ে ত্রিমূর্তির আবির্ভাব', 'বেণী আর কোষে ফটিক চাঁদ কোষাধ্যক্ষ', 'কোথায় সেদিনের রসিকতা আর কোথায় এদিনের রসিকতা' ইত্যাদি হেঁয়ালিপূর্ণ উক্তিগুলির কটাক্ষ কাহার প্রতি ছিল, তাহা স্থানীয় বৌদ্ধ পাঠক সহজে অনুমান করিতে পারিতেন। ইহাতে সর্বানন্দের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, অনুসন্ধিৎসা ও সৎসাহসের পরিচয় ছিল" (প্রাগুক্ত)।

পরিতাপের বিষয় প্রকাশনার দু'বছরে বৌদ্ধ পত্রিকা'র কয়টি সংখ্যা বের হয়েছে, প্রতিযোগিতা প্রতিদ্বন্দ্বিতা'র মান কেমন তা নিয়ে কোন গবেষণা এ পর্যন্ত হয়নি।

জগজ্জ্যোতি:

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ-প্রান্তে বিংশ শতাব্দীতের শুরুতে যে প্রতিষ্ঠান ও প্রকাশনা বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতির পুনর্জাগরণে অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করে তা হচ্ছে কলকাতায় কর্মযোগী কৃপাশরণ মহাস্থবির (১৮৬৫-১৯২৬) প্রতিষ্ঠিত বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা (১৮৯২) এবং সভার মুখপত্র জগজ্জ্যোতি (১৯০৮)। সভা ও জগজ্জ্যোতি কে ঘিরে বৌদ্ধরা বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন সংস্কৃতি চর্চায় এবং বৌদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে প্রাণের আবেগে উদ্বেলিত হলো। জগজ্জ্যোতি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করল, বৌদ্ধ অবৌদ্ধ গবেষক-লেখকদের বৌদ্ধ ধর্ম-দর্শন, ইতিহাস-ঐতিহ্য-কৃষ্টি বিষয়ক লেখা প্রকাশের মধ্য দিয়ে বাংলায় বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতির পুনরুত্থান ঘটতে লাগল। বুদ্ধের মহিমায় অবিভক্ত ভারতবাসীর চিত্ত আলোকিত হলো।

১৯০৮ সালে আষাঢ়ী পূর্ণিমা তিথিতে বিশিষ্ট বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ গুণালংকার মহাস্থবির ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি অধ্যাপক সমণ পুন্নানন্দের যুগ্ম সম্পাদকত্বে মাসিক "জগজ্জ্যোতি' র প্রথম আত্মপ্রকাশ। প্রথম সংখ্যায় প্রকাশিত উদ্বোধন কবিতা: 'আসিয়াছি আমি, তোমাদের দ্বারে, নাম মম জগজ্জ্যোতি/অজ্ঞান আঁধারে মায়াবদ্ধ জীবে দেখাতে সদ্ধর্ম জ্যোতি'। শত প্রতিকূলতার মাঝেও সেই 'সদ্ধর্ম জ্যোতি' প্রকাশে জগজ্জ্যোতি এখনো ক্রমশ দ্যুতি থেকে দ্যুতিময় বৌদ্ধ সাময়িকপত্র।

তিন বছর যুগ্ম সম্পাদনায় জগজ্জ্যোতি প্রকাশনার পর সমণ পুন্নানন্দ দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়ালে গুণালংকার মহাস্থবিরের সম্পাদনায় জগজ্জ্যোতি প্রকাশ পেতে থাকল। ১৯১৬ সালে গুণালংকারের মৃত্যুজনিত কারণে রমণীরঞ্জন সেন বিদ্যাবিনোদ কয়েক সংখ্যা জগজ্জ্যোতি সম্পাদনা করেন। ১৯১৭ সালে ভারততত্ত্ববিদ, মনীষী ড. বেণীমাধব বড়ুয়া

ও সমণ পুন্নানন্দের উপর যৌথভাবে জগজ্জ্যোতি সম্পাদনার দায়িত্ব বর্তায়। ১৯২১ সাল পর্যন্ত জগজ্জ্যোতি প্রকাশ পায়। ১৯০৮–২১ সাল পর্যন্ত 'জগজ্জ্যোতি' প্রকাশনার প্রথম পর্ব। কৃপাশরণ মহাস্থবিরের মৃত্যু ও আরো অন্যান্য কারণে তিন দশক বন্ধ থেকে ১৯৫০ সালে আবার জগজ্জ্যোতির পুনঃপ্রকাশ ঘটে। প্রকাশনার এ দ্বিতীয় পর্বে সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বৌদ্ধ শাস্ত্রে সুপণ্ডিত ও সুসাহিত্যিক শীলানন্দ ব্রহ্মচারী। ১৯৫৯ সাল পর্যন্ত প্রকাশ পায়। আবার প্রায় এক যুগ জগজ্জ্যোতি প্রকাশনা বন্ধ থাকে। তৃতীয় পর্বে ১৯৭০ সাল থেকে বার্ষিক বুদ্ধজয়ন্তী সংখ্যারূপে জগজ্জ্যোতি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগীয় প্রধান ড. দীপক কুমার বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশ পেতে থাকে। ১৯৭৭ সাল পর্যন্ত প্রকাশ পায়। জগজ্জ্যোতি প্রকাশনার চতুর্থ পর্ব শুরু হয় ১৯৮০ সালে, বাংলা ও ইংরেজী দ্বিভাষিক জগজ্জ্যোতি সম্পাদনার দায়িত্ব নেন, কবি-প্রাবন্ধিক হেমেন্দুবিকাশ চৌধুরী। তাঁর সম্পাদনায় জগজ্জ্যোতি শুধু উভয় বাংলায় পণ্ডিত সমাজে নয়, বিশ্ব পণ্ডিত গবেষক সমাজে 'জগজ্জ্যোতি' প্রকাশনা আজ এক মর্যাদার আসনে বৃত। আর যুগোপযোগী বুদ্ধিদীপ্ত সম্পাদনার গুণে জগজ্জ্যোতি সম্পাদক হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী আজ বুদ্ধচর্চায় নিবেদিত প্রাণ খ্যাত ব্যক্তিত্বে পরিণত হয়েছেন। তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত জগজ্জ্যোতি'র বিশেষ সংখ্যা যেমন অতীশ দীপঙ্কর জন্ম সহস্র বার্ষিক সংখ্যা (১৯৮৩), ড. বেণীমাধব বড়ুয়া জন্মশতবার্ষিক সংখ্যা (১৯৮৯), কৃপাশরণ মহাথের ১২৫তম জন্মবার্ষিক সংখ্যা (১৯৯০), ড. বাবাসাহেব আম্বেদকর জন্মশত বার্ষিক সংখ্যা (১৯৯১), বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা শতবর্ষ সংখ্যা (১৯৯৩), বুদ্ধচর্চা বিষয় প্রবন্ধ সংকলন সংখ্যা (১৯৯৫), সম্রাট অশোক স্মৃতিতে 'অশোক ২৩০০' সংখ্যা (১৯৯৭), প্রফেসর জি.পি. মললসেকের জন্মশত বার্ষিক সংখ্যা (১৯৯৯), সংঘনায়ক ধর্মপাল মহাথের সম্মাননা সংখ্যা (২০০২), প্রফেসর কাজু আজুমা সম্মাননা সংখ্যা (২০০১) ইত্যাদি দেশ-বিদেশের বিদ্বৎ সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে।

ভারতে বৌদ্ধধর্মের মহিমা পুনঃপ্রচার, বাঙালি বৌদ্ধদের ধর্মশিক্ষা দান, পালি সাহিত্য থেকে বুদ্ধের অমিয়বাণী ও বৌদ্ধ ধর্মের গভীর তত্ত্বাবলী বাংলা সাহিত্যে প্রকাশ এবং বৌদ্ধ সাহিত্য অনুবাদে বাঙালিকে সহায়তা প্রদানের লক্ষ্য ছিল জগজ্জ্যোতির। জগজ্জ্যোতির মাধ্যমে বাঙালি পণ্ডিত লেখকরা বৌদ্ধ ধর্মের গৌরবদীপ্ত মহিমা, গবেষণালব্ধ প্রামাণ্য তথ্য অতি চমৎকারভাবে উপস্থাপন করেছেন। বাঙালির বহুদিনের বৌদ্ধ ধর্ম বিষয়ক অনুসন্ধিৎসার নিবৃত্তি সাধনে জগজ্জ্যোতির ভূমিকা অপরিসীম' (বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা শতবর্ষ সংখ্যা, ১৯৯২)।

অজ্ঞান আঁধারে সদ্ধর্মের জ্যোতি বিতরণের মাধ্যমে জগজ্জ্যোতি শতবর্ষ পানে ছুটে চলেছে। উভয় বাংলায় বৌদ্ধ সমাজের ধর্ম ও বুদ্ধিভিত্তিক বিবর্তন বিশ্লেষণ মূল্যায়নে দীর্ঘকাল স্থায়ী এই বৌদ্ধ পত্রিকার উপর গবেষণার প্রয়োজন অবশ্যম্ভাবী।

সংঘশক্তি :

রেঙ্গুনে অগ্‌গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির স্থাপিত 'রেঙ্গুন বুদ্ধিস্ট মিশন'-এর মুখপত্র হিসেবে মাসিক 'সংঘশক্তি'র প্রথম প্রকাশ ১৯২৮ সালে। বিভিন্ন সময়ে আর্যবংশ ভিক্ষু, জ্যোতিঃপাল ভিক্ষু (পরবর্তীতে সংঘরাজ) ও শীলালংকার ভিক্ষু (পরবর্তীতে সংঘরাজ), রাজেন্দ্র বিনোদ বড়ুয়া 'সংঘশক্তি' সম্পাদনা করেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানী বোমার আঘাতে রেঙ্গুন বুদ্ধিস্ট মিশন প্রেস ধ্বংস হওয়ার আগে পর্যন্ত সর্বমোট কয় সংখ্যা 'সংঘশক্তি' প্রকাশিত হয়েছিল তা জানা যায়নি। উল্লেখ্য, এই মিশন প্রেস থেকে পালি ও বাংলা ভাষায় বৌদ্ধ ধর্ম দর্শন সংস্কৃতির উপর বেশ কিছু মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল, যেগুলো প্রাচীন বৌদ্ধ সমাজ-সংস্কৃতির আকর গ্রন্থ হিসেবে স্বীকৃত। এপার-ওপার বাংলার বৌদ্ধদের সাথে রেঙ্গুন ও আরাকানের সংস্কৃতির বিনিময়, প্রভাব-প্রতিপত্তি সম্পর্কে জানার জন্য 'সংঘশক্তি' পত্রিকার উপর গবেষণার প্রয়োজন; এখনো অনেক সংগ্রাহকের কাছে সংঘশক্তির সংখ্যা পাওয়া যায়।

বিংশ শতাব্দীর ত্রিশ-চল্লিশের দশকে উভয় বাংলা মিলে অনেক বৌদ্ধ সাময়িকপত্র প্রকাশিত হয়েছিল। কোনটি দুই-তিন বছর, কোনটা বা দুই-তিন সংখ্যা মাত্র। ১৯৩০-৩১ সালে গজেন্দ্র লাল চৌধুরী এবং রায় বাহাদুর ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়ার সম্পাদনায় 'সম্বোধি' নামে মাসিক পত্রিকা প্রকাশ পায়। ৬ষ্ঠ সংখ্যা পর্যন্ত প্রকাশের পর পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩১সালে এন সি বড়ুয়ার সম্পাদনায় 'বহুরূপী' নামে একটি পাক্ষিক পত্রিকা বের হত, এক বছরের মধ্যে পত্রিকাটি বন্ধ হয়ে যায়। ১৯৩৪ সালে ড. বেণীমাধব বড়ুয়া ও নেপালবাসী ধর্মাদিত্য ধর্মাচার্যের যুগ্ম সম্পাদনায় রেঙ্গুন প্রিন্টিং ওয়ার্কস হতে ইংরেজী ত্রৈমাসিক 'বুদ্ধিস্ট ইণ্ডিয়া' প্রকাশ পায়। ১৯৩৪ সালে কলকাতা থেকে মাসিক 'বৌদ্ধ ভারত' ধর্মাদিত্য ধর্মাচার্যের সম্পাদনায় বের হয়। পার্বত্য চট্টগ্রাম থেকে রাণী বিনীতা রায়ের পৃষ্ঠপোষকতায় সলিল রায়ের সম্পাদনায় ১৯৩৬ সাল থেকে 'গৈরিক' নামে সাহিত্য পত্রিকা প্রকাশ পেত। প্রায় একদশক ব্যাপী পত্রিকাটি প্রকাশিত হয়েছিল। কলকাতাস্থ বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমিতির উদ্যোগে মুখপত্র হিসেবে সত্যেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দীর সম্পাদনায় ১৯৩৯ সালে 'জাগরণী' পত্রিকা প্রকাশ পায়। ইহা ছাড়াও আবুরখীল নিবাসী নির্মলচন্দ্র বড়ুয়া সম্পাদিত 'উদয়', রেঙ্গুন থেকে প্রকাশিত জ্যোতিষ রঞ্জন বড়ুয়া সম্পাদিত 'ছাত্র সংঘ' ও বিপ্লবী অজয় সিংহ সম্পাদিত 'ব্রহ্ম বাঙালী', করল নিবাসী নগেন্দ্রলাল বড়ুয়া ও বৈদ্যপাড়া নিবাসী নিকুঞ্জ বিহারী চৌধুরী সম্পাদিত 'বৌদ্ধ বাণী' পত্রিকার নাম উল্লেখ করা যায়। এগুলো বর্তমানে প্রকাশিত হয় না। এ সব সাময়িক পত্রিকা নিয়ে ব্যাপকভিত্তিক কোন গবেষণা হয়নি। পত্রিকাগুলো ক্রমেই কালের গর্ভে বিলীন হয়ে যাচ্ছে। এখনো ব্যক্তিগত সংগ্রাহক ও মন্দির ভিত্তিক পুরানো লাইব্রেরীতে পত্রিকাগুলো কয়েক সংখ্যা করে থাকতে পারে, তরুণ গবেষকরা এ দিকে দৃষ্টি দিতে পারেন। কলকাতায় চট্টগ্রামের গৌরব ভারততত্ত্ববিদ তিব্বত-বিশারদ রায় বাহাদুর

শরচ্চন্দ্র দাশ প্রতিষ্ঠিত বুদ্ধিষ্ট টেকস্ট সোসাইটি (১৮৯২) থেকে তাঁর সম্পাদনায় প্রকাশিত জার্নাল এবং শ্রীলংকা নিবাসী অনাগরিক ধর্মপাল প্রতিষ্ঠিত মহাবোধি সোসাইটি (১৮৯১)'র মুখপত্র 'দি মহাবোধি' (প্রকাশনার ১১৩ বছর চলছে, বর্তমান সম্পাদক উপালী রূপসিংঘে) বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি, সাহিত্য ও ইতিহাস-ঐতিহ্য চর্চার অন্যতম পুরোধা গবেষণাপত্র ও সাময়িকপত্র হিসেবে বিবেচিত।

বিংশ শতাব্দীর চল্লিশের দশকের শেষ পর্যায়ে রাজনৈতিক পটপরিবর্তনে ভারত বিভক্ত হলো, বাংলা দ্বিখণ্ডিত হলো—পশ্চিমবঙ্গ ও পূর্ববঙ্গ তথা পূর্ব পাকিস্তান। আমরা হলাম পূর্ব পাকিস্তানের নাগরিক। পূর্ববঙ্গের বৌদ্ধরা সাংস্কৃতিক জাগরণের কেন্দ্রবিন্দু কলকাতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। তারপরও নব উদ্যমে পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে কিছু বৌদ্ধ পত্র পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

১৯৫০/১৯৫১ সালে নলিনীরঞ্জন বড়ুয়ার সম্পাদনায় ত্রৈমাসিক 'পূর্ণিমা' প্রকাশিত হয়। ১৯৫৪ সালে সাংবাদিক-সাহিত্যিক বিশ্বেশ্বর চৌধুরীর সম্পাদনায় 'বিশ্ববাণী' প্রকাশ পায়। কয়েক সংখ্যা প্রকাশের পর বন্ধ হয়ে যায়। পত্রিকাটি ১৯৬৩-৬৪ সালে শীলব্রত চৌধুরীর সম্পাদনায় পুনঃ প্রচারিত হয়। কলকাতা থেকে ১৯৫৪/১৯৬১ সালে 'বিশ্ব বৌদ্ধ' নামে একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদনার দায়িত্বে ছিলেন বাগীশ বন্ধু মৎসুদ্দী, জ্ঞানতিলক শ্রমণ (ড. অমল বড়ুয়া) এবং ড. অরবিন্দ বড়ুয়া। কলকাতা থেকে মহাবোধি সোসাইটির বাংলা ভাষায় মুখপত্র হিসেবে ১৯৫৬ সালে 'নিরঞ্জনা' প্রকাশিত হয়। সোসাইটির অন্যান্য কার্যক্রম সচল থাকলেও পত্রিকাটি এখন প্রকাশিত হয় না। সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়া সম্পাদিত 'পারমিতা' (১৯৫৬) এবং সমাজসেবী ও সাহিত্যানুরাগী সত্যপ্রসন্ন বড়ুয়া সম্পাদিত 'অন্তিকা' বিশেষ করে সাহিত্য পত্রিকা হিসেবে প্রশংসার অধিকারী ছিল। চট্টগ্রামস্থ বৌদ্ধ সমিতির মুখপত্র হিসেবে বিভিন্ন পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত 'বিশ্ব মৈত্রী'-র প্রথম প্রকাশকাল ১৯৬০ সাল। সাহিত্যিক অশোক বড়ুয়া, অরুণ বিকাশ বড়ুয়া, বিমল কান্তি বড়ুয়া বিভিন্ন সময়ে 'বিশ্ব মৈত্রী' সম্পাদনা করেন। সমিতির অন্যান্য সাংগঠনিক কার্যক্রম অব্যাহত থাকলেও মুখপত্র হিসেবে পত্রিকাটি এখন প্রকাশিত হয় না। এসব পত্রিকাগুলোর প্রকাশনার সংখ্যা ও মান নিয়ে কোন গবেষণা এ পর্যন্ত হয়নি।

কৃষ্টি:

'দর্শন সাগর' নামে সুপরিচিত প্রিয়ানন্দ মহাথের কর্তৃক ১৯৫৬ সালে 'কৃষ্টি' প্রথম প্রকাশিত হয়। পত্রিকাটি বেশ কিছু বছর বন্ধ ছিল। বিভিন্ন সময়ে পত্রিকাটির সম্পাদনায় ছিলেন বিমলেন্দু বড়ুয়া, ড. প্রণব কুমার বড়ুয়া ও সুগতানন্দ মহাথের। বর্তমানে ঢাকা থেকে বাংলাদেশ বৌদ্ধ কৃষ্টি প্রচার সংঘের মাসিক মুখপত্র হিসেবে কৃষ্টি প্রকাশিত হয়। প্রধান সম্পাদক ও নির্বাহী সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন যথাক্রমে সংঘের সভাপতি সাংঘিক

ব্যক্তিত্ব শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ মহাথের এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সুমন কান্তি বড়ুয়া। পত্রিকাটি মাসিক হলেও মনে হয় অনিয়মিত বিশেষ করে পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। যা মে ২০০২ বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা'র সম্পাদকীয়তে স্বীকারও করা হয়েছে। 'বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের নিয়মিত মাসিক ধর্ম-দর্শন ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা হিসেবে কৃষ্টি'র যে জোয়ার শুরু হয়েছিল তা নানা কারণে আজ শ্লথ।' একই সালের আষাঢ়ী পূর্ণিমা সংখ্যায় সম্পাদকীয়তে উল্লেখ আছে: 'প্রকাশনা ছাড়া আমাদের উত্তরাধিকারীদের গৌরবোচিত ইতিহাস ও ঐতিহ্যের স্বত্ত্বাধিকারী করার কোন বিকল্প পথ নেই। অনন্তকালের সাক্ষী ও সম্পদে পরিণত হবে এইরূপ নিয়মিত প্রকাশনা'। এই উপলব্ধির পরও 'কৃষ্টি'র বিগত সংখ্যাগুলোর বিবেচনায় আমরা বলতে পারব না 'কৃষ্টি' তার নাম ও ক্যাপসনে প্রচারিত 'মাসিক সাহিত্য পত্রিকা'র বৈশিষ্ট্য-মান ধারণ করছে। অথচ আমরা যথেষ্ট যোগ্যতা ও সুযোগের অধিকারী 'কৃষ্টি'র নির্বাহী সম্পাদকের কাছ থেকে মানসম্মত 'কৃষ্টি' আশা করতে পারি।

নালন্দা :

কলকাতায় ১৯৩৫ সালে বিশ্ববিশ্রুত পণ্ডিত ড. বেণীমাধব বড়ুয়া কর্তৃক বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে প্রতিষ্ঠিত 'নালন্দা বিদ্যাভবন' এর মুখপত্র হচ্ছে 'বৌদ্ধ ধর্ম ও ভারত-সংস্কৃতিমূলক পত্রিকা, 'নালন্দা'। ত্রৈমাসিক এই পত্রিকাটি প্রথম ১৯৬৬ সালে ভারত সরকার কর্তৃক 'রাষ্ট্রপতি পুরস্কার'-এ ভূষিত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ধর্মাধার মহাস্থবির (১৯০১-২০০০) সম্পাদনা করেন। 'প্রাণের সঙ্গে বায়ুর যে সম্পর্ক তেমনি এক অচ্ছেদ্য বন্ধন ছিল তাঁর (ধর্মাধার মহাস্থবির) নালন্দা পত্রিকার সঙ্গে। তিনি বলতেন আমরা ভিক্ষু আমাদের সন্তান নেই কিন্তু নালন্দা বিদ্যাভবন ও নালন্দা পত্রিকা আমার সন্তান তুল্য' (সম্পাদকীয় ধর্মাধার জন্মশতবর্ষ স্মরণ সংখ্যা-নালন্দা, সম্পাদক ড. অমল বড়ুয়া)। প্রথম সংখ্যার বিষয়সূচি থেকে নালন্দা পত্রিকার মান উপলব্ধি করা যায়: বৌদ্ধ ধর্মের তিরোধান/ ড. অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায়, অধ্যাপক, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, মহাপরিনির্বাণ/শ্রী নির্মল চন্দ্র বড়ুয়া, গৌতমবুদ্ধ ও তাঁর সাধনা / শ্রী সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়া, অভিধর্ম/শ্রী শীলানন্দ ব্রহ্মচারি, কনিষ্ক ও বৌদ্ধ ধর্ম/শ্রী সুকুমার সেনগুপ্ত, অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বৌদ্ধ সাহিত্যে কবি অশ্বঘোষের অবদান / শ্রী লক্ষণ চন্দ্র সেনগুপ্ত, অধ্যাপক অষ্টাঙ্গ আয়ুর্বেদ কলেজ, রাহুল সাংকৃত্যায়ন / ড.দীপক কুমার বড়ুয়া, বিবেকানন্দের দৃষ্টিতে বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম/ শ্রী সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, নালন্দা বিদ্যাভবন/ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, অধ্যাপক কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় এবং বৌদ্ধ সংবাদ ও আমাদের কথা। পরবর্তীতে ১৯৭৪ সাল থেকে ড. সুকোমল চৌধুরী সম্পাদনা করেন। বর্তমানে ড. অমল বড়ুয়া সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন। উভয় বাংলায় সুপরিচিত এই পত্রিকাটি বর্তমানে নিয়মিত প্রকাশিত হয় না।

বোধিভারতী :

কলকাতাস্থ বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে ১৯৫৩ সালে বৌদ্ধ ছাত্র-যুবকদের সংগঠন হিসেবে 'বোধিভারতী' প্রতিষ্ঠা লাভ করে। প্রতিষ্ঠাতা আদর্শনিষ্ঠ সুপুরুষ শৈলেন্দ্র নাথ বড়ুয়া। ১৯৫৩ সালে বৌদ্ধ ছাত্র-ছাত্রী কর্তৃক হাতে-লেখা পত্রিকা হিসেবে সংগঠনের নামানুসারে 'বোধিভারতী'র আত্মপ্রকাশ। ১৯৭০ সালে প্রথম ছাপার অক্ষরে বার্ষিক সংকলন 'বোধিভারতী' ড. সুধাংশু বিমল বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রকাশিত হয়। শুরু থেকে বর্তমান পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্ম-সংস্কৃতি ও সাহিত্যধর্মী এ পত্রিকার অভিনব বৈশিষ্ট্য হচ্ছে শুধু বৌদ্ধ লেখকদের লেখা পত্রিকায় ছাপানো হয়। উদ্দেশ্যঃ বৌদ্ধ ছাত্র-তরুণদের সাহিত্য চর্চায় উদ্বোধিত করার মানসে স্বাধীন প্রচার ক্ষেত্র তৈরী করে দেওয়া। এ দৃষ্টিকোণ থেকে পত্রিকাটি উভয় বাংলায় একটি অনন্য সাময়িকী। ড. সুধাংশু বিমল বড়ুয়া, ড. সুকোমল চৌধুরী ও সমর বড়ুয়ার পর বর্তমানে 'বোধিভারতী'র সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন সুখ্যাত কবি প্রাবন্ধিক হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী। তাঁর সুসম্পাদনায় ২০০৩ সালে মানসম্পন্ন বাংলা-ইংরেজী দ্বিভাষিক 'বোধিভারতী' সুবর্ণজয়ন্তী সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। সুবর্ণ জয়ন্তীর সম্পাদকীয় মতে 'বাঙালি বৌদ্ধসমাজে সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চার ক্ষেত্রে বোধিভারতী এই দীর্ঘ চলার পথে আপন বোধির দীপ্তিতে ভাস্বর।'

মহান মুক্তিযুদ্ধের মধ্য দিয়ে বিশ্ব মানচিত্রে বিংশ শতাব্দীর ৭১ এ 'বাংলাদেশ' নামে এক স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের অভ্যুদয় ঘটে। নতুন রাষ্ট্রে রাজনীতি-অর্থনীতি-সমাজনীতি পরিবর্তনের পাশাপাশি শিল্প-সাহিত্য, সংস্কৃতি, ধর্ম, বিজ্ঞান, ইতিহাস-ঐতিহ্য চর্চায়ও আমূল পরিবর্তন সাধিত হতে লাগল। নতুন উদ্যমে সংখ্যালঘিষ্ট বৌদ্ধরাও শিক্ষা-দীক্ষা, খেলাধূলা, সাহিত্য-সংস্কৃতি চর্চায়, আর্থসামাজিক-রাজনৈতিক বিকাশে সামিল হলো। সমাজের অর্থনৈতিক ভিত কিছুটা দৃঢ়তা পেতে লাগল, সচ্ছল মধ্যবিত্ত শ্রেণীর বিকাশ ঘটতে লাগল। ফলে ৭০ এর দশক থেকে বিংশ শতাব্দীর শেষ দশক পর্যন্ত কয়েকটি সংগঠনের উদ্ভব, অনুষ্ঠান-উৎসবাদি উপলক্ষে পত্র-পত্রিকা প্রকাশ এবং নিয়মিত ও অনিয়মিত বেশ কিছু মানসম্পন্ন বৌদ্ধ সাময়িক পত্র-পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে।

অনোমা:

চট্টগ্রাম থেকে সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বার্ষিক পত্রিকা 'অনোমা' ১৯৭৭ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ১১ সদস্য বিশিষ্ট অনোমা পরিচালনা বোর্ড কর্তৃক প্রকাশিত প্রচারিত 'অনোমা'র প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক অরুণ বিকাশ বড়ুয়া। জন্মলগ্নেই পত্রিকাটি তথা সম্পাদকের দৃঢ় প্রত্যয়-'অনোমা একটি সাংস্কৃতিক পত্রিকা। সংস্কৃতি চর্চার স্বার্থেই এর জন্ম। ইতিহাস, ঐতিহ্য ও কৃষ্টি-আমাদের স্বরূপ অন্বেষাই এর লক্ষ্য। সাথে সাথে সমাজকে প্রত্যক্ষ করা ও প্রতিফলিত করা, বৃহৎ সামাজিক ঐক্যবোধের ধারণায় উজ্জীবিত করাও এর লক্ষ্যান্তর্গত।...

ক্ষুধার সাথে, দারিদ্র্যের সাথে এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে সংস্কৃতিই শিক্ষা দেয়। সংস্কৃতি শিক্ষা দেয় মুক্ত হতে, উদার হতে, চক্রান্ত বিহীন হতে; যেখানে সংকীর্ণতা, স্বার্থপরতা, স্থূলতা, স্থবিরতা সেখানে সংস্কৃতি তার বিরুদ্ধে মুক্তবুদ্ধি, স্বচ্ছ দৃষ্টি, উদার মানবিকতাবোধ, সূক্ষ্ম রুচিজ্ঞান, আদর্শিত জীবনবোধের ধারণা ও গতিময়তা আমদানী করে।' পত্রিকাটি সর্বজনীনবোধ, আধুনিক বিজ্ঞানমনস্কতা, প্রগতিশীল চিন্তা-চেতনা এবং অসাম্প্রদায়িক দৃষ্টিভঙ্গির জন্য উভয় বাংলার সর্ব মহলের কাছে আদৃত হয়ে উঠে। সময়ের পরিবর্তনের সাথে পত্রিকাটির অবয়বের বেশ পরিবর্তন সাধিত হয়। ১৯৮২ সালে অনোমা'কে কেন্দ্র করে 'অনোমা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী' গঠিত হলো। গোষ্ঠীর সংবিধানে তাঁর বুদ্ধি, মেধা, সাহিত্য প্রতিভার স্বীকৃতি স্বরূপ অরুণ বিকাশ বড়ুয়াকে অনোমা'র আজীবন সম্পাদকের মর্যাদায় অভিষিক্ত করা হয়। ১৯৭৭ সাল থেকে ১৯৯৫ সাল পর্যন্ত অনোমা সম্পাদনা করেন অরুণ বিকাশ বড়ুয়া। তাঁর মৃত্যুজনিত কারণে ১৯৯৬ সাল থেকে গোষ্ঠীর সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক বার্ষিক মুখপত্র 'অনোমা' সম্পাদনার দায়িত্ব পালন করছেন বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রাবন্ধিক, প্রবীণ সমাজ-সংস্কৃতি কর্মী অধ্যাপক বাদল বরণ বড়ুয়া। 'নতুন ও পরিবর্তিত জীবনের জন্য সংস্কৃতি চর্চা অপরিহার্য' এ চিন্তাধারায় প্রকাশনা জগতের শত প্রতিকূলতার মাঝেও বিগত ২৯বছর ধরে অনোমা তার মানের ধারাবাহিকতা বজায় রেখে প্রকাশিত হচ্ছে। আমি নিজে যেহেতু এ পত্রিকার সম্পাদনার সাথে সম্পৃক্ত, তাই এ পত্রিকার বৈশিষ্ট্যগত মান সম্পর্কে নিজে না বলে বর্তমানে বৌদ্ধ পত্রিকা সম্পাদনায় সুখ্যাত 'চারুলতা' সম্পাদক উত্তমকুমার বড়ুয়াকে উদ্ধৃতি দিচ্ছি: 'স্বকীয়তায় ভীড়ে অনোমা আজো শ্রেষ্ঠত্বের গৌরবে একক।.অনোমা'র লেখক ও লেখার বিষয় নির্বাচনে সর্বজনীনতা আমাকে মুগ্ধ করে। বিশেষতঃ গবেষণাধর্মী ও বিষয়ভিত্তিক মৌলিক লেখা প্রকাশের ক্ষেত্রে প্রাজ্ঞতা অন্য যেকোন বৌদ্ধ পত্রিকা থেকে (এমনকি জাতীয় ক্ষেত্রেও) অনোমা'কে স্বতন্ত্র ঔজ্জ্বল্য দান করেছে। গৌরবের ২৫ বছরে অনোমা তার সৃষ্টির অনন্যতা দিয়ে সংস্কৃতি ও সমাজমনস্ক মানুষের চিন্তার জগতকে আলোড়িত করে নানাভাবে।' (অনোমার জন্য পত্র কয়েক ছত্র/ অনোমা ২৫ বছর পূর্তি স্মারক, ২০০১)। তবে যুগোপযোগী ধারণার বিপরীতে বৃত্তাবদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনাও পরিলক্ষিত হচ্ছে। এখনই সম্পাদকসহ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গকে সচেতন হতে হবে, না হয় শুধু নিয়ম রক্ষার জন্য প্রকাশিত হবে সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি, শিল্প-সাহিত্যের কোন কাজে আসবে না।

জ্যোতি:

'জ্যোতি' পালি বুক সোসাইটি বাংলাদেশ -এর বার্ষিক মুখপত্র। 'স্বদেশ ও বিদেশে মহামানব গৌতম বুদ্ধের জীবন দর্শনকে এবং তারই আলোকে বৌদ্ধ ধর্মের সুমহান ঐতিহ্যকে প্রচার মানসে' (সম্পাদকীয় ১৯৭৮) ১৯৭৮ সালে শুভ বুদ্ধ পূর্ণিমা উপলক্ষে 'জ্যোতি'

প্রথম প্রকাশ পায়। বাংলা ও ইংরেজী দ্বিভাষিক জ্যোতি সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক, সমাজ-সংস্কৃতি কর্মী ও নাট্যকর্মী বিজয় কৃষ্ণ বড়ুয়া ১৯৭৮ সাল থেকে ১৯৮৮ সাল পর্যন্ত সম্পাদনা করেন। ১৯৮৯ সাল থেকে জ্যোতি সম্পাদনার দায়িত্বে আছেন লেখক-শিক্ষক-সংগঠক সলিল বিহারী বড়ুয়া। পত্রিকাটি এখনো প্রকাশিত হয়, কিন্তু বর্তমানে মানের প্রসারতা আশানুরূপ নয়।

বৌদ্ধ একাডেমী পত্রিকা/ বুদ্ধিস্ট একাডেমী জার্ণাল :

বাংলাদেশ বৌদ্ধ একাডেমী প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে গঠিত 'বৌদ্ধ একাডেমী বাস্তবায়ন কমিটি' র মুখপত্র হিসেবে ১৯৮৯ সালে বৌদ্ধ একাডেমী পত্রিকার আত্মপ্রকাশ, সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন সমাজের কৃতী সন্তান, কবি- লেখক, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজী বিভাগের অধ্যাপক তপন জ্যোতি বড়ুয়া। পত্রিকার লক্ষ্য-উদ্দেশ্য সম্পর্কে সম্পাদকের বলিষ্ঠ -স্পষ্ট উচ্চারণ: 'বাংলাদেশের বৌদ্ধ সম্প্রদায় কোন অর্বাচীন ছিন্নমূল অনিকেত মানবগোষ্ঠী নয়। এই দেশেরই মানস মৃত্তিকার গভীরে বৌদ্ধ সমাজের শিকড় প্রোথিত। বাংলার অন্যান্য দৃঢ়মূল জনগোষ্ঠীর পাশাপাশি সুপ্রাচীন অতীত থেকে বিবর্তিত হতে হতে বৌদ্ধ সমাজ বিশ শতকের প্রান্তিক সময়ে আজ উপনীত। এই সুদীর্ঘ বিবর্তনের এক ঐতিহাসিক পর্বে বৌদ্ধ মহিমান্বিত ঐতিহ্য। উৎসের সঞ্জীবনী প্রাণ ঝোরার অনিঃশেষ ধারায় বারবার অভিষিক্ত হয়ে জাতিকে আমরা প্রাণিত রাখতে চাই। আমাদের ঐতিহ্য ও ঐতিহ্যচর্চা কেবলই অতীতমুখী হবে না। প্রগতি অভিসারী সমকালীন চিন্তা-চেতনা ও কর্ম প্রয়াসের সাথেও সংলগ্নতা থাকবে আমাদের' (সম্পাদকীয় প্রথম বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ডিসেম্বর ১৯৮৯)। প্রথম সম্পাদকীয়তে ঘোষণা ছিল বৎসরে তিনটি সংখ্যায় এটি প্রকাশিত হবে এবং বৎসরে এক বিশেষ ইংরেজী সংখ্যা (বুদ্ধিস্ট একাডেমী জার্ণাল) প্রকাশিত হবে। এভাবে অনিয়মিতভাবে বাংলা-ইংরেজী ভাষায় কয়েকটি সংখ্যা অধ্যাপক তপন জ্যোতি বড়ুয়া সম্পাদনা করেন, সমাজ সুসম্পাদনাজাত বৌদ্ধ একাডেমী পত্রিকা ও জার্ণাল আশান্বিত হলো। কিন্তু বিভিন্ন কারণে ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল। পরবর্তীতে বুদ্ধিস্ট একাডেমী জার্ণাল এক সংখ্যা (১৯৯৪) সম্পাদনা করলেন অধ্যক্ষ নীলোৎপল বড়ুয়া, ২০০১ সালে সম্পাদনার দায়িত্ব নিলেন অধ্যাপক শিশির বড়ুয়া। তাঁর সম্পাদনায় বাংলা-ইংরেজী দ্বিভাষিক বুদ্ধিস্ট একাডেমী জার্ণাল অনিয়মিতভাবে প্রকাশিত হচ্ছে।

চারুলতা:

ঢাকা থেকে 'বৌদ্ধ মননশীলতার উৎকৃষ্টধর্মী পত্রিকা' 'চারুলতা' ১৯৯৬ সালে প্রাণোচ্ছল স্পষ্টবাদী সমাজ-সংস্কৃতি সংগঠক উত্তম কুমার বড়ুয়ার সম্পাদনায় প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রকাশনার উদ্দেশ্য: 'বৌদ্ধ শিল্প-সাহিত্য ও সংস্কৃতির মুখপত্র হয়ে ওঠার সুপ্ত বাসনা নিয়ে

আত্মপ্রকাশ করে চারুলতা। চারুলতা বিচরণ করতে চায় বৌদ্ধ শিল্প, সাহিত্য, দর্শন, ঐতিহ্য ও জীবন চর্চার ব্যাপৃত বেলাভূমে। স্পর্শ করতে চায় বৌদ্ধ সমগ্রতাকে এবং সেটা গভীরতর অর্থে' (চারুলতা ডায়েরী)। অল্প সময়ের মধ্যে চারুলতা অভীষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে অনেক এগিয়ে গেছে। আজ স্বমহিমায় সমুজ্জ্বল, লাভ করেছে পাঠক জনপ্রিয়তা। চারুলতাকে কেন্দ্র করে ২০০১ সালে সংগঠন 'চারুলতা পরিষদ' গঠিত হয়। ফলে প্রকাশনা ও সাংগঠনিক কর্ম উদ্যোগ বেড়ে যায়। দশ বছরে যে ২১টি সংখ্যা চারুলতা প্রকাশ পায়, তার মধ্যে তিথি বিভ্রাট সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ১৯৯৯), কীর্তিমান সংখ্যা (১৯৯৮), প্রজন্ম ও ক্যারিয়ার সংখ্যা (সেপ্টেম্বর ২০০০), আলোকিত নারী প্রতিভা মুৎসুদ্দী সংখ্যা (এপ্রিল ১৯৯৯), ছড়াকার সুকুমার বড়ুয়া সংখ্যা (মে ১৯৯৭), গণকবিয়াল ফণী বড়ুয়া সংখ্যা (সেপ্টেম্বর) আলোকিত জ্যোতিঃপাল (অক্টোবর ২০০২), আফগানিস্তানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংসের প্রেক্ষিতে 'হিংস্রতার কবলে অহিংস বুদ্ধ' সংখ্যা (মে ২০০১), ভিক্ষু জ্ঞানজ্যোতি হত্যার পর 'দানবীয় সন্ত্রাসে বিপন্ন মানবতা' সংখ্যা (মে ২০০২) ইত্যাদি বিশেষ সংখ্যাগুলো পাঠক সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে। চুম্বকীয় অথচ যুক্তি নির্ভর যুগোপযোগী চিন্তাঋদ্ধ সুন্দর ভাষাশৈলী সমৃদ্ধ সম্পাদকীয়, চেতনা জাগানিয়া বিষয় নির্ধারণ ও বিষয়ে প্রাজ্ঞ লেখক নির্বাচন এবং আকর্ষণীয় অঙ্গসৌষ্ঠবের কারণে বর্তমানে বৌদ্ধ সাময়িক পত্র-পত্রিকাগুলোর মধ্যে চারুলতার স্থান অনন্য।

সৌগত :

ঢাকা থেকে উদ্যমী, কর্মনিষ্ঠ ভিক্ষু সুনন্দপ্রিয় সম্পাদিত বুদ্ধচর্চার অনবদ্য ম্যাগাজিন 'সৌগত' প্রকাশিত হচ্ছে ১৯৯৬ সাল থেকে। বিশেষ করে পূর্ণিমা উপলক্ষে সাময়িকীটি প্রকাশ পায়। মাঝে মাঝে বিশেষ সংখ্যাও প্রকাশিত হয়। যেমন সংঘরাজ শীলালঙ্কার সংখ্যা, আফগানে বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস ও তালেবানী বর্বরতা সংখ্যা, একুশ শতক: বাংলাদেশের বৌদ্ধদের নিয়ে ভাবনা সংখ্যা ইত্যাদি। পত্রিকাটিতে বৌদ্ধ ধর্ম সংস্কৃতি দর্শন, শিল্প-সাহিত্য বিষয়ক প্রবন্ধ, গল্প, ভ্রমণ কাহিনী, কবিতাসহ বিভিন্ন স্বাদের লেখা উপস্থাপিত হয়। যার ফলে পাঠক তার প্রয়োজনীয় বিষয় সম্পর্কে অবহিত হতে পারেন। প্রায় সংখ্যায় উত্তর বঙ্গের আদিবাসী বৌদ্ধদের সমাজ-সংস্কৃতি প্রকাশের প্রচেষ্টা নিঃসন্দেহে প্রশংসনীয় দিক। প্রতিটা সংখ্যাতে অঙ্গসৌষ্ঠব ও মান বৃদ্ধির প্রচেষ্টা পরিলক্ষিত হয়।

সম্যক:

চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংগঠক ও সমাজকর্মী স্বপন কুমার বড়ুয়া সম্পাদিত 'বৌদ্ধ ধর্মীয় সমাজ সংস্কৃতিমূলক মুখপত্র 'সম্যক' প্রথম প্রকাশিত হয় ১৯৯৬ সালে। মধ্যখানে পত্রিকাটি কয়েক বছর বন্ধ ছিল। পত্রিকাটিতে কিছু কিছু সম্পাদকীয় সময়োপযোগী, যেমন বৌদ্ধ বিহারে বিয়ের মন্ত্র প্রদান একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ (৯ম বর্ষ, আষাঢ়ী পূর্ণিমা

সংখ্যা), বুদ্ধ পূর্ণিমার সঠিক তারিখ নির্ধারণে আর কত বছর বিভ্রাট চলবে... (১০ম বর্ষ, বুদ্ধ পূর্ণিমা সংখ্যা) ইত্যাদি। জনমত সংগঠিত করার জন্য সম্যক-এর কিছু কার্যক্রম ইতিবাচক, যেমন 'বৌদ্ধদের বিবাহ অনুষ্ঠানে প্রাণী হত্যা' বন্ধের পক্ষে প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিত্বের মতামত গ্রহণ। পত্রিকাটিতে শুধু বৌদ্ধ সমাজ ধর্ম সংস্কৃতি ও ব্যক্তিত্ব বিষয়ক লেখা উপস্থাপিত হয়।

অমিতাভ :

একবিংশ শতাব্দী তথা নতুন সহস্রাব্দে যে কয়েকটি নতুন বৌদ্ধ পত্রিকার আত্মপ্রকাশ ঘটে তার মধ্যে প্রকাশনার ধারাবাহিকতায়, নান্দনিক প্রচ্ছদ, বুদ্ধিদীপ্ত লেখা উপস্থাপনা এবং পত্রিকাকে কেন্দ্র করে নানান মনন-সৃজন ঋদ্ধ কর্মোদ্যোগের কারণে 'অমিতাভ' পাঠক সমাজের কিছুটা দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়েছে। ফিচার লেখক, তরুণ সমাজ-সংস্কৃতিকর্মী শ্যামল চৌধুরী'র সম্পাদনায় চট্টগ্রাম থেকে এই ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রথম প্রকাশ পায় ২০০১ সালে। পত্রিকাটি এ পর্যন্ত প্রতি বছর চারটি করে নিয়মিত প্রকাশিত হচ্ছে। পত্রিকাটিতে বৌদ্ধ সমাজ, বৌদ্ধধর্ম-সংস্কৃতি ছাড়াও সার্বজনীন লেখা উপস্থাপিত হয়। কিছু কিছু সম্পাদকীয় বুদ্ধিদীপ্ত এবং সাহসী। যেমন: 'ধর্মীয় অনুশাসন মোতাবেক আমাদেরকে নানা অনুষ্ঠানাদি করতে হয় বা করে থাকি। কিন্তু অনেক সময় ধর্মীয় অনুশাসনের তোয়াক্কা না করে নিছক লৌকিকতার খাতিরে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় করে থাকি। বিশেষ করে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের সংবর্ধনা, মহাস্থবির বরণ ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ানুষ্ঠানের ক্ষেত্রে তা দেখা যায়। এ ধরনের পবিত্র, গাম্ভীর্যপূর্ণ, মর্যাদাব্যঞ্জক অনুষ্ঠানকে অহেতুক সময় নষ্ট, আর্থিক অপচয় ও হৈ হুল্লোড় ধরনের জাঁকজমকপূর্ণ অনুষ্ঠানে পরিণত করা হয় যা সম্পূর্ণ অযৌক্তিক, নীতি বহির্ভূত, অবৌদ্ধিক কাজ। মোটেও বৌদ্ধরীতির পর্যায়ে পড়ে না। বলাবাহুল্য, যাঁর উদ্দেশ্যে এ ধরনের অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয় তাঁর স্মৃতি রক্ষাকল্পে কোন প্রকল্প প্রণয়ন ও বাস্তবায়নে দূরদর্শী কোন চিন্তা করা হয় বলে মনে হয় না। শুধুমাত্র অনুষ্ঠানের দিনেই এর সার্থকতা নিহিত থাকে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যায়, অনুষ্ঠান উপলক্ষে সংগৃহীত পুরো টাকাই খরচের আওতায় পড়ে যায়, পরবর্তীতে কোন প্রকল্প বাস্তবায়ন বা স্মৃতি মন্দির নির্মাণের জন্য আবারও অর্থ সংগ্রহ করতে হয়। অনেক সময় তা বাস্তবে রূপ দেওয়াও অসম্ভব হয়ে পড়ে। তাই এসব অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া-সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে অপ্রয়োজনীয় খাতে অর্থের অপচয় না করে, অর্থের ব্যবহার সংক্ষিপ্ত করে বিভিন্ন প্রকল্প প্রণয়ন যেমন-গরীব মেধাবী শিক্ষার্থীদের বৃত্তি প্রদান, ধর্মীয় পুস্তক প্রকাশনা, অসুস্থ ভিক্ষুদের চিকিৎসার জন্য ফান্ড গঠন, দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠা করা যেতে পারে। যাতে করে সমাজ ও সদ্ধর্মের প্রভূত উন্নয়ন সাধিত হবে।' (৩য় বর্ষ, দ্বাদশ সংখ্যা, আষাঢ়ী পূর্ণিমা, ৩১ জুলাই ২০০৪) পত্রিকাটির উদ্যোগে গৃহীত গ্রন্থ প্রকাশনা উৎসবের আয়োজন, আনন্দ ভ্রমণ-গ্রাম -উপজেলা ভিত্তিক

প্রতিনিধিদের নিয়ে কর্মশালার আয়োজন, কুইজ প্রতিযোগিতার আয়োজন, বিষয়ভিত্তিক প্রতিনিধিত্বশীল ব্যক্তিদের মতামত গ্রহণ, সেমিনারের আয়োজন, গ্রন্থ প্রকাশনা (প্রথম প্রকাশিত গ্রন্থ সাহিত্যিক-সাংবাদিক বিমলেন্দু বড়ুয়া রচিত 'জাতক প্রেমকথা') ইত্যাদি কার্যক্রম দ্বারা পত্রিকার উৎকর্ষতা বাড়ছে। ক্রমে লাভ করছে নতুন নতুন পাঠক।

বোধিবার্তা:

নিরপেক্ষতায় সচেষ্ট বৌদ্ধ ধর্মীয় সামাজিক সাংস্কৃতিক মুখপত্র 'বোধিবার্তা' প্রথম প্রকাশিত হয় মুকুল রতন বড়ুয়ার সম্পাদনায় ১৯৯৪ সালে, বর্তমানেও তিনি পত্রিকাটির সম্পাদক। আগের সংখ্যায় ট্যাবলয়েড সাইজে বের হতো, বর্তমানে দৈনিক পত্রিকা আকারে কলেবরে প্রকাশিত 'বোধিবার্তা'টি বিশেষ করে পূর্ণিমা উপলক্ষে প্রকাশিত হয়। মাঝখানে কিছু সময় পত্রিকাটি প্রতি মাসে প্রকাশ পেত। পত্রিকাটিতে এক সংখ্যা প্রকাশের পর হতে পরবর্তী সংখ্যা প্রকাশের আগে পর্যন্ত বৌদ্ধ সমাজ-ধর্ম-সংস্কৃতি সম্পর্কিত দেশীয় আন্তর্জাতিক প্রায় সকল সংবাদ, মনে হয়, প্রকাশিত হয়।

আরো কিছু উল্লোখযোগ্য বৌদ্ধ সাময়িক পত্র-পত্রিকা হচ্ছে সনৎ কুমার বড়ুয়া সম্পাদিত 'একটি বৌদ্ধ ধর্মীয় সামাজিক মুখপত্র' 'ময়নামতি' (১৯৯৭), বাংলাদেশ বুড্ডিস্ট ফাউন্ডেশনের মুখপত্র 'দি ফাউন্ডেশন' (১৯৯১), চট্টগ্রাম বৌদ্ধ বিহারের কঠিন চীবর দানোৎসব উপলক্ষে প্রকাশিতশ্রীমান বড়ুয়া সম্পাদিত 'অর্ঘ্য', পটিয়া কেন্দ্রীয় বৌদ্ধবিহার ও কল্যাণ প্রকল্পের উদ্যোগে কঠিন চীবর দানোৎসব উপলক্ষে অধ্যাপক অভিজিৎ বড়ুয়া মানু সম্পাদিত 'বোধি' (২০০২) পত্রিকাটি অল্প সময়ের মধ্যে অঙ্গসৌষ্ঠব ও গুণগত উৎকর্ষতার কারণে সুধী সমাজের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে সক্ষম হয়। সাংবাদিক অশ্রু বড়ুয়া সম্পাদিত ত্রৈমাসিক 'মহাকারুণিক' (২০০০) চার রঙা ট্যাবলয়েড পত্রিকা হিসেবে পাঠকের কিছুটা আকর্ষণ করে। বাংলাদেশ বুদ্ধিষ্ট ফেডারেশনের মুখপত্র 'দীপঙ্কর', বাংলাদেশ বৌদ্ধ যুব পরিষদের মুখপত্র 'সাম্য', সাতকানিয়া-লোহাগাড়া বৌদ্ধ ঐক্য পরিষদের মুখপত্র 'ঐক্য', মহামুনি তরুণ সংঘের প্রকাশনা 'সম্ভবা', মহামুনি সংস্কৃতি সংঘের প্র কাশনা 'প্রবাহ', ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের প্রকাশনা 'সৌম্য', চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের প্রকাশনা 'গৈরিক', চট্টগ্রাম কলেজ বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের প্রকাশনা ' জ্যোতিকা', চট্টগ্রাম মেডিকেল কলেজ বৌদ্ধ ছাত্র সংসদের বার্ষিকী 'স্বস্তিকা', দীপক বড়ুয়া সৃজন সম্পাদিত 'মুক্তকথা', অধ্যাপক প্রিয়তোষ বড়ুয়া সম্পাদিত 'সম্বোধি', বি. সুনন্দ থের সম্পাদিত 'ধর্মবংশ', ছন্দক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর মুখপত্র 'ছন্দক', সময়ের সত্যসন্ধানী পত্রিকা 'পোস্ট মর্টেম' ইত্যাদি। বাংলাদেশের চট্টগ্রাম বা ঢাকা থেকে পত্রিকাগুলো নিয়মিত বা অনিয়মিতভাবে এখনো প্রকাশিত হয়।

কলকাতা থেকে প্রকাশিত সর্বভারতীয় বৌদ্ধ মিশনের পত্রিকা 'মিশন দর্পণ' (১৯৮৬),

শান্তিনিকেতন আম্বেদকর বুদ্ধিস্ট ওয়েলফেয়ার মিশনের মুখপত্র 'বোধিরশ্মি', সংঘনায়ক আনন্দমিত্র মেমোরিয়াল এন্ড কালচারাল সেন্টারের মুখপত্র 'আনন্দরশ্মি' (২০০২), কবি সুগত বড়ুয়া সম্পাদিত ত্রৈমাসিক কবিতাপত্র 'কাছে দূরে' (১৯৭৪) সম্পাদকের মৃত্যুজনিত কারণে পত্রিকাটি এখন প্রকাশিত হয় না।

ইহা ছাড়াও জয়ন্তী স্মারক, সংবর্ধনা স্মারক, অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া স্মারক হিসেবে ঢাউস সাইজের প্রায় ক্ষেত্রে বাণী প্রধান এ পর্যন্ত অনেক পত্রিকা বাংলাদেশ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। সংগঠন আধিক্য, সম্পাদক হিসেবে আত্মপ্রচার মানসিকতা, মুদ্রণ শিল্পের ব্যাপক অগ্রগতি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর আত্মপ্রকাশ ইত্যাদি কারণে স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলাদেশে সংখ্যালঘিষ্ঠ বৌদ্ধদের বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকার সংখ্যা দ্রুত বর্ধনশীল। এসব বৌদ্ধপত্রিকাগুলো বৌদ্ধ সমাজ বিনির্মাণে কতটুকু ভূমিকা রেখেছে তা জানার জন্য প্রতিটা পত্রিকার উপর বিশদ পদ্ধতিগত আলোচনা প্রয়োজন।

তথ্যসূত্র:

১) বিভিন্ন বৌদ্ধ পত্র-পত্রিকা

২) সাময়িক পত্রে জীবন ও জনমত — ড. মুস্তাফা নূর-উল ইসলাম (১৯৭৭, বাংলা একাডেমী, ঢাকা)

৩) উনিশ শতকে বাংলাদেশের সংবাদ সাময়িকপত্র —ড. মুনতাসীর মামুন (২০০০, ঢাকা)

৪) সাময়িকপত্র ও সমাজ গঠন বাংলাদেশের পরিস্থিতি— ড. ইসরাইল খান (২০০৬, ঢাকা)

মহামনীষী ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া

বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী*

উনবিংশ শতাব্দী বাংলার বৌদ্ধ সমাজের ইতিহাসের এক পুনরুত্থান যুগ। বৌদ্ধধর্ম বুদ্ধের জীবিতকালে সমগ্র উত্তর-মধ্য ভারতে সহস্র সহস্র মানুষকে আত্মশুদ্ধি ও আত্মমুক্তিতে এবং বিশ্বমৈত্রী ভাব পোষণে উদ্বুদ্ধ করেছিল। সম্রাট অশোকের সময়ে তা সারা ভারতে এবং বহির্ভারতের কয়েকটি দেশে প্রসারিত হল, এমনকি ক্রমে সমগ্র এশিয়া মহাদেশে পরিব্যাপ্ত হয়ে বিভিন্ন দেশের জনমানসের হৃদয় জয় করে তাদের কৃষ্টি ও সভ্যতার প্রধান হেতু হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু নানা কারণে কালক্রমে ভারত ভূখণ্ডে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্ত হয়ে গেল, কেবলমাত্র চট্টগ্রামে তান্ত্রিক প্রভাবে বিকৃত প্রায় বৌদ্ধধর্ম, ভিক্ষুসংঘ ও গৃহস্থ সমাজ তাঁদের অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। সৌভাগ্যের বিষয় উনবিংশ শতক ও বিংশ শতকের গোড়ার দিকে আরাকানের সংঘরাজ সারমেধ মহাস্থবির, আচারিয়া পুন্নাচার, চট্টগ্রামের জ্ঞানালংকার মহাস্থবির (লালমোহন ঠাকুর), রাজগুরু ভগবান চন্দ্র মহাস্থবির, অগ্গমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির, জমিদার হরগোবিন্দ মুৎসুদ্দি, নাজির কৃষ্ণচন্দ্র চৌধুরী প্রভৃতি বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের নবজাগরণের পথিকৃৎ কতিপয় পণ্ডিত ও সমাজসংস্কারক ভিক্ষু এবং গৃহস্থের প্রচেষ্টায় চট্টগ্রামে থেরবাদ বৌদ্ধ ধর্ম পুনরুজ্জীবিত হল। এদিকে বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার প্রতিষ্ঠাতা কৃপাশরণ মহাস্থবির ও মহাবোধি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা অনাগারিক ধর্মপালের অক্লান্ত চেষ্টায় কলকাতা ও ভারতের অন্যান্য স্থানে বৌদ্ধধর্ম পুনঃপ্রতিষ্ঠিত হল। চট্টগ্রামের যে কয়েকজন বৌদ্ধ মনীষী ভিক্ষু ও গৃহী পালি ভাষা, বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শনে শিক্ষা লাভ করে বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চার পুনঃপ্রবর্তনে ব্রতী হন তাঁদের মধ্যে আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া অন্যতম ও অসাধারণ। তাঁর সমসময়ে যে কয়েকজন প্রতিভাবান মনীষী ভারতসন্তান তাঁদের সারস্বত সাধনায় ও অবদানে ভারতকে পৃথিবীতে উচ্চাসনে প্রতিষ্ঠিত করেছেন, আচার্য ডক্টর বেণীমাধব বড়ুয়া তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ আসন লাভের অধিকারী। তিনি বিশাল পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ মানবিক গুণের অধিকারী একজন মহাপুরুষ। তিনি ছিলেন একাধারে দার্শনিক, ঐতিহাসিক, প্রাচীন ভারতীয় জীবনদর্শনের অন্ধকারাচ্ছন্ন অধ্যায় উদ্‌ঘাটনের পথিকৃৎ, কাব্যধর্মী লেখক ও সমাজ সংস্কারক, অথচ ব্যক্তিগত জীবনে সরল, অনাড়ম্বর, সাম্প্রদায়িক চিন্তাধারামুক্ত, নিরপেক্ষ দৃষ্টিসম্পন্ন, সত্যসন্ধানী, দৃঢ়প্রতিজ্ঞ তেজস্বী একজন মানুষ। প্রায়

---

* ডঃ বিনয়েন্দ্র নাথ চৌধুরী এম.এ, পি.আর. এস, পি. এইচ. ডি. গভর্ণমেন্ট সংস্কৃত কলেজ কলকাতার প্রাক্তন অধ্যাপক এবং বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার সভাপতি।

ত্রিশ বৎসরব্যাপী সর্বতোমুখী প্রতিভাসম্পন্ন আচার্য বেণীমাধব বৌদ্ধধর্ম ও ভারততত্ত্ববিদ্যার বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন শাখায় বহু মৌলিক গ্রন্থ, প্রবন্ধ নিবন্ধ রচনা করে গিয়েছেন, যেগুলি দেশ-বিদেশের বিদ্বজ্জনসমাজে অমূল্য সম্পদ হিসাবে স্বীকৃতি লাভ করেছে। তিনি এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ডি. লিট. ডিগ্রি লাভ করেছেন। যদিও তাঁর মত মহাপুরুষের সম্পূর্ণ মূল্যায়ন সম্ভব নয়, এখানে তাঁর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য চিত্রণের প্রয়াস করছি।

মহাপুরুষ বা প্রতিভাবান ব্যক্তির জীবনী আলোচনার একটা শিক্ষণীয় দিক আছে। মহাপুরুষের জীবনবৃত্তান্ত ও অবদান আমাদের জীবনযাত্রায় প্রেরণা দেয় এবং তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমরা অন্তত কিছুটা বড় হতে পারি। বেণীমাধব বড়ুয়া ইংরেজী ১৮৮৮ সালের ৩১ শে ডিসেম্বর অবিভক্ত বাংলার চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার অন্তর্গত মহামুনি পাহাড়তলী নামে বর্ধিষ্ণু গ্রামে এক বনেদী মধ্যবিত্ত পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। পিতা রাজচন্দ্র তালুকদার, পেশায় কবিরাজ ও কিছু ভূসম্পত্তির অধিকারী ছিলেন। মাতা ধনেশ্বরী দেবী ঐ গ্রামের জমিদার ইনজিনীয়ার দক্ষিণা রঞ্জন মুৎসুদ্দির কন্যা। বেণীমাধবেরা ভাইবোন মিলে এগারজন— অশ্রুমতী, চারুমতী, শুভংকরী, ক্ষেমংকরী, শুভদা ও নর্মদা নলিনী এবং বেণীমাধব, কানাইলাল, সুধীরচন্দ্র, বিশ্বামিত্র ও যদুগোপাল। বেণীমাধব ছিলেন পিতামাতার চতুর্থ সন্তান এবং ভাইদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তিনি ছয় বৎসর বয়সে গ্রামের মডেল স্কুলে ভর্তি হন পৈতৃক তালুকদার পদবী ত্যাগ করে বেণীমাধব বড়ুয়া নামে। এই নামেই তিনি বড়ুয়া সমাজের মুখ উজ্জ্বল করেছেন। এই বিদ্যালয় থেকেই তিনি প্রাইমারী এবং মিড্‌ল ইংলিশ (M.E.) পরীক্ষা পাশ করে ১৯০২ খৃষ্টাব্দে চট্টগ্রাম শহরে যান উচ্চতর শিক্ষার জন্য। সেখানে ১৯০৬ খৃষ্টাব্দে চিটাগং কলেজিয়েট স্কুল থেকে এন্ট্রান্স পরীক্ষা এবং ১৯০৮ খৃষ্টাব্দে চিটাগং কলেজ থেকে এফ. এ পরীক্ষা পাশ করেন। চট্টগ্রাম শহরে থাকাকালীন তিনি ধর্মবংশ ভিক্ষুর কাছে পালি শিক্ষা করেন। এই সময়ে তাঁর ভবিষ্যত জীবনের বীজ উপ্ত হয়। গতানুগতিক পরীক্ষা সংক্রান্ত পাঠ্যপুস্তকের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে নিজের রুচি অনুযায়ী পাঠ্যতালিকা বহির্ভূত ইংরেজী, বাংলা, ইতিহাস, ভূগোল ইত্যাদি নানাবিধ গ্রন্থ পাঠে অধিক সময় ব্যয় করতেন। ইংরেজী ও বাংলা সাহিত্যের প্রতি তাঁর স্বাভাবিক আকর্ষণ ছিল। ভাল ইংরেজী লিখতে পারতেন বলে তিনি শিক্ষকদের খুব প্রিয় ছাত্র ছিলেন। ইংরেজী ও বাংলা ভাষার প্রতি যে অনুরাগ ও দখল ছিল তা উত্তরকালে পরিবর্ধিত ও বিকশিত হয়ে তাঁর রচিত গবেষণামূলক গ্রন্থ ও নিবন্ধাদিতে সাহিত্যধর্মী বৈশিষ্ট্যে পরিস্ফুট হয়েছে।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দে ছাত্রাবস্থায় পিতার ইচ্ছানুসারে বেণীমাধব স্বগ্রামের পঙ্কজা সুন্দরী দেবীর সাথে বিবাহ-বন্ধনে আবদ্ধ হন। পরবর্তীকালে কর্মব্যস্ত সমস্যাসংকুল বেণীমাধবের অধ্যাপক জীবনে এই মহীয়সী মহিলার অবদান অপরিসীম। মধ্যবিত্ত পিতার পক্ষে তাঁর শিক্ষার

ব্যয়ভার বহন সম্ভব নয় বলে এতদিন তাঁর পিতৃব্য ধনঞ্জয় তালুকদার তাঁর শিক্ষার জন্য অর্থব্যয় করতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত এফ.এ. পরীক্ষার পরই তাঁর পিতৃব্যের মৃত্যু হয় এবং তাঁর উচ্চশিক্ষা লাভের পথে তা অন্তরায় হয়। পিতৃব্য ও পিতৃব্যপত্নীর নিকট চিরকৃতজ্ঞ ছিলেন। তাঁর মধ্যমনিকায় (১ম) উৎসর্গপত্রে তা অকুণ্ঠচিত্তে স্বীকার করেছেন। অদম্য পিতা জ্যেষ্ঠপুত্রের উচ্চশিক্ষার জন্য মেজ ছেলে কানাইলালকে চাকরি করার উদ্দেশ্যে রেঙ্গুন পাঠালেন। তিনি ছোট ভাইয়ের ঋণ কোনদিন ভোলেন নি। তিনি বি. এ. পড়ার জন্য কলিকাতার স্কটিশ চার্চ কলেজে ভর্তি হন। সেখানে পালি অনার্স পড়ার ব্যবস্থা না থাকায় প্রেসিডেন্সী কলেজের ক্লাসে যোগ দিতে হত। তবে শেষ পর্যন্ত তিনি বহরমপুর কৃষ্ণনাথ কলেজ থেকে ১৯১১ খৃষ্টাব্দে অনার্সসহ বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং ১৯১৩ খৃষ্টাব্দে তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পালিতে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান অধিকার করে এম. এ. পাশ করেন। শুনেছি এম. এ. অধ্যয়ন কালে এত তন্ময় ও বাহ্যজ্ঞান বিলুপ্ত হয়ে বসে থাকতেন যে কিছুদিন পরে তাঁর পা অবশ হয়ে যায়। তাঁর ভগ্নিপতি ডঃ সর্বানন্দ বড়ুয়ার (ক্ষেমঙ্করী দেবীর স্বামী) চিকিৎসায় তা সেরে যায়। এজন্য ভগ্নিপতির প্রতি তিনি আজীবন কৃতজ্ঞ ছিলেন। কলকাতায় আসার পরে তিনি বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার প্রতিষ্ঠাতা কৃপাশরণ মহাস্থবিরের সংগে পরিচিত হন। কৃপাশরণের অন্তরদৃষ্টি তাঁর মধ্যে বৌদ্ধ ধর্মচর্চা এবং সমাজহিতৈষণার বিপুল সম্ভাবনা দেখতে পেলো। ১৯০৯ সালে তিনি বেণীমাধকে সভার সদস্যপদে নিযুক্ত করলেন। ডঃ বড়ুয়া ১৯১২-২৬ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার সাধারণ সম্পাদক রূপে বহুবিধ ধর্মীয় ও সামাজিক কাজ সম্পাদন করেন।

'বৌদ্ধ গৃহী-বিনয়' সংকলন করতে গিয়ে বেণীমাধব বড়ুয়া পালি দীঘ নিকায়ের অন্তর্গত সিগালোবাদ সুত্ত-এর বাংলা অনুবাদ করেন বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার বার্ষিক কার্যবিবরণীতে (১৯১৩খৃ.)। কারণ এই সূত্রে বৌদ্ধ গৃহীদের অবশ্য প্রতিপাল্য নিয়ম ধর্ম বিধৃত আছে। এই গ্রন্থের 'নিবেদনে' তিনি লিখেছেন: "নিজে গৃহী বলিয়াই নাকি জানি না, আমি সতত গৃহী সাধারণের যাহাতে উপকার হয় সেইরূপ প্রণয়ন করাকেই শ্রেয়স্কর মনে করিয়া থাকি।" গৃহীদের কথা ভেবেই ইতিপূর্বে তিনি পালি মূলসমেত " লোকনীতি' নামক পুস্তকের সরল বাংলা অনুবাদ প্রকাশ করেছেন (১৯১২ খৃ.) ধর্মাংকুর সভার কার্যবিবরণীতে। এই সময় তাঁর লোকনীতি (১৯১২), মহাসতিপট্ঠান সুত্ত (১৯১৩) ধর্মাংকুর সভা থেকে এবং প্রার্থনা ও উপাসনা (১৯০৮), বঙ্গীয় বৌদ্ধসমাজ (১৯১২), বৌদ্ধধর্ম ও পুনর্জন্ম (১৯১২), মহাস্থবির কালীকুমার (১৯১৪), ডাক্তার কমলচন্দ্র বড়ুয়া (১৯১৪), বৌদ্ধদর্শনের ঐতিহাসিক তত্ত্ব(১৯১৫), প্রতীচ্যে বৌদ্ধধর্ম (১৯১২), শাক্য লিচ্ছবি ও বৃজিবংশের ধ্বংস কাহিনী (১৯১২) ও গুপ্তযুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধ ধর্মের পরিস্থিতি (১৯৩৯) জগজ্জ্যোতিতে প্রকাশিত হয়। তিনি শ্রীমৎ শঙ্করাচার্যের গ্রন্থমালা থেকে বৌদ্ধোপযোগী করে বাংলা অনুবাদ করেছেন 'মনিরত্নমালা'। এখানে প্রশ্নোত্তরে বৌদ্ধ গৃহীদের উপযোগী অনেক হিতোপদেশ

প্রদান করা হয়েছে। এসব লণ্ডন যাওয়ার পূর্বেকার ঘটনা। অবশ্য এর পূর্বে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পড়ার সময় ১৯১২ খৃষ্টাব্দে তিনি অল্পদিনের জন্য স্বগ্রামস্থ এ্যাংলো পলি ইনষ্টিটুশনে অস্থায়ী প্রধান শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন এবং ১৯১৩-১৪ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আণ্ডার গ্রাজুয়েট ক্লাসের অস্থায়ী শিক্ষক নিযুক্ত হয়েছিলেন।

এম. এ. পাশ করে বেণীমাধবের প্রতিভা বিস্ফুরিত হওয়ার পরিবেশ রচিত হয়। তিনি কৃপাশরণ মহাস্থবির ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক অনুপ্রেরিত হয়ে উচ্চতর বিষয়ে শিক্ষালাভ ও গবেষণায় উৎসাহিত হলেন। এঁদের এবং চিটাগং বুদ্ধিষ্ট এসোসিয়েশনের যৌথ প্রচেষ্টায় বেণীমাধবের জন্য একটি আবেদন পাঠানো হয় ব্রিটিশ সরকারের নিকট লণ্ডনে বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা বৃত্তি মঞ্জুর করতে। ভারত সরকারের শিক্ষা অধিকর্তা ও অন্য সদস্যবৃন্দ সহায়তা করায় স্কলারশিপ মঞ্জুর হয়। বেণীমাধব বড়ুয়ার বিলাতযাত্রা তদানীন্তন বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের জন্য একটি অবিস্মরণীয় ঘটনা। ১৯১৪ সালে ৯ই সেপ্টেম্বর বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার পক্ষ থেকে বিলাত যাত্রার প্রাক্কালে তাঁকে অভিনন্দনপত্র সহ স্বর্ণপদক অর্পণ করা হয়। সভাপতির ভাষণে শ্রীমৎ কৃপাশরণ মহাস্থবির বললেন:

"আমরা বৌদ্ধ সমাজে বড়ই হীনাবস্থায় ছিলাম। আজ আমাদের স্নেহের বেণীমাধব আমাদের মুখোজ্জ্বল করিয়া জনসাধারণের দৃষ্টিতে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজকে অনেক উন্নীত করিলেন। আমরা প্রতিশ্রুত ছিলাম বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজের যে যুবক সর্বপ্রথম বিশ্ববিদ্যালয়ে এম. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবেন তাঁহাকে একটি সুবর্ণপদক প্রদান করিব। আমরা এক বৎসরে তিনটি পালিভাষায় এম. এ. পরীক্ষোত্তীর্ণ (বেণীমাধব, মহিমারঞ্জন ও রেবতীরমন বড়ুয়া) চট্টল মাতার সুকৃতি সন্তানকে পাইলেও বেণীমাধব সকলের শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার হেতু সেই পদক পাইবার অধিকারী এবং আমি আমর স্নেহাশীর্বাদ সহ সেই সুবর্ণ পদক অর্পণ করিলাম। আমার দ্বিতীয় বক্তব্য: আমরা ধর্মাংকুর সভার পক্ষ হইতে ভারত গভর্ণমেন্টের নিকট ইউরোপে বৌদ্ধ যুবকের পালি ভাষা অধ্যয়নের নিমিত্ত এক বিশেষ বৃত্তি স্থাপন করিবার জন্য সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমনের কাল হইতে যে চেষ্টা করিয়া আসিতেছিলাম, আমাদের সেই চেষ্টা আজ ফলবতী হইয়াছে। তাহা আপনারা অবগত আছেন। সেই বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়া বেণীমাধব বিলাত গমনের জন্য প্রস্তুত। বেণীমাধবের এই গৌরবে বঙ্গীয় বৌদ্ধ সমাজ গৌরবান্বিত এবং ধর্মাংকুর সভার সম্পাদকরূপে তিনি আমাদের সহিত বিশেষভাবে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। এই হেতু ধর্মাংকুর সভার পক্ষ হইতে তাঁহাকে আমাদের আশীর্বাদ সহ এই অভিনন্দন পত্র প্রদান করিতেছি।"

এই বিলাত গমনে বেণীমাধবের সুপ্ত প্রতিভার বিকাশ লাভ ঘটেছিল তা তাঁর পরবর্তী জীবনের সৃজনশীল রচনা ও কার্যাবলী থেকে বোঝা যায়। বিলেত গিয়ে তিনি লন্ডন

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন গবেষক ছাত্র হিসেবে Dr. Rhys Davids, Mrs. Rhys Davids, L.T. Hobhouse, F.W. Thomas, L. D. Barnett, Moba Bode প্রভৃতি সুবিখ্যাত বৌদ্ধশাস্ত্রবিদ ও ভারততত্ত্ব বিশারদদের তত্ত্বাবধানে। বেণীমাধব বিলেত গিয়েছিলেন পালি ভাষা ও সাহিত্যে বিজ্ঞান ভিত্তিক গবেষণা করে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সংক্রান্ত কোন গবেষণা গ্রন্থ রচনা করা। পরিবর্তে তাঁকে গবেষণার বিষয় দেওয়া হল " বৈদিক যুগ থেকে আরম্ভ করে বুদ্ধ পর্যন্ত সময়ে ভারতীয় দর্শনের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশের ইতিহাস" (Indian Philosophy – its origin and growth from the Vedas to the Buddha) ।এই থিসিস্ রচনার প্রধান প্রধান উপাদান গ্রন্থ হচ্ছে বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ, মহাভারত, কামসূত্র, অর্থশাস্ত্র প্রভৃতি বেদোত্তর সমগ্র সাহিত্য। পালি সাহিত্য হয়ে দাঁড়াল পার্শ্বসহচর গৌণ আকর গ্রন্থ (resource book)। একজন পালি ছাত্রের পক্ষে লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে এরূপ দুরূহ বিষয়ে গবেষণা করা দুঃসাহসিকতার পরিচায়ক। উপরোক্ত সুবিখ্যাত পণ্ডিতমণ্ডলীর সুযোগ্য পরিচালনায় বেণীমাধব তাঁর গবেষণাকার্য চালিয়েছিলেন।ইতিমধ্যে তিনি অধ্যাপক Daks Hicks এর নিকট গ্রীকদর্শন এবং আধুনিক ইউরোপীয় দর্শন পড়াশুনা করে কি করে ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে যেকোন দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করতে হয় শিক্ষা করেন। তাই বেণীমাধব বড়ুয়া অক্লান্ত পরিশ্রম ও অপরিসীম মেধার জোরে তুলনামূলকভাবে ভারতীয় দর্শন সমূহকে পর্যালোচনা করে তাঁর মৌলিক গবেষণা নিবন্ধ (Thesis) প্রস্তুত করতে সক্ষম হন এবং ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ১৮ই জুলাই তাঁর থিসিসের উপর লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষক মণ্ডলী সন্তুষ্টচিত্তে তাঁকে দুর্লভ ডি. লিট. ডিগ্রীতে ভূষিত করেন। তিনিই এশিয়াবাসীদের মধ্যে প্রথম লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে উক্ত ডিগ্রীতে ভূষিত হন। লন্ডন অবস্থানকালে তিনি লেদি সায়াদ কৃত অভিধর্মবিষয়ক নিবন্ধ ইংরাজী অনুবাদ প্রকাশ করেন।

১৯১৭ খৃষ্টাব্দেই ড: বড়ুয়া ভারতে ফিরে আসেন এবং কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুনর্গঠিত পোষ্ট গ্রাজুয়েট পালি বিভাগে (১৯০৭ খৃ. থেকে এই বিভাগ চালু হয়) লেকচারার নিযুক্ত হন। ইতিপূর্বে উক্তপদে আসীন ছিলেন মহারাষ্ট্রীয় পন্ডিত ধর্মানন্দ কোশাম্বী। একই সঙ্গে তিনি Ancient Indian History and Culture বিভাগে অধ্যাপক নিযুক্ত হন। স্যার আশুতোষ ছিলেন সুদক্ষ জহুরী শিক্ষাবিদ। তিনি বেণীমাধব রত্নটিকে চিনতে পেরেছিলেন। দুবছর তিন মাস পরে প্রায় দশ বৎসর অধ্যাপক পরিচালক রূপে পালি বিভাগে সংযুক্ত থেকে ড: সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের ১৯২০ খৃ ২০শে মার্চ মহাপ্রয়াণ হলে স্যার আশুতোষ তাঁকে অধ্যাপক প্রধান হিসেবে পালি বিভাগের পরিচালক নিযুক্ত করলেন এবং ডি. লিটের থিসিস বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশ করবার ব্যবস্থা করেন। এই গবেষণা গ্রন্থটি A History of Pre-Buddhistic Indian Philosophy নামে ১৯২১ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়। ভারতীয় দর্শনের বিজ্ঞানভিত্তিক তুলনামূলক পর্যালোচনা ও ধারাবাহিক

ইতিহাস রচনা ইতিপূর্বে হয়নি। এই গ্রন্থটি তাঁর অসাধারণ মনীষা ও নিরলস সাধনার ফল। গৌতমবুদ্ধের আবির্ভাবের পূর্বে ভারতবর্ষে যে সকল দার্শনিক মত প্রচলিত ছিল তাদের যথার্থ মর্ম উদ্‌ঘাটন করে তাদের সঙ্গে বৌদ্ধদর্শনের সামঞ্জস্য অসামঞ্জস্যের বিচার বিশ্লেষণ হল গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। এই থিসিস লেখার পর বৌদ্ধদর্শনের ইতিহাস লেখার ইচ্ছা তাঁর মনে উদিত হওয়ায় তিনি A Prolegomena to a History of Buddhist Philosophy গ্রন্থটি রচনা করেন এবং তা ১৯১৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত হয়। প্রাচীন ভারতের যে সকল আজীবিক সম্প্রদায় ও পরিব্রাজক সংস্থা প্রতিষ্ঠিত ছিল যাদের অনেকেই বহু পূর্বে লুপ্ত হয়ে কালের গর্ভে বিলীন হয়েছিল সেই সকল তীর্থকারগণের জীবনচরিত, আচার-অনুষ্ঠান ও দার্শনিক মতবাদ শ্রদ্ধাসহকারে অধ্যয়ন করে তিনি The Ajivikas গ্রন্থখানি ১৯২১ সালে প্রকাশ করে তাদের লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধার করেন। ঐ বৎসরেই সহকর্মী অধ্যাপক শৈলেন্দ্র নাথ মিত্রের সংগে যৌথভাবে তিনি মধ্যএশিয়ার খোটানে আবিষ্কৃত পাণ্ডুলিপি অবলম্বন করে প্রাকৃত ধর্মপদের তুলনামূলক বিচার শ্লোকের ব্যাখ্যা করে Prakrit Dharmapada গ্রন্থটি প্রকাশ করেন।

এখানে উল্লেখযোগ্য যে এতাবৎকাল পালি বিভাগের জন্য কোন Professor এর পদ সৃষ্ট হয়নি। ড: বড়ুয়ার অসাধারণ পাণ্ডিত্যের স্বীকৃতি প্রদর্শনের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পালি বিভাগের জন্য একটি Professor এর পদ সৃষ্টি করে ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে। উক্ত বৎসরে ১লা জুন ড: বড়ুয়া প্রথম University Professor of Pali রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন এবং ১৯৪৮ সালের ২৩শে মার্চ তাঁর মৃত্যুদিবস পর্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থেকেই সগৌরবে কাজ করে যান। এছাড়া সংস্কৃত বিভাগেও তিনি আজীবন অধ্যাপনা করেছিলেন।

পালি বিভাগের দায়িত্ব গ্রহণ করার পর থেকে তিনি এই বিভাগের উন্নতি ও পালি ভাষা পঠন পাঠনের নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেন। প্রথমে তাঁর দৃষ্টি নিবদ্ধ হয় বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষার পাঠক্রম (Syllabus) সংক্রান্ত পরিবর্তন পরিবর্ধন ও সংযোজন প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের দিকে। তাঁর দূরদর্শিতা ও প্রচেষ্টায় এই দুইটি পরীক্ষা সংশ্লিষ্ট পালি সিলেবাস এমন সুবিন্যস্ত করা হল যাতে পালি ছাত্রগণ বি. এ. ও এম. এ. পরীক্ষা পাশ করলে পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারে এবং ভারতীয় দর্শন ও সাহিত্য এবং ইতিহাস ও সংস্কৃতিতে গবেষণার কাজে সাফল্যের সংগে অগ্রসর হতে পারে। ছাত্রদের পাঠ্য পুস্তকের অভাব পূরণের জন্য তাঁর সক্রিয় প্রচেষ্টায় Matriculation থেকে এম. এ. পর্যন্ত সব পরীক্ষার জন্য Pali Selections বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়।

ড: বড়ুয়া প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, পালি ও সংস্কৃত মোট এই তিনটি বিভাগেই অধ্যাপনা করতেন। প্রথমোক্ত বিভাগে তিনি পড়াতেন বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের

ইতিহাস, কখনও কখনও শিলালিপি। "সংস্কৃত আই গ্রুপের ছাত্র-ছাত্রীরা তাঁর কাছে পড়তো অশোক ও অন্যান্য প্রাকৃত শিলালিপি। পালি বিভাগে প্রয়োজন অনুসারে ত্রিপিটকের অন্তর্গত যে কোন পাঠ্যপুস্তক পড়িয়েছেন এবং সি গ্রুপের শিলালিপি, বৌদ্ধকেন্দ্র, প্রাচীন ভূগোল ও ই গ্রুপের (বর্তমানে এই দুটি গ্রুপ সি গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত) ছাত্রদের বৌদ্ধ স্থাপত্য ভাস্কর্য ও শিল্প সম্বন্ধীয় বিষয় তিনি পড়িয়েছেন। এই সব প্রাক্তন সকলেই স্বীকার করবেন যে তাঁর অধ্যাপনার মধ্যে ছিল কিছুটা স্বাতন্ত্র্য। এখানে ড: বড়ুয়ার অধ্যাপনা-সংক্রান্ত ব্যাপারে কিছু কৌতূহল উদ্দীপক খবর পরিবেশন করা যাক। তাঁর ধূমপানে ছিল প্রবল আসক্তি, প্রায় বিরামহীন ধূমপানের নেশা। প্রথম অধ্যাপনার জীবন থেকে আমরণকাল তিনি ক্লাসে সিগারেট হাতে করেই পড়িয়ে গেছেন। বাড়ীতে গড়গড়ায় তামাক সেবন করতে করতে পড়াতেন। ক্লাসে পড়াবার সময় ধূমপান করাটা অনেকেই মনে করতেন ভারতীয় নীতিবিরুদ্ধ। এ নিয়ে শ্রদ্ধেয় আশুতোষের কাছে অভিযোগ করাতে, শোনা যায় স্যার আশুতোষ নাকি তাদের বলেছিলেন—"বেণীমাধব সম্বন্ধে এ বিষয়ে কোন মন্তব্য না করাই ভাল, ক্লাসে সিগারেট টানতে টানতে পড়লেই বেণীমাধবের কাছে ছেলেরা শিখতে পারবে বেশী করে।" এই ছোট উক্তি থেকে সহজে অনুমান করা যায় যে, মহামান্য আশুতোষ তাঁর স্নেহধন্য চিন্তাশীল বেণীমাধবের অধ্যাপনা নৈপুণ্য, পাণ্ডিত্য ও অসাধারণ প্রতিভা সম্বন্ধে কতখানি আস্থা ও উচ্চধারণা পোষণ করতেন।

বেণীমাধবের অধ্যাপনার পদ্ধতি ছিল এত উচ্চাঙ্গ ও উচ্চমানের যে সাধারণ ছাত্রদের কাছে তিনি খুব প্রতিষ্ঠা করতে পারেন নি। কারণ তারা তাঁর উচ্চমানের অধ্যাপনার রীতি অনুসরণ করতে পারত না। যারা লেখা পড়ায় একটু উন্নত ধরণের এবং জ্ঞানপিপাসু তারাই তাঁর কাছে শিক্ষা লাভ করে অবশ্য যথেষ্ট উপকৃত হত। সাধারণ ছাত্ররাও ক্রমে ক্রমে তাঁর পড়াবার নির্দিষ্ট প্রণালীর সঙ্গে কিছুটা ধাতস্থ হয়ে যেত। অধ্যাপনার সময় তিনি কোন দিন নির্দিষ্ট পাঠ্যবিষয়ের গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ থাকতেন না। কি সংস্কৃত কি পালি কি প্রাকৃত কত রকম আকর গ্রন্থ থেকে সমান্তরাল উদ্ধৃতি বা বিসদৃশ বক্তব্য ভাব উল্লেখ করে কোন একটি বিষয় থেকে বিষয়ান্তরে নিয়ে গিয়ে ঐগুলির মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করতেন এবং তুলনামূলক বিচার বিশ্লেষণের দ্বারা ছাত্রদের সাহায্যে জ্ঞান বিতরণ করতেন, ফলে তাঁর শিক্ষাদান হয়ে উঠত গবেষণাধর্মী এবং ছাত্রদের মনে এই ভাবে গবেষণাস্পৃহা জাগিয়ে তুলতেন। তাঁর এই অপূর্ব অধ্যাপনার ফলে এম. এ. ক্লাসে পাঠরত অবস্থায় ছাত্ররা গবেষণা শিক্ষা পদ্ধতির সঙ্গে সুপরিচিত হয়ে উঠত।

"আমাদের ছাত্রজীবনে তাঁর সঙ্গে ক্লাস করতুম; এখনো মনে পড়ে, তিনি তন্ময় হয়ে পড়াতেন; কোন বিষয়ে তাঁর থাকত না খেয়াল। ঘড়ি ঘন্টার দিকে থাকত না কোন মনোযোগ। তিনি কখনও বাংলা ভাষার মাধ্যমে তাঁর বক্তব্য বিষয় আমাদের বোঝাবার চেষ্টা করতেন,

কখনও আমাদের সকলকে তাঁর বক্তব্য বিষয় লিখে নিতে বলতেন এবং আমরাও তদনুসারে তাঁর কথাগুলো যথাযথভাবে লিখে নেবার চেষ্টা করতুম। ক্লাসরুমে তাঁর পড়ান নির্দিষ্ট ঘন্টার মধ্যে শেষ হত না। তারপরও ঘন্টার পর ঘন্টা। আমরাও বিস্ময়ে তাকিয়ে থাকতুম ঐ জ্ঞান তপস্বীর মুখের দিকে" (*সুকুমার সেনগুপ্ত, ভূমিকা, ভারততত্ত্ববিদ্ আচার্য বেণীমাধব পৃ. xxxiii–xxxv*)। প্রসঙ্গ শেষ না হলে ছাত্রদের বাড়ীতে এনে রাত পর্যন্ত পড়াতেন এই ভাবে অধ্যাপনার কাজ তিনি জীবনের শেষদিন পর্যন্ত করেছেন।

কি অধ্যাপনা, কি গ্রন্থ বা প্রবন্ধ রচনা, কি সামাজিক কর্তব্য সম্পাদন—সব কাজই ডঃ বড়ুয়া একনিষ্ঠভাবে গুরুত্বসহকারে সম্পন্ন করতেন। প্রতিভা এমন শক্তি তা যাকে স্পর্শ করে তাই সঞ্জীবিত হয়ে ওঠে। অধ্যাপক বড়ুয়া বাংলা রচনাতেও ইংরাজীর মত সমান পারদর্শী ছিলেন। তাঁর ইংরাজী লেখন ভঙ্গীকে লক্ষণ বৈশিষ্ট্য Classical style বলা চলে। ডঃ বড়ুয়া অধ্যাপনা, গবেষণা, গ্রন্থরচনায় নিবিষ্ট থেকেও বহু শিক্ষা ও গবেষণা কেন্দ্র, সমাজ ও জনহিতকর প্রতিষ্ঠান ও সম্মেলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডঃ সুকোমল চৌধুরী যর্থাথই বলেছেন "নিষ্ঠা এবং একাগ্রতা না থাকলে কোন সৃষ্টিই সার্থক হয়না। ডঃ বড়ুয়ার প্রত্যেকটি কাজে যে নিষ্ঠা ও একাগ্রতা ছিল তার তুলনা পাওয়া ভার। যখন যে কাজটি হাতে নিয়েছেন আহার নেই, নিদ্রা নেই, বিশ্রাম নেই, ঘরবাড়ী নেই, সংসার নেই—সব কিছুকে ভুলে গিয়ে তিনি আরব্ধ কাজটির প্রতি একাত্ম হয়ে যেতেন এবং তাকে শেষ না করা অবধি তাঁর স্বস্তি ছিল না" (*আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া, পৃ. ৭৮*)। বাল্যকাল থেকেই তিনি আত্মভোলা, পোষাক পরিচ্ছদে উদাসীন অথচ দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তেজস্বী ও ন্যায়নিষ্ঠ; পরিণত বয়সে তিনি হয়েছেন দুরূহ তাত্ত্বিক সমাধানে চিন্তামগ্ন দার্শনিক। বাহ্যজ্ঞান লুপ্ত আত্মসমাহিত ঋষি। শুনেছি তিনি কোন কোন দিন রাত্রে খেতে বসে কোন বিষয়ে আলোচনা বা চিন্তা করতে করতে গভীর রাত এমন কি ভোরবেলা পর্যন্ত কাটিয়ে দিতেন। তাঁর খেয়াল থাকতনা যে ভাতের থালা সামনে পড়ে আছে।

এখন আমরা তাঁর গ্রন্থরচনা ও অন্যান্য কাজকর্মের মধ্যে ফিরে যাই। ডঃ বড়ুয়া বাংলার বৌদ্ধ সমাজ-বৃক্ষের আদিমূল খুঁজে বের করার চেষ্টা করেছেন। শুধু তাই নয়। মূল থেকে আরম্ভ করে বর্তমানে শাখা প্রশাখায় পল্লবিত সমাজবৃক্ষের কোন কোন স্থানে ত্রুটি আছে তার প্রতিকার সম্পর্কে আলোচনা করেছেন তাঁর "বৌদ্ধ পরিণয় পদ্ধতি" নামক গ্রন্থটিতে (১৯২২ সালে প্রকাশিত)। গ্রন্থের মুখবন্ধে তিনি (১) পূর্ববর্তী বৌদ্ধবিবাহ-মন্ত্রগুলির বিবরণ, (২) পূর্ববর্তী বিবাহ মন্ত্রগুলির সমালোচনা, (৩) পরিত্ত, রক্‌খা, গুত্তি, সমাগম প্রভৃতি নামের ঐতিহাসিক বিশেষত্ব; (৪) বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিত্রাণ সূত্রের উদ্ভব ও লৌকিক বৌদ্ধধর্মে ইহার বিশেষত্ব; (৫) বৌদ্ধ সমাজ গঠনের ধারা; (৬) বড়ুয়া সমাজ—ইহার উপাদান, গঠন প্রণালী, বিবাহ পদ্ধতি, অবস্থা ও আদর্শ (৭) উপসংহারে বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের

নানা দিক আলোচনা করেছেন ও বর্তমান বৌদ্ধ বিবাহ মন্ত্র এবং আনুষাঙ্গিক কার্যবিধির বর্ণনা দিয়েছেন ও গ্রন্থের পরিশিষ্টে বৌদ্ধ বিবাহ মন্ত্রের প্রাচীন পুঁথি সম্বন্ধে আলোচনা করেছেন। সুতরাং গ্রন্থটি বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের জন্য একটি অমূল্য দলিল স্বরূপ।

এরপর ডক্টর বড়ুয়া শিলালিপি ও প্রত্নতত্ত্ব চর্চায় ও বহুবিধ গ্রন্থ ও প্রবন্ধ রচনায় মনোযোগ দেন। তিনি দুর্গম অরণ্য, গিরিগুহা, প্রাচীন ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করে বহু শিলালিপি (প্রায় সমগ্র অশোকলিপি সহ), ভাস্কর্য ও স্থাপত্যের অনুলিপি ও চিত্রসংগ্রহ তাদের অর্থোদ্ধারে, বিশ্লেষণে, ব্যাখ্যায় মনোনিবেশ করে ভারত-ইতিহাসের এক অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগের আলোকপাত করেন। ফলশ্রুতি স্বরূপ বহু রচনা তাঁর কলম থেকে নির্গত হয়। ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে Royal Asiatic Society -এর journal-এ তাঁর প্রবন্ধ A note on the Bhabru Edict ও ১৯২১ খৃষ্টাব্দে Bhabru Edict of Asoka প্রকাশিত হয়। ড: বড়ুয়াও গঙ্গানন্দ সিংহের যুগ্ম সম্পাদনায় Barhut Inscriptions নামক নাতিবৃহৎ গ্রন্থটি প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ১৯২৬ সালের গোড়ার দিকে। এই গ্রন্থখানিতে স্তূপগাত্রের বিভিন্নাংশে খোদিত লেখমালার মূল প্রাকৃত অনুলিপিগুলি ইংরাজী অনুবাদ সহ ব্যাখ্যাযুক্ত অবস্থায় দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে Texts with translation and notes । একই বৎসরে তাঁর Old Brahmi Inscriptions in Udayagiri and Khandagiri নামক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। এই গ্রন্থের দুইটি ভাগ। প্রথম ভাগ আরম্ভ করা কলিঙ্গাধিপতি খারবেলের প্রশস্তির মূল প্রাকৃত লিপিটি ও তৎসহ এর ইংরাজী, সংস্কৃত ও পালি তর্জমা দিয়ে এবং এর সঙ্গে রয়েছে বিভিন্ন শিলালিপি বিশারদ পণ্ডিতদের পাঠান্তর ও বিশেষ বিশেষ শব্দের ব্যাখ্যা সহ পাদটীকা। দ্বিতীয়টি হচ্ছে খারবেলের প্রধানা মহিষীর দু-তিন লাইনে উৎকীর্ণ মূল লিপি।

Inscriptional Excursion (a critical review of the studies in the Inscription of Asoka) Indian Historical Quarterly Vol. II (১৯২৬) তে ধারাবাহিক ভাবে এই প্রবন্ধটির বর্ধিত রূপ প্রকাশিত হয় Asoka Edict in New Light নামে। তাঁর সুবৃহৎ গ্রন্থ Gaya and Buddhagaya' র রচনা সুরু করেন ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে এবং প্রথম খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৯৩১ খৃষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় খণ্ড— ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে। গয়া ও বুদ্ধগয়ার প্রাচীনত্ব ও ইতিহাস এবং সেখানকার মন্দির ও মূর্ত্তিগুলির ভাস্কর্য ও স্থাপত্য শিল্পের তাৎপর্য সম্বন্ধে গবেষণা ক্ষেত্রে ড: বড়ুয়ার অপরিমেয় অবদান পরিস্ফুট এই গ্রন্থখানিতে। গয়া হিন্দু ও বৌদ্ধ উভয়ের মিলন ক্ষেত্র ছিল—আচার্য বেণীমাধব এই সত্যকে তাঁর সুদীর্ঘ ঐতিহাসিক আলোচনার দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত করেছেন। ১৯২৬ সালে তাঁর Asoka Edict in New Light প্রকাশিত হয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। ১৯১৮ সালে কলিকাতায় অনুষ্ঠিত Oriental Conference এর Social and Religious History Section এ ড: বড়ুয়া

তাঁর রচিত Historical Background of Indology and Buddhalogy প্রবন্ধটি পাঠ করেন। এবং Valmiki as he reveals himself in his poem নিবন্ধটি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের Sir Ashutosh Mookerji Silver Jubilee Commemoration vol. III ১৯২০ প্রকাশিত হয়। তিনি আমন্ত্রিত হয়ে চারবার বার্মায় (মায়ানমার) গিয়েছিলেন— ১৯২৪, ১৯২৭, ১৯৩৭ এবং ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ে, রেঙ্গুনস্থ চিটাগং বুদ্ধিষ্ট টেম্পলে এবং অন্যান্য প্রতিষ্ঠানে বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন ও Burma সম্পর্কে ভাষণ দিয়েছিলেন। Burma and Burma Life নামে রেঙ্গুনে প্রদত্ত ভাষণটি Calcutta Review তে ১৯২৪ সালে প্রকাশিত হয়। ড: বড়ুয়া দ্বিতীয়বার Burma গমন করে Burma and Burma Treasures সম্পর্কে ভাষণ দেন যা Calcutta Review, ১৯২৭ প্রকাশিত হয়। তাঁর Bhakti Sutras of Sandilya নিবন্ধ প্রকাশিত হয় Second All India Conference, 1922 এর Proccedings এ এবং Calcutta Review তে ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর Nature of Barhut Sculptures। বিমলা চরণ লাহা প্রণীত (১৯২৫) Heaven and Hell in Buddhist Perspective এর পরিশিষ্টে প্রকাশিত হয় ড: বড়ুয়ার নিবন্ধ Genesis of the Books of Stories of Heaven and Hell. ঐ বছরেই Calcutta Review তে প্রকাশিত হয় Buddha of History।

ড: বড়ুয়ার বহু নিবন্ধ Indian Historical Quarterly (IHQ) এবং Indian Culture (IC) পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়, যথা— Message from Barhut Jataka Lebels (IHQ, vol.I); Multiplications of Jatakas (IHQ vol.II); Stupa and Tomb (IHQ. vol II); Old Brahmi Inscriptions in the Udayagiri and Khandagiri caves–Language and Style (IHQ, vol. IV); Gosala as an Epithet of Makkhali (IHQ, IV); Old Buddhist Shrines at Buddhagaya (IHQ, VI), The Yerragudi copy of Asokas Minor Rock Edict (IHQ, IX); Bodh Gaya Image Inscriptions (IHQ, IX); The Old Brahmi Inscriptions of Mahasthan (IHQ, X); The Soghaura Copper plate Inscription (IHQ X); Minor Old Brahmi Insription in Udayagiri and Khandagiri Caves (Revised Edition IHQ, XIV); The Hathigumpha Inscriptions of Kharavela (IHQ, XIV) Common Ancestry of the Pre-Ahom Rulers and some other problems of Early History of Assam (IHQ XXII); Scribe Engravers of Indrapalas copper plate and Prakrit of Pre-Ahom times (IHQ XXIII); Maskari–what it signifies (IHQ), Visnudasa–A Vasnava Reformer of South India(Indian Cutture Vol.I); Art as defined in the Brahmanas (IC,Vol I); Identity of Asandhimitta and Kaluvaki (ICI) Cittavisuddhiprakarana–its Pali basis (IC I); Five Reliefs from

Nagarjunikonda (IC I); Estimate of the people of Orissa (IC I); National Shrines of the Vijis (IC I); Two Buddhaghosas (IC I); Bogus Bodhgaya Plaque (IC I); Review of Buddhism–Its Birth and Dispersal by Mrs Rhys Davids (IC I); On a point of Interpretation (IC II); Upanisa and Upanisad (IC II); Bhela–Samhita–Discussing its historical Importance (IC III); Bodh-Gaya Sculptures (IC III); The Abhayagiri Schools in comparison and the number of Jatakas in the Abhidhamma Pitakas (IC V); Review of Vimutimagga and Visuddhimagga by P.V. Bapat (IC V); Pre–Buddhist India (IC VIII); Atthasalini (IC IX) Social Status of the Mauryas (IC X); Isitale Tadaga in Kharavela's Inscriptiong (Ic XI); Buddha's Doctrine of The Mean (IC XII); Forms , Merits and Defects of Asokas Inscriptions (IC); Rastriya Vaisya Pusyagupta and Yavanaraja Tusaspha in Rudradamana's Inscriptions (IC); Dharma Samuccaya (IC).

ড: বড়ুয়ার Thoughts on Progress (Containing the dialectics of history and the formulation of the author's own philosophy) নামে নিবন্ধমালা Calcutta Review তে ১৯৩০ সাল থেকে ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হতে থাকে। তাঁর মৃত্যুর পর ১৯৪৮ সালে ইহা Philosophy of Progress নামে পুস্তকাকারেই প্রকাশিত হয়। Flying Machines in Ancient India Jointly with G.P. Majumdar, Early Life Gosala নিবন্ধ দুটিও Calcutta Review তে প্রকাশিত হয় ১৯৩৩ সালে। Buddhadatta and Buddhaghosa–Their Contemporardity and Age নিবন্ধটি University of Ceylon Review তে ১৯৪৫ সালে প্রকাশিত হয়। অধ্যাপক বড়ুয়ার Buddhist Divinities as Embodiment of the Thirty-Seven constituents of Snpreme Knowledge এবং On the Antiquity of Image worship in India Journal of Indian Society of Oriental Art এ উপরোক্ত ছাড়াও যথাক্রমে ১৯৪০ ও ১৯৪৩ সালে প্রকাশিত হয়।

বিভিন্ন সম্মেলনে অনেক ভাষণ পাঠ করেন এবং স্মারক গ্রন্থে ড: বড়ুয়া নিবন্ধ প্রকাশ করেন। যেমন ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে বোম্বাইতে (মুম্বাই) সভাপতির ভাষণ দেন Universal aspect of Buddhism বিষয়ে পরে তা Bauddha Prabha, Journal of Buddha Society, Bombay এবং Calcutta Review Vol.XLI তে প্রকাশিত হয়। ভাষণটিতে তিনি বৌদ্ধধর্মের বিশ্বজনীনতার প্রকৃত তাৎপর্য নির্ণয় করবার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪৬ সালে Indian Philosophical Congress, Delhi র একটি Symposium এ ভাষণ দেন Role of Buddhism in Indian Life and Thought বিষয়ে, Presidential Address–Prakrit Section, in the proceedings of All India

Oriental Conferonce, Tirupati, 1940। ১৯৪৫ সালে আন্নামালাই তে অনুষ্ঠিত All India History Congress এর প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস শাখায় সভাপতির ভাষণ 'Trends in Ancient Indian History', ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত All India Oriental Conference-এ ভাষণ The Atthakavagga Parayanavagga as two companions of Pali Anthologies, Faith in Buddhism in B. C. Law, Buddhistic Studies, 1931; Early Buddhism in Birth Centenary of Ramakrishna Vol. 1937; Indus Script and Tantric Code in B. C Law Vol Part II; Mahayana in the Making in Sir Asutosh Mukherji Silver Jubilee Commemoration Vol. II Calcutta University. The Artha Sastra of Kautilya, Bharata Kaumudi, Studies in Indology in honour of Radhakumud Mukherji, 1945. প্রাচীন বারহুত স্তূপের স্থাপত্য, ভাস্কর্য ও শিলালিপির ব্যাখ্যা ও পর্যালোচনা করে এবং ভাস্কর্য চিত্রের সঙ্গে বৌদ্ধগ্রন্থের বিশেষভাবে জাতকের সম্বন্ধ নির্দেশ করে তিনি Barhut নামে তিনখণ্ডে বিভক্ত সুবৃহৎ গ্রন্থ রচনা করেন যা Indian Research Institute থেকে ১৯৩৪-১৯৩৭ সালে প্রকাশিত হয়। প্রথম খণ্ডের বিষয় Stone as a story teller, দ্বিতীয় খণ্ডের বিষয় Jataka Scenes এবং তৃতীয় খণ্ডের বিষয় Aspects of Life and Arts। তিনি যে কতবড় উচ্চশ্রেণীর শিল্প রূপরসিক ছিলেন, তার স্বাক্ষর বহন করছে, এই গ্রন্থে বিধৃত বৌদ্ধ ভাস্কর্য কলার নিদর্শন সম্বন্ধীয় বিস্তৃত বিবরণ ও তাঁর ব্যাখ্যান—পদ্ধতি। ডঃ বড়ুয়া Brahmacari Kuladananda ও তদীয় গুরু শ্রী শ্রী বিজয়কৃষ্ণ গোস্বামীর জীবন চরিত্র রচনা করেন যা পুরীর ঠাকুরবাড়ী থেকে প্রকাশিত হয় ১৯৩৮ খৃষ্টাব্দে। ডঃ বড়ুয়া তাঁর জীবনকালে যে সমস্ত অশোকের শিলালিপি আবিষ্কৃত হয়েছিল সে সব বিভিন্ন পাঠ (Version) একত্র সংকলন করে Inscriptions of Asoka Part I এবং শিলালিপিগুলির Translation, Notes and glossary অংশ Inscription of Asoka, Part II নাম দিয়ে প্রকাশের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্পণ করেন। তন্মধ্যে Inscription of Asoka-Part II প্রকাশিত হয় ১৯৪৩ খৃষ্টাব্দে। কিন্তু Part I (Text) কোন অজ্ঞাত কারণে সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয় নি। তাঁর মৃত্যুর পর আমি তাঁর বাড়ীতে একটা সুটকেসে অসম্পূর্ণ গ্রন্থটি পাই এবং অসম্পূর্ণ অংশ পুনরায় লিখে এবং আমার Introduction সংযোজন করে Inscriptions of Asoka Part I এবং তৎসহ Inscriptions of Asoka Part II পুর্নমুদ্রিতকরে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজ থেকে প্রকাশিত করি। ডঃ বড়ুয়া লিখিত একটি পুস্তিকা হল মহাবোধি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া থেকে ১৯৩৭সালে প্রকাশিত Religion of Asoka. ১৯৪৬ সালে New Age প্রকাশিত ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া রচিত Asoka and his Inscriptions (Part I and Part II) নামক সুবৃহৎ গ্রন্থখানি তাঁর অশোক সম্বন্ধে সর্বশেষ চিন্তাধারার পরিণততম রূপ। এই পুস্তকে

তাঁর অশোক সম্পর্কিত চিন্তার একটি সামগ্রিক ও সুপরিণত রূপ প্রকাশ পেয়েছে। এই গ্রন্থের Part I বা প্রথম অংশে বিবৃত হয়েছে অশোক সম্বন্ধীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের বিস্তৃত ইতিবৃত্ত অর্থাৎ অশোকের ব্যক্তিগত জীবন-ইতিহাস, অশোক সাম্রাজ্য, রাষ্ট্রবিবরণ, শাসন ব্যবস্থা, অশোক ধর্ম ও ধর্মবিজয়নীতি, Part II বা দ্বিতীয় অংশে বিবৃত হয়েছে অশোক লিপিমালার সঙ্গে প্রাচীন সাহিত্যের (পালি, প্রাকৃত ও সংস্কৃত) সঙ্গতি ও সম্বন্ধ নির্ণয়, লিপিগুলিতে ব্যবহৃত বিভিন্ন আঞ্চলিক প্রাকৃতের বৈশিষ্ট্য অশোকলিপির বাগধারা, ভাষাশৈলী এবং সর্বশেষে রয়েছে ভাষাতাত্ত্বিক ও ব্যাকরণগত বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা।

১৯৪৪ খৃষ্টাব্দে ড: বড়ুয়া সিংহলে (বর্তমান শ্রীলংকা) গমন করেন। সেখানে Dona Alpena Ratnayake Trust, The University of Ceylon, The Y. M. B.A., The Mahabodhi Society, The Bauddha Sahitya Sabha, The Citizens of Anuradhapura, Matale and Kandy এর উদ্যোগে অনুষ্ঠিত সভায় প্রদত্ত বক্তৃতামালা এবং একটি প্রবন্ধ Ceylon Lectures নামক গ্রন্থ ভারতী মহাবিদ্যালয়, কলিকাতা কর্তৃক প্রকাশিত হয়। এই বক্তৃতাগুলি হচ্ছে (১) ভারত ও সিংহল, (২) সিংহলের প্রাচীন ইতিহাস, (৩) বৌদ্ধধর্মে শ্রীলংকার অবদান, (৪) বুদ্ধদেবের মহত্ব এবং জগতে এই মহামানবের অবদান, (৫) বুদ্ধের ব্যক্তিগত ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম, (৬) প্রাতিষ্ঠানিক (Institutional) ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্ম (৭) বৌদ্ধ ধর্ম ও আদি বেদান্ত (৮) বর্তমান যুগে বৌদ্ধধর্মের আবেদন এবং Basic Concpt of Buddhism। সিংহলের বিদ্যালঙ্কার পরিবেশে তাঁকে 'ত্রিপিটকাচার্য' উপাধিতে ভূষিত করা হয়। বস্তুত ডক্টর বড়ুয়া বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে পৃথক ভাবে কোন বৃহৎ গ্রন্থ লেখেননি, যদিও এই বিষয়ে তিনি বহু বক্তৃতাদান ও নিবন্ধ রচনা করেছেন। সেইজন্য আমি কলিকাতা সারস্বত লাইব্রেরীর কর্তৃপক্ষের অনুরোধে ড: বড়ুয়ার বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক বারটি নিবন্ধ একত্র সম্পাদন করে Studies in Buddhism নামে প্রকাশ করাই। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রকাশিত Hundred Years of the University গ্রন্থে ড: বড়ুয়ার তিনটি বই এর উল্লেখ আছে, (১) Chakma Taras from Chittagong Hill Tracts, (2) Dharma Samuccaya and Karandavyuha এবং (৩) Burmese Manuscripts of Pali Works।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিও যে বেণীমাধবের সুগভীর অনুরাগ ও শ্রদ্ধা ছিল তার প্রমাণ পাওয়া যায় ছাত্রাবস্থা থেকেই মাতৃভাষায় অনূদিত কয়েকটি পালি অনুবাদ গ্রন্থ, স্বল্পপরিসর পুস্তিকা রচনায় এবং তদানীন্তন নানা মাসিক পত্রে প্রকাশিত বহু প্রবন্ধ-নিবন্ধ যাদের কিছু কিছু বর্তমান নিবন্ধে পূর্বেই উল্লিখিত হয়েছে ও অনেকগুলির হদিশ পাওয়া যায়নি। এখানে কয়েকটি বাংলা গ্রন্থের সংক্ষেপে আলোচনা করা যাক। সর্বপ্রথম ড: বড়ুয়া রচিত উল্লেখযোগ্য গ্রন্থ হচ্ছে নাতিবৃহৎ বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ Indian Research Institute থেকে ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত। মাতৃভাষার মাধ্যমে বৌদ্ধ শাস্ত্র বিষয়ক কোষগ্রন্থ রচনার

প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে তিনি গ্রন্থের ভূমিকায় বলেছেন— “অনুবাদ সহ বৌদ্ধ গ্রন্থরাজি এবং তথ্যপূর্ণ একটি বৌদ্ধকোষ বাংলা ভাষাতে প্রকাশ করিবার সংকল্প আমার বহু দিন হইতেই ছিল। এই দুরূহ কার্য সম্পাদনের সুযোগ লাভ করিয়া আমি নিজেকে ধন্য মনে করিয়াছি। জীবনের মধ্যপ্রান্তে আসিয়া বুঝিতে পারিয়াছি এই দ্বিবিধ কার্য সম্পূর্ণ করিতে না পারিলে মাতৃভাষার প্রতি আমার কর্তব্য পালন করা হইবে না। সেইজন্য নানা প্রকার কার্যে লিপ্ত থাকা সত্ত্বেও এই বিশিষ্ট কাজের দায়িত্বভার গ্রহণ করিয়াছি। এই গ্রন্থটির বিষয়বস্তু মোটামুটি তিন ভাগে বিভক্ত করা যায়। প্রথম অংশে বৌদ্ধ সাহিত্যের প্রয়োজনীয় যাবতীয় জ্ঞাতব্য বিষয়ের রূপরেখা অঙ্কিত হয়েছে। এই অংশ শুরু করা হয়েছে বৌদ্ধ গ্রন্থসমূহের নাম ও শ্রেণী বিভাগ দিয়ে। এরপর রয়েছে বৌদ্ধ সাহিত্য সংক্রান্ত অন্যান্য প্রয়োজনীয় পারিভাষিক শব্দ এবং বিষয়ের ব্যাখ্যামূলক আলোচনা ও বিবরণ, যেমন, পিটক বিভাগ, ধর্মবিভাগ, বিনয় বিভাগ, পঞ্চনিকায় বিভাগ, নবাঙ্গবিভাগ, পালি খুদ্দক নিকায়ের অন্তর্গত গ্রন্থগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় ইত্যাদি। এগুলির সঙ্গে সংযুক্ত হয়েছে অন্যান্য বৌদ্ধসম্প্রদায়ের ত্রিপিটক গ্রন্থাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয়। দ্বিতীয় অংশে রয়েছে বৌদ্ধ সঙ্গীতি সমূহের বিস্তৃত বিবরণ এবং অন্যান্য পণ্ডিতদের সঙ্গীতি সম্পর্কে মতামত আলোচিত হয়েছে। সেসব সঙ্গীতি হচ্ছে (১) প্রথম সঙ্গীতি, (২) দ্বিতীয় সঙ্গীতি (৩) মহাসঙ্গীতি (৪) অশোক সঙ্গীতি, (৫) তিষ্য সঙ্গীতি, (৬) মহাদেব সঙ্গীতি, (৭) দুষ্টগামনি সঙ্গীতি, (৮) বট্টগামনি সঙ্গীতি এবং (৯) কণিষ্ক সঙ্গীতি। এই সঙ্গীতি গুলির বিবরণ ও ঐতিহাসিকত্ব নির্ণয় সম্পর্কে অধ্যাপক বড়ুয়া যাবতীয় তথ্য পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে বিশ্লেষণ ও আলোচনা করেছেন। গ্রন্থের তৃতীয় অংশে রয়েছে আচার্য পরম্পরা ও রাজপরম্পরা নিয়ে তথ্যভিত্তিক আলোচনা।

বাংলায় রচিত একখানি অতি প্রয়োজনীয় গ্রন্থ পালি মজ্‌ঝিম নিকায়। প্রথম খণ্ডের অনুবাদ মধ্যমনিকায় যোগেন্দ্র-রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ড কর্তৃক ১৯৪০ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত। আদি বৌদ্ধ ধর্মের দুরূহ মূলতত্ত্ব এই গ্রন্থে বিধৃত আছে। এহেন তত্ত্বমূলক গ্রন্থের এমন সার্থক অনুবাদ সচরাচর দেখা যায় না। এই অনুবাদ গ্রন্থপাঠে যেমন মৌলিক পালি গ্রন্থের স্বাদ পাওয়া যায় তেমনি দুর্বোধ্য বিষয়ও অর্থদ্যোতনায় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। শুধু ভাবানুবাদ না করে তিনি মূলগ্রন্থকে যথাযথ অনুসরণ করে গদ্যাংশকে গদ্যে পদ্যাংশকে পদ্যে অনুবাদ করেছেন। তাঁর রচিত পুস্তকটি তাঁর যথেষ্ট কাব্যক্ষমতার পরিচয় বহন করে। গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেছেন, “বুদ্ধঘোষ প্রমুখ বৌদ্ধাচার্যগণের বিচারে—পরমত খণ্ডনের পক্ষেই পালি ত্রিপিটকের মধ্যে মজঝিম নিকায় সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ... আমার বিবেচনায় বুদ্ধের জীবন ও বাণীর যথার্থ মর্ম সম্যক উপলব্ধি করিতে হইলে মজ্‌ঝিম নিকায়ই একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ। অপর কোন গ্রন্থে বুদ্ধের হৃদয় এত স্পষ্টও উজ্জ্বলভাবে পরিস্ফূট হয় নাই। প্রথম খণ্ডের সূত্রগুলিই সর্বত্রই চিত্তবিমুক্তি ও প্রজ্ঞাবিমুক্তি এই দ্বিবিধ মুক্তিকে লক্ষ্য করিয়াছে এবং ঐ লক্ষ্যে পৌঁছিবার প্রকৃত সাধনপন্থা এবং অন্তরায়গুলি নির্দেশ করিয়াছে”।

১৩৫২ সালে (১৯৪৫ খৃষ্টাব্দে) বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত ডঃ বড়ুয়ার বৃহৎ নিবন্ধ "বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান" বাঙালী বৌদ্ধদের নিকট একটি মূল্যবান দলিল এবং গর্বের বিষয়। এই প্রবন্ধে ডঃ বড়ুয়া ধর্মরাজ বড়ুয়া, নবরাজ বড়ুয়া, ফুলচন্দ্র বড়ুয়া, কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া, রামচন্দ্র বড়ুয়া প্রমুখ লেখকের শতবর্ষব্যাপী পালি থেকে অনুবাদগ্রন্থ, হস্তসার, নীতিরত্ন, পালি ব্যাকরণ, বৌদ্ধ রঞ্জিকা, বুদ্ধচরিতামৃত, জাপানি বৌদ্ধ সম্প্রদায়, বিলাত দেশটা মাটির প্রভৃতি বহু কাব্য, উপন্যাস ও উপাখ্যান রচনা করেছেন। "বলা বাহুল্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস ক্ষেত্রে ডঃ বড়ুয়ার এই নিবন্ধটির মূল্য অপরিসীম। বাঙালী বৌদ্ধ কবি ও সাহিত্যিকদের বাংলা সাহিত্য ক্ষেত্রে কতখানি অবদান রয়েছে, সে সম্বন্ধে অনেক নতুন নতুন তথ্য বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাসগ্রন্থে সংযোজন করবার যথেষ্ট অবকাশ রয়েছে এ প্রবন্ধের সহায়তায়" (সুকুমার সেনগুপ্ত)।

১৩৪৫ (ইংরাজী ১৯৩৮) সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রকাশিত ডঃ বড়ুয়ার আর একটি প্রবন্ধ 'ভেল সংহিতার প্রাচীনত্ব ও বিশেষত্ব'। ডঃ বড়ুয়া ইংরাজী ভাষায়ও Bhela-Samhita–its antiquity and importance as a medical treatise শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করে Indian Culture (Vol.III July 1936-April 1937) এ প্রকাশ করেছেন। তিনি প্রামাণিক ভিত্তিতে ভেল সংহিতাকে আয়ুর্বেদ ও চিকিৎসা শাস্ত্রের উৎসরূপে পর্যালোচনা করেছেন। সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় ১৩৪৬ সালে (ইংরাজী ১৯৩৯) প্রকাশিত গুপ্তযুগে ত্রিপুরায় হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতি শীর্ষক প্রবন্ধটিতে ডঃ বড়ুয়া ত্রিপুরা জেলার গুণাইঘর গ্রামে আবিষ্কৃত মহারাজ শ্রীবৈন্য গুপ্তের তাম্রশাসনের তাৎপর্যের ভিত্তিতে তৎকালীন হিন্দু ও বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতি আলোচনা করেছেন। উক্ত পত্রিকায় ১৩৪৭ (ইংরাজী ১৯৪০) সালে ডঃ বড়ুয়ার 'শিবচরণের গীতপদ' এবং গোজেন লামা শীর্ষক দুইটি বাংলা প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এই নিবন্ধগুলিতে ডঃ বড়ুয়া পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা বৌদ্ধ সমাজের সর্বজন বিদিত ও জনপ্রিয় শিবচরণের রচিত অথবা তাঁরই নামে প্রচলিত গীতপদগুলির অবদান ও গুণাগুণ বিচার করেছেন। গীতপদগুলির সংখ্যা সাত বলে জনশ্রুতি থাকলেও, চাকমা জাতির ইতিহাসের লেখক সতীশ চন্দ্র ঘোষ ৬টি পদ সংগ্রহ করে তাঁর গ্রন্থে লিপিবদ্ধ করেছেন (চাকমা জাতি, পৃ. ৩৭—৭৮)। এই গীতগুলি "গোজেন লামা" বা "গোঁসাইলামা" পালাক্রমে তাল-লয় সমন্বয়ে গীত হয়ে থাকে। এই গীতগুলির মধ্যে বাংলার বৌদ্ধচিন্তাধারা কত দূর রক্ষিত আছে তা ডঃ বড়ুয়া বিশ্লেষণ করেছেন। শিবচরণের গীতপদগুলির ঐতিহাসিক বিশেষত্ব হিসাবে তিনি ঐগুলিতে সহজ সরল ভাষায় হীনযান ও মহাযান এই উভয় যানের লৌকিক ধারার সুন্দর সমাবেশের কথা উল্লেখ করেছেন তা গায়ক কবি ও ভক্ত সাধকের স্বাধীন অনুভূতিতে সঞ্জীবিত ও প্রাঞ্জল। সব গ্রন্থ এবং প্রবন্ধ ইত্যাদি একত্রে অধ্যাপক বড়ুয়ার রচনা প্রায় দেড়শতাধিক। কত যে হারিয়ে গেছে তার হদিশ পাওয়া যায় না। সেই সময়ের সংঘশক্তি ইত্যাদি পত্রিকা দেখলে কিছু সন্ধান পাওয়া যেত। আমার পাঠ্যাবস্থায়

কলেজস্ট্রিটের পুরাতন বই এর দোকানে একটি বই দেখেছিলাম। তার বিরাট ভূমিকা History of Indian Prostition ড: বড়ুয়ার রচনা। তখন যদি সেটা কিনে রাখতে পারতাম আজ সম্পদ হয়ে থাকত। কি বিশাল গ্রন্থ, কি অন্যের গ্রন্থের ভূমিকা, তাঁর প্রত্যেকটি রচনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ, গবেষণামূলক, পাণ্ডিত্যপূর্ণ এবং সমৃদ্ধভাষা কাব্যধর্মী। প্রতিভা ও মেধা না থাকলে এটা সম্ভব হত না। ভারততত্ত্ববিষয়ে পাণ্ডিত্যপূর্ণ গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ Royal Asiatic Society of Bengal (বর্তমান The Asiatic Society, Kolkata) তাঁকে Fellow নির্বাচিত করেন এবং Buddhist Studies-এর ক্ষেত্রে শ্রেষ্ঠ অবদানের জন্য Dr. B. C. Law স্বর্ণপদক ১৫ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে প্রদান করেন। হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে ২৩শে মার্চ ১৯৪৮ তিনি প্রয়াত হন।

ড: বড়ুয়া শুধু অধ্যাপনা ও গ্রন্থ নিবন্ধ রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন না, অন্যান্য সামাজিক কর্তব্যও অতীব নিষ্ঠাসহকারে সম্পাদন করতেন। ১৯৩৫ খৃষ্টাব্দে 'বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার' সাধারণ সম্পাদক থাকাকালীন তিনি সেখানে 'নালন্দা বিদ্যাভবন' প্রতিষ্ঠা করেন যাতে বৌদ্ধ ও অন্য ছেলেমেয়েরা বিশেষতঃ ভিক্ষু-শ্রামণেরগণ পালি ভাষা এবং বৌদ্ধধর্ম সম্বন্ধে জ্ঞানার্জন করতে পারে। এ ব্যাপারে তাঁকে অকুণ্ঠ সহায়তা করেন বিখ্যাত আইনজীবি ভূপেন্দ্রনাথ মুৎসুদ্দি। তাঁর চেষ্টায় শেঠ যুগল কিশোর বিড়লা ধর্মাংকুরের প্রাঙ্গনে ত্রিতল আর্যবিহার নির্মাণ করেছেন বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ এবং তীর্থযাত্রীদের সুবিধার্থে। ড: বড়ুয়া বৌদ্ধ ধর্মাংকুর সভার সাধারণ সম্পাদক ছাড়াও মহাবোধি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়ার সদস্য, কলিকাতাস্থ ইরান সোসাইটির প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ও সহসভাপতি, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের কার্য্যকরী সমিতির সদস্য, কলিকাতার ভারতী মহাবিদ্যালয়ের গভর্ণিং বডির সদস্য, Chittagong Peoples' Urban Cooperative Bank Ltd ও Bank of Commerce এর ডিরেক্টর বোর্ডের সদস্য। এছাড়া Chittagong Central Relief Committee, Burma Evaquees' Association, Hindu Evaquaees' Reception Committee, বিধবা বিবাহ সভা, হিন্দু সৎকার সমিতি প্রভৃতি জাতি ধর্মনির্বিশেষে বহু প্রতিষ্ঠানের সহিত যুক্ত ছিলেন। তিনি Indian Culture, Buddhist India, জগজ্জ্যোতি, বিশ্ববাণী পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন বহুদিন। তিনি যোগেন্দ্র রূপসীবালা ত্রিপিটক বোর্ডের সম্পাদক থাকাকালীন মধ্যমনিকায় (বঙ্গানুবাদ), মহাবগ্গ (পালি) মহাবর্গ (বঙ্গানুবাদ) ইত্যাদি অমূল্য গ্রন্থ প্রকাশ করেছিলেন। তিনি Indian Research Institute এর মুখ্য সম্পাদক ছিলেন। এখান থেকেও বহু গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছিল। এছাড়াও তিনি রামকৃষ্ণ বেদান্তমঠ, রামকৃষ্ণ মিশন, ভারত সেবাশ্রম সঙ্ঘ, হিন্দু মিশন, প্রগতি সঙ্ঘ প্রভৃতি জনহিতকর প্রতিষ্ঠান সমূহের সহিত সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিলেন।

পরিশেষে ড: বড়ুয়ার আর একটু মানবিক গুণের পরিচয় দিয়ে এই নিবন্ধ শেষ করছি। পূর্বে কিছুটা দিয়েছি। জ্ঞানযোগী ও কর্মযোগী অধ্যাপক বড়ুয়া মানুষ হিসাবেও ছিলেন

অনন্যসাধারণ ও আদর্শস্থানীয়। 'সবার উপরে মানুষ সত্য, তাহার উপরে নাই' কথাটি তাঁর সম্পর্কেই প্রযোজ্য। বহু মানবিক গুণ তাঁর মধ্যে সন্নিবিষ্ট হয়েছিল। তাঁর মত অমায়িক, সরল, অনাড়ম্বর, সমদর্শী, ছাত্রবৎসল, স্নেহময় পিতা, আদর্শ স্বামী এবং পরোপকারী মানুষ অতীব দুর্লভ। অথচ অন্যায় অবিচার সহ্য করতে পারতেন না। যেমন আব্দুল করিম নামে এক পণ্ডিত ব্যক্তি লিখেছিলেন বড়ুয়া সমাজে বেণীমাধব বড়ুয়া ও গজেন্দ্রলাল চৌধুরী এই দুজন ছাড়া লেখক নেই। এর প্রতিবাদে তিনি বাংলা সাহিত্যে শতবর্ষের বৌদ্ধ অবদান নামে বৃহৎ প্রবন্ধ লেখেন। নারায়ণ পত্রিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক প্রবন্ধ এবং শনিবারের চিঠিতে রায়বাহাদুর দীনেশচন্দ্র সেনের একটি গল্পের বই এর প্রতিবাদ ও সমালোচনা লেখেন। ডঃ বড়ুয়ার মত মানুষের আবির্ভাব যে কোন সমাজে দুর্লভ।

গ্রন্থপঞ্জী

১। সুকোমল চৌধুরী— *আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া*

২। হেমেন্দু বিকাশ চৌধুরী— ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া সম্বন্ধে ইংরাজী বাংলা লিখিত বহু প্রবন্ধ।

৩। *Dr. B. M. Barua Birth Centenary Commemoration Volume* (ed. Hemendu Bikash Chowdhury) –Bauddha Dharmankur Sabha।

৪। অঞ্জলি রায়—*ভারততত্ত্ববিদ্ আচার্য বেণীমাধব* (সুকুমার সেনগুপ্তের ভূমিকা সহ।)

৫। দেবপ্রিয় বড়ুয়া— *বেণীমাধব বড়ুয়া*।

সংঘরাজ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের অনন্য জীবন ও কর্ম

রথীন্দ্রবিজয় বড়ুয়া*

সময়টা শ্রাবণ মাসের মাঝামাঝি।

ধর্মপুর গ্রামের এক কিশোর বালক উত্তাল সর্তা নদীর প্রমত্ত ঢেউ ঠেলে ঠেলে ওপারে যাবার প্রাণপণ চেষ্টা করছে কিন্তু কিছুতেই এগোতে পারছে না ; ঢেউ যতই পেছনে ঠেলে দেয়, বালকের জেদ যায় বেড়ে! অবশেষে বালকের অদম্য ইচ্ছাশক্তির কাছে ঢেউ হার মানল। বালকটি জাফর আলি মুনসীর হাটের প্রাথমিক বিদ্যালয়ে পৌঁছে গেল।

মাষ্টার মশাই তো অবাক!

—এ বর্ষার দুর্যোগে তুমি এলে কী করে?

একজন পূর্ণবয়স্ক লোক এ সময় সর্ত্তা নদী পার হতে যেখানে সাহস পায়না, বলিহারি তোমার সাহস!

—-আজ যে আমার অনেক পড়া, স্যার।

বিনীতভাবে বালক বলল, না এলে পড়া করবো কি করে, আমি যে পিছিয়ে পড়বো।

এ বালক আর কেউ নয়, ধর্মপুরের পণ্ডিত হরচন্দ্র বড়ুয়ার সুযোগ্য পুত্র বিপিনচন্দ্র ওরফে আজকের পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। যাঁর পাঠ স্পৃহা ও প্রজ্ঞা সাধনা ছিল প্রবাদের মত। যদিও তাঁর বিড়ম্বিত ভাগ্য তাঁকে অন্য পাঁচটি ছেলের মত নিরবচ্ছিন্নভাবে বিদ্যাশিক্ষার সুযোগ দেয়নি। কারণ শৈশবে তাঁর পিতৃবিয়োগ হয়।

মাত্র তের বছর বয়সে পিতার শ্রাদ্ধবাসরে শ্রীমৎ ধর্মকথিক মহাস্থবিরের কাছে যখন তিনি শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হন তখন তাঁর কাছে জ্ঞান ভাণ্ডারের দ্বার খুলে গেল।

১৯২২ সালের ১৬ই নভেম্বর গুরুদেব ধর্মকথিক মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে আবদুলাপুর শাক্যমুনি বিহারের বদ্ধসীমায় ভিক্ষুসংঘের বরেণ্য ও অগ্রগণ্য ভিক্ষু আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির (রাঙ্গুনিয়া), ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির (আবদুলাপুর), বরজ্ঞান মহাস্থবির (গহিরা), শীলালংকার মহাস্থবির (নানুপুর) প্রভৃতির উপস্থিতিতে ধর্মাধারের পবিত্র উপসম্পদা সম্পন্ন হয়। তাঁকে ভিক্ষু ধর্মাধার অভিধায় ভূষিত করে দর্শনাচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ বলেন—ধর্মাধার শব্দের অর্থ হল ধর্মের আধার, ভবিষ্যতে

---

* শ্রী রথীন্দ্র বিজয় বড়ুয়া বিশিষ্ট লেখক ও প্রাবন্ধিকরূপে সুপরিচিত।

ইনি ধর্মভাণ্ডারিকের মত দেশ ও সমাজকে ধর্ম বিতরণ করবেন। বস্তুতঃ ধর্ম ও ধর্মাধার এ দুটি যেন সমার্থক। পণ্ডিত ধর্মাধার জীবনব্যাপী সাধনায় আচার আচরণে তা বহুবার প্রমাণ করেছেন। যথার্থই তিনি বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনকে সাধারণ গৃহী, পণ্ডিত ও বিদগ্ধজনকে অকাতরে শুধু বিলিয়েছেন।

তাঁর আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ ছিলেন সে যুগের বরেণ্য পণ্ডিত ও বাগ্মীবর। তাঁর অধীনে ধর্মাধার ধর্মবিনয়ের পাঠ গ্রহণ করেন।

রাজগুরু ধর্মরত্ন মহাস্থবির শ্রীলংকা ও বার্মাদেশে ত্রিপিটক শাস্ত্রে ব্যুৎপত্তি লাভ করে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করলে রাজানগর বিহারে ধর্মাধার তাঁর কাছে ধর্মবিনয়ের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় শিক্ষালাভ করেন।

আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ লক্ষ্য করেন ভিক্ষু ধর্মাধারের যেরূপ অনুসন্ধিৎসা তাঁকে সিংহলে পাঠালে সদ্ধর্মের উপকার হবে। তাঁরই উৎসাহ ও বাণীগ্রামের ডা: চাইলাফ্রু চৌধুরীর আর্থিক আনুকূল্যে ভিক্ষু ধর্মাধার উচ্চতর শিক্ষালাভের উদ্দেশ্যে সিংহল রওনা হলেন। তাঁর সঙ্গী হলেন গুরুভাই সুমনাচার ভিক্ষু। তাঁর ব্যয়ভার বহন করেন কোঠার পাড় নিবাসী ভুবনমোহন বড়ুয়া ও নানুপুরের শ্রী উপেন্দ্র চৌধুরী।

১৯২৮ সালের ফেব্রুয়ারী মাসে আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির ও গুণগ্রাহী আত্মীয়স্বজন থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরা কলিকাতায় ধর্মাঙ্কুর বিহারে উপনীত হলেন। তখন বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর বিহারে স্বামী পুন্নানন্দের কাছে অবস্থান করে সিংহলের জ্ঞাতব্য তথ্য সংগ্রহ করেন। সিংহল রওনা হওয়ার আগে বুদ্ধগয়া ও সপ্ত পবিত্রস্থান পরিদর্শন করে প্রভূত শান্তি ও আনন্দ লাভ করেন।

সিংহলের উদ্দেশে রওনা হয়ে তাঁরা মাদ্রাজে উপনীত হন। নাইডু বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক, অধ্যাপক লস্‌মি নাইডু তাঁদের আন্তরিক আতিথ্য প্রদান করেন। মাদ্রাজ থেকে রওনা হয়ে তাঁরা ভারতের দক্ষিণ বিন্দু সেতুবন্ধ রামেশ্বরমে পৌঁছে দেখেন— যতদূর দৃষ্টি যায় ভারত মহাসাগরের নীল জল, বিশাল বিস্তৃত জলধি, ভিক্ষুধর্মাধারকে অভিভূত করে ফেলল। তাঁরা জলযানে সিংহল অভিমুখে রওনা হলেন। দুধারে ফেনিল সমুদ্রের জলরাশি জাহাজে আছড়ে পড়ছে। ভিক্ষু ধর্মাধার তন্ময় হয়ে ভাবছেন—এই সাগরের মত অতলস্পর্শী গভীরতা বুদ্ধের ধর্মের। এই গভীরতা ভেদ করে তাকে আহরণ করতে হবে বুদ্ধের দর্শনশাস্ত্রের আসল মণিমুক্তো। তালাইমান্নার জেটিতে নেমে ভদন্ত অতুল সেন ও শ্রমণ অনোমদর্শীকে দেখে তাঁরা পরম প্রীতি ও সন্তোষ লাভ করেন। তাঁরা ভিক্ষু ধর্মাধার ও ভিক্ষু সুমনাচারকে স্বাগত জানান।

কয়েকদিন তাঁদের সান্নিধ্য-সুখ উপভোগ করে তাঁরা সদ্ধর্মোদয় পরিবেনে উপনীত হলে তাঁদের আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

ভিক্ষু ধর্মাধার সদ্ধর্মোদয় পরিবেনে সহাচার্য্য উপসেনের অধীনে বিনয় পিটক ও তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্র অধ্যয়ন করেন। আচার্য্য পণ্ডিত বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের কাছে বিশুদ্ধিমার্গ ও পণ্ডিত জ্ঞানাভিবংস ও সন্দভের কাছে সুত্ত পিটক, ব্যাকরণ শাস্ত্র, ছন্দ ও অলংকার শাস্ত্রে গভীর জ্ঞানার্জন করেন।

এসময় অম্বলগোদা বনাশ্রমে পণ্ডিত বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের কাছে দ্বিতীয়বার ভিক্ষু ধর্মাধার উপসম্পদা লাভ করেন। উদকসীমায় ২০ জন বিশিষ্ট মহাস্থবিরদের উপস্থিতিতে এই পবিত্র উপসম্পদা কার্য্য সম্পন্ন হয়।

অতঃপর ভিক্ষু ধর্মাধার নতুন আচার্য্য বুদ্ধদত্ত মহাস্থবিরের সঙ্গে মাতেরা গমন করেন এবং অট্‌ঠকথা সহ বিশুদ্ধি মার্গে গভীর জ্ঞান লাভ করেন।

ইতিমধ্যে অভিধর্মাচার্য্য পণ্ডিত বাগীশ্বর ও পণ্ডিত ধর্মরত্ন মহাথেরোর মধ্যে সিংহলী ভাষার উৎপত্তি নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হলে মহাচার্য্য উপসেন তাঁর প্রিয় শিষ্য ভিক্ষু ধর্মাধারকে এই বিতর্কের সুষ্ঠু সমাধানের গুরুদায়িত্ব অর্পণ করেন। ভিক্ষু ধর্মাধার সিংহলের ইতিবৃত্ত ব্যাখ্যা করে মহাস্থবিরদের প্রশ্নের যথোপযুক্ত উত্তর প্রদান করেন। উভয়ে সানন্দে এ যুক্তি মেনে নেন। সিংহলের ইতিবৃত্ত নিয়ে ভিক্ষু ধর্মাধারের পাণ্ডিত্যপূর্ণ ব্যাখ্যা বিদ্বৎসভায় স্বীকৃতি লাভ করে এবং ধর্মাধারের পাণ্ডিত্যের খ্যাতি সারা সিংহলে পরিব্যাপ্ত হয়।

আচার্য্য বাগীশ্বর ছিলেন সিংহলে অভিধর্মশাস্ত্র পারঙ্গম, এক বহুশ্রুত নাম। ভিক্ষু ধর্মাধার অভিধর্ম বিষয়ে অধ্যয়নের আগ্রহ প্রকাশ করলে আচার্য্য তাঁকে অভিধর্মাচার্য্য বাগীশ্বরের কাছে প্রেরণ করেন।

মিহিরগামা শাসন বর্ধন পরিবেশে সারি সারি নারিকেল বীথির অন্তরালে নির্জন সংঘারামের প্রশস্ত কক্ষে ভিক্ষুধর্মাধার অভিনিবেশ সহকারে 'অভিধর্ম' অধ্যয়নে রত ছিলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে স্বদেশবাসী ভিক্ষু শীলানন্দের আবির্ভাবে প্রবাসে যেন আত্মীয়সুখ অনুভব করলেন। তিনিও অভিধর্মশাস্ত্র অধ্যয়নমানসে এখানে আগমন করেছেন। এই সতীর্থকে ধর্মাধার আপনকক্ষে বরণ করে নেন।

ভিক্ষুশীলানন্দ ওরফে শীলানন্দ ব্রহ্মচারী তাঁর "সঙ্ঘ সান্নিধ্যে" গ্রন্থে লিখেছেন—"ভিক্ষু ধর্মাধার ও আমি একসঙ্গে আচার্য্য বাগীশ্বরের কাছে অধ্যয়ন শুরু করি। আচার্য্য মহোদয় আমাদের উভয়কে অনুরাগী ছাত্র পেয়ে খুশী হন এবং সোৎসাহে অকৃপণভাবে অভিধর্মের নিগূঢ়তত্ত্ব ও তথ্য পরিবেশনে আমাদের অনুগৃহীত করেন। তাঁর শিক্ষাদান পরম্পরাগত প্রথানুগ হলেও বিশেষত্বহীন নয়। তিনি অত্যন্ত জটিল বিষয়কেও সহজ সরল করে বোঝাতে পারতেন। তাঁর নিপুণ ব্যাখ্যার গুণে দুর্বোধ্য অভিধর্ম সরস সাবলীল হত।

আমার সহাধ্যায়ীদের মধ্যে ভিক্ষু ধর্মাধারের মত পাঠস্পৃহা অন্য কারো দেখিনি।

অধ্যয়নই ছাত্রদের তপস্যা এ কথাটি তাঁর জীবনে অক্ষরে অক্ষরে সত্য। স্নানাহারাদির সময় ছাড়া তিনি সর্বদা পাঠে নিমগ্ন থাকতেন। যতই তাঁর সান্নিধ্যে আসি, তাঁর আলাপ-আচরণে মুগ্ধ হই ও তাঁর প্রতি আমার শ্রদ্ধাপ্রীতি বর্ধিত হতে থাকে।"

পুরাকালে এ ধারণা প্রচলিত ছিল যে প্রতিভা শিক্ষা নিরপেক্ষ দেবশক্তি, কিন্তু এ ধারণা সর্বৈব ভ্রান্ত। প্রতিভা স্বাভাবিক শক্তি কিন্তু তা পরিশ্রমসাপেক্ষ। ভিক্ষু ধর্মাধার ত্রিপিটক শাস্ত্র অধিগত করতে যে আয়াস স্বীকার করেছেন তা উত্তরকালে তুলনামূলক শাস্ত্রে যথেষ্ট ব্যুৎপত্তিলাভে তাঁর সহায়ক হয়েছিল।

সিংহলের ধর্মকীর্তি কল্যাণ-ট্রাষ্ট বর্মীভাষায় ত্রিপিটকশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য চারটি বৃত্তি ঘোষণা করেন। পণ্ডিত ধর্মাধার ও ভিক্ষু শীলানন্দ যথাক্রমে বাঙালী ভিক্ষু হিসেবে এবং ভদন্ত সদ্ধর্মালঙ্কার সিংহলবাসী হিসেবে এই বৃত্তি লাভ করেন। পরে পণ্ডিত ধর্মাধার সদ্ধর্মোদয় পরিবেনে ভদন্ত সদ্ধর্মালংকারের কাছে বার্মিজ পদ্ধতিতে অভিধর্ম শিক্ষার কৌশল অধিগত করেন।

সিংহলের বিদ্যোদয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ডঃ আনন্দ মিত্র মহাথের বলেন— ধর্মাধার সিংহলে একটি সর্বজনশ্রদ্ধেয় নাম। অট্ঠকথাসহ ত্রিপিটক শাস্ত্র তাঁর কণ্ঠস্থ থাকত। ফলে তিনি ধর্মপ্রসঙ্গে জটিল প্রশ্নাদির সহজ সরল সমাধান দিতে পারতেন। শুধু তাই নয় ধর্মভাষণেও তিনি ছিলেন কৃতবিদ্যাসম্পন্ন।

ইতিপূর্বে বাঙ্গালীদের মধ্যে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া পালি শাস্ত্র ও বৌদ্ধধর্ম বিষয়ে সিংহলে বিদ্যালংকার পরিবেনে ভাষণ দিয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর রেখেছেন। এই বিশ্ববিদ্যালয় ডঃ বড়ুয়াকে 'ত্রিপিটকাচার্য্য' উপাধিতে ভূষিত করে।

সিংহলে অবস্থানকালীন পণ্ডিতধর্মাধার সিংহলের অন্যতম দর্শনীয় স্থান অনুরাধাপুরে বোধিবৃক্ষ দর্শন করতে যান। ২৩০০ বছর আগে সম্রাট অশোকের আত্মজা ভিক্ষুণী সংঘমিত্রা। এই বোধিবৃক্ষের চারা ভারত থেকে সিংহলে নিয়ে আসেন। বুদ্ধগয়া থেকে বোধিবৃক্ষের এই স্মারক আজও সিংহলবাসীর অন্তরে বুদ্ধের পবিত্র স্মৃতি জাগ্রত রেখেছে।

১৯৩২ সালের জুন মাসে মহাচার্য্য উপসেন মহাস্থবির ও অন্যান্য আচার্য্য এবং ভিক্ষুসংঘকে যথাযোগ্য সম্মান ও কৃতজ্ঞতা জানিয়ে ধর্মাধার চট্টগ্রামের উদ্দেশ্যে রওনা হলেন, কিন্তু সহযাত্রী ভিক্ষু সুমনাচার ও ধর্মদর্শী ভিক্ষু অসুস্থ হয়ে পড়ায় তাঁরা কলম্বোর জেতবনারামে যাত্রা বিরতি ঘটালেন। এমতাবস্থায় জেতবনারামে বর্ষাব্রত উদ্‌যাপন করতে হল। সেই বিহারে তখন বাঙালী ভিক্ষু ছিলেন দেবানন্দ (রাঙ্গুনিয়া)। বর্ষাশেষের কদিন আগে আচার্য্য বাগীশ্বর মহাস্থবিরও তাঁদের সাথে চট্টগ্রাম যাওয়ার উদ্দেশ্যে উপস্থিত হন। এ ছাড়া ইতালিয়ান ভিক্ষু লোকনাথ সহ তিনজন বিদেশী মিলে মোট ১২ জন ভিক্ষু বর্ষাব্রত পালন করেন। ইতিমধ্যে ভিক্ষু

সুমনাচার ও ভিক্ষু ধর্মদর্শী আরোগ্য লাভ করেন। ভিক্ষু সুমনাচারকে চট্টগ্রামে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

১৯৩২ সালের ডিসেম্বর মাস, জেতবনারামে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ও তাঁর সঙ্গীদের হার্দিক বিদায় সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। তাঁরা এক সুবৃহৎ জলযানে বার্মার উদ্দেশ্যে রওনা হন। যতদূর দৃষ্টি যায় নিস্তরঙ্গ নীল জলরাশি। সূর্য্যাস্তের রঙে নীল সমুদ্র যেন গলানো সোনা। এ অপূর্ব দৃশ্য ধর্মাধার ও সহ-যাত্রীরা প্রাণভরে উপভোগ করলেন।

তিনি বার্মা জেটিতে অগণিত বাঙালী বৌদ্ধ ভক্তদের দেখে অভিভূত হলেন। চট্টল বৌদ্ধ সমিতির কর্মকর্তারা শোভাযাত্রা সংগঠিত করেন, ব্যাণ্ড বাদ্য সহযোগে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ও অন্যান্য ভিক্ষুদের ধর্মদূত বিহারে শোভাযাত্রা সহকারে নিয়ে আসেন।

রেঙ্গুন ধর্মদূত বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের অগ্রণী মহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির। দীর্ঘদিন পরে ধর্মাধারের দর্শনলাভ করে উভয়ে আপ্লুত। পরদিন চট্টলবাসী বৌদ্ধ দায়কবৃন্দ এক সম্বর্ধনা সভার আয়োজন করে। পণ্ডিত ধর্মাধারের এই সম্বর্ধনা সভায় পৌরহিত্য করেন অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে আচার্য্য বাগীশ্বর। তিনি সেবক মুনি সিংহকে নিয়ে এই সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করেন। বাঙালী বৌদ্ধ সমাজের অনেক গুণী-জ্ঞানী ব্যক্তি সম্বর্ধনা সভায় উপস্থিত থেকে সারগর্ভ ভাষণ দেন। তাঁদের মধ্যে বৌদ্ধ সমাজের খ্যাতনামা বিদর্শনাচার্য্য ডাঃ রাজেন্দ্রলাল মুৎসুদ্দি বলেন—'পণ্ডিত ধর্মাধার আমাদের বাঙালী বৌদ্ধভিক্ষু ও গৃহী সমাজের ভবিষ্যৎ কাণ্ডারী ও যোগ্য ভিক্ষু। তিনি আমাদের গর্ব। তাঁর মত প্রতিভা আমাদের সমাজে বিরল।'

পণ্ডিত ধর্মাধার তাঁর ভাষণে বলেন—দীর্ঘদিন পরে আপনাদের সঙ্গে মিলিত হতে পেরে নিজেকে ধন্য মনে করছি। সিংহলবাসী বৌদ্ধ ভিক্ষু ও উপাসক উপাসিকাদের দৈনন্দিন জীবনচর্য্যা, তাঁদের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, উন্নত ধর্মীয় চিন্তাধারা এবং ভিক্ষুসংঘের বিনয়সম্মত জীবনযাত্রা অনুকরণযোগ্য। বাঙালী বৌদ্ধ সমাজকে জাগাতে হলে বুদ্ধের ধর্ম-বিনয় অনুশীলন ও সমাজ সংস্কারে উদ্যোগী হতে হবে। এজন্য সবার সহযোগিতা একান্ত আবশ্যক।

পরিশেষে ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের অবদানের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে বলেন—প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির বাঙালী বৌদ্ধ সমাজকে শত বছর এগিয়ে দিয়েছেন। তিনি বৌদ্ধ সমাজের আলোর দিশারী। তাঁর রেঙ্গুন মিশন প্রেস বৌদ্ধ সাহিত্যের বিকাশে প্রভূত সহায়ক হয়েছে। ভদন্ত নিজেও পাণ্ডিত্যপূর্ণ রচনা দ্বারা ধর্ম ও সংস্কৃতির বিকাশে উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছেন।

পণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির সভাপতির ভাষণে ধর্মাধারকে বিরল প্রতিভাবান ভিক্ষু বলে উল্লেখ করেন। 'সংঘশক্তি' পত্রিকায় প্রকাশিত ভব-পরিবর্তন (১৯৩১) বিমুক্তি সুখ (১৯৩১) চরম শান্তি (১৯৩২) অনাদি সংসার (১৯৩২) প্রভৃতি রচনা তাঁর মননশীলতা ও পাণ্ডিত্যের স্বাক্ষর বহন করে। চট্টগ্রাম ফিরে গিয়ে তিনি সদ্ধর্ম প্রচারে ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করবেন, এই আমাদের একান্ত আকাঙ্ক্ষা। আমি তাঁর উত্তরোত্তর সাফল্য কামনা করি।

ধর্মাধার ভিক্ষুর পাণ্ডিত্যপূর্ণ ভাষণ ও ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের অভিভাষণ সমস্ত দর্শক ও শ্রোতৃমণ্ডলীকে উদ্বেলিত করে।

পণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও তাঁর বিরাট কর্মযজ্ঞ স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করে ও তাঁর স্নেহ সান্নিধ্যে কয়েকদিন কাটিয়ে, ব্রহ্মদেশের পবিত্র তীর্থসমূহ দর্শন করে পণ্ডিত ধর্মাধার সঙ্গীদের নিয়ে চট্টগ্রাম অভিমুখে রওনা হন।

১৯৩৩ খৃঃ ফেব্রুয়ারী তিনি তাঁর অভিধর্মাচার্য্য বাগীশ্বরকে সঙ্গে নিয়ে চট্টগ্রাম পৌছে সর্বপ্রথম পরম শ্রদ্ধাভাজন সংঘরাজ পূর্ণাচার মহাস্থবিরের জন্মভূমি ও কর্মস্থল ঊনাইনপুরা লঙ্কারাম বিহারে উপনীত হয়ে আর্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের আশীর্বাদ ও অভিনন্দন লাভ করেন। পরে লঙ্কারাম বিহারে পণ্ডিত ধর্মাধার ও বাগ্মীশ্বরকে এক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়।

এ সভায় পৌরহিত্য করেন লঙ্কারাম বিহারাধ্যক্ষ আর্য্যশ্রাবক সাধক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির। সভায় ধর্মাধারকে যথাযোগ্য সম্মান প্রদান করে তাঁর ত্রিপিটকশাস্ত্রে পাণ্ডিত্য ও কর্মকুশলতার স্বীকৃতি প্রদান করে সভাপতি ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ধর্মাধার প্রত্যুত্তরে গুরুবন্দনা ও ঊনাইনপুরাবাসীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে সংঘরাজ নিকায়ের ইতিবৃত্ত ও ঊনাইনপুরার ঐতিহ্য সম্পর্কে মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন। উপস্থিত শ্রোতৃমণ্ডলী স্বতঃস্ফূর্ত সাধুবাদ দিয়ে তাঁকে অভিনন্দিত করেন। এ সভায় আচার্য্য বাগ্মীশ্বর সিংহলী ভাষায় বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন সম্পর্কে ভাষণ প্রদান করেন। ধর্মাধার তাঁর বক্তৃতার বাংলা অনুবাদ করেন যা ছিল সহজ সরল ভাষায় সবার বোধগম্য তর্জমা। সভাশেষে তাঁরা ধর্মাধারের কর্মস্থল মির্জাপুরের গৌতমাশ্রম, আবদুলাপুরের শাক্যমুনি বিহার, ধর্মপুরে পূর্ণানন্দ বিহার, নানুপুর ও ফটিক ছড়িতে গমন করেন এবং বিপুলভাবে সম্বর্ধিত হন। ফটিকছড়ি করোনেশন হাইস্কুলের প্রাঙ্গনে এক সর্ব-ধর্ম সভার আয়োজন হয়। ফটিকছড়ি কোর্টের মুন্সেফ মহোদয় সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। এই সভায় পণ্ডিত ধর্মাধারের ভাষণ এক ধর্মালোড়ন সৃষ্টি করে। আচার্য্য বাগ্মীশ্বর সিংহলী ভাষায় বক্তৃতা দেন। যা বাংলায় অনুবাদ করেন পণ্ডিত ধর্মাধার। সংঘরাজ ভিক্ষুমহামণ্ডল আবদুলাপুরের শাক্যমুনি বিহারে ভিক্ষু সংঘের এক সাধারণ সভা আহ্বান করেন। সিংহলে ত্রিপিটক শাস্ত্রে ও

তুলনামূলক দর্শনশাস্ত্রে বুৎপত্তি লাভ করে ভিক্ষু ধর্মাধার এ দেশের ধর্মীয় শিক্ষায় যে সমস্ত ত্রুটি-বিচ্যুতি আছে তা দূর করার জন্য কয়েকটি পরিকল্পনার কথা প্রস্তাব দিলে ভিক্ষুমহামণ্ডল তা রূপায়ণের দায়িত্ব ধর্মাধারের ওপর ন্যস্ত করেন এবং তাঁকে সর্বসম্মতিক্রমে মহামণ্ডলের প্রধান সচিব নির্বাচিত করেন।

আবদুলাপুর শাক্যমুনি বিহারে ভিক্ষু মহামণ্ডল পালি শিক্ষাকেন্দ্র খুলতে উদ্যোগী হলে মহামুনির পালিশাস্ত্রে সুপণ্ডিত বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি অভিধর্মাচার্য্য, এই কেন্দ্র আবদুলাপুরের পরিবর্তে মহামুনি মহানন্দ বিহারে খোলার প্রস্তাব দেন এবং ভিক্ষু ধর্মাধারকে এই শিক্ষাকেন্দ্রের দায়িত্ব দিয়ে তাঁকে মহানন্দ বিহারের অধ্যক্ষ পদে বৃত করেন। এই শিক্ষাকেন্দ্রের যাবতীয় ব্যয়, ভিক্ষু শ্রমণদের থাকা খাওয়া ও শিক্ষার যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করার প্রস্তাব সংঘরাজ ভিক্ষু মহামণ্ডল অনুমোদন করে এবং ভিক্ষু ধর্মাধার মহানন্দ বিহারের অধ্যক্ষের দায়িত্ব নিয়ে পাহাড়তলী মহামুনি নিবাসী দায়ক দায়িকাদের সহযোগিতায় অচিরে 'মহামুনি পালি কলেজ' প্রতিষ্ঠা করেন। এ ব্যাপারে শ্রীমৎ প্রজ্ঞারত্ন মহাস্থবিরের সহযোগিতাও বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

ভিক্ষু ধর্মাধারের কর্মজীবনের নতুন অধ্যায় শুরু হল। সিংহলে বরেণ্য আচার্য্যদের প্রদর্শিত শিক্ষাপদ্ধতি অনুসরণ করে তিনি মহামুনি পালি কলেজে বিভিন্ন শাস্ত্রের তুলনামূলক আলোচনার পরিবেশ সৃষ্টি করেন।

সর্বপ্রথম শ্রমণ সুগতবংশ (ঘাটচেক) শ্রমণ সুদর্শন (ধর্মপুর) শ্রমণ শীলানন্দ (মির্জাপুর) শ্রমণ আর্য্যকীর্তি (নোয়াখালি) প্রমুখ চারজন ছাত্রকে নিয়ে মহামুনি কলেজের শুভ উদ্‌ঘাটন হয়। অচিরে এই পালিকলেজের খ্যাতি চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে। দূর দূরান্ত থেকে বিদ্যার্থীরা আসতে থাকেন, তাঁদের মধ্যে শ্রমণ শীলাচার (পুঁটিবিলা) শ্রমণ পূর্ণানন্দ (চেঁদিরপুনি) ভিক্ষু ধর্মরক্ষিত (কড়ৈয়ানগর) শ্রমণ পূর্ণানন্দ (লাকসাম), শ্রমণ জ্যোতিঃ পাল (বরইগাঁও), ভিক্ষুজিনরতন (চানগাঁও), শ্রমণ ধর্মালঙ্কার (পালং) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য।

অভিধর্মাচার্য্য বীরেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দি ও স্থানীয় বিদগ্ধজনের সমাবেশে অপরাহ্নে ত্রিপিটক শাস্ত্রের বিভিন্ন অধ্যায়ের ওপর গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা হতো। পণ্ডিত ধর্মাধার বৌদ্ধদর্শনের নিগূঢ় দিক তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ওজস্বিতায় শ্রোতৃবৃন্দের সামনে তুলে ধরতেন এবং যে কোন প্রশ্নের সমাধান সহজ সরল ভাষায় প্রকাশ করতেন।

১৯৩৪ খৃঃ দর্শনাচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির এই মহামুনি পালি কলেজে অধ্যাপকরূপে বৃত হন। এখানে যেন মণি-কাঞ্চন যোগ হল। মহামুনি পাহাড়তলী বৌদ্ধশাস্ত্র চর্চার কেন্দ্রবিন্দু রূপে সারা দেশে স্বীকৃতি পেল।

এই কলেজের ছাত্রদের মধ্যে বহু খ্যাতকীর্তি পণ্ডিত, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপক হিসেবে সুনাম অর্জন করেছেন।

১৯৩৫ সালে তিনি বিনয় পিটকের পরীক্ষা দিতে কলকাতা আসেন এবং ধর্মাঙ্কুরে অবস্থান করেন। ইতিপূর্বে শ্রীমৎ শ্রদ্ধাতিষ্য মহাস্থবির ধর্মাঙ্কুর বিহারের অধ্যক্ষ ছিলেন। তখন বিহারের অবস্থা শোচনীয়। আনন্দকুমার স্থবির আগেই চলে যান। ধর্মাঙ্কুরের সাধারণ সম্পাদক ডাঃ শান্ত কুমার চৌধুরী তাঁকে ধর্মাঙ্কুর বিহারের দায়িত্বভার গ্রহণ করতে অনুরোধ করলে তিনি মহামুনি পালি কলেজ ছেড়ে আসার অক্ষমতা প্রকাশ করেন। তাঁকে বিকল্প কোন নাম প্রস্তাব করতে বললে তিনি বয়োবৃদ্ধ ও জ্ঞানবৃদ্ধ হিসেবে ভদন্ত বংশদীপ মহাস্থবিরের নাম প্রস্তাব করেন। ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়াও এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন।

১৯৩৫ সালে তিনি দেশে ফিরে তিন দলের ভিক্ষু সংঘ সম্মেলন আহ্বান করে চট্টল ভিক্ষু সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন।

এ সময় পাহাড়তলী মহানন্দ বিহারের অধ্যক্ষ ভদন্ত উনন্দ মহাস্থবির প্রয়াত হন এবং পণ্ডিত ধর্মাধার তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন, তিনি এ সময় মানরাজার রাজগুরু পদে বৃত হন এবং এই সম্মানজনক পদে অভিষিক্ত হয়ে রাজগুরুর পূর্ণ মর্য্যাদায় যাবতীয় দায়িত্ব সুনামের সঙ্গে নির্বাহ করেন।

১৯৩৫ সালে মাঘী পূর্ণিমা উপলক্ষে চট্টগ্রামের কাচলং ভেলী নামক 'পেডান্যার মার' ছড়ায় চাকমা বৌদ্ধদের মহাসম্মেলনে যোগদান করে তিনি সভাপতি পদ অলংকৃত করেন। চাকমা রাজার তৎকালীন মন্ত্রী অবনী দেওয়ান মিলিন্দ প্রশ্ন গ্রন্থের কিছু জটিল প্রশ্নের সমাধান প্রার্থনা করলে পণ্ডিত ধর্মাধার সহজ সরল ভাষায় তা বুঝিয়ে দেন। তাঁর এই অগাধ পাণ্ডিত্যের জন্য তাঁকে 'মহাপণ্ডিত' আখ্যায় ভূষিত করা হয়। অবনী দেওয়ান পণ্ডিত ধর্মাধারকে 'চাকমা ইতিহাস' এর পাণ্ডুলিপি প্রদান করেন যা পরবর্তীকালে তাঁর 'বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনগ্রন্থে' বিশদ আলোচিত হয়েছে।

পণ্ডিত ধর্মাধারের আগমনোপলক্ষে লঙ্গুদর ও রাঙ্গামাটিতে ধর্ম সম্মেলন আয়োজিত হয়। প্রতিটি সভায় তিনি পার্বত্য চাকমা ও উপজাতি মগদের সঙ্গে ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক বন্ধনের ইতিহাস তুলে ধরে বৌদ্ধদের রীতিনীতির সাযুজ্য বিধানের ওপর জোর দেন। তিনি পার্বত্য অঞ্চলে তান্ত্রিক মতবাদের অসারতা প্রতিপন্ন করে প্রকৃত বৌদ্ধধর্মীয় পদ্ধতি বিশ্লেষণ করেন যা খুবই ফলপ্রসূ হয়েছিল।

মহানন্দ বিহারে প্রত্যাবর্তন করে তিনি কুমিল্লায় বুদ্ধ জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথিরূপে যোগদানের আমন্ত্রণপত্র পান। কুমিল্লা টাউন হলে এবং রামমালা ছাত্রাবাসে তিনি বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন নিয়ে যে সারগর্ভ ভাষণ দেন তা কুমিল্লাবাসী দীর্ঘদিন মনে রাখবে। রামমালা ছাত্রাবাসের অধ্যক্ষ ডঃ রাসমোহন চক্রবর্তী তাঁর গুণগ্রাহী ভক্ত হিসেবে পরিগণিত হন।

১৯৩৬ সালে পণ্ডিত ধর্মাধার বঙ্গীয় সংস্কৃত শিক্ষা পরিষদ আয়োজিত ত্রিপিটকের সমস্ত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে কৃতিত্বের স্বীকৃতি স্বরূপ 'ত্রিপিটক বিশারদ'

উপাধিতে ভূষিত হন এবং স্বর্ণপদক লাভ করেন। বঙ্গীয় ভিক্ষু ও গৃহী সমাজে তিনিই প্রথম ত্রিপিটক বিশারদ।

১৯৩৭ সালে পণ্ডিত নেহেরু রেঙ্গুন থেকে চট্টগ্রাম আগমন করেন এবং চট্টগ্রামের গান্ধী ময়দানে পণ্ডিত ধর্মাধার বৌদ্ধদের পক্ষ থেকে স্বাগত সম্ভাষণ জানান। তখন চট্টগ্রামে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া ছিলেন বিশিষ্ট বৌদ্ধ কংগ্রেস নেতা, তিনি আজীবন সত্য ও ন্যায়ের জন্য সংগ্রাম করে গেছেন। তাঁর সরল অনাড়ম্বর জীবন কংগ্রেসের মূল আদর্শকে সমুন্নত রেখেছে। পরবর্তীকালে তিনি কংগ্রেসের জেলা কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন।

১৯৩৮ সালে নেতাজী সুভাষ চন্দ্র বসু চট্টগ্রামে শুভাগমন করেন, পণ্ডিত ধর্মাধার বৌদ্ধ যুব সমাজের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানান। নেতাজী চট্টগ্রামের বৌদ্ধ তরুণদের স্বাধীনতা সংগ্রামে আরও অধিক সংখ্যায় অংশ গ্রহণের আহ্বান জানান।

১৯৩৮ খৃঃ চট্টগ্রামের পূর্ব-সাতবাড়িয়ায় চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতি এক বৌদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করে। এই সম্মেলনে সভাপতি পদ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে ভদন্ত দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান ও মাষ্টার মহেন্দ্রলাল বড়ুয়া পণ্ডিত ধর্মাধারকে অনুরোধ জানালে তিনি সম্মতিপ্রদান করেন। কিন্তু শর্ত দেন চট্টল বৌদ্ধ সমিতি ও বৌদ্ধ সমাগমের মধ্যে বিগত ১৪ বছরের বিবাদের অবসান ঘটাতে হবে, বৌদ্ধ সমাগম নেতা উমেশচন্দ্র মুৎসুদ্দি ও বৌদ্ধ সমিতির নেতৃবৃন্দ পরবর্তী নির্বাচনকে প্রতিনিধিত্বমূলক করার আশ্বাস দিলে ধর্মাধার সানন্দে সভাপতিত্ব করতে সম্মত হন।

মহাসভা উপলক্ষে সভাপতি পণ্ডিত ধর্মাধার ও নেতৃবৃন্দ হাশিমপুর রেলষ্টেশনে পৌঁছলে তাঁদের বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা সহকারে মূল মণ্ডপে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করা হয়। সাতবাড়িয়া রত্নাঙ্কুর বিহারে বৌদ্ধজাতির এক ঐতিহাসিক সম্মেলন শুরু হয়। সভাপতি তাঁর ভাষণে বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস তুলে ধরে যুগের সঙ্গে তাল রেখে বৌদ্ধদের এগিয়ে যাবার আহ্বান জানান এবং এই যুগসন্ধিক্ষণে ভিক্ষু সংঘের ভূমিকা ও কর্ত্তব্য নিরূপনের প্রয়াস পান। তাঁর উদাত্ত আহ্বান বৌদ্ধ যুব মানসে নতুন প্রেরণা সঞ্জীবিত করে।

১৯৩৯ সালে আরাকানের ধর্মদূত বিহারে অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে পণ্ডিত ধর্মাধার ভিক্ষু অরিয়ধম্ম ও বিপিনচন্দ্র বড়ুয়াকে নিয়ে যোগদান করেন। আকিয়াবের ন্যাশনাল স্কুল প্রাঙ্গণে সুসজ্জিত মঞ্চে দেশ-বিদেশের বরণীয় ভিক্ষু ও গুণগ্রাহীদের সমাবেশে অগ্গমহাপণ্ডিতের জন্ম-জয়ন্তী সাড়ম্বরে উদ্‌যাপিত হয়। পণ্ডিত ধর্মাধার প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের পাণ্ডিত্য ও অবদানের কথা শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন।

১৯৩৯ সালে পণ্ডিত ধর্মাধার রাজসাহীর পাহাড়পুরের প্রত্নতত্ত্বসামগ্রী পরিদর্শনে গমন করেন। A. Cunningham সোমপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ খনন করে এসব দুর্লভ প্রত্নতত্ত্বসামগ্রী উদ্ধার করেন। রাজসাহী থেকে প্রত্যাবর্তন করে তিনি সংবাদ পেলেন চট্টগ্রাম বৌদ্ধ সমিতির সভাপতি অগ্গমহাপণ্ডিত ধর্মবংশ মহাস্থবির লোকান্তরিত এবং তাঁর মরদেহ সাতবাড়িয়া শান্তিধাম বিহারে অন্তিমশয্যায় শায়িত। পণ্ডিত ধর্মাধার ভিক্ষুসংঘের সহায়তায় যথাযোগ্য মর্য্যাদায় মরদেহ সৎকার করেন। ১৯৩৮ সালে পূর্ব সাতবাড়িয়ায় চট্টল বৌদ্ধ সমিতি আয়োজিত মহাসম্মেলনে পণ্ডিত ধর্মাধার সভাপতিত্ব করেছিলেন তখন তিনি থেরবাদী সংঘের সংহতি রক্ষার জন্য 'ভিক্ষুমহাসভা' গঠনে সংকল্প গ্রহণ করেন। এখন সেই শুভমুহূর্ত উপস্থিত, এই পরিকল্পনা বাস্তবায়িত করার উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধেয় প্রজ্ঞানন্দ স্থবির ও পণ্ডিত ধর্মাধার গহিরা, রাঙ্গুনিয়া, সাতবাড়িয়া, রাউজান, কর্তালা, উনাইনপুরা প্রভৃতি গ্রামে গিয়ে বরেণ্য মহাস্থবির তথা প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, বংশদীপ মহাস্থবির, জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির ধর্মানন্দ মহাস্থবির এবং বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির প্রমুখ মহাস্থবিরদের সম্মতি আদায় করেন, ১৯৪০ সালে শ্রদ্ধেয় ধর্মানন্দ মহাস্থবিরের আহ্বানে বেতাগীতে যে মহাসভার অধিবেশন হয় তাতে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভা গঠনের সর্ব্বসম্মত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।

শ্রদ্ধেয় তেজবন্ত মহাস্থবির সংঘরাজ ও পণ্ডিত ধর্মাধার সম্পাদকের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। তাঁর ওপর সংঘরাজ ভিক্ষুমহাসভার গঠনতন্ত্র প্রণয়নের দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি কৃতিত্বের সঙ্গে এক যুগোপযোগী গঠনতন্ত্র উপহার দিয়ে বলেন এই ভিক্ষুমহাসভা থাইল্যাণ্ড, কম্বোডিয়া 'ধর্মবুক্তিক' ও মহানিকায় এবং পৃথিবীর সমস্ত বৌদ্ধরাষ্ট্রের সঙ্গে সৌভ্রাতৃত্ব বোধে উদ্বুদ্ধ হয়ে (W.F.O.B) কাজ করবে, ভিক্ষুদের উপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা, ধর্মীয় শিক্ষার সঙ্গে উচ্চতর শিক্ষালাভে উৎসাহিত করা, তাঁদের শেষ জীবনে স্বাস্থ্য, ভরণ পোষণ ও নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা অন্যতম। এই সংঘরাজ ভিক্ষুমহাসভাই ভারত উপমহাদেশে ধর্মীয় অনুশাসনের সর্বোচ্চ সংস্থা বলে স্বীকৃতি লাভ করল।

১৯৪২ সালে সদৌ আসাম বুদ্ধসমিতির আমন্ত্রণে প্রিয় শিষ্য শান্তরক্ষিত ভিক্ষুকে নিয়ে দিচাংপানি বৌদ্ধ সম্মেলনে যোগদান করেন। আসামের প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট শ্রী ক্ষেত্রধর বরগোহাঁই সম্মেলনে পৌরহিত্য করেন। পণ্ডিত ধর্মাধার বিশেষ অতিথিরূপে আসামের গৌরবময় ইতিহাস, অসমজাতির উৎপত্তি এবং আসামে বৌদ্ধ সংস্কৃতির ওপর মনোজ্ঞ ভাষণ প্রদান করেন।

সভাপতি বরগোহাঁই বলেন পণ্ডিত ধর্মাধার আসামজাতির ঐতিহ্য সম্পর্কে নতুন করে আলোকপাত করেছেন, আমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞ।

অতঃপর তিনি ডিব্রুগড়, তিনসুকিয়া, মার্গারিটা, শিবসাগর, জোরহাট প্রভৃতি

জায়গায় ধর্মীয় ভাষণ দেন। সেখানে মহামুনি পালিকলেজের প্রাক্তন ছাত্র ভিক্ষু উত্তমানন্দ ও কামাটি সম্প্রদায়ের ভিক্ষু বিশুদ্ধানন্দের সাক্ষাৎলাভ করে প্রীত হন।

চট্টগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে তিনি দমদমার অগ্রণী ভিক্ষু প্রিয়দর্শী মহাস্থবিরের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় যোগদান করেন। নিজামপুর বৌদ্ধ সমিতি পণ্ডিত ধর্মাধারকে বিপুলভাবে সম্বর্ধিত করেন।

ইতিমধ্যে সংঘরাজ তেজবন্ত মহাস্থবিরের মহাপ্রয়াণের খবর পেয়ে সাতবাড়িয়া গমন করেন এবং আরাকান থেকে মরদেহ আনার ব্যবস্থা করে যথাযোগ্য মর্য্যাদার সঙ্গে দাহকার্য্য সম্পন্ন করেন।

ভিক্ষু মহাসভার জরুরী অধিবেশন আহ্বান করে বিনাজুরী শ্মশান বিহারের অধ্যক্ষ শ্রদ্ধেয় ধর্মানন্দ মহাস্থবিরকে পরবর্তী সংঘরাজ নির্বাচিত করা হয়। ১৯৪২ সালে তিনি মাণিকছড়িতে রাজগুরু হিসেবে মানরাজার পুণ্যাহ অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। বৌদ্ধশাস্ত্রমতে 'পুণ্যাহের' তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করে রাজপরিবার ও প্রজাদের সন্তোষ বিধান করেন এবং রাজকীয় উপঢৌকনে সম্মানিত হন।

পুণ্যাহ থেকে প্রত্যাবর্তন কালে তিনি গুরুতর অসুস্থ হয়ে ফটিকছড়ি ছিলনীয়া গ্রামের 'ত্রিরত্ন বিহারে' মাসাধিক কাল বিশ্রাম করেন।

এই ছিলোনীয়া গ্রামের এক গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাস আছে। এই গ্রামের দক্ষিণাংশে জিনবংশ মহাস্থবিরের জন্ম। এখানে আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের সত্যদর্শনের পাণ্ডুলিপি প্রথমে পাঠ ও আলোচনা হয়। এখানকার বিদগ্ধজনের মধ্যে মাষ্টার মাধবচন্দ্র বড়ুয়া ও ডাঃ যামিনী রঞ্জন বড়ুয়ার নাম সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। ভারতে নৌ-বিদ্রোহের প্রথম শহীদ নিরঞ্জন বড়ুয়া ডঃ যামিনী রঞ্জন বড়ুয়ার একমাত্র পুত্র। তিনি ছিলেন পণ্ডিত ধর্মাধারের পরম স্নেহভাজন। আজাদ হিন্দ বাহিনীর সৈনিক বিভূতিরঞ্জন বড়ুয়া মনিপুর ফ্রন্টে কারারুদ্ধ হয়ে বিচারে মুক্তিলাভ করেন। তিনি মাষ্টার মাধবচন্দ্র বড়ুয়ার ভ্রাতুষ্পুত্র। পণ্ডিত ধর্মাধার সুস্থ হয়ে মহামুনি প্রত্যাবর্তন করেন এবং মহামুনি মেলাতে মগ, চাকমা ও বৌদ্ধ সমাবেশে ধর্মীয় অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন।

সে বছরই পণ্ডিত ধর্মাধার ভগ্ন স্বাস্থ্য পুনরুদ্ধারের জন্য ভদন্ত আনন্দ মিত্র মহাস্থবিরকে সঙ্গে নিয়ে শিলং গমন করেন। শিলং নিবাসী হেমেন্দু বিকাশ বড়ুয়া স্থানীয় বৌদ্ধদের সহযোগিতায় এই দুই মহাস্থবিরকে নিয়ে সাড়ম্বরে বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপন করেন। কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির ইতিপূর্বে। শিলং-এ বুদ্ধ মন্দির প্রতিষ্ঠার জন্য এক বিঘা জমি খরিদ করেন। তখন মাত্র টিনের ছাউনি নির্মিত কাঁচা বাড়ী ছিল। পণ্ডিত ধর্মাধার ও ভদন্ত আনন্দ মিত্র তাঁদের বিহার নির্মাণে উৎসাহিত করে এককালীন 'দান' স্মারক হিসেবে দেন। এতে উৎসাহিত হয়ে শিলং-এর

ব্যবসায়ী সমাজ এগিয়ে আসেন। এখন শিলং-এ বিরাট মন্দির, অতিথিবাস ইত্যাদির তুলনা মেলা ভার।

শিলং থেকে প্রত্যাবর্তন করে পণ্ডিত ধর্মাধার বাংলার দুর্ভিক্ষপীড়িত্ত দেশবাসীর সেবায় আত্মনিয়োগ করেন, মহামুনি পল্লীমঙ্গল সমিতি 'ত্রাণ' বন্টনে সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করে। ইতিমধ্যে ভদন্ত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরও দুর্ভিক্ষপীড়িত জনগনের সেবায় এগিয়ে আসেন। তাঁরা চট্টগ্রাম কমিশনারস্ রিলিফ ফাণ্ডে সঙ্ঘরাজ ভিক্ষুমহাসভার পক্ষ থেকে মোটা টাকা দান হিসেবে কমিশনারের হাতে তুলে দেন।

অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ও পণ্ডিত ধর্মাধার অনুভব করলেন যে দুর্ভিক্ষ ও প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় জাতিকে উপযুক্ত সেবা প্রদানের জন্য একটি স্থায়ী সেবা প্রতিষ্ঠানের প্রয়োজন। এজন্য ধলঘাট ষ্টেশনের অনতিদূরে প্রায় ছয় বিঘা জমি সংগ্রহ করে টেকোটা গ্রামে 'বৌদ্ধ সেবাসদন' প্রতিষ্ঠা করেন। সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার এই প্রতিষ্ঠান আজও পণ্ডিত ধর্মাধার ও প্রজ্ঞালোক মহাস্থবিরের উদ্যোগের কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করে।

অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির রেঙ্গুনে বৌদ্ধমিশন প্রেস প্রতিষ্ঠা করে ধর্ম ও জাতির সেবায় উল্লেখযোগ্য অবদান রেখে গেছেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে রেঙ্গুনে বোমার আঘাতে মিশন প্রেস ধ্বংস হয়ে গেলে পরবর্তীকালে যুদ্ধাবসানে 'বৌদ্ধ মিশন প্রেসের' ক্ষতিপূরণের দাবী ও আদায় নিয়ে কানাইমাদারি বিহারে একটি কমিটি গঠিত হয়। পণ্ডিত ধর্মাধার এই কমিটির সভাপতি নির্বাচিত হন। 'দি রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন কমিটি' তদানীন্তন ব্রিটিশ সরকারের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী জানিয়ে এক স্মারকলিপি প্রদান করেন।

১৯৪৫ সালে রাজগুরু ভগবান মহাস্থবিরের জয়ন্তী অনুষ্ঠান রাঙ্গুনীয়া সৈদবাড়ীতে অনুষ্ঠিত হয়। পণ্ডিত ধর্মাধার ধর্মীয় সম্মেলনে ভগবান মহাস্থবিরের পাণ্ডিত্য ও গুণাবলীর উল্লেখ করে বলেন—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি অধ্যাপকরূপে ভগবান মহাস্থবির সাফল্যের সঙ্গে পালি ভাষার প্রসারে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা পালন করেছেন, যা ভিক্ষু মাত্রেরই শ্লাঘার বিষয়, দ্বিতীয় দিন ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি ও সমাজের ওপর সারগর্ভ ভাষণ দেন।

১৯৪৫ সালে আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবিরের আহ্বানে তিনি বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর বিহারে আগমন করেন। তখন 'আচার্য্য' বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারের বিহারাধ্যক্ষ। বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার বার্ষিক সাধারণ সভায় স্থিরীকৃত হয় যে বিহারাধ্যক্ষই ধর্মাঙ্কুর বিহার সভার সভাপতি হবেন। তদনুযায়ী আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির বিহার সভার সভাপতি এবং পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির সহ-সভাপতি নির্বাচিত হন। ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া ধর্মাঙ্কুর বিহারের সেক্রেটারী পদে নির্বাচিত হন।

পণ্ডিত ধর্মাধার বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর বিহারের সংস্কার ও পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করেন। পশ্চিমদিকে বারান্দা উন্মুক্ত করে গ্রীল ও কোলাপসিবল গেট বসিয়ে পুরো ছাদের মেরামতিতে হাত দেন। ছাদ থেকে জল পড়ত তাও বন্ধ করা হয়। আর্য্য বিহারের অবস্থাও শোচনীয়। ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া ও পণ্ডিত ধর্মাধার উভয়ে বিড়লাকে আর্য্য-বিহারের সংস্কারের জন্য অনুরোধ করলে তিনি সানন্দে ব্যয়ভার নির্বাহে সম্মতি প্রদান করেন।

১৯৪৭ সালে আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ পণ্ডিত ধর্মাধারের ওপর বিহারের দায়িত্বভার অর্পণ করে তাঁকে ধর্মাঙ্কুরে, বিহারাধ্যক্ষ পদে অধিষ্ঠিত করে চট্টগ্রামে ফিরে যান। পণ্ডিত ধর্মাধার বিহারাধ্যক্ষের দায়িত্ব গ্রহণ করে সর্বপ্রথম বৌদ্ধধর্মাঙ্কুর সভার নির্বাচনের ব্যবস্থা করেন। বিচারপতি রমা প্রসাদ মুখার্জি—সভাপতি ও পণ্ডিত ধর্মাধার সহ-সভাপতি ও ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া যথাক্রমে সেক্রেটারী নির্বাচিত হন।

ধর্মাঙ্কুর বিহারের উন্নয়নে নতুন গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। অচিরে ধর্মাঙ্কুর বিহার নব কলেবরে আত্মপ্রকাশ করে।

১৯৪৮ সালে পণ্ডিত ধর্মাধার লক্ষ্ণৌ বিহার পরিদর্শনে যান। লক্ষ্ণৌ বোধিসত্ত্ব বিহারের তখন জরাজীর্ণ অবস্থা। পণ্ডিত ধর্মাধার লক্ষ্ণৌ, কানপুর প্রভৃতি অঞ্চল থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে এই বিহারের সংস্কার সাধন করেন।

১৯৪৯ সালে জানুয়ারী মাসে ভগবান বুদ্ধের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের পবিত্র পূতাস্থি লণ্ডন মিউজিয়াম থেকে ভারত সরকার নৌ-বাহিনীর ফ্রিগেটে প্রথমে কলম্বো ও পরে কোলকাতায় আনয়ন করেন। প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু ভারত সরকারের পক্ষ থেকে সারিপুত্ত ও মৌদ্‌গল্যায়নের পবিত্র পূতাস্থি গ্রহণ করেন। কলিকাতা রাজভবনের থ্রোনরূমে সুসজ্জিত আধারে এই পূতাস্থি সংরক্ষিত থাকে।

পণ্ডিত নেহেরুকে রাজভবনে বেঙ্গল বুড্ডিষ্ট এ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এ উপলক্ষে এক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। সংস্থার সভাপতি বিচারপতি রমাপ্রসাদ মুখার্জী ও সহ-সভাপতি পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির ও আর্য্য বংশ মহাস্থবির প্রমুখ পণ্ডিত ভিক্ষুরা উপস্থিত থেকে সারিপুত্র ও মৌদগল্যায়নের পবিত্র পূতাস্থি ভারতে আনয়নের জন্য ধন্যবাদ ও কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করা হয়।

ব্রিগেড প্যারেড গ্রাউণ্ডে সর্বসাধারণের দর্শনের জন্য 'পূতাস্থি' রেখে পরে বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রার মাধ্যমে তা মহাবোধি সোসাইটির ধর্মরাজিক বিহারে আনা হয় এবং পণ্ডিত নেহেরুর হাত থেকে ডঃ শ্যামা প্রসাদ মুখার্জী গ্রহণ করেন, পরে সেক্রেটারী দেবপ্রিয় বলিসিংহের হাতে ন্যস্ত করেন। গভর্নিং বডির সদস্যদের নিয়ে দোতালায় প্রার্থনা হলে সুসজ্জিত ক্যাসকেটের আধারে পূতাস্থি সুরক্ষিত করে, পরে বার্মা হয়ে

সাঁচীস্তুপে বিশেষভাবে নির্মিত আধারে সুরক্ষিত করা হয়। ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া বার্মা ও সাঁচীতে পবিত্র পুতাস্থি দেখাশোনা ও পরিশেষে সংরক্ষণ অবধি দায়িত্ব পালন করেন। সাঁচী অনুষ্ঠানে ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন, সিকিমের মহারাজা, কৌশিক বকুলা, লামা খম্প রিম্পোচে ও বিভিন্ন কূটনৈতিক মিশনের সদস্যবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সারিপুত্র-মৌদগল্যায়নের পূতাস্থি আনয়ন উপলক্ষে কলিকাতা নালন্দা পার্কে এক বৌদ্ধ সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। গভর্ণর ডঃ কৈলাস নাথ কার্টজু সম্মেলনের উদ্বোধন করেন এবং অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ডঃ হরেকৃষ্ণ মহাতবং উড়িষ্যার মুখ্যমন্ত্রী প্রধান অতিথির আসন অলংকৃত করেন। পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির সম্মেলনের অগ্রশ্রাবক সারিপুত্র ও মৌদ্‌গল্যায়নের পূতাস্থির তাৎপর্য্য ব্যাখ্যা করেন। ডঃ কার্টজু বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভার আজীবন সদস্যপদে বৃত হন। ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়া উপস্থিত গণ্যমান্য অতিথিদের আন্তরিক ধন্যবাদ প্রদান করেন।

অতঃপর, পণ্ডিত ধর্মাধার ধর্মাঙ্কুরে 'কৃপাশারণ হল' সংস্কারে ব্রতী হন, ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার সক্রিয় সহযোগিতায় ও কলিকাতাবাসীর অকাতর দানে তিনি যখন কাজ অনেকটাই সম্পন্ন করেন তখন গুরুতর অসুস্থ হয়ে হাওড়া জেলা রেল হাসপাতালে ভর্তি হন। ডাঃ মুনীন্দ্র প্রিয় তালুকদার ছিলেন তখন হাওড়ার সিভিল সার্জন, তাঁর চিকিৎসায় ধর্মাধার দ্রুত আরোগ্য লাভ করেন। অতঃপর কৃপাশরণ হলকে নবরূপ দেবার জন্য দিল্লী, মোদীনগর, মুরাদনগর, পাঞ্জাব, ভাকরা, পাতিয়ালা, কালকা, সিমলা, কানপুর, জামশেদপুর, আসাম ও শিলং প্রভৃতি অঞ্চল থেকে চাঁদা সংগ্রহ করে নির্মাণ কাজ সম্পন্ন করেন।

আগরতলা বেনুবন বিহার প্রতিষ্ঠায় রাজা বিক্রম কিশোর মাণিক্যের অবদান শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকার্য্য। এই বিহারের দ্বারোদঘাটন উৎসবে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির, পণ্ডিত বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, সংঘরাজ ধর্মানন্দ মহাস্থবির, আর্য্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, বিনয়াচার্য্য বংশদীপ মহাস্থবির প্রমুখ বরেণ্য ভিক্ষুরা উপস্থিত ছিলেন। ত্রিপুরার রাজধানীতে এই বেণুবন বিহার দেশ বিদেশের পর্য্যটকদের আকর্ষণের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়। শ্রদ্ধেয় আর্য্য মিত্র মহাস্থবির বিহারাধ্যক্ষ নির্বাচিত হন। তিনি আজীবন এই পদে যোগ্যতার সঙ্গে নিজ দায়িত্ব পালন করে গেছেন।

১৯৩৫ সালে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ও ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়ার উদ্যোগে এবং বিহারাধ্যক্ষ বিনয়াচার্য্য বংশদীপ মহাস্থবিরের উপাধ্যায়ত্বে নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুকরণে 'নালন্দা বিদ্যাভবন' প্রতিষ্ঠা করেন। এখানে বঙ্গীয় শিক্ষাপরিষদের সিলেবাস অনুযায়ী আদ্য, মধ্য এবং উপাধি বিষয়ে এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত ভাষা যা অন্যত্র পড়ানো হয়না, তা বিশেষভাবে পড়ানো হয়। পণ্ডিত ধর্মাধার বিদ্যাভবনে শিক্ষক ও সম্পাদকরূপে ১৯৪৭ খৃঃ যোগদান করেন। পরে তিনি

বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষপদে বৃত হন এবং আজীবন এই পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। যে সমস্ত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী এই বিদ্যাভবনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে ডঃ বি. এম. বড়ুয়া, ডঃ বিমলাচরণ লাহা, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, জগদীশ চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, বি. এ. (ক্যানটাব) পণ্ডিত বলবন্ত মিশ্র (হিন্দী) প্রভৃতির নাম উল্লেখযোগ্য। ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন এই বিদ্যাভবন পরিদর্শন করেন এবং এর শিক্ষাপ্রণালীর ভূয়সী প্রশংসা করেন।

নালন্দা বিদ্যাভবনের মুখপত্র 'নালন্দা' পত্রিকার প্রকাশনা পণ্ডিত ধর্মাধারের অক্ষয় কীর্তি। বৌদ্ধ ধর্ম ও সাহিত্য সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এ পত্রিকা উল্লেখযোগ্য অবদান রেখেছে। পণ্ডিত ধর্মাধার সম্পাদক হিসেবে যে সমস্ত 'সম্পাদকীয়' কলম লিখেছেন তা যথেষ্ট মননশীল ও যুগোপযোগী। এই পত্রিকা বৌদ্ধ সাময়িকী হিসেবে দীর্ঘদিন টিকে থাকার রেকর্ড।

১৯৫৬ সালে ২৫০০ তম বুদ্ধজয়ন্তী উপলক্ষে বার্মায় ষষ্ঠ বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশন হয়। এ উপলক্ষে বার্মার প্রধানমন্ত্রী উ-নূ বৌদ্ধরাষ্ট্র থেকে আড়াই হাজার ত্রি-পিটক শাস্ত্র পারঙ্গম ভিক্ষুদের বৌদ্ধ সঙ্গীতির অধিবেশনে যোগদানের আমন্ত্রণ জানান। ভারত থেকে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির মহাসঙ্গীতিকারক নির্বাচিত হন। তিনি ভদন্ত ধীরানন্দ মহাস্থবিরকে বিহারাধ্যক্ষের দায়িত্বভার সাময়িকভাবে অর্পণ করেন। বুদ্ধ পূর্ণিমার দুদিন আগে তিনি সঙ্গীতিকারকরূপে ষষ্ঠ সঙ্গীতিতে যোগদান করেন। ভারত থেকে ভদন্ত আনন্দ কৌশল্যায়ন, ভদন্ত বুদ্ধরক্ষিত মহাস্থবির ও বাবাসাহেব ভীমরাও ডঃ আম্বেদকর প্রমুখ বরণীয় ভিক্ষু ও বিশিষ্ট আমন্ত্রিত অতিথিরূপে যোগদান করেন।

১৯৫৪ সালের বুদ্ধ পূর্ণিমা দিনে রেঙ্গুনের শ্রীমঙ্গল পাষান গুহায় সম্মেলনের শুভ উদ্বোধন হয়। বার্মার অগ্গমহাপণ্ডিত ভদন্ত বেরু মহাস্থবির সভাপতির আসন অলংকৃত করেন। অনুষ্ঠানে সিংহলের প্রধানমন্ত্রী স্যার ব্যারণ জয়তিলক বলেন— সিংহল বার্মা দেশ থেকে দুটি অমূল্য রত্ন পেয়েছে। একটি অভিধর্ম শিক্ষা অপরটি বিদর্শন ভাবনা। এজন্য আমরা কৃতজ্ঞ। পণ্ডিত ধর্মাধারের সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী উ-নু, প্রধান বিচারপতি উ-তুইন-সং, সিংহলের ডাডলী সেনানায়ক, স্যার ব্যারণ জয় তিলক, ডঃ আম্বেদকর প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ভাব বিনিময় হয়। সঙ্ঘায়নে সঙ্গীতি কারক হিসেবে পণ্ডিত ধর্মাধার বিনয়, সূত্র ও অভিধর্ম পিটকের সংশোধনী, সংযোজন ও পুনর্মূল্যায়ণে অংশ গ্রহণ করে অটঠকথার টীকা, অনুটীকা ইত্যাদি মূল পিটকের ভাষ্যের সঙ্গে সংগতি রেখে প্রয়োজনীয় সংস্কারের কাজে মোট পাঁচ শত বিশিষ্ট ভিক্ষুদের সঙ্গে একত্রে কাজ করে দীর্ঘ ছয় বছরে বিশুদ্ধ ত্রিপিটক প্রণয়ন করেন। ত্রিপিটকের এই বিশুদ্ধ সংস্করণ সারা পৃথিবীর বৌদ্ধ রাষ্ট্রে প্রচার করা হয়। বার্মা ভাষায়ও ত্রিপিটক প্রকাশ করা হয়।

সংঘায়নের কাজের ফাঁকে ফাঁকে তিনি থাইল্যাণ্ড, কাম্বোডিয়া ভ্রমণ করেন। ওয়াট মহাধাতু বিহারের অধ্যক্ষ অগ্গমহাপণ্ডিত বিমল ধম্মের আমন্ত্রণে পণ্ডিত ধর্মাধারের এই থাইল্যাণ্ড ভ্রমণ। বৌদ্ধ ধর্মের বার্তা নিয়ে অশোকের দূত সোম ও উত্তরা লক্ষরাম পঠনে প্রথম যেখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেন তিনি তা দর্শন করেন। এছাড়া বুদ্ধের পদচিহ্নখ্যাত সচচ বোধি গিরি দর্শন করেন। সঙ্গে ছিলেন আসামের ভিক্ষু তেজবন্ত। তাঁরা থাইল্যাণ্ড মিউজিয়ামও দর্শন করেন।

অতঃপর তাঁরা কম্বোডিয়ার রাজবিহারে সঙ্ঘরাজ জ্যোতিজ্ঞানের সাদর অভ্যর্থনা লাভ করেন। তাঁরা অঙ্কুরভাটের ধ্বংসাবশেষ পরিদর্শন করেন এবং ভদন্ত কি-তপোয় ভিক্ষুর প্রদত্ত সম্বর্ধনা সভায় যোগদান করেন। এখানে ধর্মাধার পালি ও সংস্কৃত ভাষায় বক্তৃতা করেন। কি-তপোয় ছিলেন পালি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত, ধর্মাধার মহাস্থবির সংঘায়নের শেষে কামায়ুট ভাবনা আশ্রমে ফুজি মেধাবী সেয়াদর কাছে বিপসসনা ভাবনানুশীলন করেন।

তিনি বার্মা থেকে প্রত্যাবর্তন করে ভারতে বুদ্ধগয়া আন্তর্জাতিক সাধনা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য ডঃ রাষ্ট্রপাল ভিক্ষু সাধারণ সম্পাদক ও পণ্ডিত ধর্মাধার প্রথম প্রতিষ্ঠাতা সভাপতি হিসেবে এই আন্তর্জাতিক ভাবনাকেন্দ্র গড়ে তোলেন। বিপসসনা সাধিকা দীপার মা (ননী বালা বড়ুয়া), গুরুজী অনাগারিক মুনীন্দ্র তাঁর গুণমুগ্ধ শিষ্য-শিষ্যাদের অন্যতম। বার্মার রাজেন্দ্র লাল মুৎসুদ্দিও গুণগ্রাহী সাধকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। প্রধানমন্ত্রী উ-নুর বুদ্ধগয়ায় উপসম্পদা অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে তাঁকে আশীর্বাদ প্রদান করেন।

বার্মার অর্হৎ ভিক্ষু তংফুলু সেয়াদকে আন্তর্জাতিক সাধনাকেন্দ্রে ও কলিকাতা বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে বিপুল সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। ইগতপুরী ধর্মগিরি সাধনাকেন্দ্রেও পণ্ডিত ধর্মাধার বিপসসনা ভাবনা করেন প্রখ্যাত বিদর্শনচার্য্য সত্যনারায়ণ গোয়েঙ্কা গুরুজীর কাছে। ১৯৮৮ খৃঃ ১০ই এপ্রিল কলিকাতা পটারী রোডে প্রথম বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করেন বর্তমান সংঘরাজ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির। বিদর্শন শিক্ষাগুরু—গুরুজী মহসিস সেয়াদ কলিকাতায় শুভাগমন করেন। তিনি মহাবোধি ও ধর্মাঙ্কুরে বিদর্শন সাধক মুনীন্দ্রজী ও সুভূতি রঞ্জন বড়ুয়ার উদ্যোগে ধ্যান শিক্ষা বিষয়ে ভাষণ দেন।

১৯৫৬ সালে বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর বিহারে মহা আড়ম্বরের সঙ্গে বুদ্ধ জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। ডঃ রমা চৌধুরী (রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য) বক্তা, ডঃ যতীন্দ্র বিমল চৌধুরী প্রধান অতিথি রূপে নালন্দা পার্কে আয়োজিত সমাবেশে ভাষণ প্রদান করেন। ১৯৫৬ খৃঃ ১৪ই অক্টোবর নাগপুরে ভ্যাকসিন ইন্‌সিটিউট ময়দানে বাবা সাহেব ডঃ বি. আর. আম্বেদকর প্রায় এক লক্ষ অনুগামী নিয়ে বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেন। ভদন্ত

উ-চন্দ্রমুনী কুশীনগর মহাপরিনির্বাণ বিহারের অধ্যক্ষ ও পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির প্রমুখ বিশিষ্ট মহাস্থবিরেরা এই দীক্ষা অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন। শরণশীল ও পঞ্চশীল গ্রহণের মধ্য দিয়ে এই দীক্ষা অনুষ্ঠান শুরু হয় এবং নব বৌদ্ধ হিসেবে দীক্ষিত আম্বেদকর অনুগামীরা শপথ বাক্য পাঠ করেন। ডঃ আম্বেদকর আবেগমথিত কণ্ঠে বলেন—''আমরা হিন্দু হিসেবে জন্মেছি কিন্তু হিন্দু হিসেবে মরব না। আমরা এখন বৌদ্ধ, বৌদ্ধধর্মে জাতিভেদ নেই। আমরা অস্পৃশ্যতার অভিশাপ থেকে আজ মুক্ত।''

পণ্ডিত ধর্মাধার ধর্মীয় আচারবিধি রীতিনীতি শিক্ষায় নব বৌদ্ধদের সর্বপ্রকার সাহায্যের আশ্বাস দেন। তিনি পশ্চিমবঙ্গে খড়্গপুর ও কলিকাতা শহীদ মিনারে দীক্ষা সমারোহ পরিচালনা করেন।

১৯৬৫ সালে ১লা সেপ্টেম্বর পণ্ডিত ধর্মাধার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি অধ্যাপক পদে যোগদান করেন এবং দশ বছর যাবত কৃতিত্বের সঙ্গে অধ্যাপনার দায়িত্ব পালন করেন। কোলকাতায় তিনি বিভিন্ন মণীষী ও জ্ঞানীগুণীর সংস্পর্শে আসেন। তন্মধ্যে ডঃ সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বি. এম. বড়ুয়া, ডঃ প্রবোধ চন্দ্র সেন, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত ও ডঃ অনুকূল চন্দ্র ব্যানার্জী। পণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন, ডঃ সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণণ, ডঃ বি. আর আম্বেদকর প্রভৃতি, ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত বলেন—'আমরা অধ্যাপকেরা পর্য্যন্ত তাঁর বক্তৃতা শুনতাম। পালি ভাষায় তাঁর জ্ঞানের গভীরতা দেখে অবাক হতাম। ১৯৬৬ সালে সিংহলে বিশ্ব বৌদ্ধ সম্মেলনে তিনি 'সুখ সঙ্ঘসস সামগ্গি সম্মাগনং তপো সুখ' বিষয়ে যে ভাষণ দেন তা সিংহলবাসী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করে।

১৯৬৯ সালে পণ্ডিত ধর্মাধারের উদ্যোগে নালন্দা পার্কে আড়ম্বরের সঙ্গে কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবিরের শতবার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়।

১৯৭৩ সালে মহাবোধি সোসাইটি প্রাঙ্গনে নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির ও অনাগরিক ধর্মপালের প্রতিকৃতিতে মাল্য দান করেন ভদন্ত জিনরতন মহাথের ও ভদন্ত আর্য্য বংশ মহাস্থবির। পণ্ডিত ধর্মাধার ডেলিগেট সেসনের উদ্বোধনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। পশ্চিমবঙ্গ বিধান সভার মাননীয় অধ্যক্ষ অপূর্ব লাল মজুমদার আবেগময়ী বক্তৃতা দিয়ে মূল সভার উদ্বোধন করেন। ডঃ অরবিন্দ বড়ুয়াকে সভাপতি করে নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন নামে সংস্থা গঠিত হয়।

১৯৭৬ সালে কলিকাতা নালন্দা পার্কে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের হীরক জয়ন্তী উদ্‌যাপিত হয়। এই জয়ন্তীর উদ্বত্ত তহবিল থেকে 'ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী' নামে একটি প্রকাশনী সংস্থা গঠিত হয়। এই সংস্থা মহাস্থবিরের গ্রন্থের পুনর্মুদ্রণ ও বৌদ্ধ বরেণ্য কথা সাহিত্যিক অষ্টম সংঘরাজ শীলালংকার মহাস্থবিরের বই পুনর্মুদ্রিত করেন এবং অনেক গবেষক ও নবীন সাহিত্যিকদের বইও মুদ্রণ করেন।

১৯৭৪ সালে ১৮ই নভেম্বর বুদ্ধগয়ায় ভারতীয় ভিক্ষু মহাসভার অধিবেশনে সর্বসম্মতভাবে পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির 'সংঘরাজ' নির্বাচিত হন। অনুসংঘনায়ক হন ভদন্ত অতুল সেন মহাস্থবির। পণ্ডিত ধর্মাধারই ভারতীয় ভিক্ষু মহাসভার প্রথম সংঘরাজ। ১৯৭৬ খৃঃ পণ্ডিত ধর্মাধার বাংলাদেশে প্রিয় শিষ্য শান্তপদ মহাথেরোর সুবর্ণজয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদান করেন। পরে তিনি আর্য্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবিরের শত বার্ষিকী জয়ন্তী অনুষ্ঠানে যোগদান করে এই মহান বিদর্শন সাধকের অবিস্মরণীয় কীর্তির উল্লেখ করে শ্রদ্ধার্ঘ নিবেদন করেন।

১৯৮৩ সালে ২৩শে নভেম্বর কলিকাতার সুবর্ণ বণিক হলে নালন্দা বিদ্যাভবনের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব সাড়ম্বরে পালিত হয়। পণ্ডিত ধর্মাধার অনুষ্ঠানে পৌরোহিত্য করেন। রামকৃষ্ণ ইন্‌সটিটিউট অব কালচারের সেক্রেটারী স্বামী লোকেশ্বরানন্দ অনুষ্ঠানের শুভ উদ্বোধন করে ভাষণ প্রদান করেন। এ উপলক্ষে ডঃ রমা চৌধুরীকে (ভূতপূর্ব রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য) ও প্রখ্যাত বৌদ্ধ দার্শনিক শীলানন্দ ব্রহ্মচারীকে সার্টিফিকেট অব অনার স্মারক দিয়ে সম্মানিত করা হয়।

সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার এক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় কুঞ্জবন বৌদ্ধ বিহারে, সেখানে ডঃ সত্যপাল ভিক্ষুকে পি-এইচ ডিগ্রি প্রাপ্তিতে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করা হয়। এ উপলক্ষে পণ্ডিত ধর্মাধার এই তরুণ ভিক্ষুর অধ্যাবসায়, নিষ্ঠা ও কর্মদক্ষতার প্রশংসা করেন।

১৯৮৮ সালে ২৭শে জুলাই কলিকাতা বিদর্শন কেন্দ্রে সাড়ম্বরে ধর্মাধার জয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। সেই বছরেই ২০শে আগষ্ট পণ্ডিত ধর্মাধার গুরুতর অসুস্থ হয়ে গড চার্চ হসপিটালে ভর্তি হন। তাঁর অগণিত ভক্তের আকুল প্রার্থনা ও ডাক্তারদের সুচিকিৎসায় তিনি আরোগ্য লাভ করেন। তাঁকে বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্রে স্থানান্তরিত করা হয়। ধর্মাধার সেবা কমিটি গঠন করে তাঁর পরিচর্য্যা ও রীতিমত ডাক্তারী তত্ত্বাবধানে নার্স নিয়োগ করে দেখাশোনায় তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ হয়ে ওঠেন।

১৯৮৯ সালে ৩রা এপ্রিল বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন ময়দানে ভিক্ষু পরিবাসব্রত উদ্‌যাপিত হয়। পণ্ডিত ধর্মাধার ধর্মদেশনা করে আলোচনার সূত্রপাত করেন। তাঁর প্রিয় শিষ্য সুগত বংশ মহাস্থবির সুষ্ঠুভাবে পরিবাস পরিচালনা করেন। ডঃ সত্যপাল ভিক্ষু, ডঃ জিনবোধি ও রতনজ্যোতি মহাস্থবির প্রমুখ ভিক্ষুরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে 'পরিবাস' ব্রতকে সার্থক করেন। সমগ্র অনুষ্ঠানের ব্যবস্থাপনায় ছিলেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির।

১৯৯০ সালে ২০শে ডিসেম্বর পণ্ডিত ধর্মাধারের ৯০ তম জন্মতিথি সাড়ম্বরে বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্র সংলগ্ন মাঠে উদ্‌যাপিত হয়। পণ্ডিত ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী, ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র, ডঃ দিলীপ কুমার কাঞ্জিলাল মহাস্থবিরের কর্মজীবনের বিভিন্ন ঘটনা উল্লেখ করে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

১৯৯২ সালে পালি ও সংস্কৃত সাহিত্যে উল্লেখযোগ্য অবদানের জন্য ভারতের রাষ্ট্রপতি পণ্ডিত ধর্মাধারকে 'Certificate of Honour' প্রদান করে রাষ্ট্রপতি ভবনের দরবার হলে আনুষ্ঠানিকভাবে সম্মানিত করেন। পরবর্তীকালে এশিয়াটিক সোসাইটি পণ্ডিত ধর্মাধারকে ভারতীয় প্রাচীন ভাষা ও সাহিত্যে বিশেষতঃ পালি সাহিত্যে অসামান্য অবদানের আজীবন স্বীকৃতি (Life time achievement award) স্বরূপ B. C. Law স্বর্ণপদকে ভূষিত করেন। 'বেনারস সমপূর্নরানন্দ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষ ডঃ গৌরীনাথ শাস্ত্রী তাঁকে ভারতের শ্রেষ্ঠ দার্শনিক বলে উল্লেখ করেন। ডঃ প্রতাপ চন্দ্র চন্দ্র তাঁকে মানবতাবাদী বৌদ্ধ সাধক রূপে আখ্যায়িত করেন।

পণ্ডিত ধর্মাধার দানেও মুক্ত হস্ত ছিলেন। যখন কোন প্রার্থী হাজির হয়েছে তিনি কাউকে বিমুখ করেননি। তিনি পালি সাহিত্যের উন্নতিকল্পে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে পালি শিক্ষা প্রসারে এবং ধর্মাঙ্কুরে অতীশ দীপঙ্কর হল নির্মাণে এবং বিদর্শন শিক্ষা কেন্দ্রে ও বিভিন্ন বিহারে অর্থ দিয়েছেন। দেশেও নানা প্রতিষ্ঠানে উদার হস্তে দান দিয়েছেন। আন্তর্জাতিক সাধনাকেন্দ্র প্রতিষ্ঠায় নিজে ও শিষ্য-ভক্তদেরও উদ্বুদ্ধ করেছেন।

পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির ছিলেন একাধারে মহান দার্শনিক পণ্ডিত এবং প্রখ্যাত লেখক, অন্যদিকে বিরাট ধর্মীয় ব্যক্তিত্ব যিনি শতধাদীর্ণ বৌদ্ধ-ধর্মীয় গোষ্ঠীগুলিকে সংঘরাজ ভিক্ষু মহাসভায় অন্তর্ভুক্ত করে ধর্মপ্রচারে ও কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে অজ্ঞানতার অন্ধকার থেকে মুক্ত করে থেরবাদী বৌদ্ধ ধর্মের প্রজ্ঞাসমন্বিত জীবনে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলেন। বুদ্ধের নিয়মনীতির ক্ষেত্রে তিনি ছিলেন আপোষহীন এক সংগ্রামী ব্যক্তিত্ব।

উনবিংশ শতাব্দীতে সংঘরাজ সারমেধ মহাথের বৌদ্ধধর্মের অনাচার ও তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে চট্টগ্রামের মহামুনি পাহাড়তলীর 'হেঞ্চাখর ঘোনায়' রাউলী বৌদ্ধ পুরোহিতদের ধর্ম বিনয়ানুসারে উদকসীমায় দীক্ষা দিয়ে যে ধর্মবিপ্লবের সূচনা করেন, তাঁর অনুসৃত পথে পণ্ডিত ধর্মাধার সংস্কার আন্দোলন শুরু করেন। চারদিকের ধর্মীয় অনাচার ও তান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে তিনি লেখনী ধারণ করেন। তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে তাঁর শিষ্যেরাও এগিয়ে আসেন।

পণ্ডিত ধর্মাধার বুঝেছিলেন মানুষের চিন্তার ক্ষেত্রে বিপ্লবই আসল বিপ্লব। এজন্য কুসংস্কারাচ্ছন্ন জাতিকে ধর্মের আলোকবর্তিকা দেখাতে, নতুন পথের দিশা দিতে তিনি বেঙ্গল মিশন প্রেস থেকে প্রকাশিত 'সঙ্ঘশক্তি' পত্রিকায় একের পর এক প্রবন্ধ লিখেছেন। তন্মধ্যে বৌদ্ধ ধর্ম ও শংকরাচার্য্য (১৯৩৩), নির্বাণ, জন্মান্তরবাদ, প্রতিসম্ভিদা (১৯৩৫) কার্য্যকারণ, অভিনিব্বোগরূপ, সমালোচনা, (১৯৩৮) কর্মতত্ত্ব, অভিভাষণ প্রভৃতি।

এছাড়া জ্ঞানতাপস সমন পুন্নানন্দ সামী ও কবি গুণালঙ্কার প্রতিষ্ঠিত জগজ্জ্যোতি পত্রিকাতে বোধিসত্ত্ব, মৈত্রীসাধনা, অনাত্মবাদ বঙ্গ সংস্কৃতি ও ইহার প্রসার, অহিংসা ও আমিষাহার প্রভৃতি প্রবন্ধ লেখেন (১৯৫১-১৯৫৫)।

১৯৫৮ সালে মজঝিম নিকায় গ্রন্থের দ্বিতীয় সংস্করণের অনুবাদ সহজ, সরল ও সরস করে পাঠক সাধারণের উপভোগ্য করে প্রকাশ করেন।

মান্দালয় বিহারের উপাচার্য্য প্রজ্ঞাস্বামী 'পালি ভাষায় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' লিখে যশস্বী হন। পণ্ডিত ধর্মাধার এই গ্রন্থটির বঙ্গানুবাদ করে বাঙালী পাঠকদের 'ইতিহাস' সম্বন্ধে অবহিত করান।

নালন্দা বিদ্যাভবনের মুখপত্র 'নালন্দা' ধারাবাহিকভাবে তাঁর রচনা প্রকাশ করেন। তন্মধ্যে নালন্দা বিদ্যাভবন, নেত্তিপ্রকরণ পরিচয়, বৌদ্ধধর্ম ও দর্শন, নেত্তি হার পরিচয়, অবদান সাহিত্যে বুদ্ধকথা, অভিধর্ম নিদান, অগ্নমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক, বিগত শতাব্দীর বৌদ্ধ সমাজ ও সংঘনায়ক জ্ঞানালঙ্কার, মহাস্থবির অভয়শরণ প্রভৃতি।

১৯৬৬ সালে খৃষ্টান সম্প্রদায়ের মাসিক পত্র বিশ্বজ্যোতিতে 'মৃত্যুর পরে' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। চট্টল পরিষদের স্মারক গ্রন্থে 'চট্টগ্রামে মগধ সংস্কৃতি' শীর্ষক প্রবন্ধ লিখে 'চট্টগ্রামের বৌদ্ধ জাতির ইতিহাস' তুলে ধরেন।

বাংলাভাষায় পকেট সংস্করণ ধর্মপদের সমূল বঙ্গানুবাদ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবিরের অক্ষয়কীর্তি। অধ্যাপক প্রবোধ চন্দ্র সেন এই সম্বন্ধে বলেন—মূল পাঠের সঙ্গে বিতর্ক-ব্যাখ্যা ও পাণ্ডিত্য বর্জিত সহজ সরল অথচ মূলানুগ অনুবাদ থাকাতে বইখানি পণ্ডিত অপণ্ডিত পাঠকের নিত্যসঙ্গী ও নিত্যপাঠ্য হবার উপযোগী হয়েছে। গ্রন্থের নিবেদন অংশে লেখক ধর্মপদ ও গীতার যে সারগর্ভ তুলনামূলক আলোচনা করেছেন এবং গীতার শ্লোকগুলোর উদ্ধৃতি দিয়ে নিজ বক্তব্য প্রমাণ করেছেন তা বিস্ময়কর।

মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়নের বৌদ্ধ দর্শনের হিন্দী থেকে বাংলাভাষায় অনুবাদ করে পণ্ডিত ধর্মাধার যশস্বী হয়েছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা ভাষা ও সাহিত্যবিভাগের প্রধান ডঃ শশি ভূষণ দাশগুপ্ত বলেন—পণ্ডিত ধর্মাধারের মত একজন শাস্ত্রজ্ঞই এই অনুবাদের কাজে হাত দিয়েছেন এবং এই শোভন সংস্করণ প্রকাশের জন্য তিনি ধন্যবাদার্হ।

বৌদ্ধধর্ম কিভাবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে বিস্তার লাভ করেছে 'শাসন বংশ' গ্রন্থে তা মান্দালয়ের সংঘরাজ বিহারের পঞঞা সামী থের সবিস্তারে উল্লেখ করেছেন। পণ্ডিত ধর্মাধার এ গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ করে বিদ্বৎজনের প্রশংসা অর্জন করেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের প্রধান ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন—"নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ পণ্ডিত ধর্মাধার শাসন বংশের অনুবাদ করে বাঙালী পাঠকবর্গের উপকার সাধন করেছেন।"

পণ্ডিত ধর্মাধারের অধিমাস—বিনিশ্চয় (১৯৬৩) 'সদ্ধর্মের পুনরুত্থান' ও 'বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন' তাঁকে চিরস্মরণীয় করে রাখবে। অধিমাস বিনিশ্চয় সৌর গণনার সামঞ্জস্যের জন্যই প্রধানতঃ অধিমাস কল্পিত হয়েছে। এতে বুদ্ধের সময় থেকে ৫০০০ বছরের অধিমাস বর্ষপঞ্জী লিপিবদ্ধ হয়েছে।

পণ্ডিত ধর্মাধারের 'মিলিন্দপঞহ বা মিলিন্দ প্রশ্ন' গ্রন্থের অনুবাদ এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বৌদ্ধ দর্শনের নিগূঢ় তত্ত্ব মীমাংসায় পণ্ডিত নাগসেন ও রাজা মিলিন্দের তর্ক-বিতর্ক এই গ্রন্থের প্রতিপাদ্য। ভিক্ষু নাগসেন কী অসম্ভব যুক্তি জাল বিস্তার করে মিলিন্দের ভ্রান্তি অপনোদন করেছেন—তা বৌদ্ধ মাত্রেরই জ্ঞাতব্য। কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ পণ্ডিত বিষ্ণুপদ ভট্টাচার্য্য এই গ্রন্থের ভূমিকায় বলেন—সুপণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির এই গ্রন্থের অনুবাদ করে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতির একটি রাজপথ উন্মুক্ত করেছেন। প্রাচীন ভারতীয় ধর্ম ও দর্শন ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে যাঁদের ঔৎসুক্য আছে এরূপ সকল বঙ্গবাসীই এই গ্রন্থপাঠ করে পরিতৃপ্তি লাভ করবেন।'' এ গ্রন্থটি স্নাতকস্তরে বিশ্ববিদ্যালয়ে পাঠ্য।

বিংশ শতাব্দীর এই অবিসংবাদী পণ্ডিত, রেনেসাঁ যুগের অন্যতম পুরোধা ; সদ্ধর্মসাধক ও মৈত্রী ধর্মের প্রচারক এবং অগ্রণী থেরবাদ ধর্মের উদ্‌গাতা পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির আপন স্বাতন্ত্রে ও ব্যক্তিমাধুর্য্যে একশত বছর যাবত দেশ ও জাতিকে অনুপ্রাণিত করেছেন। কিন্তু তিনি ঐতিহ্যকে ভোলেননি। তাঁর পূর্বসূরীদের মধ্যে কর্মবীর কৃপাশরণ মহাস্থবির, কবিধ্বজ গুণালংকার মহাস্থবির। আচার্য্য পুন্নাচার মহাথের, সংঘনায়ক জ্ঞানালংকার, অগ্গমহাপণ্ডিত প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির, আর্য্যশ্রাবক জ্ঞানীশ্বর মহাস্থবির, বিনয়াচার্য্য বংশদীপ মহাস্থবির, আচার্য্য বিশুদ্ধানন্দ মহাস্থবির, সংঘরাজ শীলালংকার, সমন পুন্নানন্দ সামী প্রমুখ মহাস্থবির এবং শিক্ষাক্ষেত্রে অনন্যকীর্তির অধিকারী ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, ধর্মরাজ বড়ুয়া (হস্তসার খ্যাত), নবরাজ বড়ুয়া, পালি ব্যাকরণ, নীতিরত্ন, কবি নবীন চন্দ্র সেন, (তাঁর অমূল্য অবদান 'অমিতাভ' কাব্যগ্রন্থ) স্বগ্রামের ডঃ এনামূল হক (আরাকান রাজসভায় বাংলা সাহিত্য), কবি ফুলচন্দ্র বড়ুয়া (বৌদ্ধ রঞ্জিকা) কবি সর্বানন্দ বড়ুয়া—জগজ্জ্যোতি কাব্যগ্রন্থ, রায় বাহাদুর শরচ্চন্দ্র দাস, তিনিই প্রথম তিব্বত গমন করে বহু সংখ্যক সংস্কৃত, পালি ও তিব্বতি ভাষায় রচিত গ্রন্থ সংগ্রহ করেন। সমাজ সংস্কারে কৃষ্ণ চৌধুরী (নাজির) রাজনৈতিক জগতে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ বড়ুয়া (কংগ্রেস), ধীরেন্দ্র লাল বড়ুয়া, রোহিণী রঞ্জন বড়ুয়া (সূর্য্যসেনের সহযোগী পরে দুজনেরই ফাঁসী হয়।) নৌ-বিদ্রোহের অন্যতম শহীদ নিরঞ্জন বড়ুয়া, পণ্ডিত ধর্মাধারের খুবই স্নেহভাজন ছিলেন, তাঁরা আমাদের গর্ব।

বিংশ শতাব্দীর সুদীর্ঘ ইতিহাসে অনিবার্য্যভাবে পণ্ডিত ধর্মাধারের নাম এসে যায়।

তিনি ছিলেন একটি শতাব্দীর চেতনা, বৌদ্ধজনমানসে তিনি চিরদিন ভাস্বর হয়ে থাকবেন। তিনি ভারতে আধ্যাত্মিক চেতনার মূর্ত প্রতীক। বৌদ্ধ ধর্মের প্রচারে ও প্রসারে তিনি বারে বারে ছুটে গেছেন নাগপুর, লক্ষ্ণৌ, অন্ধ্র ও নাগার্জুনকোণ্ডায়। ভদন্ত উ-চন্দ্রমুনির সঙ্গে নববৌদ্ধদের সামাজিক অধিকার রক্ষায় ও বৌদ্ধরূপে আত্মবিশ্বাস অর্জন করতে সাহস জুগিয়েছেন। ভারতীয় ভিক্ষু মহাসভা গঠন করে তিনি কুশীনগর মহাপরিনির্বাণ বিহারের অধ্যক্ষ উ-চন্দ্রমুনিকে সভাপতি করে নব বৌদ্ধদের শিক্ষার প্রসারেও উদ্যোগী হন। নিজে সহ-সভাপতি পদ অলংকৃত করেন এবং ভদন্ত আনন্দকৌশল্যায়নকে সম্পাদক করে কাজ শুরু করেন। চট্টগ্রামে সাতবাড়িয়া রত্নাঙ্কুর বিহারে প্রদত্ত ভাষণে বৌদ্ধদের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধিও ভিক্ষুদের ইতিকর্ত্তব্য বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ মার্গ প্রদর্শন করেন। যা আজ এক ঐতিহাসিক দলিল।

পণ্ডিত ধর্মাধারের ক্ষান্তি বিভূষিত ঋষিকল্প ধ্যানগম্ভীর ব্যক্তিত্বের সংস্পর্শে যাঁরা এসেছেন তাঁরা অভিভূত হয়েছেন। তিনি কুশল প্রশ্ন করেছেন সর্বাগ্রে। বাংলাদেশের অষ্টম সংঘরাজ মহামান্য শীলালংকার মহাস্থবিরের সঙ্গে তাঁর আজীবন প্রীতির সম্পর্ক ছিল। একজন শীলের অলঙ্কার ও অন্যজন ধর্মের আধার। প্রজ্ঞার আলোয় দুজনেই দেদীপ্যমান, পরস্পর পরস্পরের প্রতি গভীর শ্রদ্ধাশীল।

সংঘরাজ শীলালঙ্কার পণ্ডিত ধর্মাধারের আগেই প্রয়াত। তাঁর চলে যাওয়ার পর আশঙ্কা ছিল আর আমাদের পরমপূজ্য ভন্তেকে নিজেদের মধ্যে ধরে রাখতে পারবো কিনা : সেই আশঙ্কাই সত্যি হলো।

২৯শে অক্টোবর, ২০০০ সাল। কঠিন চীবরদানের অব্যবহিত পরে ভিক্ষুদের কর্মবাচ্য পাঠ কার্য্যসমাপ্ত করে তিনি নিজ প্রকোষ্ঠে প্রবেশকালে আকস্মিক ভাবে পড়ে গিয়ে সেই যে শয্যা নিলেন আর উঠলেন না। ৪ঠা নভেম্বর গড চার্চ হসপিটালে চিকিৎসকদের সমস্ত প্রয়াসকে ব্যর্থ করে দিয়ে চলে গেলেন।

আজ পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির আমাদের মাঝে নেই। মৃত্যু মানুষের স্বাভাবিক পরিণাম কিন্তু তাঁর পুণ্যস্মৃতি আমাদের স্মৃতিতে ভাস্বর, যাঁদের পুরনো কর্মবীজ ক্ষীণ হয়ে গেছে, নতুনের সম্ভাবনা নেই, সেই ক্ষীণবীজ আর্য্যশ্রাবকেরা প্রদীপের মত নির্বাপিত হন। তবু তাঁর অস্তিত্ব আমাদের চেতনায় প্রোজ্জ্বল। তাঁর আরব্ধ কাজ আমাদেরই সম্পন্ন করতে হবে। যদি তাঁর অমূল্য গ্রন্থরাজির পুনর্মুদ্রণ, 'নালন্দা' পত্রিকার প্রকাশনা ও নালন্দাবিদ্যাভবনকে সঞ্জীবিত করতে পারি এবং তাঁর স্মৃতি ভবন নির্মাণ করতে পারি তবেই তাঁকে সত্যিকারের শ্রদ্ধা নিবেদন করা হবে।

পশ্চিমবঙ্গে আবিষ্কৃত বৌদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন

সুজিত কুমার বড়ুয়া*

ভারতীয় বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে "বাংলা" যে সকল কারণে উল্লেখযোগ্য তার অন্যতম হল, ক্ষীয়মান বৌদ্ধধর্মের শেষ আশ্রয়স্থল রূপে এখানে দ্বাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত এই ধর্ম এক সামাজিক-সাংস্কৃতিক শক্তিরূপে টিঁকে ছিল, যা উপমহাদেশের অন্য কোথাও ছিল না। দ্বিতীয়ত, বাংলায় ছিল তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্ম নামে বিচ্ছিন্ন-দিশাহীন এক ধর্মীয় বাতাবরণের আবাসস্থল। বিশুদ্ধ বুদ্ধচর্চার এই তান্ত্রিক বজ্রবাণী-সহজিয়া রূপান্তর বাংলার একান্ত নিজস্ব ধারা এবং এই ধর্মচর্চার শেষ পরিণতি। তৃতীয়ত, এই বাংলাতেই ঊনবিংশ শতাব্দীতে আদি থেরবাদী বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে।

বাংলায় বৌদ্ধ ধর্মচর্চার প্রবেশ সম্রাট অশোকের সমকালীন, অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে। যা, বিগত একশো বছরের বিজ্ঞানভিত্তিক আধুনিক প্রত্নসম্পদ আহরণ, সংরক্ষণ ও সংগ্রহের মাধ্যমে প্রামান্য দলিল হিসাবে স্বীকৃত। ইতিহাসচর্চা, ভূতত্ত্ব এবং পুরাতত্ত্বের গবেষণায়ও একথার সমর্থন পাওয়া যায়।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে সরকারি তত্ত্বাবধানে যেসব বৌদ্ধ প্রত্নতত্ত্বের উৎখনন হয়েছে তা সংক্ষিপ্তসারে লিপিবদ্ধ করার প্রয়াস সময়োচিত ও প্রাসঙ্গিক—এই বিশ্বাসের উপর ভিত্তি করেই এ রচনার অবতারণা।

তমলুক (তাম্রলিপ্ত) ঃ পূর্ব-মেদিনীপুর জেলার-জেলাশহর তমলুককে বৌদ্ধযুগের প্রাচীন নৌবন্দর তথা পৃথিবীখ্যাত নগর তাম্রলিপ্তরূপে পণ্ডিতরা মনে করেন।'মহাবংস' থেকে জানা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে এ স্থান সমুদ্রকূলবর্তী সমৃদ্ধ বন্দর-নগর ছিল। সম্রাট অশোকের রাজধানী পাটলিপুত্র থেকে তাঁর পুত্র মহেন্দ্রর নেতৃত্বে এক বৌদ্ধ ধর্মীয় গোষ্ঠী এই বন্দর থেকেই শ্রীলংকায় সংঘস্থাপনের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়েছিল।

চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন তাঁর বিবরণীতে এ অঞ্চলে ৪৪টি সংঘরাম ও অসংখ্য ভিক্ষুর কথা উল্লেখ করেছেন। ৭ম শতাব্দীতে হিউয়েন সাং এ স্থানে ১০টি বিহার ও সহস্রাধিক ভিক্ষুর দেখা পান। তাঁর ৪৪ বৎসর পরে ইৎ-সিঙ কেবলমাত্র ৪/৫টি বিহারের দর্শন পেয়েছিলেন—তাম্রলিপ্তে।

১৯৫৪-১৯৫৬ সালে অধুনা তমলুক শহর ও পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে পুরাতত্ত্ব বিভাগের

---

* সহকারী নিবন্ধক, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

পূর্বাঞ্চল শাখা উৎখননকার্য্য চালায়। এ কাজে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন শ্রী এম. এন. দেশপাণ্ডে। উৎখননে প্রাপ্ত শুঙ্গ ও কুষান যুগের মৃৎ-ফলকে বর্ণিত আছে জাতক কাহিনী। এ ব্যতীত পাওয়া যায় প্রস্তর যুগের নানাবিধ সামগ্রী তথা মৌর্য যুগ, কুষান যুগ ও গুপ্ত যুগের তামার মুদ্রা, নানাবিধ খেলনা ও জীবজন্তুর মূর্তি এবং পোড়া মাটির সামগ্রী। পাল রাজাদের সময়কার প্রাপ্ত দেবীমূর্তিযুক্ত একটি মোহর এ প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য।

ইতিপূর্বে ১৮৮১ সালে তমলুকের নিকটবর্তী রূপনারায়ণ নদী দিক পরিবর্তন করলে নদীমাটির নিম্নস্তর থেকে বহু প্রাচীন মুদ্রা ও মৃৎমূর্তি পাওয়া যায়। মুদ্রাগুলিতে নানাবিধ সাংকেতিক চিহ্ন ও বিভিন্ন পশু-পাখীর ছবি পরিলক্ষিত হয়। তদানীন্তন মেদিনীপুর জেলার— জেলাশাসক উইলসন্ সাহেব মুদ্রাগুলি পরীক্ষার জন্য এশিয়াটিক সোসাইটিতে পাঠান। পণ্ডিতরা মুদ্রাসকল পরীক্ষা করে মত দেন যে—এগুলি গুপ্ত যুগ ও তৎপরবর্তী বৌদ্ধ রাজন্যদের সময়কার।

কর্ণসুবর্ণ ঃ প্রাচীন বঙ্গের অন্যতম মহানগরের নাম—কর্ণসুবর্ণ। ৭ম শতাব্দীতে এই স্থান ছিল গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের রাজধানী। হিউয়েন সাং তার বিবরণীতে এখানে অবস্থিত লো-টো-মো-শি বিহারের (রক্ত মৃত্তিকা মহাবিহার) কথা উল্লেখ করেছেন। বিহারটির অবস্থান বর্তমান মুর্শিদাবাদ জেলার বহরমপুরের সন্নিকটে চিরুটি স্টেশন সংলগ্ন নীলকুঠিডাঙ্গায় শনাক্ত করা হয়েছে।

১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে লেয়ার্ড এর প্রস্তাবনা সমর্থন করে বেভারীজ মুর্শিদাবাদ জেলার ভাগীরথী তীরবর্তী রাঙ্গামাটি গ্রামাঞ্চলে কর্ণসুবর্ণের অবস্থিতি অনুমান করেন। কিন্তু এর সমর্থন পাওয়া যায়নি। পরবর্তী পর্য্যায়ে ১৯২৮-২৯ সালে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের উদ্যোগে মুর্শিদাবাদের রাক্ষসিডাঙ্গা (ডেভিলস্ মাউন্ট) এলাকায় খননকার্য্য চালিয়ে কিছু পোড়ামাটির লিপি, সিলমোহর উদ্ধার করা যায়।

অতঃপর ১৯৬২ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যাপক ডঃ এস. আর. দাসের নেতৃত্বে ব্যাণ্ডেল-বারহাওয়া লাইনে চিরুটি রেল স্টেশনের সন্নিকটে খননকার্য্য চালিয়ে রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের সন্ধান পাওয়া যায়। উৎখননের ফলে এ স্থানে ২য়-৩য় শতাব্দীতে মানববসতির পরিচয় প্রাপ্ত হয়। অনুসন্ধানের ফলে এস্থানে ৬টি বিভিন্ন পর্য্যায়ের মনোরম সৌধমালা বা গৃহাদির ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়। বিশেষজ্ঞদের মতে সুপ্রশস্ত প্রাঙ্গন, সোপান এবং তৎসংলগ্ন গোলাকার স্তূপ ভিত্তি এটি একটি বৌদ্ধ বিহার। এই বিহারের নির্মাণকাল ৬ষ্ঠ-৯ম শতাব্দীর মধ্যবর্তী বলে পণ্ডিতরা মত দেন। এখানে প্রাপ্ত একটি ডিম্বাকৃতি সীলমোহরে লিখিত আছে—

১। শ্রী—রক্তমৃত্তিকা—মহাবৈহা।

২। রিক—আর্য্য-ভিক্ষু-সঙ্ঘস্য

অর্থাৎ এই সীলমোহর 'রক্তমৃত্তিকা মহাবিহারের আর্য্য ভিক্ষু দিগের'। সীলের উপরের অংশে ধর্মচক্র এবং তার দুপাশে দুটি হরিণের মূর্তি আছে। এটি সেকালের বৌদ্ধ ধর্মীয় সংস্থার পরিচয় বহন করে।

ডিসেম্বর ২০০5 থেকে ভারতীয় পুরাতত্ত্ব সর্বেক্ষণের পূর্বভারতের দফতর প্রধান বিমল বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে পুনরায় এস্থানে খননকার্য্য শুরু হয়েছে। এখন পর্য্যন্ত পোড়ামাটির বুদ্ধ ও বোধিসত্ত্বের মূর্তি, ৫০ সেঃ মিঃ লম্বা কালো পাথরের সূর্য্যমূর্তি, প্রাচীন বিষ্ণুমূর্তি ছাড়াও উৎখননের থেকে এই নগরীর যে নিকাশী ব্যবস্থা পরিলক্ষিত হয় তা খ্রীষ্টপূর্ব ৩য় শতকের মৌর্য নগরীর সাদৃশ্য প্রায়। বিশেষজ্ঞদের মতে এস্থানে ৩য় শতাব্দী থেকে ১৬শ শতাব্দী পর্য্যন্ত কেতাদুরস্ত মানুষের বাস ছিল। কিন্তু ১৬শ শতাব্দীর পর জনপদ হিসাবে এস্থান কেন বর্জিত হয়েছিল তার কোন সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা পাওয়া যায়নি।

চন্দ্রকেতুগড় (বালান্দা মহাবিহার) ঃ অবিভক্ত ২৪ পঃ জেলার অন্যতম একটি পরগনার নাম বালান্দা। উঃ ২৪ পঃ জেলার দেগঙ্গা, হাড়োয়া, মিনাখাঁ এবং দঃ ২৪ পঃ জেলার ভাঙ্গড় থানার উত্তর-পশ্চিম অংশে এর অবস্থান। বিশিষ্ট পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞ যথা হরপ্রসাদ শাস্ত্রী, সতীশ চন্দ্র মিত্র, ডি. সি. সরকার, দেবপ্রসাদ ঘোষ, এম. এ. জব্বর এবং কালিদাস দত্তর মতানুসারে বর্তমান মুসলিম অধ্যুষিত এই পরগণার মধ্যেই ছিল সুবিখ্যাত 'বালান্দা মহাবিহার'। এই মহাবিহারের আচার্য্য রূপে ছিলেন বিশিষ্ট বৌদ্ধ পণ্ডিত সিদ্ধেশ্বর বনরত্ন (১৩৮৪-১৪৬৮)।

১৯৫৭ সাল থেকে ১৯৬২ সাল পর্য্যন্ত কোলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামের কিউরেটার ডঃ কুঞ্জবিহারী গোস্বামীর নেতৃত্বে এবং তদানীন্তন ভারত সরকারের মাননীয় শিক্ষামন্ত্রী হুমায়ুণ কবীরের আন্তরিক উৎসাহে ও তাঁর দফতরের প্রারম্ভিক আর্থিক সহযোগিতায় উত্তর ২৪ পরগণা জেলার-হাড়োয়া থানার-দেউলিয়া মৌজার চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাথমিক খননকার্য্য পরিচালিত হয়। বিশেষজ্ঞদল চন্দ্রকেতুগড়ের উত্তরাংশে খনা-মিহির ঢিবি এবং দক্ষিণাংশে হাড়োয়া-বেঁড়াচাঁপা পাকা রাস্তার পাশে গড়-পরিখায় তাঁদের মূল কার্য্যক্রম সীমায়িত রাখেন। এস্থানে যে বিহারটি উৎখনিত হয়েছে তা দৈর্ঘ্যে ৬৩ ফুট ও প্রস্থে ১৪ ফুট বিশিষ্ট এবং বিহার সংলগ্ন একটি মণ্ডপও আবিষ্কৃত হয়েছে যা দৈর্ঘ্য-প্রস্থে ৪৫ ফুট এবং ৪ ফুট প্রাচীর বিশিষ্ট। অল্পদূরে অনুরূপ একটি ক্ষুদ্র বিহার পাওয়া যায়। এখানকার জলনিকাশী ও মাটির পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা সৃজনশীল মানবজাতির বাসস্থানের পরিচায়ক।

বাংলায় প্রাপ্ত সর্বপ্রাচীন (খ্রীঃ ১ম-৩য় শতক) বেলেপাথরের মূর্তি এস্থানেই উত্তোলিত হয়। এ ব্যতীত চন্দ্রকেতুগড়ে খননকার্য্য চালিয়ে প্রাপ্ত নানান টেরাকোটা বিশেষত যক্ষিণী মূর্তি, ধ্যানী বুদ্ধ মূর্তি, অন্যান্য দেব দেবীর মূর্তি, মাটির পাত্র প্রভৃতি পুরা নিদর্শন খ্রীষ্টপূর্বের সময় হতে মৌর্য, শুঙ্গ, কুষান, গুপ্ত এবং পাল যুগের পরিচয় বহন করে। এ সকল প্রত্নতত্ত্ব সামগ্রী বর্তমানে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আশুতোষ মিউজিয়ামে সংগৃহীত আছে।

এখানে উল্লেখ্য যে স্থানীয় বিশিষ্ট ব্যক্তিত্ব এম. এ. জব্বর স্বীয় প্রচেষ্টায় 'বালান্দা প্রত্নসংগ্রহশালা' প্রতিষ্ঠা করে চন্দ্রকেতুগড় তথা সন্নিহিত লাল মসজিদ, পিলখানার মঠ, হাদিপুর, শানপুকুর এলাকা থেকে নানান প্রত্নবস্তু সংগ্রহ তথা পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও গবেষণায় ব্যাপৃত থেকে এ অঞ্চলের আদিম সৃষ্টিকে বর্তমান প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার চেষ্টা করেছেন। এ ব্যতীত জব্বর সাহেব প্রকাশ করেছেন এ অঞ্চলের অনন্য সাধারণ ইতিহাসের বই। তাঁর এই ঐকান্তিক প্রয়াসের প্রতিচ্ছবি দেখা যায় যখন দেশ-বিদেশের ছাত্র-ছাত্রী তথা অনুসন্ধিৎসু গবেষকরা নানান প্রশ্নের উত্তর খুঁজতে উপস্থিত হন এই সংগ্রহশালায়।

চন্দ্রকেতুগড়ে প্রাপ্ত তত্ত্ব, তথ্য এবং পুরানিদর্শনগুলি "বালান্দা মহাবিহারের" অবস্থান সম্পর্কে যথেষ্ট ইঙ্গিত বহন করলেও এ বিষয়ে পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞদের সুনির্দিষ্ট মতামতের প্রয়োজন আছে। আশা করা যায় অদূর ভবিষ্যতে সরকারী প্রচেষ্টায় এ মহাবিহার সম্পর্কিত সকল তথ্য সম্পূর্ণতা লাভ করবে।

ভরতপুর ঃ বর্ধমান জেলার পানাগড়ের কাছে ভরতপুর গ্রামে সরকারি তত্ত্বাবধানে ১৯৭২ সাল থেকে ১৯৭৪ সাল পর্য্যন্ত সময়কালে উৎখননকার্য্য পরিচালনা করার ফলে এক বৌদ্ধবিহার কমপ্লেক্স আবিষ্কৃত হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করেন আদি মধ্যযুগে বিহারটি নির্মিত হয়েছিল। বাংলার বুদ্ধচর্চার ক্ষেত্রকে আরও প্রসারিত করার জন্য সরকারি পৃষ্ঠপোষকতায় এই উৎখননকার্য্য বিস্তারিতভাবে হওয়া প্রয়োজন।

জগজীবনপুর ঃ পশ্চিমবঙ্গের মালদহ জেলা ও বাংলাদেশের রাজশাহী জেলার মধ্যবর্তী অঞ্চলে পুনর্ভবানদীর অববাহিকায় নন্দনগড় বিলের পাশে বিগত শতাব্দীর নয়ের দশকের শেষলগ্নে এক অতীব গুরুত্বপূর্ণ বৌদ্ধ পুরাতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া গেছে। বিশেষজ্ঞদের আশা এই নবআবিষ্কার বাংলার ইতিহাস তথা ভারতে উৎখনিত বৌদ্ধ বিহারসমূহের চর্চার ক্ষেত্রে নতুন ভাবনা সঞ্চারিত করবে।

মালদহ জেলার জেলা শহর মালদহের দক্ষিণপূর্বে ৪০ কি.মি. দূরে হাবিবপুর থানার, জগজীবনপুর গ্রামের তুলাভিটা অঞ্চলে ১৯৯২ সাল থেকে রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের তত্ত্বাবধানে যে উৎখনন কার্য্য চালানো হয় তার ফলস্বরূপ নবম শতাব্দীর এক বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়েছে। দুর্ভাগ্য যে বিহারটির উপরিকাঠামো কিছুই ঠিক নেই। তবে প্রত্নস্থলটিতে বারান্দাসহ আয়তকার আঙ্গিনামুখী বেশ কয়েকটি মঠ-কক্ষ পাওয়া গেছে। এটির মূল বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে, কোণের কক্ষগুলি ছিল বৃত্তাকার। জগজীবনপুরের বিহারটির সাধারণ গঠন এবং আকৃতি নালন্দার মতন ছিল বলেই ধারণা করা হয়।

এ স্থানে প্রাপ্ত একটি বিশাল তাম্রপত্রে সিদ্ধমাতৃকা হরফে, সংস্কৃত ভাষায় বলা আছে— 'পাল বংশের রাজা দেবপালের পুত্র মহারাজাধিরাজ মহেন্দ্রপাল বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য তাঁর রাজত্বের এই অংশের জায়গা নিজ সেনাপতি বজ্রদেবকে সমর্পিত করলেন'।

বজ্রদেব বিহারটির প্রতিষ্ঠা তথা বিহারে তান্ত্রিকবৌদ্ধদের উপাসনার জন্য বুদ্ধ, প্রজ্ঞাপারমিতা ও অন্যান্য বৌদ্ধ দেব-দেবীর মূর্তি স্থাপিত করেন। বিহারটি বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দ্বারা পরিচালিত হত। প্রাপ্ত তাম্রপত্রটির ওজন ১২ কিঃ গ্রাঃ, দৈর্ঘ্য ৫৩ সেঃ মিঃ, প্রস্থ ৩৯ সেঃ মিঃ ও ০.৭৫ সেঃ মিঃ পুরু। এই তাম্রপত্রটি বাংলার ইতিহাসচর্চার ক্ষেত্রে নতুন আলোকবর্তিকা নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। কারণ, ইতিপূর্বে পণ্ডিতদের ধারণা ছিল মহেন্দ্রপাল প্রতিহার বংশীয় রাজা এবং দেবপালই বাংলার শেষ পাল রাজা ছিলেন। কিন্তু উপরিউক্ত তাম্রপত্রটি প্রামান্য দলিলস্বরূপ এই সত্য প্রতিষ্ঠা করে যে—

১। বাংলায় পাল বংশের রাজকার্য্য দেবপালের পর মহেন্দ্র পাল এবং অতঃপর সুরপালের হাতে ন্যস্ত হয়।

২। নবম শতাব্দীতে বাংলার এতদ অঞ্চল প্রতিহার রাজাদের দখলে যায়নি বরঞ্চ পালদের শাসনকার্য্যই সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

এস্থানে উৎখননের ফলে একটি মিশ্রধাতুর শীলমোহর পাওয়া গেছে (১৯ সেঃ মিঃ × ২১.৮ সেঃ মিঃ)। এই সীলমোহরের উপরিভাগে ধর্মচক্র এবং তার দুপাশে দুটি হরিণ চিহ্ন দেখে পুরাতত্ত্ব বিশেষজ্ঞরা এটিকে পাল রাজাদের 'সরকারি স্মারক' (official badge) তথা স্থানটিকে বৌদ্ধবিহাররূপে চিহ্নিত করেছেন। শীলমোহরের নিম্নভাগে দেবনাগরীতে লেখা আছে—'শ্রী বজ্রদেব কারিত নন্দদির্ঘী বিহারীয় আর্য্যভিক্ষু সংঘ'। অর্থাৎ এই বিহারটির নাম 'নন্দদির্ঘীর বিহার' এবং প্রতিষ্ঠাতা শ্রী বজ্রদেব। ইতিপূর্বে ভারতবর্ষে যে সকল বৌদ্ধ বিহারের সন্ধান পাওয়া গেছে, সেখানকার কোন সীলমোহরে বিহার প্রতিষ্ঠাতার নাম লেখা ছিল না। এই অর্থে বিহারটির প্রতিষ্ঠাতার অনন্যসাধারণ দূরদর্শিতার পরিচয় পাওয়া যায়। মনে করা হয় তুলাভিটার অদূরে বর্তমান নন্দনগড় বিল নামকজলাশয়ের নামে এই বিহারটির নামকরণ হয়েছে।

তুলাভিটা ব্যতীত আরও পার্শ্ববর্তী চারটি স্থানকে উৎখননের জন্য চিহ্নিত করা হয়েছে। এগুলি হল আখরিডাঙ্গা, নিমডাঙ্গা, মৌভিটা, লক্ষীটিবি।

বিশেষজ্ঞদের অভিমত 'নন্দদিঘীর বিহারটি' খুব সম্ভবত নালন্দা মহাবিহারের থেকেও আকারে বড় হবে, যার বিস্তৃতি বাংলাদেশের রাজশাহী জেলা পর্য্যন্ত হওয়া অসম্ভব নয়। অদূর ভবিষ্যতে এই খননকার্য্য সম্পূর্ণ হলে বিশেষজ্ঞরাই এই বিষয়ে সুচিন্তিত মতামত দেবেন। এস্থানে প্রাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সামগ্রীর বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ—৯ম/১০ম শতাব্দীর মানুষের জীবনচর্চার বিস্তারিত পরিচয় বহন করে যা আগামী দিনে ইতিহাস চর্চার ক্ষেত্রকেউৎসাহিত করবে এ প্রত্যাশা আমাদের সকলের।

জয়নগর ঃ দক্ষিণবঙ্গে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব লক্ষ্য করেছিলেন চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন। কিন্তু বঙ্গের এ অঞ্চলে তমলুক ছাড়া অন্য কোন ক্ষেত্রে সরকারি পর্য্যায়ে সেই বৌদ্ধ

সংস্কৃতি উদ্ধারের কাজ পরিলক্ষিত হয়নি। যদিওবা পণ্ডিত ও বিশেষজ্ঞরা বার বার দাবি করেছেন দক্ষিণ ২৪-পরগণার সুন্দরবন সন্নিহিত অঞ্চলে সমৃদ্ধ বৌদ্ধ জনপদের অস্তিত্ব ছিল। সুখের বিষয় অতি সম্প্রতি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রত্নতত্ত্ব দফতরের ব্যবস্থাপনায় দক্ষিণ ২৪-পরগণা জেলার জয়নগর থানার ধোসা-চন্দনেশ্বর গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত, পিয়লী নদীর তীরবর্তী ধোসা গ্রামে উৎখননকার্য্য শুরু হয়েছে। ফেব্রুয়ারী ২০০৬ এ শুরু হওয়া এই খননকার্য্যে নেতৃত্ব দিচ্ছেন পঃবঙ্গ প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের অধ্যক্ষ অমল রায়।

ধোসা গ্রামের পঞ্চাননতলার 'সাহেববাড়ি' নামে খ্যাত একটি ঢিবি উৎখননের ফলে একটি বড় আকারের স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ পাওয়া গেছে। এই প্রাচীন ঢিবি থেকে এলাকার মানুষ দীর্ঘদিন যাবৎ মাটি কেটে, ইট নিয়ে বাড়ি, ঘর এবং রাস্তা তৈরীর ফলে স্থাপত্যটির উপরিঅংশ সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হয়েছে এবং বর্তমানে এর ভিত ছাড়া কোন কিছুই অবশিষ্ট নেই। এস্থানে পাওয়া বিভিন্ন নিদর্শন থেকে বিশেষজ্ঞদের অনুমান এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ বিহারের ধ্বংসাবশেষ। বিহারটির ভিত খননের ফলে দেখা যায়—বহুভুজক্ষেত্রযুক্ত প্রাচীন স্তূপের কাঠামো পরপর সাজান আছে। পর্য্যায়ক্রমে উৎখননে প্রথমে গুপ্তযুগের, দ্বিতীয়তে কুষানযুগের এবং তৃতীয় পর্য্যায়ে আরও প্রাচীন যুগের স্থাপত্যের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রাথমিকভাবে মনে করা হচ্ছে বিহারটি খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতক থেকে খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের মধ্যবর্তী সময়ে প্রতিষ্ঠিত।

ধোসায় উৎখনণের ফলে পাওয়া গেছে একটি পোড়ামাটির বুদ্ধমস্তক ও তার অবয়বের অংশ। এ প্রসঙ্গে বিশেষজ্ঞদের অভিমত— চতুর্থ-পঞ্চম শতাব্দীর পরিশীলিত গুপ্ত টেরাকোটা শিল্পশৈলীর এমন নিদর্শন বাংলায় এই প্রথম। এ ব্যতীত এখানে মিলেছে একটি সমধর্মী পুরুষ মূর্তির অবয়বের অংশবিশেষ, ইটের উপর উৎকীর্ণ একটি নারীমূর্তি এবং গুপ্তযুগের লিপিতে 'নিবীতস্য' লেখযুক্ত ইট, প্রাচীন সংকেত ও লেখযুক্ত তাম্রমুদ্রা, ব্রাহ্মীঅক্ষরযুক্ত গোলাকার সীলমোহর ও মৃৎপাত্রের ভগ্নাংশ বিশেষ।

ধোসার ৬ কিঃ মিঃ দূরে তিলপি গ্রামেও উৎখননকার্য্য শুরু হয়েছে। এস্থানে প্রাপ্ত সাধারণ মৃৎপাত্রের অংশ এবং ধাতু আকর ও ধাতুমলের থেকে অনুমান, স্থলটি মৌর্যযুগের নগর সভ্যতার সমসাময়িক।

পুনের ডেকান কলেজের বিশিষ্ট পুরাতাত্ত্বিক অধ্যাপক এস. এন. রাজগুরু এইস্থান পরিদর্শন করে এটিকে নিম্নবঙ্গের আদি, ঐতিহাসিক পর্বের প্রত্নস্থল বলে চিহ্নিত করেছেন।

বিশেষজ্ঞদের মতে এখানকার মুদ্রা ও লিপির ব্যবহার থেকে সমাজ বিকাশের যে উত্তরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়, তাতে উত্তর ভারতের নগরায়ণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে সাদৃশ্য আছে।

সুন্দরবনে দুহাজার বছর আগে জনবসতি সত্যিই কতটা বিস্তৃত ছিল, তার মানই বা কেমন ছিল আগামী দিনে এ অংশের উৎখননকার্য্যই তার প্রকাশ ঘটাবে বলে আশা করা যায়। এ প্রত্যাশাই হয়ত বাংলার প্রাচীন ইতিহাসকে নতুন পথে চালিত করবে।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধসাহিত্য চর্চা (১৯০০-১৯৭৫)

ঐশ্বর্য বিশ্বাস

" Buddhist Studies in Calcutta University"– ভাষান্তরে যার রূপ 'কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধসাহিত্য চর্চা', — অবশ্য 'বৌদ্ধসাহিত্য' বলতে আমাদের যা ধারণা আর বিশ্ববিদ্যালয়ের পঠন-পাঠন ও গবেষণার জন্য সীমিত বিষয়সূচীর মধ্যে এই সাহিত্যচর্চার অবকাশ কতখানি তা নিয়ে আজ স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন ওঠে।

ইতিহাস, প্রাচীন ইতিহাস, দর্শন, সংস্কৃত, তুলনামূলক ধর্মতত্ত্ব, দক্ষিণ-পূর্ব এশীয় দ্বীপরাষ্ট্র সমূহের চর্চা সংক্রান্ত বিভাগগুলিও বৌদ্ধসাহিত্য, দর্শন বা ধর্মতত্ত্ব নিয়ে চর্চা করে। কিন্তু শতাব্দী প্রাচীন যে বিভাগটি শুধুমাত্র উক্ত বিষয় চর্চার জন্যই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার চর্চার ধারাটি এখন কী রূপ নিয়েছে প্রবন্ধটি মূলত তার ওপরই আলোকপাত করতে চলেছে। এখানে 'বৌদ্ধসাহিত্য' বলতে আমাদের ধারণা যাঁদের গবেষণা ও মতামতের ওপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে তাঁদের মতভেদ নিয়ে দু'চার কথা বোধহয় অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

বৌদ্ধশাস্ত্রে নিবদ্ধ তথ্যাবলী থেকে মোটামুটিভাবে আমরা অধুনা ভারতবর্ষের যে ভৌগলিক সীমা সেই ক্ষুদ্রপরিসরে বৌদ্ধধর্ম বিবতর্নের যে চালচিত্রটি পাই তার যুগভিত্তিক আনুমানিক কালসীমা হলঃ আদি বৌদ্ধধর্ম বা হীনযানের বিবর্তন (খ্রীঃ পূঃ ৪২৮—২০০ খ্রীঃ পূঃ), হীনযান থেকে মহাযান (খ্রীঃ পূঃ ২০০—৫০০ খ্রীঃ), মহাযান থেকে তান্ত্রিক বৌদ্ধধর্মে অর্থাৎ বজ্রযান, মন্ত্রযান বা কালচক্রযানে (৫০০ খ্রীঃ — ১১৫০ খ্রীঃ)-র পরবর্তী রূপান্তর এমনই যে আনুমানিক দ্বাদশ থেকে ঊনবিংশ শতক (১১৫০ খ্রীঃ— ১৮০০ খ্রীঃ) পর্যন্ত বৌদ্ধতত্ত্ব ও কৃষ্টি ভারতবাসীর প্রাত্যহিক ধর্মচর্যায় লীন হয়ে থাকলেও 'বুদ্ধ' বা 'বৌদ্ধ' নামরূপটি এদেশ থেকে অন্তর্হিত হয়ে গিয়েছিল। তাই বৌদ্ধধর্ম বা সাহিত্য চর্চার ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা আছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, বৌদ্ধশাস্ত্র থেকে বুদ্ধের ঐতিহাসিকতা প্রমাণ করা যায় না। তিনি প্রকৃতপক্ষে কী শিক্ষা দিয়েছিলেন তা নিয়েও প্রচুর মতভেদ; কারণ অধুনা স্বীকৃত বৌদ্ধশাস্ত্র বা সাহিত্যের রূপরেখাটি তৈরী হয়েছিল বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের (খ্রীঃ পূঃ ৪৮৩) প্রায় আড়াইশ শতক পরে মৌর্যসম্রাট কিংবদন্তী রাজা অশোকের (খ্রীঃ পূঃ ২৭৩/৭২-২৩২) শাসনকালে এবং এর লিপিবদ্ধ রূপ দেখা যায় আর দু' শতাব্দী পরে শ্রীলঙ্কারাজ বট্টগামণী অভয় (খ্রীঃ পূঃ ১০১-৭৭ বা খ্রীঃ পূঃ ৮৮-৪৪) পৃষ্ঠপোষকতায় রচিত পালিসাহিত্যে[১] এবং কুষাণসম্রাট কণিষ্কের (খ্রীঃ প্রথম শতাব্দী) পৃষ্ঠপোষকতায় বিরচিত 'মহাবিভাষা' নামক সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যে[২]। এখন সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যের আবার দুটি সুস্পষ্ট

ড: ঐশ্বর্য বিশ্বাস কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালি বিভাগের লেকচারার।

স্তরভেদ—বিশুদ্ধ পাণিনীয় সংস্কৃতে রচিত মহাযান আচার্য বা দার্শনিকগণের দর্শনগ্রন্থ সমূহ[৩] এবং মিশ্র বা 'Hybrid' সংস্কৃত বা সমধিক প্রসিদ্ধ প্রতিশব্দ বৌদ্ধসংস্কৃতে বিরচিত সর্বাস্তিবাদি সম্প্রদায়ের আচার্যগণের গ্রন্থাবলী[৪]। এই লিপিবদ্ধ করণের পূর্বে আবার গ্রন্থগুলোর কিছু কিছু চৈনিক অনুবাদও হয়ে গিয়েছিল। এই পরিস্থিতিতে কোন ভাষায় সংরক্ষিত বৌদ্ধ সাহিত্যকে আমরা মূল এবং প্রামাণ্য বলে দাবি করব?

অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকে বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত উপাদান থেকে বুদ্ধ বা তথাকথিত 'বৌদ্ধ-ভারত'[৫] সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের সমর্থনে বৌদ্ধ সাহিত্যের সাহিত্যিক উপাদান-সমূহ প্রামাণ্য বলে স্বীকৃতি পেতে থাকল তখনও পণ্ডিত মহলে এই নিয়ে বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছিল। Rhys Davids, Fousboll, Oldenberg, Kern প্রমুখ পণ্ডিতগণ পালি বৌদ্ধশাস্ত্রে লিপিবদ্ধ বিষয়বস্তুর ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করলেন। আর Stcherbatsky, Rosenberg, Obermiller সংস্কৃতে নিবদ্ধ বৌদ্ধসাহিত্য চর্চায় ব্রতী হলেন। এই সুস্পষ্ট বিভাজন তাঁদের রচনায় বড় স্পষ্ট। এই পরিস্থিতিতে পালি বৌদ্ধশাস্ত্র বা সাহিত্য প্রামাণ্য এবং সংস্কৃত ব্রাত্য বা সমধিক গুরুত্বের অধিকারী নয় তা বলা যায় না। তৃতীয় একটি মতামত আমরা একশ্রেণীর পণ্ডিতের কাছ থেকে পাই; পালি এবং সংস্কৃত - উভয়শাস্ত্রই নাকি অধুনালুপ্ত তৃতীয় একটি শাস্ত্র যা মাগধীভাষায় বিরচিত, তার থেকে সংগৃহীত। আর এই কল্পিত লুপ্ত শাস্ত্রটিকে উদ্ধার করার জন্য Levi, Poussin, Lamotte, Tucci, Conze, Bareau, Frauwallner পালি ও সংস্কৃত বৌদ্ধ শাস্ত্র গ্রন্থগুলির চুলচেরা বিশ্লেষণ করে সাদৃশ্যমূলক বিষয়গুলো অন্বেষণ করতে থাকলেন।[৬] সাম্প্রতিক বিশ্বব্যাপী বৌদ্ধ ধর্ম ও দর্শন চর্চা যা সাহিত্যের নির্যাসরূপে আমরা পাই উক্ত শাস্ত্রগুলোর সম্মিলিত চর্চার যোগফল (Synthesis)। বাস্তবিকই এই চর্চা বড় দুরূহ। কারণ হেগেলের 'প্রজ্ঞানবাদী সূত্র' অনুসারে পালি বৌদ্ধসাহিত্য যদি প্রস্তাব (Thesis) হয়, সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্য তার বিকল্প প্রস্তাব বা দ্বন্দ্ব (Anti-thesis) এবং এর সমাধানসূত্র খুঁজতে চেষ্টার মধ্যে নিহিত থাকছে মীমাংসা (Synthesis)। আধুনিক বৌদ্ধ ধর্ম বা দর্শন চর্চা এই তৃতীয়স্তরে বিরাজ করছে। ভাষাতাত্ত্বিকরা পালির মূল খুঁজতে চাইছেন এবং বৌদ্ধ দর্শন চর্চায় নিহিত গবেষকগণ পালি এবং সংস্কৃত বৌদ্ধসাহিত্যের অনুরূপ বিষয়গুলি একত্র করে তৃতীয় কোন সূত্রের সঙ্গে তুলনাত্মক বিশ্লেষণ করতে চেষ্টা করছেন। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালিবিভাগের প্রবাদ প্রতিম অধ্যাপক বেণী মাধব বড়ুয়া মহাশয়ও বহুপূর্বে তাঁর উত্তরসূরীদের দৃষ্টিকে এদিকে আকর্ষণ করতে চেয়েছিলেনঃ 'বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন সম্বন্ধে সম্যক জ্ঞানার্জন করতে হলে সংস্কৃত ভাষা শিক্ষা করা অত্যাবশ্যক; কারণ হিন্দু, জৈন তথা মহাযান বৌদ্ধধর্মের যাবতীয় গ্রন্থরাজি সংস্কৃত ভাষাতে লিখিত। সুতরাং সংস্কৃত ভাষায় অনভিজ্ঞ ব্যক্তি সমস্ত ত্রিপিটক অধ্যয়ন করলেও প্রকৃত বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞানার্জন অসম্পূর্ণ থেকে যাবে'[৭]।

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৌদ্ধসাহিত্য চর্চার শতক প্রাচীন এই বিভাগটির সূচনা করতে গিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিদগ্ধ কর্তৃপক্ষ যে মূল্যবান দিক দর্শন দিয়েছিল, সেটি একটু দেখা যাক— "The objective of the university in undertaking this venture was to open out to its advanced students an opportunity for a comprehensive study of that distinct and widespread civilization which is represented by Buddhism. The fact should not be lost sight of that from the 5th century B.C. to the 12th century A.D. Buddhism moulded thoughts, ideals and literatures of the entire Far East. The history of Buddhism is also a story of cultural contacts between different groups of people in South, South-East and East-Asia. The Department of Pali Studies was intended to provide opportunities for the study of the cultural contacts between all these different regions."[৮] [কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বাধীন বিষয়রূপে স্নাতকোত্তর স্তরে পঠন-পাঠনের বিষয়রূপে পালি গৃহীত হয়েছিল ১৮৮৯ সালে। পুঙ্খানুপুঙ্খ পাঠ্যসূচীও স্থির হয়েছিল। কিন্তু পদ্ধতিগত শিক্ষাদানের বিষয়টি অধরাই থেকে গিয়েছিল। এমন কি ১৮৮৯-১৯০০ সাল পর্যন্ত আগ্রহী পড়ুয়াও আসেন নি। ১৯০১ সালে সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক সতীশচন্দ্র আচার্য্য পরীক্ষার্থীরূপে উপস্থিত হলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরীক্ষক, প্রশ্নপত্র ইত্যাদি প্রস্তুতি নিয়ে বেশ ফাঁপরে পড়েন। অবশেষে ত্রাতার ভূমিকায় অবতীর্ণ হন প্রাতঃস্মরণীয় পালি পণ্ডিত T. W. Rhys Davids মহাশয়। সানন্দে তিনি পরীক্ষার ছ'টি প্রশ্নপত্রই প্রস্তুত করে দেন এবং স্বয়ং পরীক্ষক রূপে মূল্যায়ণ করেন। পরবর্তী পরীক্ষার্থী ছিলেন সাহিত্যিক ও ভাষাতাত্ত্বিক রূপে ঘরে বাইরে নন্দিত হরিনাথ দে। এই সময়ও Prof. Rhys Davids উক্ত দায়িত্বগুলো পালন করেন। কিন্তু ১৯০১, ১৯০৬ বা ১৯০৯ সালে যে পরীক্ষার্থীদের আমরা দেখি তাঁরা ছিলেন হয় প্রতিজনিক (Private) অথবা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে অসংশ্লিষ্ট (Non-Collegiate) পরীক্ষার্থী।[৯]

শুধুমাত্র ভাষা শিক্ষার মধ্যেই যাতে বিভাগীয় পঠন-পাঠন বা গবেষণা আবদ্ধ না থাকে তা সূচনাতেই সুস্পষ্টরূপে নির্দেশ করা হয়েছিল। সেই দিক থেকে দেখতে গেলে বৌদ্ধ তত্ত্ব, ধর্ম দর্শন বা সাহিত্য চর্চার গুরুত্ব অনুধাবন করে পালি বিভাগের মতো বিভাগ প্রতিষ্ঠা করে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় দূরদর্শিতার এক বিরল দৃষ্টান্ত রেখেছিল। ভারতবর্ষে বৌদ্ধ ধর্মসংস্কৃতিকে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা ব্যবস্থার অন্তর্ভুক্ত করে আধুনিক শিক্ষার অঙ্গীভূতকরণের বিষয় ভারতবর্ষে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় ছিল পথিকৃৎ। ফলে বিভাগের পাঠ্যসূচীর রূপরেখাটি কেমন হবে সে সম্পর্কেও বিভাগের সামনে কোন দৃষ্টান্ত ছিল না। কিন্তু এই বিভাগের প্রাক্তন ছাত্র এবং অধ্যাপকবৃন্দের তালিকাটি দেখলেই বোঝা যায় যে বৌদ্ধ ধর্মতত্ত্বের সীমিত গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ না থেকে বিভাগটি প্রাচ্যবিদ্যাচর্চার এক পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল। প্রথমেই এখানে উল্লেখ করতে হয় অধ্যাপক বেণীমাধব বড়ুয়ার নাম—যিনি

ছাত্র এবং অধ্যাপকরূপে একইসঙ্গে বিভাগটিকে ধন্য করেছিলেন। এছাড়া নলিনাক্ষ দত্ত, বিমলা চরণ লাহা, সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় , দামোদর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার, আর সিদ্ধার্থ, ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির, ভদন্ত কে. ধর্মরক্ষিত, R. Kimura, J. Masuda, সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায়, হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, প্রবোধচন্দ্র বাগচি, ননীগোপাল মজুমদার, রাধাগোবিন্দ বসাক, নিরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্ত্তী, সাতকড়ি মুখোপাধ্যায়, Stella Kramrich, বিনয়চন্দ্র সেন, জিতেন্দ্র নাথ বন্দোপাধ্যায়,অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় প্রমুখ।

এই প্রসঙ্গে স্যর আশুতোষ মুখোপাধ্যায়ের অবদান প্রাতঃ স্মরণীয়। মূলতঃ তাঁর ঐকান্তিক প্রচেষ্টাতেই ১৯০৭ সালে সংস্কৃত এবং পালি প্রভৃতি স্বাধীন বিভাগের মর্যাদা লাভ করে। পালিতে ব্যুৎপন্ন সুপণ্ডিত মারাঠী অধ্যাপক ধর্মানন্দ কৌশাম্বী মহাশয় ১৯০৭ সালের শেষপর্বে বিভাগীয় অধ্যাপক রূপে নিযুক্ত হন। তাঁর মাসিক 'আচরিয়ভাগং' (আচার্য দক্ষিণা বা বেতন) ছিল একশতটি টাকা। অবশ্য সুদূর মহারাষ্ট্র থেকে স্বল্পবেতনে দেশান্তরে তাঁর পক্ষে ব্যয়ভার নির্বাহ কষ্টকর ছিল। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পরের বছরই অক্টোবর মাস থেকে তাঁর সান্মানিক বৃদ্ধি করে আড়াইশ টাকা করেন। কিন্তু ধর্মানন্দ কৌশাম্বী এই পদ থেকে ইস্তফা দেন।[১০] তাঁর পরবর্তী অধ্যাপক রূপে নিয়োগ পত্র পান তৎকালীন সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ। ১৯১০ সালের জুলাই মাসে সপ্তাহে ন্যূনতম তিনঘন্টা অধ্যাপনার পরিবর্তে তাঁরও মাসোহারা স্থির হয় একশ' টাকা।[১১] ১৯১০ থেকে ১৯১৭ পর্যন্ত একক প্রচেষ্টায় বিদ্যাভূষণ মহাশয় বিভাগটি ধরে রাখেন। মূলতঃ ১৯১৭-১৮ সালেই বিভাগটি পরিপূর্ণতা লাভ করে। এই শিক্ষাবর্ষে অধ্যাপনার জন্য নিম্নলিখিত অধ্যাপকবৃন্দ যোগদান করেন ঃ

মহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, এম. এ. পি. এইচ্ ডি।

দামোদর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকর, এম্. এ

বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার, এম্. এ

বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এম্. এ (স্বর্ণপদক প্রাপ্ত, ১৯১২)

এই সময় পাঠ্যসূচীও পরিবর্তিত হয়। ১৯০৬ সালের যে পাঠ্যসূচী স্থির হয়েছিল তার সঙ্গে মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্যচর্চার ওপর অধিক গুরুত্ব আরোপ করে বৌদ্ধসংস্কৃতে রচিত কয়েকটি গ্রন্থ অন্তর্ভুক্ত করা হয়। স্নাতকোত্তর স্তরে যে আটটি পত্র পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট তার প্রথম চারটি সাধারণ পত্র এবং অবশিষ্ট চারটি হল ছাত্রছাত্রীদের ঐচ্ছিক পত্র নির্বাচন। উক্ত চারটি সাধারণ পত্র ছিল ঃ

প্রথম পত্র	ঃ	সুত্তপিটকের নির্বাচিত অংশাবলী
দ্বিতীয়পত্র	ঃ	বিনয়পিটকের নির্বাচিত অংশাবলী
তৃতীয়পত্র	ঃ	পালি ও প্রাকৃত ব্যাকরণ
চতুর্থপত্র	ঃ	পালি সাহিত্য ও বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস

অবশিষ্ট চারটি ঐচ্ছিকপত্র ছাত্রছাত্রীরা চারটি বিভাগের(Group) যে কোন একটি থেকে নির্বাচন করতেন।

বিভাগ — ক (সাহিত্য)

পঞ্চম পত্র	ঃ	জাতকের নির্বাচিত অংশসমূহ
ষষ্ঠ পত্র	ঃ	পালি সাহিত্যের সাধারণ ইতিহাস
সপ্তম পত্র	ঃ	প্রত্নলেখ
অষ্টম পত্র	ঃ	অপঠিত পালি অনুচ্ছেদের ইংরাজীতে অনুবাদ এবং পালি অনুচ্ছেদ লিখন

বিভাগ - খ (পালি দর্শন)

পঞ্চম পত্র	ঃ	অভিধম্ম পিটকের নির্বাচিত অংশসমূহ
ষষ্ঠ পত্র	ঃ	ত্রিপিটকেতর সাহিত্যের নির্বাচিত অংশসমূহ
সপ্তম পত্র	ঃ	টীকাভাষ্যসহ ত্রিপিটক এবং ত্রিপিটকেতর সাহিত্যের নির্বাচিত অংশসমূহ
অষ্টম পত্র	ঃ	পালি অনুচ্ছেদ এবং পালি অনুবাদ

বিভাগ - গ (পালি দর্শন)

পঞ্চম পত্র	ঃ	(ক) পালি ঐতিহাসিক বর্ষপঞ্জী (Annals) এবং ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থসমূহের নির্বাচিত বিষয়াবলী (খ) অপঠিত পালি অনুচ্ছেদের ইংরাজী অনুবাদ
ষষ্ঠ পত্র	ঃ	মৌর্যযুগের শিলালেখমালা
সপ্তম পত্র	ঃ	গুপ্তযুগের গুহা এবং শিলালেখমালা
অষ্টম পত্র	ঃ	ভারতবর্ষের প্রাচীন ভূগোল এবং পালি অনুচ্ছেদ রচনা

বিভাগ - ঘ (মহাযান সাহিত্য এবং দর্শন)

পঞ্চম পত্র	ঃ	মহাযান সাহিত্যের নির্বাচিত গ্রন্থসমূহের নির্বাচিত গদ্য ও পদ্যাংশ
ষষ্ঠ পত্র	ঃ	মাধ্যমিক এবং যোগাচারা দর্শনের নির্বাচিতগ্রন্থরাজি
সপ্তম পত্র	ঃ	বৌদ্ধন্যায়ের নির্বাচিত গ্রন্থরাজি
অষ্টম পত্র	ঃ	ক) সংস্কৃত ব্যাকরণ খ) অনুচ্ছেদ

পাঠ্যসূচীর বিভাজন থেকে আমাদের বুঝতে অসুবিধে হয় না যে বৌদ্ধধর্মের তিনটি পর্যায় —১) বৌদ্ধধর্মের নিরবিচ্ছিন্ন বা ধারাবাহিক ইতিহাস, ২) অভিধর্ম দর্শন এবং ৩) মহাযান বৌদ্ধ সম্প্রদায় ও তাদের সাহিত্য এবং দর্শন সম্পর্কে শিক্ষার্থীগণকে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়ার জন্য পাঠ্যসূচী প্রণয়ণে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছিল। এমন কি ছাত্রদের সুবিধার জন্য 'Tutorial' এবং 'Seminar' এর ব্যবস্থা ছিল। সপ্তাহে অন্ততঃ একবার ছাত্র এবং শিক্ষকগণ একত্রিত হয়ে পাঠ্যবিষয়, পাঠ্য বিষয় সহায়ক বা প্রাচ্য বিদ্যা বিষয়ক বিভিন্ন বিষয় নিয়ে মতবিনিময় করতেন। এই সময় আমরা অধ্যাপকবৃন্দের তালিকাটির দিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিতে পারি —

ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া
প্রফেসর দামোদর রামকৃষ্ণ ভাণ্ডারকার
বাবু নলিনাক্ষ দত্ত
ভিক্ষু কুকুল্‌নাপে দেবরক্ষিত
রাজগুরু ভগবানচন্দ্র মহাস্থবির
বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র
সমণ পুন্নানন্দ
সমণ রামবুক্কেল্লে সিদ্ধার্থ
বাবু গোকুলদাস দে।

এঁদের সঙ্গে ঐচ্ছিক বিষয়গুলোর পঠন-পাঠনে সহায়তার জন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস এবং সংস্কৃত বিভাগের নিম্নলিখিত অধ্যাপকবৃন্দ অতিথি অধ্যাপক রূপে যোগ দেন ঃ

ইতিহাস বিভাগের চারজন প্রথিতযশা অধ্যাপক
বাবু সুরেন্দ্রনাথ মজুমদার
বাবু রাধাগোবিন্দ বসাক
Mr. R. Kimura
Mr. J. Masud

এছাড়া প্রফেসর ভাণ্ডারকর তো ছিলেনই। আর সংস্কৃত বিভাগের বাবু নিরঞ্জন প্রসাদ চক্রবর্ত্তী।

১৯২০ সালে সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণের অকাল প্রয়াণে পালি বিভাগে আকস্মিক এক শূন্যতার সৃষ্টি হয়। অতঃপর ডঃ বড়ুয়ার ওপর বিভাগের দায়িত্ব ন্যস্ত হয়। ১৯২৫ সালে 'Executive Committee' - এর সুপারিশে পালি বিভাগে 'Professor' পদ সৃষ্টি হয় এবং সেই পদ অলংকৃত করেন ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া[১২] — প্রথম এশীয় যিনি লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Doctorate of Literature' উপাধি অর্জন করেন। ১৯২৫ থেকে ১৯৪৮ ছিল পালি বিভাগের এক গৌরবময় অধ্যায়। নতুন নতুন অধ্যাপক নিয়োগ এবং

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস, সংস্কৃত, তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের প্রখ্যাত অধ্যাপকগণের সক্রিয় সহযোগিতায় বিভাগটি সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর হয়।

১৯৩৬ সালে ডঃ বড়ুয়া পাঠ্যসূচীর পুণর্মূল্যায়ণ করেন। তৎকালীন পাঠ্যসূচীর পরিমার্জন ও পরিবর্দ্ধনের পর স্নাতকোত্তর স্তরে (M. A.) চারটির পরিবর্তে প্রতিটি বিভাগে তিনটি করে পত্র নিয়ে পাঁচটি ঐচ্ছিক বিভাগ খোলা হয়। নতুন যে বিভাগটির সূচনা হয় তার বিষয়বস্তু ছিল বৌদ্ধ শিল্প ও মূর্তিতত্ত্ব (Buddhist Art & Iconography)। অপরপক্ষে চারটি অবশ্যপাঠ্য সাধারণ পত্রের (Compulsory paper) পরিবর্তে পাঁচটি পত্র আবশ্যিক করা হয়। ১৯৩৮-৩৯ এর শিক্ষাবর্ষে দেখা যাচ্ছে এই বিভাগটির পঠন-পাঠনের জন্য প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের Dr. Stella Kramrich এবং জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় মহাশয় অতিথি অধ্যাপক (Guest Lecturer) রূপে যোগ দিয়েছেন।

১৯৩৯ সালে স্নাতকোত্তর স্তরে পরীক্ষার জন্য যে সংশোধিত পাঠ্যসূচীটি আমরা পাই, সেটি নিম্নরূপঃ-

প্রথম পত্র

বৌদ্ধসূত্র সমূহের (পালি এবং সংস্কৃত) টীকা ভাষ্য ব্যতিরেকে নির্বাচিত অংশ।

দ্বিতীয়পত্র

বিনয় এবং ধর্মীয় ইতিহাসাশ্রয়ী গ্রন্থসমূহের নির্বাচিত অংশ।

তৃতীয় পত্র

'পালি দার্শনিক গ্রন্থাবলীর নির্বাচিত অংশ (পালি এবং সংস্কৃত)

চতুর্থপত্র

ভাষা এবং সাহিত্য (ব্যাকরণ, ভাষাতত্ত্ব এবং সাহিত্যের ইতিহাস)

পঞ্চম পত্র

মূল গ্রন্থসমূহের বিশেষ সাক্ষ্য প্রমাণ সহ ইতিহাস এবং ভূগোল

বিভাগ - ক (সাহিত্য)

ষষ্ঠপত্র

নির্বাচিত জাতক এবং অবদান সমূহ এবং লোকসাহিত্যের নির্বাচিত গ্রন্থাবলী

সপ্তম পত্র

নির্বাচিত পদ্যাবলী এবং ত্রিপিটকেতর গ্রন্থসমূহের নির্বাচিত গদ্য এবং পদ্য

অষ্টম পত্র

সাদৃশ্যমূলক ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা এবং প্রবন্ধ।

বিভাগ - খ (দর্শন এবং ধর্ম)

ষষ্ঠপত্র

পালি সাহিত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক গ্রন্থাবলী

সপ্তম পত্র

বৌদ্ধসংস্কৃত সাহিত্যের বিশিষ্ট দার্শনিক গ্রন্থ সমূহ এবং অন্যান্য সংস্কৃত গ্রন্থরাজি যেখানে বৌদ্ধ দর্শন আলোচিত হয়েছে।

অষ্টম পত্র

ভারতীয় দর্শনের তুলনামূলক অধ্যয়ন এবং প্রবন্ধ।

বিভাগ - গ (লিপিতত্ত্ব এবং ইতিহাস)

ষষ্ঠ পত্র

বৌদ্ধ ইতিহাসাশ্রিত বিশেষ গ্রন্থাবলী, প্রত্নতাত্ত্বিক প্রতিবেদনসমূহ, বৌদ্ধ পরিব্রাজকগণের ভ্রমণ বৃত্তান্তে প্রাপ্ত তথ্যাবলী।

সপ্তম পত্র

নির্বাচিত প্রাকৃত প্রত্নলেখ

অষ্টম পত্র

নির্বাচিত সংস্কৃত প্রত্নলেখ এবং প্রবন্ধ

বিভাগ - ঘ (মহাযান সাহিত্য এবং দর্শন)

ষষ্ঠপত্র

নির্বাচিত সংস্কৃত সূত্রাবলী এবং কাব্যসাহিত্য

সপ্তম পত্র

উল্লেখযোগ্য দার্শনিক এবং তান্ত্রিক গ্রন্থাবলী

অষ্টম পত্র

বর্হিভারতের বৌদ্ধধর্ম এবং প্রবন্ধ।

বিভাগ - ঙ (শিল্প এবং মূর্তিতত্ত্ব)

ষষ্ঠ পত্র

স্থাপত্য-ভাস্কর্য এবং চিত্রশিল্প বিষয়ক নির্বাচিত বৌদ্ধ এবং অন্যান্য ভারতীয় গ্রন্থাবলী

সপ্তম পত্র

নির্বাচিত বৌদ্ধ সৌধ, নক্সা, মূর্তি, প্রাচীর চিত্র(Frescoes)

অষ্টম পত্র

ভারত ও বর্হির্বিশ্বে বৌদ্ধ শিল্পের উৎস ও বিবর্তন এবং প্রবন্ধ

১৯৫২ - ৫৩ সাল নাগাদ আবার নলিনাক্ষ দত্ত বিষয়সূচী পরিবর্ত্তনের জন্য উদ্যোগী হন এবং এই পরিবর্তনের সময় উত্তর এশিয়া, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া এবং শ্রীলংকায় বৌদ্ধ ভাবধারাশ্রিত ভারতীয় সংস্কৃতির বিস্তার সংক্রান্ত বিষয়ের ওপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয় এবং বিভাগ - 'ঘ'এ 'এশিয়-বৌদ্ধধর্ম' শিরোনামে পূর্বোক্ত বিষয়গুলি অন্তর্ভূক্ত করা হয়। ১৯৫৫ সালে স্নাতকোত্তর স্তরে পরীক্ষার্থীগণের অধীত বিষয়সমূহ ছিল[১৩] ঃ

প্রথম পত্র

নির্বাচিত পালি ত্রিপিটকের গ্রন্থসমূহ (সুত্ত এবং বিনয়)

দ্বিতীয় পত্র

নির্বাচিত পালি অভিধম্ম গ্রন্থরাজি এবং বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থাবলী ও দর্শন

তৃতীয় পত্র

নির্বাচিত পরবর্ত্তী পালি এবং বৌদ্ধসংস্কৃত গ্রন্থাবলী এবং বৌদ্ধসাহিত্যের ইতিহাস

চতুর্থ পত্র

মূল পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণের নির্বাচিত অংশ এবং ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পালি ব্যাকরণ

পঞ্চম পত্র

রাজনৈতিক ইতিহাস, ভৌগলিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস

বিভাগ - ক (প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য এবং দর্শন)

ষষ্ঠ পত্র — বিশিষ্ট ত্রিপিটক এবং ত্রিপিটকেতর গ্রন্থ সমূহ

সপ্তম পত্র — উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহ

অষ্টম পত্র — সদৃশ ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক আলোচনা এবং প্রবন্ধ

বিভাগ - খ

মহাযান সাহিত্য এবং দর্শন (বাংলা এবং উড়িষ্যায় বিস্তৃত বৌদ্ধধর্ম সহ)

ষষ্ঠপত্র — নির্বাচিত মহাযান এবং তান্ত্রিক গ্রন্থসমূহ

সপ্তম পত্র — নির্বাচিত মাধ্যমিক, যোগাচারা এবং বৌদ্ধধর্মাশ্রিত আদি বাংলায় রচিত গ্রন্থসমূহ।

অষ্টম পত্র — বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য এবং বেদান্ত দর্শন ও সদৃশ সাহিত্যগুলোর তুলনামূলক আলোচনা এবং প্রবন্ধ

বিভাগ - গ (লিপিতত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব , শিল্প ও প্রত্নতত্ত্ব)

ষষ্ঠপত্র — নির্বাচিত প্রাকৃত এবং সংস্কৃত শিলালেখ এবং তার লিপিতত্ত্ব

সপ্তম পত্র — বৌদ্ধ শিল্প এবং মূর্তিতত্ত্ব

অষ্টম পত্র — বিশিষ্ট বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যাবলী, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যসমূহ এবং প্রাচীনভারতীয় ভূগোল

বিভাগ - ঘ (এশীয় বৌদ্ধধর্ম)

ষষ্ঠপত্র — ভারত এবং বহির্ভারতে প্রাপ্ত বৌদ্ধসাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন

সপ্তম পত্র — মধ্যএশিয়া, চীন, জাপান, তিব্বত, ইন্দোচীন ও ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধ এবং সমজাতীয় সংস্কৃতি।

অষ্টম পত্র — বর্মা (মায়ানমার) শ্যাম এবং শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধ ও সমজাতীয় সংস্কৃতি এবং প্রবন্ধ

পরবর্ত্তী পাঠ্যসূচী পরিবর্তনটি আমরা লক্ষ্য করি ১৯৮৮ - ৯০ সালে ডঃ দীপক কুমার বড়ুয়া মহাশয়ের আমলে। সেখানে আশা প্রকাশ করা হয়েছে যে পালি শিক্ষার্থীগণ বৌদ্ধ ধর্ম, দর্শন বা সাধারণ বিষয়াবলম্বী পালি গ্রন্থ যেগুলি সিংহলী, শ্যাম বা বর্মী লিপিতে লিখিত সেগুলো পাঠেও যথেষ্ট আগ্রহী ও যত্নশীল হবেন।[১৪] এখানে সাধারণ বা আবশ্যিক পাঠ্য প্রথম পাঁচটি পত্রে খুব বেশী পরিবর্তন হয় নি।

প্রথম পত্র

পালি ত্রিপিটকের নির্বাচিত গ্রন্থ সমূহ (সুত্ত এবং বিনয়)

দ্বিতীয় পত্র

পালি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতে বিরচিত নির্বাচিত গ্রন্থসমূহ (অভিধর্ম, ত্রিপিটক এবং ত্রিপিটকেতর বা ধর্মীয় বিষয় সংক্রান্ত অংশসমূহ এবং অনুশাসন ব্যতিরেকে রচিত অংশসমূহ।)

তৃতীয় পত্র

পিটকোত্তর যুগে রচিত পালি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত গ্রন্থসমূহ, এবং বৌদ্ধসাহিত্যের ইতিহাস।

চতুর্থ পত্র

মূল পালি, সংস্কৃত এবং প্রাকৃত ব্যাকরণের অংশবিশেষ এবং ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পালি ব্যাকরণ।

পঞ্চম পত্র

প্রথম ভাগ — পালি, সংস্কৃত ও প্রাকৃত ব্যাকরণ

দ্বিতীয় ভাগ — ঐতিহাসিক ও তুলনামূলক পালি ব্যাকরণ

মূলগ্রন্থের সাক্ষ্য সহ ইতিহাস

প্রথম ভাগ— রাজনৈতিক ইতিহাস

দ্বিতীয় ভাগ— ধর্মীয় ইতিহাস

বিভাগ - ক

ষষ্ঠ পত্র ঃ আদি বৌদ্ধসাহিত্য এবং দর্শন

সপ্তম পত্র ঃ উল্লেখযোগ্য বৌদ্ধ দার্শনিক গ্রন্থসমূহ

অষ্টম পত্র ঃ সমজাতীয় ভারতীয় সাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন

বিভাগ - খ

মহাযান বৌদ্ধ সাহিত্য ও দর্শন (বাংলা এবং উড়িষ্যায় প্রচারিত বৌদ্ধধর্মসহ)

ষষ্ঠ পত্র ঃ নির্বাচিত মহাযান এবং তন্ত্রযান গ্রন্থসমূহ

সপ্তম পত্র ঃ নির্বাচিত মাধ্যমিক, যোগাচারা এবং বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক আদি বাংলা গ্রন্থসমূহ

অষ্টম পত্র ঃ বৌদ্ধ, জৈন, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি সমজাতীয় ধর্মীয় ও দার্শনিক প্রস্থানের তুলনামূলক অধ্যয়ন।

বিভাগ - গ

(লিপি উৎকীরণ তত্ত্ব, মূর্তিতত্ত্ব, শিল্প এবং প্রত্নতত্ত্ব)

ষষ্ঠ পত্র ঃ নির্বাচিত প্রাকৃত এবং সংস্কৃত শিলালেখমালা এবং হস্তলিপিতত্ত্ব

সপ্তম পত্র ঃ বৌদ্ধ শিল্প ও মূর্তিতত্ত্ব

অষ্টম পত্র ঃ বিশিষ্ট বৌদ্ধ ঐতিহাসিক তথ্যাবলী, প্রত্নতাত্ত্বিক তথ্যপঞ্জী এবং প্রাচীন ভারতীয় ভূতত্ত্ব

বিভাগ - ঘ (এশিয়-বৌদ্ধধর্ম)

ষষ্ঠ পত্র ঃ ভারত ও বর্হিভারতস্থ বৌদ্ধসাহিত্যের তুলনামূলক অধ্যয়ন।

সপ্তম পত্র ঃ তিব্বত, মধ্যএশিয়া, চীন, জাপান, ইন্দো-চীন এবং ইন্দোনেশিয়ায় বৌদ্ধ ও সমগোত্রীয় সংস্কৃতি

অষ্টম পত্র ঃ বার্মা (মায়ানমার), শ্যাম এবং শ্রীলঙ্কার বৌদ্ধ ও সমগোত্রীয় সংস্কৃতি এবং প্রবন্ধ।

এই পরিবর্তিত পাঠ্যসূচীটি মোটামুটি প্রায় দুই দশকের ওপর অপরিবর্তিত থাকে এবং প্রস্তাবিত পাঠক্রমটি[১৫] যেটি পরবর্ত্তী শিক্ষাবর্ষ (২০০৬-২০০৭) থেকে চালু হতে পারে তাতেও মূলগত কোন পরিবর্তন হয় নি। এখানে শিক্ষার্থীদের পালি গ্রন্থগুলি রোমান এবং দেবনাগরী লিপিতে পাঠ করার ওপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে।

একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল নয়ের দশকের দ্বিতীয়ার্দ্ধ থেকেই বাংলা মাধ্যমে উত্তরপত্র প্রস্তুতির আবেদন আসতে থাকে এবং ১৯৯৮ এ প্রথম সেই উদ্দেশ্য ফলপ্রসূ হয়। পরবর্ত্তী পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের মধ্যে এই প্রবণতাই বেশী। সুতরাং চাহিদা অনুসারে এখন বাংলায় উচ্চমানের বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্যাশ্রিত গ্রন্থ অপ্রতুল হলেও দুষ্প্রাপ্য নয়। সেইরকম পাঠ্যসূচীতে সহায়ক

গ্রন্থরূপেও এই গ্রন্থগুলি স্থান পেয়েছে। যার ফলে পাঠ্যক্রমের পত্রগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বিশ্লেষণে কিছু পরিবর্তন আমরা পাই। যেমন তৃতীয় পত্রের ১৯৮৮-৯০ এর পাঠক্রমটি ছিল—

পিটকোত্তর যুগে রচিত পালি এবং বৌদ্ধ সংস্কৃতের নির্বাচিত গ্রন্থসমূহ এবং বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাস। সর্বোচ্চমান — ১০০। যার প্রথম ভাগে (First half) ৫০ নম্বর এবং দ্বিতীয়ভাগে (Second half) ৫০ নম্বর।

প্রথম পর্ব — পূর্ণমান ৫০

মিলিন্দ পঞ্হ ঃ (সম্পাদনা ট্রেক্‌নার) পৃষ্ঠা ৯০ - ১২৩

সাসনবংস ঃ (পালি টেক্সট সোসাইটি) পৃঃ ৫৪ - ১৬৪

(অপরান্ত দেশ সংক্রান্ত অংশ)

ললিতবিস্তর ঃ প্রথম এবং তৃতীয় অধ্যায়

দিব্যাবদান ঃ সম্পাদনা ই. বি. কাওয়েল শ্রোণকোটিকর্ণাবদান এবং অশোকাবদান

দ্বিতীয় পর্ব - পূর্ণমান - ৫০

উইন্টার নিত্‌জ ঃ হিস্ট্রী অব্ ইণ্ডিয়ান লিটারেচার দ্বিতীয়খণ্ড (বৌদ্ধসাহিত্য সংক্রান্ত বিষয়)

গাইগার ঃ পালি লিটরেচার অ্যাণ্ড ল্যাঙ্গুয়েজ (অনুবাদ বি. কে. ঘোষ, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি পাবলিকেশন), (পালি সাহিত্য সংক্রান্ত অধ্যায়)

সহায়ক পাঠ্য ঃ

বি. সি. লাহা ঃ হিস্ট্রী অব্ পালি লিটারেচার, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ডদ্বয়

এ. সি. ব্যানার্জ্জী ঃ সর্বাস্তিবাদ লিটারেচার

ম্যাবেল বোড়ে ঃ পালি লিটারেচার ইন্ বার্মা

জি. পি. মললসেকেরের ঃ পালি লিটারেচার অব্ সীলন্

বীল ঃ ক্যাটেনা অব্ বুদ্ধিস্ট স্ক্রিপচারস্

আনেস্কি ঃ ফাইভ আগমস

হর্নেল ঃ ম্যানাস্ক্রিপট্ রিমেইন্স অব্ বুদ্ধিস্ট লিটারেচার ফাউণ্ড ইন্ ইষ্টার্ন টার্কিস্তান

প্রস্তাবিত পাঠ্যসূচীটি[১৬] (২০০৬-২০০৭) হল -পিটকোত্তর পালি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের নির্বাচিত গ্রন্থসমূহ এবং বৌদ্ধসাহিত্যের ইতিহাস।

প্রথম পর্ব — পূর্ণমান ৫০

মিলিন্দ পঞ্হ ঃ (পি. টি. এস্) পৃষ্ঠা ৯০ - ১২৩

সাসনবংস ঃ (পি. টি. এস্) (সুবর্ণ ভূমির বিবরণ সম্বলিত অধ্যায়)

ললিতবিস্তর ঃ দশম অধ্যায়

দিব্যাবদান ঃ অশোকাবদান

বৌদ্ধসাহিত্যের ইতিহাস - থেরবাদ সাহিত্য এবং মহাযান সাহিত্য

সহায়ক পাঠ্য (পূর্ববর্তী পাঠ্যসূচীর সাতটি গ্রন্থ অপরিবর্তিত)

স্যাক্রেট বুক অব্ দি ইস্ট ঃ কোয়েশ্চেন অব্ কিং মিলিন্দ, প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড

মণিকুন্তলা হালদার ঃ হিস্ট্রী অব্ বুদ্ধিজিম বেস্‌ড অন্ সাসনবংস

বিজয়া গোস্বামী ঃ ললিতবিস্তর (এশিয়াটিক্ সোসাইটি পাবলিকেশন)

জয়দেব গাঙ্গুলী শাস্ত্রী ঃ ললিতবিস্তর (বঙ্গানুবাদ)

ই. বি. কাওয়েল ঃ দিব্যাবদান

এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে

বিশ্বনাথ বন্দোপাধ্যায় ঃ পালি ও প্রাকৃতসাহিত্যের ইতিহাস

বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী ঃ বৌদ্ধসাহিত্য

পালি বিভাগের এই পরিক্রমার পথটি (১৯০০ - ১৯৭৫) আমরা তিনটি যুগে ভাগ করতে পারি।[১৭] ১৯২৫ সালে ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়ার 'Professor' পদে যোগদান থেকে ১৯৪৮ সালে তাঁর অকাল প্রয়াণ পর্যন্ত সময়টি তাঁর নামেই নামাঙ্কিত করলে অত্যুক্তি হয় না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ তাঁর সুযোগ্য তত্ত্বাবধানে বিভাগের প্রয়োজন অনুযায়ী শিক্ষক নিয়োগের ফলে পঠন-পাঠন-গবেষণা প্রভৃতি বিষয়ে বিভাগটি অনতিবিলম্বে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গৌরবরূপে স্বীকৃত হয়। লক্ষ্যণীয় যে চার-পাঁচ বছরের ব্যবধানে পাঠ্যসূচী পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে পূর্ণ, আংশিক বা সাম্মানিক শিক্ষক পদ তৈরী করে অভিজ্ঞ অধ্যাপক নিয়োগের মাধ্যমে বিভাগীয় শিক্ষার মান অক্ষুণ্ণ রাখার প্রয়াস অব্যাহত ছিল। এই পর্যায়ে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ থেকে ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৯৩১), ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী (১৯৩১-৩২), ডঃ বিনয়চন্দ্র সেন (১৯৩২-৩৩) এবং সংস্কৃত বিভাগ থেকে ডঃ সাতকড়ি মুখার্জ্জী (১৯৩১-৩২) যোগদান করেন। ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাকও ১৯৩৫-৪১ পর্যন্ত এই বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। তাঁর স্বেচ্ছা অবসরের পর প্রেসিডেন্সী কলেজের ডঃ সদানন্দ ভাদুড়ী (১৯৪৪) সাম্মানিক অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র মহাশয় ১৯৩৫ সালে বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তর কলা ও বিজ্ঞান পরিষদের কর্মসচিবরূপে (Secretary to the Councils of Post-Graduate Teaching in Arts and Science) যোগদান করায় শূন্যস্থান সৃষ্টি হয়। এই বিভাগের গবেষক ছাত্র দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া ১৯৩৭ সালে সহকারী অধ্যাপকরূপে (Assistant Lecturer) যোগদান করেন। এই সময় আসামী ভাষার অধ্যাপক শ্রী বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া মহাশয় আংশিক অধ্যাপকরূপে দু'বছর (১৯৩৭-৩৮ / ১৯৩৮-৩৯) পালি বিভাগে অধ্যাপনা করেন। এছাড়া এই বিভাগের গবেষক নলিনীনাথ দাশগুপ্ত (১৯৩৭) এবং তিব্বত ও চৈনিক ভাষা বিভাগের সহকারী গবেষক (Research Assistant) শ্রী অনুকূলচন্দ্র ব্যানার্জ্জী

(১৯৩৫) সহকারী অধ্যাপকরূপে বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে যে Dr. Stella Kramrich এবং জিতেন্দ্রনাথ বন্দোপাধ্যায় অতিথি অধ্যাপক (Guest Lecturer) রূপে ১৯৩৮-৩৯ শিক্ষাবর্ষে এই বিভাগে অধ্যাপনা করেন। ১৯৩৯-৪০ শিক্ষাবর্ষে আমরা নিম্নলিখিত অধ্যাপক সূচী পাই ঃ

বেণীমাধব বড়ুয়া, এম. এ., ডি. লিট্ (লণ্ডন)
ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত, এম. এ., পি. এইচ্. ডি., ডি. লিট্ (লণ্ডন)
মিঃ গোকুলদাস দে, এম. এ.
মিঃ দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, এম. এ.
মিঃ শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, এম. এ.
ডঃ প্রবোধচন্দ্র বাগচী, এম. এ., ডি. লিট্ (প্যারিস)
মিঃ বিরিঞ্চি কুমার বড়ুয়া, এম. এ.
ডঃ সাতকড়ি মুখার্জ্জী, এম. এ., পি. এইচ্. ডি.
ডঃ অমরেশ্বর ঠাকুর, এম. এ., পি. এইচ্. ডি.
Dr. Stella Kramrich, পি. এইচ্. ডি.
প্রঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জ্জী, এম. এ., ডি. লিট্ (লণ্ডন)
প্রঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী, এম. এ., পি. এইচ্. ডি.
মিঃ জিতেন্দ্রনাথ ব্যানার্জ্জী, এম. এ.
ডঃ বিনয় চন্দ্র সেন, এম. এ., পি. এইচ্. ডি. (লণ্ডন)
ডঃ রাধাগোবিন্দ বসাক, এম. এ., পি. এইচ্. ডি.

সুকুমার সেন ও মনমোহন ঘোষ, সুনীতি কুমার চ্যাটার্জ্জীর অনুপস্থিতিতে পালি বিভাগে অধ্যাপনা করতেন। উল্লেখ্য যে পালি বিভাগের অধ্যাপকগণও অন্যান্য বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ডঃ বড়ুয়া ও ডঃ দত্ত প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের সঙ্গে (১৯১৯) যুক্ত ছিলেন। ডঃ বড়ুয়া সংস্কৃত বিভাগের সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন। পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে পালি বিভাগে ১৯৪৪-৪৬ সালে আবার সাম্মানিক অধ্যাপক পদে আংশিক সময়ের জন্য অধ্যাপক নিয়োগ করা হয়। এই নিয়োগের ক্ষেত্রে অর্থাৎ পূর্ণ বা আংশিক যে কোন ধরণের পদ পূরণের ক্ষেত্রে সর্বদা 'নির্বাচক সমিতি'র (Selection Committee) মাধ্যমে নিয়োগ করা হত। ১৯৪৪ সালে নিযুক্ত সাম্মানিক আংশিক অধ্যাপকগণ (Honorary Part-time Lecturers) হলেন —

ডঃ সদানন্দ ভাদুড়ি, এম. এ., পি. এইচ্. ডি.
শ্রী রামপ্রসাদ ভাদুড়ি, এম. এ., পি. আর. এস
শ্রী অনুকূলচন্দ্র ব্যানার্জ্জী, এম. এ., বি. এল.
শ্রী শ্যামসুন্দর ব্যানার্জ্জী, এম. এ.

কর্মরত অবস্থায় ১৯৪৮-এর ২৩শে মার্চ প্রঃ বড়ুয়ার অকাল প্রয়াণের পর বিভাগের দায়িত্বভার ন্যস্ত হয় মহাযান তত্ত্বে সুপণ্ডিত অধ্যাপক ডঃ নলিনাক্ষ দত্তের ওপর। অবশ্য "University Professor" পদটি শূন্যই থেকে যায়। ১৯৪৯ সালে উত্তরাধিকার সূত্রেই যেন এই শিরোপাটি ডঃ দত্তকে প্রদান করা হয়। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুই গর্ব, এশিয়ার প্রথম ডি. লিট্ (লণ্ডন) ডঃ বড়ুয়া এবং অপর ডি. লিট্. (লণ্ডন) ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত ছিলেন এক জ্ঞানৈষণার অন্বেষী। ডঃ দত্ত ১৯৪৮ থেকে ১৯৫৮ সালে তাঁর অবসর গ্রহণের পূর্ব পর্যন্ত বিভাগীয় প্রধান পদে আসীন ছিলেন। ডঃ দত্তের সময়ও পালি বিভাগে কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ নিয়োগ হয়। সর্বাগ্রে উল্লেখ্য ডঃ অনুকূল চন্দ্র ব্যানার্জ্জী। ১৯৪৪ সালে তিনি সাম্মানিক আংশিক সময়ের অধ্যাপক রূপে এই বিভাগে যোগ দিয়েছিলেন এবং ১৯৪৮ সালে তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। দু'বছর পর ১৯৫০ সালে প্রেসিডেন্সী কলেজের অধ্যাপক শ্রী দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য সাম্মানিক আংশিক অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। গবেষণারত শ্রী প্রভাসচন্দ্র মজুমদার এবং শ্রী সুকুমার সেনগুপ্ত সময় সময় অধ্যাপনার কাজও করতেন। ১৯৫১-৫২ শিক্ষাবর্ষে উভয়েই সাম্মানিক আংশিক অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ১৯৫৫-৫৬ শিক্ষাবর্ষে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ডঃ কল্যান কুমার গাঙ্গুলী সহায়ক অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। ১৯৫৭ সালে ডঃ হেরম্বনাথ চ্যাটার্জ্জী সাম্মানিক আংশিক অধ্যাপক রূপে যোগ দেন। এই সময় অধ্যাপক অনুকূলচন্দ্র ব্যানার্জ্জী "Ghosh Travelling Fellowship" নিয়ে বার্মায় (মায়ানমার) 'অভিধর্ম' চর্চায় ব্রতী হন। প্রত্যাবর্তনের পর 'Reader' পদে আসীন হন। পালি বিভাগে ১৯৫৭ সালেই এই পদটি সৃষ্টি হয়। এই পর্বে পাঠ্যসূচীর পুনর্মূল্যায়ণ সম্পর্কে পূর্বেই আলোচনা করা হয়েছে।

ডঃ দত্তের অবসরের পর ১৯৫৮ সালে বিভাগীয় প্রধানরূপে ডঃ অনুকুল চন্দ্র ব্যানার্জ্জী দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। ১৯৫৮-৫৯ সালে যেখানে মাত্র ৭ জন শিক্ষার্থী স্নাতকোত্তর শ্রেণীতে ভর্ত্তি হন ১৯৭৫-৭৬ সালে সেই সংখ্যা তিনগুণ বৃদ্ধি পেয়ে হয় ২৩। ১৯৫৮ সালের নভেম্বর থেকে ১৯৭৫-এর ডিসেম্বর পর্যন্ত ডঃ ব্যানার্জ্জীর তত্ত্বাবধানে এই বিভাগের ছাত্রসংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পায়।পূর্বতন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ অবশ্য সংখ্যাতত্ত্বের প্রতি দৃকপাত মাত্র না করে পঠন-পাঠন শিক্ষণ বা গবেষণার গুণগত উৎকর্ষতার প্রতি অধিক গুরুত্ব দিতেন। নলিনাক্ষ দত্ত মহাশয়ের সময় অধ্যাপকগণের যে তালিকা আমরা পাই সেখানে স্বল্পবিস্তর পরিবর্তন হয়েছিল কিন্তু ডঃ ব্যানার্জ্জীর সময় এই বিন্যাসটি ছিল বেশ চমকপ্রদ। ১৯৬০ সালে ডঃ অনুকূলচন্দ্র ব্যানার্জ্জী 'Professor' পদে যোগ দিলে বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ বিশ্বনাথ ব্যানার্জ্জী 'Reader' পদটি অলংকৃত করেন। কিন্তু মাত্র দু'বছরের মধ্যে তিনি সংস্কৃত কলেজের (কলকাতা) 'Professor' পদে যোগদান করলে 'Reader' পদটি শূন্য হয়। ১৯৬৫ সালে শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া মহাশয়

ঐ পদে আসীন হন। মহারাজা মণীন্দ্রচন্দ্র কলেজের পালির 'Professor' ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত ১৯৬৮ সালে পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক রূপে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন। এই সময় সাম্মানিক আংশিক অধ্যাপক রূপে পালি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত হন যথাক্রমে ত্রিপিটক বিশারদ ও নালন্দা বিদ্যাভবনের অধ্যক্ষ ভদন্ত ধর্মাধার মহাস্থবির (১৯৬৬)। ১৯৬৮ সালে রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগার এবং UNESCO -এর ভারপ্রাপ্ত আধিকারিক এবং দর্শন ও সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক ডঃ দীপক কুমার বড়ুয়া পালি বিভাগে অধ্যাপকরূপে যোগদান করেন। দেশ-বিদেশের বিদগ্ধ মহলে সমাদৃত এই অধ্যাপক দীর্ঘদিন এই বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ডঃ কানাইলাল হাজরা ১৯৬৮ সালে পালি বিভাগে যোগদান করেন এবং 'Pool Officer' রূপে ১৯৭১ পর্যন্ত অধ্যাপনা করেন। ১৯৭১ সালে ডঃ হাজরা পূর্ণ সময়ের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। ১৯৭০ সালে শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া অবসর গ্রহণ করলে 'Reader' পদটি শূন্য হয়। ১৯৭১ সালে শ্রী প্রভাসচন্দ্র মজুমদার ঐ পদ অলংকৃত করেন। কিন্তু কলা ও বিজ্ঞান বিভাগের সচিব রূপে কর্মব্যস্ততা হেতু প্রভাসবাবু বিভাগীয় শিক্ষকতায় আর যোগ দিতে পারেন নি। আমৃত্যু (নভেম্বর ১৯৭৪) প্রভাসবাবু সচিবের দায়িত্বই পালন করেন। ডঃ আশা দাশ (১৯৭১), ডঃ শ্যামসুন্দর ব্যানার্জ্জী সাম্মানিক আংশিক অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন। শ্যামসুন্দর ব্যানার্জ্জী ১৯৪৬ সাল থেকে সুদীর্ঘকাল এই বিভাগে সাম্মানিক আংশিক অধ্যাপক রূপে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭০ সালে বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালন সভার (Syndicate) অনুমোদিত পারিশ্রমিকের বিনিময়ে সৃষ্ট আংশিক অধ্যাপক (Parttime Lecturer) পদে শ্যামসুন্দর ব্যানার্জ্জী মহাশয়কে নিয়োগপত্র দেওয়া হয়। এছাড়া তুলনামূলক ভাষাতত্ত্ব বিভাগের 'Reader' ডঃ চিন্ময় দত্ত (১৯৬৩) এবং হিন্দী বিভাগের 'Reader' ডঃ প্রবোধ নারায়ণ সিং (১৯৭০) পালি বিভাগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। ১৯৭৪ সালে (ডিসেম্বর) ডঃ হৃষীকেশ গুহ সাম্মানিক আংশিক সময়ের অধ্যাপক রূপে যোগদান করেন।

অধ্যাপক ব্যানার্জীর অভিভাবকত্বে বিভিন্ন সময় পালি বিভাগে নিম্নলিখিত অধ্যাপকগণ অধ্যাপনা করেন —

শ্রী প্রভাসচন্দ্র মজুমদার — এম. এ., সুত্ত বিশারদ

ডঃ বিশ্বনাথ ব্যানার্জী — এম.এ., ডি.ফিল (মিউনিখ)

শ্রী দ্বিজেন্দ্রলাল বড়ুয়া, — এম.এ.

ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত — এম.এ., সুত্ত বিশারদ

ডঃ দীপক কুমার বড়ুয়া — এম.এ., ডিপ্লোমা (লাইব্রেরী), পি.আর.এস., পি.এইচ্.ডি

ডঃ কানাইলাল হাজরা — এম.এ., এল্.এল্.বি., ডিপ্লোমা (ল্যাঙ্গুয়েজ), পি.এইচ্.ডি (শ্রীলঙ্কা)

ভদন্ত ধর্মাধার মহাস্থবির — ত্রিপিটক বিশারদ

ডঃ আশা দাশ — এম.এ., পি.এইচ্.ডি

ডঃ শ্যামসুন্দর ব্যানার্জী — এম.এ., ডি.লিট্ (লণ্ডন)

ডঃ চিন্ময় দত্ত

ডঃ প্রবোধ নারায়ণ সিং

ডঃ হৃষীকেশ গুহ — এম.এ., পি.এইচ্.ডি

ডঃ সুনীতি কুমার চ্যাটার্জী — এম.এ., ডি.লিট্ (লণ্ডন)

ডঃ সুকুমার সেন — এম.এ., পি.এইচ্.ডি

এছাড়া স্নাতক-পূর্ব স্তরে পালি ও বৌদ্ধ সাহিত্যচর্চার জন্য কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় নিজস্ব পরিমণ্ডলে উদ্যোগ নিয়েছিল এবং ১৯১২ থেকে ১৯৩২ সাল পর্যন্ত এই ব্যবস্থা চালু ছিল। কারণ মাধ্যমিক থেকে স্নাতক শ্রেণী পর্যন্ত (Matriculation to B.A. Honours Stages) তৎকালীন কোন বিদ্যালয় বা মহাবিদ্যালয়ে পালি পঠন-পাঠনের ব্যবস্থা ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ প্রাজ্ঞ ভিক্ষু, 'Bengal Buddhist Association'-এর সহাধ্যক্ষ (Vice-President) সমণ পুণ্ণানন্দের সাহায্য প্রার্থনা করলে তিনি সানন্দে পালির অধ্যাপক(Junior University Lecturer) রূপে স্নাতক পূর্বস্তরে অধ্যাপনার গুরু দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিয়েছিলেন। কিন্তু ছাত্র সংখ্যার আধিক্যবশতঃ তাঁর একার পক্ষে এই দায়িত্বভার পীড়াদায়ক হবে বিবেচনা করে তৎকালীন বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ পালিতে স্নাতক বাবু বেণীমাধব বড়ুয়া মহাশয়কে সহায়ক অধ্যাপক রূপে মনোনীত করেন এবং একাধারে 'ছাত্র-শিক্ষক' রূপে এই 'জ্ঞানতাপস' শিক্ষাদানের গুরুদায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করেন। ১৯১৩ সালের অগাষ্ট মাসে বেণীমাধব বড়ুয়ার পর ১৯১৪ ও ১৯১৬ সালে যথাক্রমে শ্রী মুকুন্দ বিহারী মল্লিক এবং শ্রী মহেন্দ্র কুমার ঘোষ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃক প্রশিক্ষক (Instructors) রূপে নিযুক্ত হন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে বেণীমাধব বড়ুয়া কিন্তু অধ্যাপক রূপে যোগ দিয়েছিলেন। এই পর্যায়ের পঠন-পাঠন প্রশিক্ষণ সুচারু রূপে সম্পাদনের নিমিত্ত একটি নতুন সন্নিযুক্ত স্থায়ী সমিতি (Standing Committee) তৈরী হয়েছিল—যার সদস্যগণ ছিলেন স্যার আশুতোষ মুখার্জী (সভাপতি), মহামহোপাধ্যায় ডঃ সতীশচন্দ্র বিদ্যাভূষণ, ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, শ্রী নলিনাক্ষ দত্ত, সমণ পুণ্ণানন্দ, শ্রী গোকুলদাস দে, ভদন্ত আর সিদ্ধার্থ, শ্রী মুকুন্দ বিহারি মল্লিক এবং শ্রী মহেন্দ্র কুমার ঘোষ।

স্নাতকপূর্ব থেকে স্নাতকশ্রেণী পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে বেতন সংগৃহীত হত ঃ

মাধ্যমিক শ্রেণী (Matriculation Classes)	১ টাকা
মধ্যবর্ত্তী শ্রেণী (Intermediate Classes)	১-৮ টাকা
স্নাতক শ্রেণী [(B.A. Classes (Pass)]	২ টাকা
স্নাতক শ্রেণী - সাম্মানিক [(B.A. Classes (Hons.)]	২-৮ টাকা

১৯৩২ সালেই পালি পঠন-পাঠনের ক্রমবর্ধমান চাহিদার ফলে বিভিন্ন বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয়ে পালি শিক্ষার ব্যবস্থা হয় এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের নিজস্ব পরিকাঠামোয় তা রদ হয়।

১৯১৯ সালের ১০ই মে উচ্চশিক্ষা সংসদের (Board of Higher Studies) এক সভার কার্য বিবরণী (Proceedings) থেকে জানা যায় যে ছাত্রদের থেকে সংগৃহীত বেতন, শংসাপত্র প্রদান বিষয়ে স্নাতকোত্তর স্তরের আচরণবিধিই অনুসৃত হবে এবং স্নাতকোত্তর স্তরের অধ্যাপকগণই ১৯১৯-২০ শিক্ষাবর্ষে এই স্তরে অধ্যাপনা করবেন। সেখানে অধ্যাপকগণের নিম্নরূপ তালিকা পাওয়া যায় —

ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া, বাবু শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র, বাবু নলিনাক্ষ দত্ত, সমণ পুন্নানন্দ, বাবু গোকুল দাস দে, স্বামী আর. সিদ্ধার্থ। এছাড়া ১০০ টাকা পারিশ্রমিক ধার্য হয় নিম্নলিখিত নবনিযুক্ত প্রশিক্ষকদ্বয়ের জন্য — বাবু মুকুন্দবিহারী মল্লিক, বাবু মহেন্দ্র কুমার ঘোষ। উপরোক্ত অধ্যাপকবর্গের নিমিত্ত ধার্য পারিশ্রমিক ছিল ৩০০ টাকা।[১৮]

গবেষণা বিভাগ (১৯১৭ - ১৯৭৬ খ্রীঃ)[১৯]

পালি বিভাগে বৌদ্ধসাহিত্য বা অন্যান্য বিষয়ের ওপর মৌলিক গবেষণার কাজ শুরু হয়েছিল অনেক পরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট বরেণ্য অধ্যাপকবৃন্দ তাঁদের ব্যক্তিগত গবেষণা এবং গবেষণা পত্র প্রকাশ করেছিলেন প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের বিভিন্ন নামী পত্র-পত্রিকায়। কিন্তু পালি বিভাগের উদ্যোগে বা অধীনে এই ধরণের কাজ খুব বেশী হয় নি। অন্ততঃ শতবর্ষের এই যাত্রাপথে আমরা যদি অন্যান্য বিভাগগুলির ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে তুলনা করি। যদিও বিভাগীয় অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর 'A Short History of the Pali Studies in the University of Calcutta (1880 - 1983)' শীর্ষক প্রবন্ধে বিভিন্ন পত্র - পত্রিকায় প্রকাশিত এই বিভাগের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট অধ্যাপক, গবেষক, শিক্ষার্থীগণের গবেষণা পত্র বা প্রবন্ধের তালিকা দিয়ে দাবী করেছিলেন যে "It will be evident from the following list of books that valuable contributions were made by the members of the Department to the enrichment of our knowledge in the field of Buddhism and allied Culture of ancient India and their works certainly reflect on the credit of the Department."[২০] তাঁর প্রদত্ত তালিকাটিতে আমরা ১৯১৭-১৯৭৬ পর্যন্ত বহুচর্চিত যে গ্রন্থ, প্রবন্ধ বা গবেষণা পত্রের বিবরণ পাচ্ছি তা নিম্নরূপ ঃ

ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া ঃ ১) 'A History of the Pre-Buddhistic Indian Philosophy'. লন্ডন ইউনিভার্সিটির 'Doctorate of Literature' এই গবেষণা গ্রন্থটি ১৯২১ সালে কলিকাতা- বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত হয়। তাঁর বিভিন্ন ভিন্নধর্মী পত্রপত্রিকায় প্রকাশিত গবেষণাপত্র ও প্রবন্ধ ব্যতিরেকে কয়েকটি গ্রন্থের নাম উল্লেখ করা হল ঃ- ২) 'The Ajavikas, Gaya and Buddhagaya' (2 Vols), ৩) 'Bharut' (Illustrated monographs in three volumes), ৪) 'Old Brahmi Inscriptions in the Udayagiri and Khandagiri Cave', ৫) 'Asoka and his Inscriptions' (Part I

and II), ৬) 'Inscriptions of Asoka' (Translation and Glossary), ৭) 'Philosophy of Progress', ৮) 'Prolegomena to a History of Buddhist Philosophy'.

এরপর আমরা পাই শ্রী নলিনীনাথ দাশগুপ্তের নাম। ১৯৩৭ সালে ডঃ বড়ুয়ার কাছে গবেষণা নিরত এই গবেষকের বিষয় ছিল "History of Buddhism in Bengal" যা 'বাংলায় বৌদ্ধধর্ম' শিরোনামে ১৯৪৮ সালে প্রকাশিত হয়। নলিনীনাথ দাশগুপ্তের দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য কাজ হল বৌদ্ধধর্মের (আনুমানিক ১০০০ - ১২০০ খ্রীষ্টাব্দ) ওপর আর্. সি.মজুমদারের সম্পাদনায় "The History and Culture of the Indian People" গ্রন্থের পঞ্চম খণ্ডে প্রদত্ত গবেষণাধর্মী প্রবন্ধ।

বেণীমাধব বড়ুয়ার অধীনে দ্বিতীয় উল্লেখযোগ্য গবেষক শ্রী দেব প্রসাদ গুহ (১৯৪৫-৪৮ খ্রীঃ)। তাঁর কাজের ক্ষেত্র ভিন্নধর্মী। পালি ছন্দের ওপর বিভিন্ন গবেষণা পত্র বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। পালিচর্চার ক্ষেত্রে এই দিকটি শুধু সেই সময়ই অধরা ছিল না পরবর্তী ৬০ বছরেও পালি সাহিত্যের এই বিষয়টির ওপর উল্লেখযোগ্য কোন কাজ পাওয়া যায় নি। সুকুমার সেনগুপ্ত মহাশয় তাঁর কাজ সম্পর্কে বলেছেন ঃ "This like his predecessors Arnold and Hopkins, contributing a great deal to the study of Vedic and Epic metres, Prof. D. P. Guha had already made some distinct contribution to our knowledge of Pali Prosody before other scholars entered into this particular branch of Pali learning." ১৯৮৩ সাল পর্যন্ত সুবিখ্যাত 'Indian Culture'-এ তাঁর প্রকাশিত অপর উল্লেখযোগ্য গবেষণাপত্রটি ছিল - "A few knotty points in the Mahavamsa account of the Second Buddhist Council." উল্লেখ্য এই অশীতিপর তরুণ আজও নিরলস সারস্বত সাধনায় ব্রতী।

এই বিভাগের অপর এক প্রথিতযশা অধ্যাপক ছিলেন ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত। তাঁর লণ্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ে 'Doctorate of Literature' এর জন্য কৃত গবেষণা গ্রন্থ 'Some Aspects of the Mahayana Buddhism and its relation to Hinayana" ১৯৩০ সালে প্রকাশিত হয়। মহাযান বৌদ্ধধর্মে তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্যের প্রতিফলন উক্ত গ্রন্থটি ব্যতিরেকে বৌদ্ধধর্মের বিবর্তনের এক কুয়াশাচ্ছন্ন পর্বকে তিনি ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থিত করেছেন দুইখণ্ডে বিভক্ত 'Early History of the spread of Buddhism and Buddhist Schools' গ্রন্থটিতে। এছাড়াও আছে 'Early Monastic Buddhism' এবং 'Three Principal Schools of Buddhism'। তাঁর অনন্য সাধারণ কীর্তিটি হল 'Gilgit Manuscripts' সম্পাদনা। পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রীর সহযোগিতায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত বিভিন্ন খণ্ডে বিন্যস্ত এই পাণ্ডুলিপি বহন করছে কতিপয় গুরুত্বপূর্ণ মহাযান গ্রন্থরাজি এবং মূলসর্বাস্তিবাদি বৌদ্ধ সম্প্রদায়ের বিনয়ের খণ্ডাংশ। বৌদ্ধ সাহিত্যের ইতিহাসকে যা এক নতুন দিকদর্শন দিতে সাহায্য করেছিল।

নলিনাক্ষ দত্তের অধীনে গবেষক ছাত্র শ্রী প্রভাস চন্দ্র মজুমদার (১৯৪৮-৫১) 'মৈত্রেয় ব্যাকরণ' নামক একটি মহাযান বৌদ্ধ গ্রন্থ সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। এটি ছিল তাঁর গবেষণা কার্যের বিষয়। প্রভাসচন্দ্র মহাশয় কাজটিতে মূলতঃ দুটো সূত্র ব্যবহার করেছেন – 'Gilgit Manuscripts' এবং তিব্বতীয় গ্রন্থাবলী।

যাঁর বদান্যতায় স্বল্প আয়াসে এই প্রবন্ধের দুর্মূল্য তথ্যগুলি সংগ্রহ করেছি সেই 'ছাত্রদরদী' অধ্যাপক শ্রী সুকুমার সেনগুপ্তও গবেষক ছাত্ররূপে ডঃ দত্তের অধীনে ব্রতী হয়েছিলেন এক অসাধারণ সংগ্রহ কার্যে। তাঁর বিষয়বস্তু ছিল "Medicine and surgery in Ancient India from the Buddhist and Jain sources'। এই গবেষণাসূত্রেই ১৯৭৫ সালে 'Calcutta Orientalists' পত্রিকায় তাঁর গবেষণা পত্র 'Use of Injections in Ancient India' প্রকাশিত হয়। তাঁর গবেষণা গ্রন্থ (Doctoral Thesis) হল "Buddhism in South-East Asia".

পালি ভাষা এবং সাহিত্যে সুপণ্ডিত অধ্যাপক শৈলেন্দ্রনাথ মিত্র অশোকানুশাসনের ওপর একাধিক গবেষণাপত্র বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় প্রকাশ করেন। উক্ত পত্রগুলি অশোকানুশাসনের কতিপয় তাত্ত্বিক শব্দ (Technical Terms) এবং ব্যাক্যাংশ (Phrase)। এই শব্দগুলি পালি সাহিত্যের সাহায্যে ব্যাখ্যা করে এর ওপর নতুনভাবে গবেষণার জন্য উৎসাহ সৃষ্টি করেন। আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়ার সঙ্গে যৌথ সম্পাদনায় ১৯২১ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত 'প্রাকৃত ধর্মপদ' তাঁর অপর এক অক্ষয় কীর্তি। শৈলেন্দ্রনাথ মিত্রের অন্য উল্লেখযোগ্য কাজ হল ১৯৩৫ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের থেকে সুবিখ্যাত ও জনপ্রিয় পালি ব্যাকরণ 'বালাবতার' - এর প্রকাশ। গ্রন্থটির সম্পাদনা, ইংরাজী ও বাংলা তর্জমা এবং কতিপয় তাত্ত্বিক শব্দের ওপর টিপ্পনীসহ প্রকাশ করেছিলেন।

শ্রী গোকুল দাস দে, জাতক সাহিত্য এবং পালি বিনয়ের ওপর গভীর অনুসন্ধান করেন এবং ১৯৫১ সালে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে জাতকের ওপর "Significance and importance of Jatakas" এবং ১৯৫৩ সালে বিনয়ের ওপর "Democracy in the Early Buddhist Samgha" প্রকাশিত হয়।

শ্রী দ্বিজেন্দ্র লাল বড়ুয়া সম্পাদিত 'চরিয়াপিটক অট্ঠকথা' পালি টেক্স্ট সোসাইটি থেকে ১৯৩৯ সালে প্রকাশিত হয়।[১৩] তাঁর বহুচর্চিত গ্রন্থটি অবশ্য উচ্চপালি শিক্ষার জন্য নয়। প্রাথমিক পালি শিক্ষার পরবর্তী পর্যায়ের পড়ুয়াদের জন্য বোর্ড অব্ সেকেন্ডারী এডুকেশন্ থেকে প্রকাশিত 'Pali Grammar' বা 'Elements of Pali Grammar' গ্রন্থটি মহাবিদ্যালয় এবং বিশ্ববিদ্যালয় স্তরের পালি শিক্ষার্থী ও অধ্যাপকগণও নির্দ্ধিধায় ব্যবহার করেন।

অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় ছিলেন পালি বিভাগের অপর এক আন্তর্জাতিক ব্যক্তিত্ব যিনি বৌদ্ধ সংস্কৃত ও তিব্বতীয় বৌদ্ধশাস্ত্রে গভীর ব্যুৎপত্তির জন্য খ্যাতি অর্জন করেন।

তাঁর গবেষণা গ্রন্থ (Thesis for Ph. D. Degree) 'Sarvastivada Literature' ১৯৫৭ সালে প্রকাশিত হয়। এছাড়াও তাঁর অন্যান্য গ্রন্থগুলি উল্লেখের দাবি রাখে। যেমন - ১) Buddhism in India and Abroad(1973) , ২) বুদ্ধ ও বৌদ্ধ ধর্ম, ৩) Buddhism in China ৩) Two Buddhist Vinaya Texts in Sanskrit and the Like. গবেষণা কার্যে তাঁর নির্দেশনা আজও তাঁর উত্তরসূরীদের মধ্যে বহুভাবে চর্চিত । তাঁর অধীনে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'Doctorate of Philosophy' এর জন্য কুড়িটি গবেষণা হয়। উল্লেখ্য যে ১৯৪৫ সালের পর এই বিভাগে ডঃ অনুকূলচন্দ্র ব্যানার্জীর অধীনেই ১৯৬০ সালে (১৪ বছর ব্যবধানে) গবেষণাপত্র জমা পড়ে। রাষ্ট্রীয় সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী ছিলেন ডঃ ব্যানার্জীর অধীনে প্রথম 'Doctor of Philosophy' (D. Phil)। ডঃ আশা দাশ ছিলেন এই বিভাগের প্রথম মহিলা গবেষক যিনি ডঃ ব্যানার্জীর অধীনে ১৯৬৬ সালে 'Doctor of Philosophy' (D. Phil) উপাধি প্রাপ্ত হন। ১৯৭৫ সালে পর্যন্ত তিনি বিভাগীয় প্রধান রূপে আসীন ছিলেন। শিক্ষাজগতের অপর দুটি গুরুত্বপূর্ণ পদ তিনি অলংকৃত করেন ঃ ১৯৬৯ সালের মার্চে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা বিভাগের অধ্যক্ষ (Dean of the Faculty of Arts) নির্বাচিত হন এবং কিছুদিনের জন্য পশ্চিমবঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা পর্ষদের সভাপতি (President) ছিলেন।

ডঃ বেণীমাধব বড়ুয়া থেকে ডঃ অনুকূল চন্দ্র বন্দোপাধ্যায় পর্যন্ত কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধসাহিত্য চর্চা বিশ্বমানের গবেষণা এবং পঠন-পাঠনের জন্য এক স্বর্ণোজ্জ্বল অধ্যায়। এই পর্বে গবেষণার বিষয়বস্তু এবং স্নাতকোত্তর স্তরের পাঠ্যসূচী পরিবর্তন , পরিবর্ধন বা পদ্ধতিগত বিন্যাস থেকে অনুমান করতে অসুবিধা হয় না যে সমসাময়িক বিশ্বব্যাপী প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন ও নতুন নতুন তথ্যের আলোক প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে পালি বিভাগও সুন্দরভাবে সামঞ্জস্য রেখে চলেছিল। বিভাগীয় প্রধানরূপে আমরা যে তিনজন অধ্যাপককে পেয়েছি তাঁদের তিনজনের অধীত বিষয়, ব্যক্তিত্ব তদনুসারে কর্মপদ্ধতি ছিল ভিন্নমুখী। কিন্তু বৌদ্ধসাহিত্য বা প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস অনুসন্ধিৎসু অধ্যাপক, গবেষক বা শিক্ষার্থীগণের কাছে তাঁরা প্রাতঃ স্মরণীয়। পরবর্ত্তী পর্যায় অর্থাৎ বিগত ত্রিশ বছর (১৯৭৬-২০০৬ খ্রীঃ) পালি বিভাগ সেই বিশ্বমানের চর্চা ধরে রাখতে পারে নি। এই আক্ষেপের সুরটি সর্বত্র অনুরণিত হচ্ছে এবং গবেষণার সূত্র রূপে বৌদ্ধ সাহিত্যের যে কোন সূত্র- - পালি, সংস্কৃত, বৌদ্ধ সংস্কৃত, তিব্বতীয় বা চৈনিক উপাদান সংগ্রহ বা সংগৃহীত উপাদানের পাঠোদ্ধার বা তুলনামূলক আলোচনা কোন বিষয়েই এই বিভাগের নিরঙ্কুশ আধিপত্য নেই। গবেষণাপত্রগুলির মৌলিকতা (Fundamental Study) নিয়েও অকারণ সন্দেহ আমাদের পীড়িত করে। এককালে খ্যাতনামা অধ্যাপকগণের অধ্যাপনা পরীক্ষা অভিমুখী ছিল না। তাঁরা অনায়াসে বিষয়টির গভীরতায় ছাত্রদের নিয়ে যেতে পারঙ্গম ছিলেন। কিন্তু আজ পরীক্ষার জন্য নির্দিষ্ট বিষয়সূচী সমাপনান্তে কর্তব্য পালনের মাধ্যমে পঠন-পাঠনের

প্রাত্যহিক প্রয়োজনটুকু পূরণ হয়ে চলেছে। গবেষণালব্ধ 'ডিগ্রী' আজ পরীক্ষায় প্রাপ্ত ক্রমোন্নতির একটি বিশেষ পর্যায়মাত্র। বস্তুত স্নাতকোত্তর শ্রেণীর অনুসন্ধিৎসা যেখানে এসে আলো-জল পেয়ে ভবিষ্যতের মহীরুহ রূপে অবতীর্ণ হওয়ার আশ্বাস পেত আজ সেই 'Doctorate of Philosophy'-র জন্য গবেষণার অনুসন্ধিৎসাই তৈরী হচ্ছে না। প্রযুক্তিবিদ্যার প্রতি অতিরিক্ত আসক্তি আজ আর মানবিক বিদ্যা চর্চার প্রতি কোন মেধাবী ছাত্রের আগ্রহ সৃষ্টি করতে পারছে না। জীবনে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার লক্ষ্যে সুপ্রতিষ্ঠার আপাত মন্থর প্রক্রিয়াটির প্রতি তারা আর ফিরে দেখতে চায় না। যখন দেখার চেষ্টা করে তখন দৃষ্টি অস্বচ্ছ হয়ে যায়। এহেন পরিস্থিতিতে সমসাময়িক বা আধুনিক সাহিত্য অবসর বিনোদনের মাধ্যম হলেও প্রাচীন সাহিত্য চর্চার শ্রমটুকু মস্তিষ্ক কোষে প্রদাহের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। তার ওপর অপ্রচলিত ভাষা আয়ত্ব করে সেই সাহিত্য চর্চায় যখন জীবিকার আশ্বাস ক্ষীণ হয়ে আসে তখন সেই বিড়ম্বনা জীবনে ডেকে আনা কেন ?এহেন পরিস্থিতিতে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বৌদ্ধসাহিত্যচর্চার ন্যায় দুরূহ বিষয়ের ওপর প্রবন্ধ লিখতে গেলে স্বাভাবিকভাবে প্রথম চারদশকের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়ের ওপর আলো পড়াই স্বাভাবিক। কিন্তু উক্ত প্রবাদপ্রতিম ব্যক্তিগণের স্নেহধন্য এই বিভাগটি তাঁদের প্রদর্শিত তিনটি বিশেষ নির্দেশনা থেকে আজও বার হয়ে আসার দুঃসাহস দেখাতে পারে নি। পুরাতন পাথেয়ই আমাদের আজও নিঃশেষ হয় নি। তাই হয়ত নতুন কালের সূচনায় বিলম্ব । এতদ্সত্ত্বেও এই বিভাগ শম্বুকগতিতে অগ্রসর হচ্ছে। উৎস হতে জল সঞ্চার অধিক না হলেও একদম শুষ্ক হয়ে যায় নি। ফলে স্নান বন্ধ না হলেও বিষয়ের গভীরে অবগাহন স্তব্ধ হয়ে আছে।

পাদটীকা

১। বিমলাচরণ লাহা, "এ হিস্ট্রী অব্ পালি লিটারেচার" বারাণসী, ইণ্ডিকা, প্রথম সংস্করণ ১৯৩৩, এই সংস্করণ ২০০০, প্রথম অধ্যায়, পৃষ্ঠা ২৯-৬৬।

২। প্রঃ পি. ভি. বপৎ সম্পাদিত "২৫০০ ইয়ারস্ অব্ বুদ্ধিজিম্", নিউ দিল্লী পাবলিকেশন ডিভিসন, মিনিস্ট্রী অব্ ইন্‌ফরমেশন অ্যাণ্ড ব্রড্‌কাস্টিং, গর্ভমেন্ট অব্ ইণ্ডিয়া, প্রথম প্রকাশ মে, ১৯৫৬ (জ্যৈষ্ঠ ১৮৭৮), দ্বিতীয় মুদ্রণ, অগাষ্ট ১৯৬৪ (শ্রাবণ, ১৮৮৬), চতুর্থ অধ্যায় পৃঃ ৪২-৪৫।

৩। তদেব, পৃঃ ১২২-৫৫।

৪। এ. সি. ব্যানার্জী — "দ্য সর্বাস্তিবাদ লিটারেচার", ক্যালকাটা, দ্য ওর্য়াল্ড প্রেস প্রাইভেট লিমিটেড্, ১৯৭৩।

৫। শব্দ বন্ধটি Rhys Davids প্রণীত "Buddhist India' গ্রন্থটির বহুচর্চিত বাংলা প্রতিশব্দ।

৬। লালমণি যোশী, "ডিসার্নিং দ্য বুদ্ধ", নিউ দিল্লী, মুন্সীরাম মনোহরলাল পাব্‌লিসার্স প্রাইভেট লিমিটেড, প্রথম সংস্করণ ১৯৮৩, প্রথম অধ্যায়, (অ্যাপ্রোচেস টু বুদ্ধিজিম্) পৃষ্ঠা ১-৮।

৭। ডঃ অঞ্জলি রায়, 'ভারত তত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব', কলকাতা - ১৫, ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, বুদ্ধপূর্ণিমা, ১৪০০, ভূমিকা, পৃঃ XXXI.

৮। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি অ্যানুয়াল রিপোর্ট, ১৯৫৪-৫৫।
৯। 'জার্নাল অব্ দ্য ডিপার্টমেন্ট অব্ পালি' ইউনিভার্সিটি অব্ ক্যালকাটা, কলকাতা, ১৯৮২, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫২।
১০। "he was unable to continue to act as a University Lecturer in Pali". ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি মিনিট্স্, ১৯০৯, পৃঃ ৪৪।
১১। ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি মিনিট্স্, ১৯১০, পৃঃ ৭৯৮।
১২। "The Executive Committee recommends that Dr. Benimadhab Barua be appointed in the special grade Rs. 500-25-700 with effect from 1st June 1925, and that he be placed in charge of the Department with the designation of University Professor as a personal distinction". Proceeding (1925) 19th November, 1925.
১৩। 'জার্নাল অব্ দ্য ডিপার্টমেন্ট অব্ পালি', ইউনিভার্সিটি অব্ কলকাতা, কলকাতা ১৯৮২, প্রথম খণ্ড, পৃঃ ১৫৪-৫৬; ১৬২-৬৩, ১৬৫-৬৬।
১৪। "Students are expected to read Pali works in Sinhalese, Siamese and Burmese characters." পাঠ্য ক্রম ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি এম. এ., এক্সামিনেশন, ১৯৮৮-৯০, টেক্স্ট বুক্স, পালি।
১৫। "Students are expected to read Pali works in Roman or Devnagari Scripts" প্রস্তাবিত পাঠ্যক্রম, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ফ্যাকাল্টি অব্ আর্টস, সাবজেক্ট পালি, ২০০৬ (রিভাইস্ড সিলেবাস) এম. এ. পার্ট-ওয়ান এক্সামিনেশন।
১৬। তদেব।
১৭। এই সময়ের ইতিহাসের জন্য ব্যবহৃত সূত্রগুলি হল ঃ প্রসেডিংস অন দ্য কাউন্সিল অব্ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট টিচিং ১৯১৭-৩৫; ইউনিভার্সিটি মিনিটস্, ১৮৮০-৮১ এবং তৎপরবর্ত্তী; ডেভেলপ্মেন্ট অব্ পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট স্টাডিস ইন্ আর্টস অ্যাণ্ড লেটারস্, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি (১৯০৭-৪৮), প্রকাশিত হয় ১৯৪৯; হাণ্ড্রেড ইয়ারস্ অব্ ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, ১৯৫৭; অ্যানুয়াল রিপোর্টস, ইউনিভার্সিটি কলেজ অব্ আর্টস অ্যাণ্ড কমার্স ১৯৫৪-৫৫ এবং তৎপরবর্তী।
১৮। প্রসিডিংস অব্ দ্য কাউন্সিল অব্ পোষ্ট গ্র্যাজয়েট টিচিং, ১৯১৯, ক্যালকাটা ইউনিভার্সিটি, পৃঃ ১০২-৩; 'জার্নাল অব্ দ্য ডিপার্টমেন্ট অব্ পালি', তদেব, পৃঃ ১৭৭-৭৮।
১৯। অ্যানুয়াল রিপোর্টস্, ইউনিভার্সিটি অব্ ক্যালকাটা (কন্ভোকেশন), ১৯৫৪-১৯৬২; ইউনিভার্সিটি ক্যালেণ্ডার, ১৯২৯, পার্ট-২, ভল্যুম ওয়ান্; তদেব ১৯৫৩, পার্ট-টু ভল্যুম ওয়ান্; প্রাচ্যবিদ্যা তরঙ্গিনী, ১৯৬৯ (এ. আই. এইচ. সি); জার্নাল অব্ দ্য ডিপার্টমেন্ট অব্ পালি, ** অঞ্জলি রায়, 'ভারততত্ত্ববিদ আচার্য বেণীমাধব'; তদেব, পৃঃ ১৭১-৭৪।
২০। তদেব, পৃঃ ১৭১; প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে ডঃ সেনগুপ্তের উক্ত প্রবন্ধটি বর্তমান প্রবন্ধের প্রেরণা, উৎস এবং মৌলিক সূত্র।

বর্তমান যুগ

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী বৌদ্ধ—একটি সমীক্ষা

আশিস্ বড়ুয়া*

২০০১ সালের আদমসুমারী অনুসারে পঃবঙ্গের মোট জনসংখ্যা ৮,০১,৭৬,১৯৭ (আট কোটি এক লক্ষ ছিয়াত্তর হাজার একশত সাতানব্বই)। ধর্মের ভিত্তিতে চিত্রটা এই রকম ঃ

হিন্দু	৫,৮১,০৪,৮৩৫ (৭২%)
মুসলিম	২,০২,৪০,৫৪৩ (২৫%)
খ্রীষ্টান	৫,১৫,১৫০ (০.৬৪%)
বৌদ্ধ	২,৪৩,৩৬৪ (০.৩০%)
শিখ	৬৬,৩৯১ (০.০৮%)
জৈন	৫৫,২২৩ (০.০৭%)

এই চিত্র থেকে দেখা যাচ্ছে পঃ বঙ্গে সংখ্যাগতভাবে বৌদ্ধদের স্থান চতুর্থ।

তবে বৌদ্ধ বলতে এখানে নেপালী বৌদ্ধ, চিনা বৌদ্ধ, তিব্বতী বৌদ্ধ ও বাঙালী বৌদ্ধদের সমবেত সংখ্যা বোঝায়। এখান থেকে বাঙালী বৌদ্ধদের সংখ্যা আলাদাভাবে নির্ণয় করা সম্ভব নয়। গণনার সময় বাঙালী বৌদ্ধদের সঠিকভাবে নথিবদ্ধ করা হয়না। কারণ চেহারা, ভাষা, পোষাক প্রভৃতি বাহ্য উপকরণ দিয়ে বাঙালী বৌদ্ধ ও বাঙালী-হিন্দুদের মধ্যে পার্থক্য করা যায়না। তাই গণনাকারীরা কোন প্রশ্ন না করেই অনুমানের ভিত্তিতে বাঙালী বৌদ্ধদের হিন্দু হিসাবে চিহ্নিত করে দেয়। সাধারণ বৌদ্ধ নাগরিকরা এই ব্যাপারে বিশেষ সচেতন নন। তাই আদম সুমারীতে বৌদ্ধ জনসংখ্যা সঠিকভাবে প্রতিফলিত নয়। বৌদ্ধ জনগণের এই বিষয়ে সচেতন হওয়া খুবই জরুরী। সেই সঙ্গে জনগণনা আধিকারিকের গোচরেও বিষয়টি আনা প্রয়োজন। ধর্মের পাশাপাশি মাতৃভাষার কলাম রাখার একটি প্রস্তাবও গণনা আধিকারিকের কাছে রাখা যেতে পারে। সেক্ষেত্রে সহজেই শুধু বাঙালী বৌদ্ধই নয়, বাঙালী খ্রীষ্টান বা বাঙালী মুসলিমদের সংখ্যাও জনসংখ্যা বিবরণ থেকে পাওয়া যাবে।

আদম সুমারী থেকে প্রাপ্ত পঃ বঙ্গের বৌদ্ধদের জেলাভিত্তিক চিত্রটি এই রকম।

দার্জিলিং	—	১,৭৭,৩২৭

* পশ্চিমবঙ্গ সরকারের এ্যাসিস্টেন্ট সেক্রেটারী পদে কর্মরত, গড়িয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি সংসদ-এর সম্পাদক, "অত্তদীপ" পত্রিকার সম্পাদক, "চল যাই" সাময়িক পত্রিকার সহ সম্পাদক, কবি ও প্রাবন্ধিক।

জলপাইগুড়ি	—	৪৩,৭৩৪
কুচবিহার	—	৪৭৪
উত্তর দিনাজপুর	—	৩৩৫
দক্ষিণ দিনাজপুর	—	১৭৫
মালদহ	—	১৬৪
মুর্শিদাবাদ	—	২৪৪
বীরভূম	—	২২২
বর্ধমান	—	১,৬০৭
নদীয়া	—	৬৩৫
উত্তর চব্বিশ পরগণা	—	৫,৮৩৯
হুগলী	—	১,৩১৯
বাঁকুড়া	—	১৩৮
পুরুলিয়া	—	১৮৫
মেদিনীপুর	—	১,৬৩৭
হাওড়া	—	১,০৮৫
কলকাতা	—	৬,৪৪৫
দঃ চব্বিশ পরগণা	—	১,৭৯৯

এর মধ্যে বাঙালী বৌদ্ধ কতজন তা নিরূপণ করার একটা চেষ্টা করা যেতে পারে।

পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী বৌদ্ধরা সকলেই পূর্ববঙ্গ থেকে আগত। পশ্চিমবঙ্গে বসতি স্থাপন করার সময় এরা প্রথমে আত্মীয়স্বজন বা পরিচিত মানুষের সন্ধান করেছে। তাদের কাছাকাছি থাকার চেষ্টা করেছে। এই বঙ্গের আদি বাসিন্দা না হওয়ার কারণে এরা কেউই কৃষিজীবী নয়, ব্যবসা বা চাকুরীর কাজে লিপ্ত। তাই এদের অধিকাংশই শিল্পোন্নত জেলা, কলকাতা ও এর উপকণ্ঠে বসবাস করে। পশ্চিমবঙ্গের যে সমস্ত জেলায় এরা অধিক সংখ্যায় বসতি স্থাপন করেছে সেগুলি হল কলকাতা, হাওড়া, উত্তর চব্বিশ পরগণা, হুগলী, বর্ধমান, দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা, জলপাইগুড়ি প্রভৃতি। বিভিন্ন জেলার বিশেষ বিশেষ অঞ্চলেই এদের বসতি ঘনীভূত। যেমন—

বর্ধমান	—	দুর্গাপুর, বার্ণপুর, কালনা।
নদীয়া	—	চাকদহ, কল্যানী।
উঃ ২৪ পরগণা	—	ইছাপুর, সোদপুর, দত্তপুকুর, শ্যামনগর, ব্যারাকপুর, বিবেকনগর।
হুগলী	—	ব্যাণ্ডেল, রিষড়া, পোলবা, ভদ্রেশ্বর।
মেদিনীপুর	—	মেদিনীপুর সদর।

হাওড়া	—	সাঁত্রাগাছি, বেলুড়।
দঃ ২৪-পরগণা	—	মহেশতলা, রামপুর, আকড়া।
জলপাইগুড়ি	—	দোমহনি, গয়েরকাটা, বাগরাকোট, নাগরাকাটা, কালচিনি, বিন্নাগুড়ি, ওদলাবাড়ি, ডামডিং, ফালাকাটা, জয়গাঁ, ময়নাগুড়ি, মালবাজার।
দার্জিলিং	—	দার্জিলিং টাউন, শিলিগুড়ি।
কলকাতা	—	বৌবাজার, তালতলা, বেহালা, গড়িয়া, টালিগঞ্জ, চেতলা, আলিপুর, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, বান্ধব নগর, তেঘড়িয়া, সল্টলেক।

উত্তর দিনাজপুর, দক্ষিণ দিনাজপুর, মালদহ, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি অনগ্রসর জেলায় এদের সংখ্যা খুবই কম। ধরা যেতে পারে গড়ে দশ জন।

পশ্চিমবঙ্গে সর্বাধিক বৌদ্ধ বসতি দার্জিলিং জেলায়। এই রাজ্যের মোট বৌদ্ধজনসংখ্যার ৭২ শতাংশ। কিন্তু এদের অধিকাংশই নেপালী বা তিব্বতী বৌদ্ধ। বাঙালী বৌদ্ধ সংখ্যা দার্জিলিং টাউনে মাত্র ৩২ জন।

দার্জিলিং জেলার শিলিগুড়িতে বেশ কিছু সংখ্যক বাঙালী বৌদ্ধ বাস করে। এখানে তিনটি বুদ্ধ মন্দির আছে। [এই প্রবন্ধে বুদ্ধমন্দির বলতে শুধু বাঙালী বুদ্ধ মন্দিরের কথাই বলা হয়েছে] প্রাপ্ত তথ্যানুসারে শিলিগুড়িতে মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা আনুমানিক ১২০০ জন।

জলপাইগুড়ি জেলার বিভিন্ন চা বাগানে বহু বাঙালী বৌদ্ধ বসবাস করে। যেমন, দোমহনি, গয়ের কাটা, বাগরাকোট, নাগরাকাটা, কালচিনি, বিন্নাগুড়ি, ওদলাবাড়ি, ডামডিং, ফালাকাটা, জয়গাঁ, ময়নাগুড়ি, মালবাজার প্রভৃতি। এদের মধ্যে মালবাজারে একটি, ডামডিং-এ একটি, নাগরাকাটায় দুইটি, বিন্নাগুড়িতে একটি, আলিপুরদুয়ারে একটি, ময়নাগুড়িতে একটি ও জয়গাঁয় একটি বুদ্ধ মন্দির আছে। এই অঞ্চলগুলির মধ্যে মালবাজার, বিন্নাগুড়ি ও ময়নাগুড়িতে বৌদ্ধ বসতি তুলনামূলকভাবে বেশী। গড়ে আনুমানিক ২০০ জন। অন্যান্য চা বাগান অঞ্চলে সংখ্যাটা গড়ে ৬০ জন ধরা যেতে পারে। জলপাইগুড়ি শহরে সংখ্যাটা ৪০ জন। এই হিসেবে সমগ্র জলপাইগুড়ি জেলায় বৌদ্ধ জনবসতি (৩ x ২০০ + ৯ x ৬০ + ৪০ =) মোট ১১৮০ জন।

কুচবিহার জেলায় অল্প কিছু সংখ্যক বাঙালী বৌদ্ধ বাস করে। কুচবিহার টাউনে এদের সংখ্যা আনুমানিক ৩০ জন। সারা জেলায় আরো ১০ জন অনুমান করে নিলে সমগ্র কুচবিহার জেলায় মোট বৌদ্ধ জনসংখ্যা = ৪০ জন।

বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর ও বার্ণপুরে একটি করে বুদ্ধ মন্দির আছে। দুর্গাপুরে বাঙালী বৌদ্ধ জনসংখ্যা মোট ৩৫০ জন। বার্ণপুরেও সংখ্যাটা অনুরূপ। এছাড়া কালনা, চিত্তরঞ্জন, পানাগড়, বুদবুদ, বর্ধমান টাউন প্রভৃতি বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বৌদ্ধদের

সংখ্যাটা অনুমান করা যেতে পারে মোট ১০০ জন। এই হিসেবে বর্ধমান জেলায় বাঙালী বৌদ্ধর সংখ্যা মোট ৮০০ জন।

নদীয়া জেলার চাকদহে একটা বুদ্ধ মন্দির আছে। এখানে বৌদ্ধ জনসংখ্যা আনুমানিক প্রায় ১০০ জন।

উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় ইছাপুর, সোদপুর, দত্তপুকুর, ব্যারাকপুর ও বিবেকনগরে একটি করে ও শ্যামনগরে দুটি বুদ্ধমন্দির আছে। প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে সোদপুরে ২৫০ জন ও ব্যারাকপুরে ২৫০ জন বাঙালী বৌদ্ধ আছে। ইছাপুর, দত্তপুকুর ও বিবেকনগরেও সংখ্যাটা অনুরূপ ধরে নেওয়া যেতে পারে। শ্যামনগর একটি বড় বৌদ্ধ পল্লী। এখানে বাঙালী বৌদ্ধদের সংখ্যা ধরা যেতে পারে আনুমানিক প্রায় ১২০০ জন। এই হিসেবে উত্তর চব্বিশ পরগণা জেলায় বাঙালী বৌদ্ধদের মোট সংখ্যা ২৪৫০ জন।

হুগলী জেলায় দুটো বৌদ্ধ পল্লী আছে। ব্যাণ্ডেল ও রিষড়া। প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে ব্যাণ্ডেলের জনসংখ্যা ২৬৭ জন ও রিষড়ায় ৮০০ জন। এই হিসেবে হুগলী জেলায় মোট বাঙালী বৌদ্ধ ১০৬৭ জন।

মেদিনীপুর সদর টাউনে ২০টি বাঙালী বৌদ্ধ পরিবার বাস করে। ২০টি পরিবারে গড়ে ৫ জন সদস্য ধরলে মোট সংখ্যা হয় ১০০ জন।

হাওড়া জেলায় দুটো বৌদ্ধ পল্লী। বালি-বেলুড় ও সাঁত্রাগাছি। প্রাপ্ত হিসেব অনুসারে বেলুড়ের জনসংখ্যা ২০০ জন। সাঁত্রাগাছির সংখ্যাটাও অনুরূপ অনুমান করা যেতে পারে। হাওড়ার দুটো বৌদ্ধপল্লীতে জনসংখ্যা দাঁড়ায় ৪০০ জন।

দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলায় তিনটি বৌদ্ধ পল্লী। মহেশতলা, রামপুর ও আকড়া। প্রাপ্ত হিসেব অনুযায়ী মহেশতলায় বাঙালী বৌদ্ধ ৮০০ জন ও আকড়ায় ১৯২ জন। রামপুরে সংখ্যাটা অনুমান করা যেতে পারে প্রায় ২০০ জন। সুতরাং দক্ষিণ চব্বিশ পরগণা জেলার তিনটি বৌদ্ধ পল্লীতে মোট জনসংখ্যা ১১৯২ জন।

কলকাতার বৌদ্ধ বসতি অঞ্চলগুলি হল বৌবাজার, তালতলা, বেহালা, গড়িয়া, টালিগঞ্জ, চেতলা, আলিপুর প্রভৃতি। এর মধ্যে টালিগঞ্জে বাঙালী বৌদ্ধ ২৭৮ জন, গড়িয়ায় ৪০৯ জন, দমদম ক্যান্টনমেন্টে ২১৫ জন, তেঘড়িয়ায় ৮২ জন। বৌবাজার, তালতলা, চেতলা, আলিপুর, বান্ধবনগর প্রভৃতি অঞ্চলে সংখ্যাটা গড়ে আনুমানিক ১০০ জন। বেহালা বিরাট জায়গা। এখানে সংখ্যাটা আনুমানিক ৩০০ জন। এ ছাড়াও সারা কোলকাতায় বহু বাঙালী বৌদ্ধ ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করে। সেই সংখ্যাটা অনুমান করা যেতে পারে প্রায় ১০০০ জন। সুতরাং কলকাতায় বাঙালী বৌদ্ধদের আনুমানিক সংখ্যা ২,৬৮৪ জন।

উপরোক্ত হিসাব মত পশ্চিমবঙ্গে বাঙালী বৌদ্ধ জনসংখ্যা ১১,৩১৫ জন। এছাড়াও পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন আনাচে কানাচে বেশ কিছু বৌদ্ধ বসবাস করে যাদের এই হিসেবের মধ্যে ধরা যায়নি। এদের সংখ্যাও খুব কম হবেনা। ধরে নেওয়া যেতে পারে সংখ্যাটা

৩০০০। সুতরাং এই হিসেবে পশ্চিমবঙ্গের বাঙালী বৌদ্ধ জনসংখ্যা দাঁড়াচ্ছে ১৪,৩১৫ জন। পশ্চিমবঙ্গের মোট জনসংখ্যার ০.০২ শতাংশ।

এই অতি স্বল্প সংখ্যক বাঙালী বৌদ্ধরা গরিষ্ঠ হিন্দু সমাজের মধ্যে এমনভাবে বিলীন হয়ে রয়েছে যে আলাদাভাবে নজরেই পড়েনা। যে সমস্ত বৌদ্ধ পল্লীতে বৌদ্ধরা একত্রিত হয়ে বসবাস করে সেইসব অঞ্চলে এদের অস্তিত্ব সামান্য কিছুটা নজরে পড়ে।

পশ্চিমবঙ্গে জেলা ভিত্তিক বাঙালী বুদ্ধ মন্দিরগুলির একটি তালিকা নিচে দেওয়া হল।

দার্জিলিং	—	গন্ধমাদন বিহার
		আনন্দ ভিক্ষু লেন, ছোট কাকঝোরা
		দার্জিলিং
শিলিগুড়ি	—	বুদ্ধভারতী
		মহানন্দ পাড়া
”	—	হায়দার পাড়া বিদর্শন ধ্যানাশ্রম
”	—	ইন্টারন্যাশনাল বুদ্ধিষ্ট রিসার্চ সেন্টার
		গুরুং বস্তী
জলপাইগুড়ি	—	মাল বাজার বৌদ্ধ বিহার
		মালবাজার
”	—	ডামডিং বৌদ্ধ বিহার
		ডামডিং
”	—	তপোবন বিহার
		নাগরাকাটা
”	—	বুদ্ধজয়ন্তী বিহার
		নাগরাকাটা
”	—	ডুয়ার্স মৈত্রী বিহার
		বিন্নাগুড়ি
”	—	আলিপুরদুয়ার বুদ্ধবিহার
		আলিপুরদুয়ার
”	—	বৌদ্ধশান্তি বিহার
		ময়নাগুড়ি
”	—	জয়গাঁ বৌদ্ধ বিহার
		জয়গা
বর্ধমান	—	দুর্গাপুর সাধনা কেন্দ্র
		বিদ্যাসাগর পল্লী, বেনাচিতি, দুর্গাপুর

বর্ধমান	—	বার্ণপুর বুদ্ধ বিহার
		বার্ণপুর, বৈষ্ণববাঁধ
,,	—	কালনা বুদ্ধ মন্দির
		কালনা
নদীয়া	—	চাকদহ বুদ্ধ বিহার
		চাকদহ
বীরভূম	—	আম্বেদকর বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন
		সোনাঝুরি, শান্তিনিকেতন
উঃ ২৪ পরগণা	—	তথাগত বিহার
		মানিকতলা, ইছাপুর
,,	—	ধর্মাধার বৌদ্ধ বিহার
		সরোজিনী নাইডু রোড, নাটাগড়, সোদপুর
,,	—	জেতবন বিহার
		দত্তপুকুর
,,	—	বোধি বিহার
		নূতন পল্লী,শ্যামনগর
,,	—	জগদ্দল বিহার
		আতপুর নূতন পল্লী, শ্যামনগর
,,	—	কুঞ্জবন বিহার
		কল্যানী রোড, শিউলি তেলেনি পাড়া,
		মোহনপুর, ব্যারাকপুর
,,	—	ত্রিরত্ন বিহার
		বিবেকনগর
,,	—	জ্ঞানালঙ্কার বৌদ্ধ বিহার
		দিগ্‌বেরিয়া, বাদুরোড, মধ্যমগ্রাম
উঃ ২৪ পরগণা	—	মহামতি অশোক বুদ্ধবিহার
		খোর্দা বামনিয়া গ্রাম, গুমা, হাবড়া
হুগলী	—	আনন্দ বোধি বিহার
		কেওটা শ্যামসুন্দরপুর, সাহাগঞ্জ
,,	—	ধর্মোদয় বিহার
		পাঁচলোকি বড়ুয়া পাড়া, পোঃ মোড়পুকুর, রিষড়া

হুগলী	—	জেতবন বুদ্ধ বিহার ৪৯, কার্ল মার্কস সরণী, পোঃ মোড়পুকুর, রিষড়া
,,	—	দেউলপাড়া বুদ্ধ বিহার তারকেশ্বর
মেদিনীপুর	—	মেদিনীপুর বুদ্ধ বিহার মেদিনীপুর
হাওড়া	—	সাঁত্রাগাছি বুদ্ধ বিহার জগাছা, জি. আই. পি. কলোনি
,,	—	বেলুড় বুদ্ধ বিহার গ্রাম বাসুকাটি, পোঃ আনন্দনগর, বালি, হাওড়া
,,	—	ধর্মদূত বৌদ্ধ বিহার রাজচন্দ্রপুর বড়ুয়া পাড়া, পোঃ ঘোষপাড়া, বালি, হাওড়া
দঃ ২৪-পরগণা	—	মহেশতলা বুদ্ধাঙ্কুর সোসাইটি পশ্চিম রায়পুর, মহেশতলা
,,	—	মহেশতলা বৌদ্ধ সমিতি দক্ষিণ জালকুড়া, মহেশতলা
,,	—	শাক্যমুনি বিহার রামপুর বড়ুয়া পাড়া, পোঃ গোবিন্দপুর, মহেশতলা
,,	—	আক্রা বৌদ্ধ বিহার জগন্নাথ নগর, বড়ুয়াপাড়া, আক্রা, মহেশতলা
কলকাতা	—	বৌদ্ধ ধর্মাঙ্কুর সভা ১, বুদ্ধিষ্ট টেম্পল ষ্ট্রীট কলকাতা-১২
,,	—	বিদর্শন শিক্ষাকেন্দ্র ৫০টি/১সি, পটারী রোড, কলকাতা-১৫
,,	—	গড়িয়া বুদ্ধ বিহার ২১/১, মিলন পার্ক, কলকাতা-৮৪
,,	—	ইণ্ডিয়ান বুদ্ধিষ্ট মেডিটেশন সেন্টার বিদ্যাসাগর সরণী, বড়বাগান, বেহালা, কলকাতা-১৩
,,	—	ধর্মচক্র বিহার বান্ধবনগর, দমদম, কলকাতা - ২৮

কলকাতা	—	বেনুবন বিহার ১৩, মৈত্রী সরণী, দমদম ক্যান্টনমেন্ট, কলকাতা-৬৫
”	—	চেতলা বুদ্ধ বিহার চেতলা
”	—	সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন চিনার পার্ক, তেঘড়িয়া, কলকাতা - ৫৯
”	—	টালিগঞ্জ সার্বজনীন বৌদ্ধ বিহার ৪৬, মুর অ্যাভেনিউ, কলকাতা
”	—	বোধিচারিয়া মৈত্রী নগর, পোঃ কদমপুকুর, রাজারহাট
”	—	তামাং বুদ্ধিষ্ট অ্যাসোসিয়েসন ৬৬/১, ব্যানার্জীপাড়া রোড, পোঃ পশ্চিম পুঁটিয়ারী কলকাতা - ৭৩

বিদেশী বুদ্ধ মন্দির

শ্রীলঙ্কা	—	মহাবোধি সোসাইটি অফ ইণ্ডিয়া কলেজ স্কোয়ার কলকাতা-৭৩
মায়ানমার	—	মায়ানমার বুদ্ধ মন্দির ১, ইডেন হাসপাতাল রোড কলকাতা - ৭৩
”	—	প্যাগোডা বারাসত বার্মা কলোনী
জাপান	—	জাপানী বুদ্ধ মন্দির ঢাকুরিয়া, কলকাতা
তিব্বত	—	তিব্বতী বুদ্ধ মন্দির পদ্মপুকুর, ভবানীপুর
চিনা	—	চিনা বুদ্ধ মন্দির তপসিয়া, কলকাতা
”	—	চিনা বুদ্ধ মন্দির ৪২৬, যশোর রোড, কলকাতা - ৫৫
”	—	হিউয়েন সাং বুদ্ধিষ্ট টেম্পল চৌভাগা, ২৪ পরগণা, কলকাতা - ৩৯

এই বিহারগুলি স্থানীয় ভিত্তিতে মূলতঃ বৌদ্ধদের অর্থানুকূল্যে নির্মিত হয়েছে। বাঙালী বৌদ্ধরা আর্থিকভাবে খুব শক্তিশালী নয়। এই বুদ্ধবিহারগুলিতেও তারই প্রতিফলন পরিলক্ষিত হয়।

এই সমস্ত বিহারে একজন ভিক্ষু বিহারাধ্যক্ষ হিসেবে থাকেন এবং ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠানগুলি পরিচালনা করেন। কোন কোন বিহারে একাধিক ভিক্ষু বা শ্রমণকেও থাকতে দেখা যায়।

বিহারগুলি আঞ্চলিক ভিত্তিতে গঠিত সমিতির তত্ত্বাবধানে নির্মিত ও রক্ষিত হয়। যেমন সোদপুরে নাটাগড় বৌদ্ধ সমিতির তত্ত্বাবধানে 'ধর্মাধার বৌদ্ধ বিহার'। দত্তপুকুরে জেতবন বিহার পরিষদের তত্ত্বধানে "জেতবন বিহার", রিষড়া বৌদ্ধ সমিতির তত্ত্বাবধানে "ধর্মোদয় বিহার", গড়িয়া বৌদ্ধ সংস্কৃতি সংসদের তত্ত্বাবধানে "গড়িয়া বুদ্ধ বিহার" ইত্যাদি। সংগঠনগতভাবে বিহারগুলির মধ্যে পারস্পরিক কোন যোগসূত্র নেই। প্রত্যেকটিই স্বশাসিত এবং সোসাইটি রেজিষ্ট্রেশন অ্যাক্ট দ্বারা নিবন্ধীকৃত প্রতিষ্ঠান। রামকৃষ্ণ মিশন বা খ্রীষ্টান চার্চের মত কোন কেন্দ্রীয় সংগঠন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত নয়। এই সব বিহারে বাসকারী ভিক্ষুরা অবশ্য সকলেই সঙ্ঘের অধীন।

পশ্চিমবঙ্গ তথা ভারতে বাঙালী বৌদ্ধ ভিক্ষুদের দুইটি সঙ্ঘ আছে। (১) ভারতীয় সঙ্ঘরাজ ভিক্ষুমহাসভা ও (২) অখিল ভারত ভিক্ষু সঙ্ঘ। এই বঙ্গের অধিকাংশ ভিক্ষুই সঙ্ঘরাজ ভিক্ষু মহাসভার অন্তর্গত। এই সঙ্ঘের প্রথম সঙ্ঘরাজ ছিলেন পণ্ডিত ধর্মাধার মহাস্থবির। বর্তমান সঙ্ঘরাজ হলেন শ্রীমৎ প্রজ্ঞাজ্যোতি মহাস্থবির।

অখিল ভারত ভিক্ষু সঙ্ঘে বাঙালী ভিক্ষুর সংখ্যা খুবই কম। এখানে অবাঙালী বিশেষ করে মহারাষ্ট্রের ভিক্ষুদের প্রাধান্য বেশী।

পশ্চিমবঙ্গে বৌদ্ধদের অনুপাতে ভিক্ষুর সংখ্যা খুবই কম। বিভিন্ন পল্লীতে গড়ে ওঠা বুদ্ধবিহারের জন্য ভিক্ষু পাওয়া একটা সমস্যা। বাংলাদেশ থেকে পড়াশোনা করতে আসা ছাত্র-ভিক্ষুরা এই প্রয়োজনের কিছুটা পূরণ করছে বটে, তবে সেটা কোন স্থায়ী সমাধান নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে শ্রামণ্য ধর্মে দীক্ষিত হবার আগ্রহ দেখা যাচ্ছেনা। অবশ্য আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ করে ধর্মপ্রাণ যুবকদের সঙ্ঘে আকর্ষণ করার মতো ব্যক্তিত্ব বা পরিবেশ পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধ সঙ্ঘে নেই এমনটাও মনে করা হয়ে থাকে।

বৌদ্ধ ভিক্ষুদের জ্ঞানচর্চা মূলতঃ পালি পঠন পাঠনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। বিশাল শিক্ষাক্ষেত্রের অন্যান্য বিভাগে তাদের বিচরণ করতে দেখা যায়না। অপরদিকে বর্তমান প্রজন্মের যুবক যুবতীরা শিক্ষার বিভিন্ন দিকে (পালি বাদ দিয়ে) পারদর্শিতা অর্জন করছে। ফলে ভিক্ষুদের সঙ্গে এদের মানসিক আদান-প্রদানের সমস্যা তৈরী হচ্ছে। ফলতঃ গোটা সমাজই ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। বৌদ্ধদের উচ্চ আদর্শযুক্ত নিজস্ব শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলাই সম্ভবতঃ এই সমস্যার সমাধানের একমাত্র পথ। কিন্তু সে আশাও সুদূরপরাহত। কারণ

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন পল্লীতে যে বুদ্ধবিহারগুলি গড়ে উঠেছে তাদের প্রাথমিক উদ্দেশ্য অঞ্চলের বৌদ্ধদের ধর্মীয় প্রয়োজন পরিপূর্ণ করা। পাশাপাশি ছোটোখাটো সেবামূলক কাজ যেমন দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপন, লাইব্রেরী প্রতিষ্ঠা, মেধাবী ছাত্রদের বৃত্তি প্রদান প্রভৃতি করে থাকে বটে কিন্তু শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলার মতন ইচ্ছে বা মানসিকতা এদের মধ্যে দেখা যায়না। সম্প্রতি কয়েকজন ভিক্ষু ব্যক্তিগত প্রচেষ্টায় কয়েকটি নিজস্ব প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছে। যেমন শান্তিনিকেতনে আম্বেদকর বুদ্ধিষ্ট ওয়েলফেয়ার মিশন, মধ্যমগ্রামে জ্ঞানালঙ্কার বৌদ্ধবিহার, তেঘড়িয়ার চিনার পার্কে সিদ্ধার্থ ইউনাইটেড সোস্যাল ওয়েলফেয়ার মিশন প্রভৃতি। এই প্রতিষ্ঠানগুলি একটি করে অনাথ আশ্রম পরিচালনা করে। রাজারহাটের মৈত্রীনগরে গড়ে ওঠা প্রতিষ্ঠান বোধিচারিয়া অবশ্য একটি বিদ্যালয় পরিচালনা করে। বিশাল কমপ্লেক্স-এ ১২ ক্লাস পর্য্যন্ত পড়ানো হয়। ছাত্র ও ছাত্রী আবাস সহ এই বিদ্যালয় এক প্রশংসনীয় উদ্যোগ সন্দেহ নেই। তবে এটি একটি বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টা। এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি গড়ে তোলার পেছনে একটি সামাজিক প্রয়োজনীয়তা আছে সেটা বোঝা যায়। সেদিক থেকে এর একটি মূল্য আছে। কিন্তু উচ্চ আদর্শযুক্ত বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে এটি পরিচিত হয়ে উঠতে পারেনি। বোধিচারিয়া প্রতিষ্ঠানটি চাক্‌মা বৌদ্ধদের দ্বারা পরিচালিত। এখানকার অধিকাংশ ছাত্রছাত্রীই ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের চাক্‌মা।

বাঙালী বৌদ্ধ সমাজে উচ্চশিক্ষিত মানুষের কোন অভাব নেই। স্বস্ব ক্ষেত্রে তাদের অনেকেই সুপ্রতিষ্ঠিত। এদের সকলের সহযোগিতায় বৌদ্ধ আদর্শযুক্ত মিশনারী স্কুল ও কলেজ প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে যুবক যুবতীদের মধ্যে শিক্ষার পাশাপাশি উন্নত মানসিকতা গঠন করার একটা প্রচেষ্টা শুরু হওয়া প্রয়োজন।

বর্তমানে এই সমাজের নূতন প্রজন্মের ছেলেমেয়েদের নিজস্ব স্বকীয়তা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি প্রভৃতি বর্জন করতে দেখা যাচ্ছে। বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শনে তারা আগ্রহহীন হয়ে পড়ছে। এবং এই মানসিকতাকে প্রগতিশীলতার লক্ষণ মনে করে আত্মসন্তুষ্টি ভোগ করছে। একে অস্তিত্বের সংকটও বলা যেতে পারে। উপরে প্রস্তাবিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে আধুনিক শিক্ষার পাশাপাশি তাদের বৌদ্ধ আদর্শের প্রতি উদ্বুদ্ধ করা যেতে পারে।

বাঙালী বৌদ্ধ সমাজ সংখ্যাগতভাবে ছোট হলেও এরা এই রাজ্যে সাধারণ মানুষের কাছে এক বিশেষ মর্যাদা পেয়ে থাকে। কারণ বুদ্ধ ও বুদ্ধের দর্শন সম্বন্ধে তাদের উচ্চ ধারণা পোষণ এবং সেই ধর্মাবলম্বী মানুষদের দুর্লভতা। এই মর্যাদা রক্ষা করা এই রাজ্যের বাঙালী বৌদ্ধদের তাই এক গুরুদায়িত্ব।

এরা সাধারণভাবে শান্তিপ্রিয় ও নির্ঝঞ্ঝাট জীবনযাত্রা পছন্দ করে। বিভিন্ন বৌদ্ধ পল্লীর দিকে তাকালে একটা সুন্দর সমাজচিত্র ফুটে ওঠে। তবে এর আড়ালে এক ভয়ানক সংকটের সম্ভাবনাও অনুভব করা যায়। কারণ এই সমাজ একতাবদ্ধ নয়। কোন সামাজিক সংকট উপস্থিত হলে তাকে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিরোধ করার অবস্থায় এরা নেই। আঞ্চলিক সংগঠনগুলি প্রত্যেকটিই ধর্মীয় সংগঠন। পুরো সমাজকে নেতৃত্ব দেওয়ার ক্ষমতা এদের কারুর নেই।

বিগত বছরে ২৫৪৯তম বুদ্ধ জয়ন্তী উদযাপন করার জন্য কলকাতায় মহাবোধি সোসাইটির উদ্যোগে সমস্ত বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠান মিলে ট্যাবলো সহযোগে এক শোভাযাত্রা বের করা হয়েছিল। প্রচেষ্টাটির সাফল্যের মধ্যে সংহতির একটা চেহারা ফুটে উঠেছিল। আশা করা গিয়েছিল পরবর্তী বছরে, ২৫৫০ তম বুদ্ধজয়ন্তীতে, আরো বড় এবং সুসংবদ্ধ শোভাযাত্রা দেখা যাবে। সংহতির বন্ধন দৃঢ়তর হবে। কিন্তু সব শুভ চেতনাকে ভ্রান্ত প্রমাণ করে চিরাচরিত বিভেদ পন্থা মাথা চাড়া দেয়ও ২৫৫০ তম শোভাযাত্রার জৌলুস অনেকটাই ম্লান করে দেয়। সংকীর্ণ দৃষ্টিভঙ্গী, প্রজ্ঞার অভাব এবং ভ্রান্ত অহমিকা এই সমাজকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছে। এই ঘটনা তারই এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

তবে সম্প্রতি "অল ইণ্ডিয়া ফেডারেশন অব বেঙ্গলী বুদ্ধিষ্ট" বা "নিখিল ভারত বাঙালী বৌদ্ধ সংগঠন" নামে একটি প্রতিষ্ঠানকে অগ্রণী ভূমিকা গ্রহণ করতে দেখা গেছে। এই সংগঠন এই রাজ্যের বাঙালী বৌদ্ধদের চাকুরী ও শিক্ষা সংক্রান্ত সুযোগ সুবিধার বিরুদ্ধে সরকারী চক্রান্তকে প্রতিহত করতে সক্ষম হয়েছে। অন্ধকার আকাশে এ এক রূপোলী রেখার মত। এই রাজ্যের বাঙালী বৌদ্ধদের অবিলম্বে এই সংগঠনের সদস্যপদ গ্রহণ করে একে শক্তিশালী করা দরকার। ০.০২ শতাংশ জনসংখ্যা এক ছাতার তলায় একত্রিত না হলে এই বিশাল জনসমুদ্রে কোথায় বিলীন হয়ে যাবে কে জানে? এই প্রতিষ্ঠানকে কেন্দ্র করে পূর্বালোচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপনের কথাও বাঙালী বৌদ্ধরা ভেবে দেখতে পারে।

ভিক্ষুদের কথা আলোচনা প্রসঙ্গে এই প্রবন্ধে বলা হয়েছে এই বঙ্গে বৌদ্ধদের অনুপাতে ভিক্ষুর সংখ্যা খুবই কম। এরই পাশাপাশি আরেকটি বিষয়ের প্রতিও দৃষ্টিপাত করা প্রয়োজন। সেটি হল উপযুক্ত ভিক্ষু আবাসের অভাব।

বয়স্ক ভিক্ষু, বিভিন্ন জায়গা থেকে আগত অতিথি ভিক্ষু এবং অসুস্থ ভিক্ষুর থাকার উপযুক্ত জায়গা এখানে নেই। সংগঠনগতভাবে কোন প্রতিষ্ঠানের কোন পরিকল্পনার কথাও শোনা যায়না। পশ্চিমবঙ্গের বৌদ্ধদের সম্মিলিত প্রচেষ্টায় ভিক্ষুদের চিকিৎসার জন্য একটি ছোট দশ শয্যার হাসপাতাল স্থাপন খুব দুরূহ কাজ নয়। দরকার শুধু উদ্যোগের। যেটার একান্তই অভাব।

ভারতবর্ষে বৌদ্ধরা সাংবিধানিকভাবে স্বীকৃত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়। তবে সংখ্যালঘু হিসেবে যাবতীয় সুযোগ সুবিধা গরিষ্ঠ সংখ্যালঘু সম্প্রদায় তথা মুসলিমরাই ভোগ করে থাকে। বাঙালী বৌদ্ধরা সেদিক থেকে খুবই উপেক্ষিত। পশ্চিমবঙ্গে মোট জনসংখ্যার ০.৩০% বৌদ্ধ এবং ০.০৮% শিখ। অর্থাৎ সংখ্যাগতভাবে শিখেরা বৌদ্ধদের এক তৃতীয়াংশেরও কম। অথচ এই রাজ্যে গুরুনানকের জন্ম দিনে ছুটি দেওয়া হলেও, বুদ্ধপূর্ণিমায় দেওয়া হয়না। যার কোন বিশ্বাসযোগ্য ব্যাখ্যাই হয়না।

এই রাজ্যের বাঙালী বৌদ্ধদের তাই সচেতন হতে হবে। সচেতনতা তাদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে। সচেতনতা তাদের সংখ্যাল্পতা সম্পর্কে। সচেতনতা জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্বের বিপন্নতা সম্পর্কে।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ ঐতিহ্যের এক ঝলক

প্রণব কুমার বড়ুয়া*

প্রাচীনকাল ঃ

১। **সীতাকোট বিহার** — চাপাই নবাবগঞ্জ জেলার ফতেপুর সাড়াস নামক স্থানে অবস্থিত। ৫ম থেকে ৭ম শতাব্দীতে এই বিহারটি নির্মিত হয়। বিহারটির দৈর্ঘ্য পূর্ব পশ্চিমে ২১৪ ফুট এবং উত্তর দক্ষিণে ২১২ ফুট। বিহারে মোট ৪৯টি কক্ষ। ১৯৬৮ সালে খনন কাজ আরম্ভ হয়।

২। **ভাসু বিহার**— একসময় এ বিহার ভারতবর্ষে বিখ্যাত বৌদ্ধ বিহার হিসেবে পরিচিত ছিল। মহাস্থান (বগুড়া) এলাকায় এ বিহারটি অবস্থিত। পুণ্ড্রবর্ধনের রাজধানীর সন্নিকটে পো-সি-পো নামে যে বিহারটির কথা হিউয়েন সাঙ উল্লেখ করেছেন এটাই সেই প্রাচীন বৌদ্ধ বিহার। এখানে পাশাপাশি দুটি বিহার আছে। বিহারের মোট কক্ষ ৭১টি। এটি নবম শতকের বিহার বলে অনুমান করা হয়। এ বিহারের সন্নিকটে একটি বৌদ্ধ মন্দিরেরও চিহ্ন রয়েছে। বিহারটির আয়তন ১৮৪ X ১৫২ ফুট। এ বিহারে ৭০০ জন মহাযান বৌদ্ধ ভিক্ষু বাস করতেন।

৩। **গোকুল মেদ** — মহাস্থানগড় এলাকায় এটি সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার বলে অনুমিত হয়। কারণ এর কক্ষসংখ্যা বেশী, আয়তনও বড় এবং স্থাপত্য রীতিও অনুপম। সর্বমোট ১৭২টি কক্ষ ছিল এই বিহারের। খৃষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে গুপ্ত আমলে বিহারটি নির্মিত হয়। এটি একটি উঁচু বিহার ও মন্দির। পরবর্তী কালে মন্দিরের সাথে বেহুলা-লক্ষীন্দরের কাহিনী যুক্ত হয়ে যায়। সেন আমলেই এ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়।

৪। **গোবিন্দ ভিটা**— এখানে ষষ্ঠ শতকে নির্মিত একটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। দুর্ভাগ্যের বিষয় বিহারের নামটি জানা যায়নি। পোড়ামাটির মূল্যবান চিত্রফলক দ্বারা এর প্রাচীনত্ব গুপ্ত আমলের বলে ধারণা করা হয়েছে। এটি মহাস্থান গড়ের ২০০ গজ উত্তরে অবস্থিত ছিল।

৫। **খোদার পাথর ভিটা**— বগুড়ার মহাস্থান থেকে ৪৫ মাইল দূরে পাঁচবিবি ঘোড়াঘাট

---

* অধ্যক্ষ ডঃ প্রণব কুমার বড়ুয়া, পি. এইচ. ডি। প্রবীণ শিক্ষাবিদ ও বিশিষ্ট সমাজসেবী, বাংলাদেশ।

রাস্তার দক্ষিণে অবস্থিত। সাড়ে নয়ফুট লম্বা, আড়াই ফুট চওড়া ও আড়াই ফুট গভীর গ্রানাইট পাথর এটি। এর ওজন প্রায় ১০০ মন। মুসলিম আমলে এই পাথরের নাম খোদার পাথর ভিটা হয়। আসলে এই পাথরটি একটি বৌদ্ধ মন্দিরের দেয়ালের অংশ যা ষষ্ঠ শতকে নির্মিত হয়েছিল। এই মন্দিরে এক খন্ড পাথরে খোদাইকৃত তিনটি বুদ্ধমূর্তি আবিষ্কৃত হয় খনন করার পর। মন্দিরের আসল নাম হারিয়ে গেছে। এ মন্দির পূর্বমূখী এ জন্য এটি বৌদ্ধ মন্দির- বৌদ্ধ মন্দির সাধারণত পূর্বমুখী হয়। এটি দিনাজপুর-জয়পুরহাট সীমান্তে অবস্থিত। এ অঞ্চলে বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তির সাথে সাথে এর পরিচয়ও লুপ্ত হয়ে যায়।

৬। **সোমপুর মহাবিহার—** এটি নওগাঁ জেলার বদরগাছি থানায় অবস্থিত পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ বিহার। দ্বিতীয় পাল সম্রাট ধর্মপাল (৭৭০-৮১০) এই মহাবিহারটি নির্মাণ করেন। এটি পাহাড়পুর বৌদ্ধ বিহার নামেও পরিচিত। সমতলভূমি থেকে ১০০ ফুট উঁচু পাহাড়সমস্থানে এটি নির্মিত বলে স্থানীয় লোকেরা এই স্থানকে পাহাড়পুর বলত।

ইন্দোনেশিয়ায় জাভা দ্বীপের বোরবুদুর হলো পৃথিবীর সর্ববৃহৎ বৌদ্ধ মন্দির(স্তূপ বা চৈত্য)। বাংলাদেশের সোমপুর মহাবিহার হচ্ছে বিশ্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বৌদ্ধ মহাবিহার। বিহারটি দুর্গ আকারে তৈরী। এটি পূর্ব পশ্চিমে ৯২২ ফুট উত্তর দক্ষিণে ৯১৮ ফুট। চারিদিকের সীমানা দেয়ালের পুরুটা হল ১৬ ফুট। সর্বমোট ১৭৭টি কক্ষ। কক্ষগুলির সামনে ৯ফুট চওড়া বারান্দা। এটি ছিল আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়। এখানে সাহিত্য, ধর্ম, দর্শন, বিজ্ঞান, যুক্তিবিদ্যা, হেতু বিদ্যা, চিকিৎসাবিদ্যা, শিল্পকলা পড়ানো হতো। দেশ বিদেশের ছাত্ররা (ভিক্ষু) এখানে এসে উচ্চ শিক্ষা গ্রহণ করতেন। খ্যাতিমান বৌদ্ধ পন্ডিত এখানের অধ্যাপক ছিলেন। মন্দিরের দেয়ালে শতাধিক পাথরের মূর্তি ছিল। এখানে মন্দিরের গায়ে খুবই উন্নত মানের ২ হাজার পোড়ামাটির চিত্রফলক ছিল। এই বিহারের স্থাপত্যরীতির প্রভাব বোরবুদুরে, কম্বোডিয়ার আংকরভাটেও পরিলক্ষিত হয়। এর কারণ এটি তাদের চেয়ে প্রাচীন।

৭। **হলুদ বিহার—** পাহাড়পুর থেকে ১২ মাইল দক্ষিণে হলুদ বিহার অবস্থিত। ইহা সোমপুর বিহারের সমসাময়িক বলে অনুমান করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণার পর এই সত্য পাওয়া যাবে। গ্রামের নামই হলুদ বিহার। এখানে ৪টি ঢিবি আছে। প্রায়ই কেটে নিঃশেষ করা হচ্ছে। কাটার সময় পোড়ামাটির ফলকচিত্র এবং মূল্যবান তিনটি পাথরের বুদ্ধমূর্তিও পাওয়া গেছে। গ্রামে প্রাচীন দীঘি আছে। এই গ্রামেই বৌদ্ধবিহার ও বৌদ্ধ স্তূপ ছিল।

৮। **শালবন বিহার**— এটি কুমিল্লা শহর থেকে ৬ মাইল পশ্চিমে অবস্থিত। এটি সোমপুর বিহারের আদলেই নির্মিত হয়েছিল তবে ঐ বিহারের চেয়ে ছোট। সর্বমোট ১১৫টি কক্ষ। বর্গাকৃতি এই বিহারের প্রতিটি বাহু ৫৫০ ফুট। এটিও একটি আবাসিক বৌদ্ধ বিশ্ববিদ্যালয়। ৮ম শতকে বৌদ্ধরাজা ভবদেব (দেববংশীয় রাজা) এই বিহার নির্মাণ করেন। ৪০০ বছর ধরে এ বিহারে জ্ঞানচর্চা হয়েছিল। ত্রয়োদশ শতক পর্যন্ত এ বিহারের টিকে থাকার প্রমাণ পাওয়া যায়।

এই বিহারের কেন্দ্রস্থলে ছিল একটি মন্দির। মন্দিরে অবস্থিত ছিল বুদ্ধমূর্তি। প্রতিদিন এই মন্দিরে উপাসনার জন্য ভিক্ষুরা মিলিত হতেন। মন্দিরটি ১৬৮ ফুট X ১১০ ফুট এর প্রত্যেকটি বাহু ১৭০ ফুট লম্বা। মন্দিরের চারিদিকে প্রদক্ষিণের পথ, দেওয়ালের গায়ে পোড়ামাটির ফলকচিত্র। ভিক্ষুরা এখানে চক্রমন করতেন। চক্রমন ভিক্ষুদের সাধনার একটি অংশ।

খননকার্যের ফলে এখানে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে যা নিকটস্থ যাদুঘরে সুরক্ষিত আছে। উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত ময়নামতি— লালমাই এলাকা বিস্তৃত পাহাড় শ্রেণীতে এই প্রাচীন বৌদ্ধ ঐতিহ্য অবস্থিত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় সেনানিবাসের নির্মাণের জন্য পাহাড় খননের সময় এই মহান গৌরবগাথা আবিষ্কৃত হয়।

এই বিস্তীর্ণ এলাকার অন্যান্য বৌদ্ধ ঐতিহ্য হলো ঃ—

ক) **কোটিলামুড়া**— এটি শালবন বিহার থেকে তিনমাইল উত্তরে অবস্থিত। খননের ফলে স্তূপ আবিষ্কৃত হয়েছে পাশাপাশি তিনটি। এ যেন বৌদ্ধধর্মের ত্রিরত্নের প্রতীক। ত্রিরত্ন হল বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ। এরকম পাশাপাশি তিনটি স্তূপ আর কোথাও আবিষ্কৃত হয়নি। এগুলি শালবন বিহারের সমসাময়িক। এছাড়া কুমিল্লার ময়নামতি এলাকার অন্যান্য যে সমস্ত বৌদ্ধ ঐতিহ্য বিদ্যমান তাহলো:

ক) **চারপত্র মুড়া**—১৯৫৬ সালে খনন কার্যের ফলে এখানে বৌদ্ধ বিহার আবিষ্কৃত হয়।

খ) **আনন্দ বিহার**— বাংলাদেশে এ পর্যন্ত যতগুলি বৌদ্ধ বিহার অবস্থিত হয়েছে তম্মধ্যে এটি দ্বিতীয় বৃহত্তম। কে এ বিহারের নির্মাতা তা জানা যায়নি। পন্ডিতদের ধারণা এটি দেববংশীয় তৃতীয় রাজা আনন্দদেব নির্মাণ করেন। মনে হয় এ বিহার শালবন বিহারের আগে নির্মিত হয়েছিল। আনন্দ বিহারের ৩০০ ফুট পূর্বে একটি বড় দীঘি আছে—একে আনন্দ রাজার দীঘি বলা হয়।

গ) **ভোজ বিহার**— আনন্দ বিহারের আট মাইল দক্ষিণে আর একটি বিহার ছিল যার নাম ভোজ বিহার। এখানেও বৌদ্ধ মন্দির ছিল।

ঘ) রূপবান কন্যা বিহার— এ বিহারের আসল নাম জানা যায়নি। স্থানীয় লোকেরা একে রূপবান কন্যার বিহার বলে। অথচ কোন বিহারের নাম এরকম হতে পারেনা সেজন্য এটি এখনও গবেষণার বিষয়।

প্রত্নতাত্ত্বিকরা মনে করেন কুমিল্লার চান্দিনা এলাকায় কয়েকটি বৌদ্ধ বিহার ছিল। গ্রামের প্রবীণ ব্যক্তিদের কাছে জানা যায় সে সমস্ত প্রাচীন বিহারের কথা। চান্দিনার পূর্ব দিকের গ্রামের নাম বড়কামতা। বড় কামতার আশে পাশে বৌদ্ধ বিহার ছিল। কিন্তু বর্ত্তমানে তার কোন অস্তিত্ব নাই। সমতটের নৃপতি দেব খড়্গের যে দুটি তাম্রশাসন পাওয়া গেছে তা থেকে জানা যায় এ এলাকায় ৪টি বৌদ্ধ বিহার নির্মাণের জন্য ভূমিদান করা হয়েছিল। জয় কর্মান্ত স্থান থেকে যে তাম্রশাসন পাওয়া যায় তাতে ডঃ নলিনীকান্ত ভট্টশালী সহ অনেক পন্ডিত মনে করেন জয় কর্মান্তই হল বর্ত্তমানের বড়কামতা। এই কামতা থেকেই কুমিল্লা নামের আগমন হয়েছে বলে বিশ্বাস।

কুমিল্লার অদূরে বরুরা নামে একটি থানা আছে। অনেকেই মনে করেন এই নামটি বাঙালী বৌদ্ধদের পদবী বড়ুয়া থেকেই এসেছে।

সংঘরাজ পন্ডিত জ্যোতিপাল মহাথেরোর কাছে শুনেছি লাকসাম রেল স্টেশনটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ স্তূপের উপরই নির্মিত যার নাম বড়তুয়া অর্থাৎ বড়স্তূপ। কুমিল্লা বিহারের দক্ষিণ পূর্বদিকে পাঁচসুরী নামে একটি গ্রাম আছে। পাঁচস্তূপ থেকে পাঁচসুরী নাম হয়েছে। ধারণা করা হয় পঞ্চশীলের পাঁচশীলকে স্মরণ করে একদা এখানে পাঁচটি স্তূপ নির্মিত হয়েছিল।

৯। **পন্ডিত বিহার**— পন্ডিতদের ধারণা এটি চট্টগ্রামেই অবস্থিত ছিল। দুঃখের বিষয় এই স্থানটি এখনও নির্ণীত হয়নি। এ বিহারটি সিদ্ধাচার্য তিলোপার কর্মভূমি। এছাড়া তার শিষ্য সিদ্ধাচার্য নরোপাও এখানে অবস্থান করেন। গবেষকরা বলেন নালন্দাবিহার ধ্বংসের পরও এই পন্ডিত বিহার জাগরুক ছিল এবং বৌদ্ধ ধর্মচর্চা কেন্দ্র হিসেবে বিরাজিত ছিল। বৌদ্ধ পন্ডিতদের ধারণা পন্ডিত বিহার হয় দেয়াঙ পাহাড়ে, নয়ত চট্টগ্রাম শহরের রঙমহল পাহাড় বা পরীর পাহাড়ে অবস্থিত ছিল (অর্থাৎ জেনারেল হাসপাতাল পাহাড় এবং কাছারী পাহাড়)।

১০। **সাভার**— সাভার ঢাকা শহরের ১৫ মাইল উত্তর পশ্চিমে অবস্থিত। এই এলাকায় অনেক বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। এগুলি ঢাকা যাদুঘরে আছে। ১৯১৩ ও ১৯২৬ সালের খননের ফলে এখানে বহু পোড়ামাটির ফলক ও কয়েকটি বুদ্ধমূর্তি পাওয়া যায়। অষ্টম ও নবম শতাব্দী থেকে এটি সমৃদ্ধ নগরী ছিল। সাভারের প্রাচীন নাম সাহোর। এই সাহোরে অনেক বৌদ্ধ সিদ্ধাচার্য জন্মগ্রহণ করেন। অতীশ দীপংকরও

এই অঞ্চলকে সাহোর বলে উল্লেখ করেছেন। লালমাটিতে গঠিত এ প্রাচীন জনপদ বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির কেন্দ্র ছিল।

১১। **ধামরাই**— সাভারের নিকটেই ধামরাই। এটিও প্রাচীন বৌদ্ধ জনপদ। সম্রাট অশোক সারা ভারতবর্ষে ৮৪ হাজার স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন- যে স্তূপকে ধর্মরাজিকা বলা হয়। অনুরূপ একটি স্তূপ ধামরাইতে নির্মিত হয়েছিল তার কারণ এটি ছিল বৌদ্ধ ধর্মচর্চার কেন্দ্রভূমি। এখন ধামরাইতে অশোক স্তম্ভের ধ্বংসাবশেষ বিদ্যমান। ধর্মরাজিকা থেকেই ধামরাই নামের উৎপত্তি।

১২। **বজ্রযোগিনী**— এটি মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে অবস্থিত একটি গ্রামের নাম। এই গ্রামেই দশম শতকের বৌদ্ধ পন্ডিত অতীশ দীপংকর জন্ম গ্রহণ করেন। ইহা একটি পুণ্যতীর্থ। বৌদ্ধরা সৃষ্টি কর্তাকে বিশ্বাস করে না বলে তাদের নাস্তিকও বলা হয়। পন্ডিত অতীশ দীপংকর বৌদ্ধ ছিলেন তাই তার জন্মস্থানটি নাস্তিক পন্ডিতের ভিটা নামে পরিচিত। বিক্রমপুর ছিল সমৃদ্ধ জনপদ এখানে চন্দ্র সেনবংশীয় রাজা রাজত্ব করেন।

১৩। **অন্যান্য প্রাচীন বিহার ঃ**

ক) **বিক্রমপুরী বিহার**—বিক্রমপুরে অবস্থিত ছিল।

খ) **ত্রৈকূটক বিহার**—আজও নির্ণীত হয়নি।

গ) **দেবীকোট বিহার**—সম্ভবত উত্তরবঙ্গে অবস্থিত ছিল।

১৪। **ঝিয়রী**—চট্টগ্রামের আনোয়ারা থানার অধীনে এই ঝিয়রি গ্রাম। একজন কৃষক তার মাটির বাড়ী তৈরীর সময় মাটি খনন করার পর্যায়ে এই গ্রামে ৬১টি ছোট ছোট বুদ্ধমূর্তি সহ অন্যান্য প্রত্নতাত্ত্বিক উপকরণ পায়। সহজেই অনুমেয় ঝিয়রী বিহার এখানে অবস্থিত ছিল।

১৫। **চন্দ্রনাথ বা চন্দ্রশেখর ও আদিনাথ**—ইহা চট্টগ্রামের সীতাকুন্ড থানার সীতাকুন্ড পাহাড়েই অবস্থিত। পন্ডিত বিহারের মত প্রসিদ্ধ না হলেও এই পাহাড়শীর্ষে সপ্তম শতকে বৌদ্ধপন্ডিত চন্দ্র গোমীন এবং পঞ্চদশ শতকে আর এক বৌদ্ধ পন্ডিত চন্দ্রজ্যোতি সাধনা করেন। সে হিসেবে এ পাহাড়ের নাম হয় চন্দ্রনাথ, অনেকে চন্দ্রশেখরও বলে। কালক্রমে এই চন্দ্রনাথ বা চন্দ্রশেখর বৌদ্ধতীর্থ হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়।

ঠিক তেমনি কক্সবাজার জেলার মহেষখালির আদিনাথ তীর্থও বৌদ্ধ তীর্থ ছিল পরে হিন্দু তীর্থে পরিণত হয়। স্থানীয় রাখাইন বৌদ্ধেরা বলে ইহা বৌদ্ধতীর্থ ছিল।

১। **বাংলাদেশের বর্তমান বৌদ্ধ ঐতিহ্য**

রামকোট বিহার—এটি কক্সবাজার জেলার রামু থানা থেকে দুই মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। বিহারটি এক একর জমির উপর নির্মিত। বিহারের পুরো দেয়াল এবং গঠনরীতি দেখলে মনে হয় এটি প্রাচীন। বিহারের অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ করে জানা যায় এটি অশোক আমলে নির্মিত। প্রাচীন বিহারের বহু কিছু ধ্বংস হয়েছে। কিন্তু অনেকেই তা সমর্থন করেন না-তবে বিহারটা যে প্রাচীন তাতে সন্দেহ নাই।

স্থানীয় প্রবীণেরাও এই মত পোষণ করেন। বিহারটি কবে নির্মিত হয়েছে তার কোন প্রমাণ নেই। এর নির্মাণশৈলীতে আরাকান বার্মার প্রভাব রয়েছে। রামকোটের প্রাচীন নাম রম্যবতী। তিব্বতী গ্রন্থ পগ-সাম-জোক জ্যাংগ এ এই রম্যবতীর উল্লেখ আছে। ইহা বর্ত্তমানে একটি পুণ্যতীর্থ।

২। **চিৎমরুম বিহার**—এই বিহারটি পার্বত্য চট্টগ্রামের কাপ্তাই জলবিদ্যুৎ কেন্দ্রের সন্নিকটেই অবস্থিত। এটি একটি প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থ। এখানে ভক্ত নরনারী আগমন করেন, বুদ্ধপূজা করেন এবং ভিক্ষুদের পিন্ডদান করেন। বিহারের বুদ্ধমূর্তিটি প্রাচীন এবং আকর্ষণীয়। ১৮০ বছর পূর্বে এ বিহার ও মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়।

বৌদ্ধদের বিশ্বাস কায়মনোবাক্যে শ্রদ্ধাময় চিত্তে এখানে দানদিলে এবং বুদ্ধমূর্তির সামনে কোন কিছুর জন্য অধিষ্ঠান করলে তার মনস্কামনা পূর্ণ হয়।

৩। **ফরাচিন বিহার**— চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানার বাগোয়ান গ্রামে অবস্থিত। বিহারের মূর্তিটি বদু নামক এক পার্বত্যবাসী বৌদ্ধ ১৭৮৫ সালে প্রতিষ্ঠা করেন বলে ডাঃ রামচন্দ্র বড়ুয়া অভিমত ব্যক্ত করেছেন। এই মূর্তির সামনে মানত করলে তা পূর্ণ হয় বলে জনগণের বিশ্বাস। পূর্বে চৈত্র সংক্রান্তিতে এখানে মেলা হত।

৪। **চক্রশালা বিহার**— ইহা একটি প্রাচীন বৌদ্ধ তীর্থ। আগে বিরাট বিহার ছিল। বর্ত্তমানে সে বিহার নেই তবে সে স্মৃতিকে বহন করে একটি ছোট মন্দির বিদ্যমান আছে। চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানার পটিয়া রেল ষ্টেশনের পূর্বে হাইদগাঁও গ্রামটি চক্রশালা। এখানে ধর্মচক্র প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল, সে চক্রকে স্মৃতিবহ করার জন্য স্থানের নাম হয় চক্রশালা। কথিত আছে বুদ্ধ এই পবিত্র তীর্থে এসেছিলেন। পরবর্তীকালে পন্ডিত অতীশ দীপংকর ও এই স্থান পরিদর্শন করেন। এখানে হাইডমজা নামে যে জমিদার ছিলেন তার বাগানেই বিহার নির্মিত হয়। পঞ্চদশ শতকে চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির বার্মা থেকে আনীত বুদ্ধের ত্রিভংগ মূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ডাঃ রামচন্দ্র বড়ুয়া তাঁর চট্টগ্রামের মগের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন বেপারী মহাস্থবির ১৮৪৯ সালে এখানে নতুন বৌদ্ধ চৈত্য নির্মাণ করেন। বছরের চৈত্রসংক্রান্তিতে

মেলা হয়। স্থানটি শ্রীমতি খালের তীরে অবস্থিত। চক্রশালা বৌদ্ধ রাজাদের রাজধানীও ছিল। তাঁরা আরাকানের প্রতিনিধি হয়ে রাজত্ব করতেন। চট্টগ্রাম বহু সময় আরাকানের অধীনে ছিল।

৫। **মহামুনি বিহার**—১৮১৩ খৃঃ মতান্তরে ১৮০৫ খৃষ্টাব্দে পাহাড়তলীর চাইঙ্গ মহাস্থবির আরাকানের মহামুনি মূর্তির অনুসরণে নিজ গ্রামে একটি বড় আকর্ষণীয় মহামুনি মূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। চট্টগ্রাম জেলার রাউজান থানায় পাহাড়তলী অবস্থিত। পরে মানিকছড়ির মানরাজা এখানে মন্দির নির্মাণ করেন। পাহাড়তলীতে মহামুনি মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় একে মহামুনি পাহাড়তলী নামেও অভিহিত করা হয়। অনেক সময় মহামুনি বললেও পাহাড়তলী বোঝানো হয়। মূর্তি প্রতিষ্ঠার পর বিহার উৎসর্গের দিবসে চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলার প্রবর্ত্তন করা হয়। এখনও সে মেলা প্রচলিত আছে। প্রতি বছর চৈত্র সংক্রান্তিতে প্রচুর পার্বত্য বৌদ্ধ নরনারীর আগমন হয়। বিদেশের বহু বৌদ্ধ পন্ডিত এ তীর্থ পরিদর্শন করেন।

৬। **ঠেগরপুনি বিহার (বুড়া গোঁসাই মন্দির) ঃ**

চট্টগ্রাম জেলার পটিয়া থানায় ঠেগরপুনিতে অবস্থিত। এখানে পঞ্চদশ শতকে চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির ত্রিভংগ বুদ্ধমূর্তি প্রতিষ্ঠা করেন। পরে মূর্তিটি অদৃশ্য হয়। বাগখালি নিবাসী নীলকুমারী দেবী স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে অদৃশ্য ত্রিভংগ বুদ্ধমূর্তির দুটি অংশ উদ্ধার করেন এবং তা ঠেগরপুনিতে প্রতিষ্ঠা করেন। বর্তমানে মূর্তিটির মস্তকাংশ এবং নিম্নাংশ পাওয়া গেছে। খননের সময় মস্তকের কিছুটা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। মূর্তিটি পুরানো এবং বহুদিন মাটির নীচে থাকায় সজীবতা বিনষ্ট হয়। এজন্য একে বুড়া গোঁসাইও বলা হয়। স্থানীয় লোকদের কাছে আজও এটি বুড়াগোসাইয়ের মূর্তি নামে পরিচিত। মূর্তিটি ঐতিহাসিক ও প্রাচীন এবং পবিত্র। ১৮৫৫ সালে মূর্তি উদ্ধার করা হয় এবং একই সালে বিহার নির্মিত হয়। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় মেলা হয়। এখনও মেলা প্রচলিত আছে এ সময় প্রচুর জনসমাগম হয়। এই মূর্তির সামনে অধিষ্ঠান করে কিছু কামনা করলে মনস্কামনা পূর্ণ হয় বলে সকলের বিশ্বাস।

৭। **মহাপরিনির্বাণ বিহার**—এই বিহারটি রাউজান থানার রাউজানে অবস্থিত। ১৯০৮ সালে এই বিহারে বুদ্ধের একটি আকর্ষণীয় মহাপরিনির্বাণ মূর্তি প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। মূর্তিটি ২৫ ফুট লম্বা এবং উত্তর দক্ষিণে প্রসারিত। বিহারটি পশ্চিমমুখী। গ্রামের জমিদার এই বিহার ও মূর্তি নির্মাণ করেন। বিহারের ভিতরে ও বাইরে বিভিন্ন চমকপ্রদ শিল্পকর্ম আছে।

গৌতম বুদ্ধের পর যে বুদ্ধ আসবেন তার নাম হবে আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধ এই বিশ্বাসকে

অবলম্বন করে এই বিহারেই পাশেই একটি আর্যমৈত্রেয় বুদ্ধের মূর্তি নির্মিত হয়েছে। এই ধরনের মূর্তি বাংলাদেশে সর্বপ্রথম দেখা যায়-অন্যত্র নাই। প্রতি বছর মাঘী পূর্ণিমায় এখানে মেলা হয়। প্রচুর জনসমাগম হয়ে থাকে, মেলা আজও প্রচলিত আছে।

৮। **চেঁদির পুকুর চৈত্য**—এই চৈত্যটি চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির নির্মাণ করেন পঞ্চদশ শতকে। চন্দ্রজ্যোতি মহাস্থবির চেঁদির পুকুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তিনি উচ্চ শিক্ষার জন্য বার্মায় গিয়েছিলেন, শিক্ষাশেষে দেশে আসার সময় বুদ্ধমূর্তি আনেন। এই রকম একটি মূর্তি এখানে প্রতিষ্ঠাপূর্বক চৈত্য নির্মাণ করেন। চেঁদির পুকুর চট্টগ্রাম জেলার লোহাগাড়া থানায় অবস্থিত। প্রতিবছর চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলা হয়।

৯। **লামাপাড়া বৌদ্ধ বিহার**—কক্সবাজার জেলার রামু থানার লামাপাড়ায় রাখাইন সম্প্রদায় এই বিহার নির্মাণ করেন। আরাকান ও বার্মার স্থাপত্য শিল্পের অনুকরণে এই বিহার নির্মিত হয়েছে। বিহারে আকর্ষণীয় ব্রোঞ্জের বুদ্ধমূর্তি আছে এবং ভাস্কর্য শিল্পসুষমা অনুপম। এছাড়া বিহারে আকর্ষণীয় ঘন্টা আছে। অধিকন্তু ড্রাগন সহ রক্ষক দেবতার মূর্তি আছে। এটি এদেশে রাখাইন সম্প্রদায়ের সর্ববৃহৎ বিহার। রাখাইনেরা দেশত্যাগের কারণে এর জমজমাট অবস্থা আর নাই। বর্তমানে ইহা পর্যটন কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত এক আকর্ষণীয় বৌদ্ধ ঐতিহ্য। প্রায় ২৫০ বছর আগে এই বিহারটি নির্মিত হয়েছে বলে জানা যায়।

১০। **চন্দ্রনাথ**— ইহা সীতাকুন্ড থানার সীতাকুন্ড পাহাড়েই অবস্থিত। বৌদ্ধ ঐতিহ্য অনুসারে জানা যায় সপ্তম শতকে উত্তরবংগের চন্দ্রগোমীর নামে এক বৌদ্ধ সাধক (ভিক্ষু) সীতাকুন্ডের এক পাহাড়শীর্ষে সাধনা করেন। পরে পঞ্চদশ শতক থেকে চন্দ্রজ্যোতি নামে চট্টগ্রামের আর এক বৌদ্ধ ভিক্ষুর সাধনাকেন্দ্র ছিল এই পাহাড় শীর্ষে। পদভারে প্রকম্পিত এই পবিত্র পাহাড়শীর্ষের নাম হয় চন্দ্রনাথ। কেহ কেহ একে চন্দ্রশেখরও বলে। জানা যায় বৌদ্ধ রাজারা এখানে বৌদ্ধ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। ইহা বৌদ্ধ তীর্থে পরিণত হয়। এখানে চৈত্রসংক্রান্তিতে মেলা হত। ডাঃ রামচন্দ্র বড়ুয়া মগের ইতিহাস গ্রন্থে লিখেছেন এই বৌদ্ধ বিহারে প্রস্তর নির্মিত দুটি আকর্ষণীয় মূর্তি ছিল। আমি ষাট বছর পূর্বেও এই চন্দ্রনাথ পাহাড়ে বৌদ্ধ বিহার দেখেছি, বুদ্ধমূর্তিও দেখেছি। সে সময় চৈত্রসংক্রান্তিতে এখানে বৌদ্ধদের সমাগম হত। কালক্রমে ইহা হিন্দুতীর্থে পরিণত হয়। বৌদ্ধ বিহার ও মূর্তির পরিচয় এখন আর নাই।

বাংলাদেশের বৌদ্ধ মেলা

মেলার নাম	স্থান	সময়
১। মহামুনি মেলা	পাহাড়তলী, রাউজান, চট্টগ্রাম	চৈত্রসংক্রান্তি
২। ফরাচিং মেলা	বাগোয়ান, রাউজান, চট্টগ্রাম	ঐ
৩। চক্রশালা মেলা	পটিয়া, চট্টগ্রাম	ঐ
৪। মহামুনি মেলা	সাতবাড়িয়া, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	ঐ
৫। চৈত্যমেলা	চেঁদির পুকুর, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	ঐ
৬। চৈত্যমেলা	মছদিয়া, লোহাগাড়া, চট্টগ্রাম	মাঘী পূর্ণিমা
৭। ব্যূহচক্র মেলা	পঃ বিনাজুরী, রাউজান, চট্টগ্রাম	ঐ
৮। পরিনির্বাণ মেলা	রাউজান, রাউজান, চট্টগ্রাম	ঐ
৯। সূর্য বৈদ্যের মেলা	আবুরখীল, রাউজান, চট্টগ্রাম	ঐ
১০। মহামুনি মেলা	আবদুল্লাহপুর, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	ঐ
১১। পরিনির্বাণ মেলা	শীলঘাটা, সাতবাড়িয়া, চট্টগ্রাম	ঐ
১২। বুড়াগোঁসাই মেলা	ঠেগরপুনি, পটিয়া, চট্টগ্রাম	ঐ
১৩। শাক্যমুনি মেলা	রাজানগর, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম	ফাল্গুনী পূর্ণিমা
১৪। ধাতু চৈত্য মেলা	ইছামতি, রাঙ্গুনীয়া, চট্টগ্রাম	ঐ
১৫। ধাতু মেলা	বরিয়া, আনোয়ারা, চট্টগ্রাম	ঐ
১৬। আচারিয়া মেলা	ঊনাইনপুরা, পটিয়া, চট্টগ্রাম	ঐ
১৭। বোধি মেলা	ফতেনগর, চন্দনাইশ, চট্টগ্রাম	ঐ
১৮। শাক্যমুনি মেলা	ঢেমশা, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	বৈশাখী পূর্ণিমা
১৯। বোধিদ্রুম মেলা	বৈদ্যপাড়া, বোয়ালখালী, চট্টগ্রাম	ঐ
২০। বুদ্ধপূর্ণিমা মেলা	করৈয়া নগর, সাতকানিয়া, চট্টগ্রাম	ঐ
২১। অমিতাভ মেলা	মেরং লোয়া, রামু, কক্সবাজার	ঐ
২২। মহামুনি মেলা	হাইদচকিয়া, ফটিকছড়ি, চট্টগ্রাম	চৈত্রসংক্রান্তি
২৩। পরিনির্বাণ মেলা	মানিকপুর, চকরিয়া, কক্সবাজার	ঐ
২৪। রামকোট মেলা	রামু, কক্সবাজার	ঐ
২৫। বারুনী মেলা	আবুরখালী, রাউজান, চট্টগ্রাম	বারুনীর স্নান দিবসে

বিঃ দ্রঃ বর্তমানে অনেক মেলা আর প্রচলিত নাই: কোন কোন গ্রামে উৎসবে ব্যূহচক্র মেলা অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে।

বৌদ্ধ উৎসব, পর্ব ও পার্বন

১। **বৈশাখী পূর্ণিমা (বুদ্ধ পূর্ণিমা)**--- এই পবিত্র দিনে নেপালের লুম্বিনী কাননে বুদ্ধের জন্ম হয়, ভারতের বুদ্ধগয়ায় গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করেন এবং ভারতের কুশীনগরে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। সেজন্য এই দিনটি বৌদ্ধদের কাছে অতি পবিত্র এবং এটা তাদের শ্রেষ্ঠতম ধর্মীয় উৎসব। এদিন বাংলাদেশের জাতীয় ছুটি।

২। **আষাঢ়ী পূর্ণিমা**— এ পবিত্র দিনে সিদ্ধার্থ মাতৃজঠরে প্রবেশ করেন। ২৯ বছর বয়সে গৃহত্যাগ করেন দুঃখমুক্তির সন্ধানে, এ পবিত্র দিনে বুদ্ধ সারনাথের ইসিপতনে সর্বপ্রথম তাঁর নবলদ্ধ ধর্ম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মাঝে প্রচার করেন-যাকে ধর্মচক্র প্রর্বতন বলা হয়। এ দিনে ভিক্ষুদের বর্ষাবাস আরম্ভ হয়। বুদ্ধ মাতৃদেবীকে ধর্মদেশনার জন্য স্বর্গে গমন করেন এবং এ দিনে তিনি ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। অতএব দিনটিও অতি পবিত্র। চারি আর্য্যসত্য, অষ্টাঙ্গিক মার্গ, প্রতিত্য সমুৎপাদ নীতির জন্ম হয় এই দিনে। কৌণ্ডণ্য, বপপ, অস্বজিৎ, ভদ্দীয়, মহানাম হলো পঞ্চ বর্গীয় ভিক্ষু।

৩। **ভাদ্র পূর্ণিমা (মধু পূর্ণিমা)**— এ পবিত্র দিনে পারল্যেয় বনে বনের পশু বানর-বুদ্ধকে একটি মৌচাক দান করেছিল অন্যদের দান দেওয়ার দৃশ্য দেখে। মধু পানের জন্য বুদ্ধ বানরের দান গ্রহণ করেন এতে সে খুবই পরিতৃপ্ত হয় এবং আনন্দে এ গাছ থেকে ও গাছে লাফানোর সময় হঠাৎ মাটিতে পড়ে গিয়ে সংগে সংগে মৃত্যু বরণ করে। মৃত্যুর সময় তার চিত্ত প্রসন্ন ছিল এবং দানচিত্তের উদ্‌বোধন হয়েছিল। তারপর সে স্বর্গ লাভ করে। এই দানীয় ঘটনাকে অবলম্বন করে এ তিথি পালিত হয়। ঐ দিন বৌদ্ধেরা ভিক্ষুসংঘকে মধুদান করে।

৪। **আশ্বিনী পূর্ণিমা (প্রবারণা পূর্ণিমা)**— এ পূর্ণিমা তিথিতে ভিক্ষুদের ত্রৈমাসিক ব্রতের অবসান হয়। ব্রতশেষে ভিক্ষুরা প্রবারণা করে। প্রবারণা আত্মসমর্পণের মাধ্যমে আত্মশুদ্ধির অনুষ্ঠান। এ দিনকে বৌদ্ধেরা বড় ছাদাংও বলে। ছাদাং বার্মিজ শব্দ তার অর্থ হলো বড় উপোসথ দিবস। আষাঢ়ী পূর্ণিমা হল ছোট ছাদাং। দুঃখের বিষয় শব্দটি বৌদ্ধেরা ভুলতে বসেছে। রাত্রে আকাশে ফানুস উড়ানো হয় সন্ধ্যায় এবং ভোররাতে ভাসমান বুদ্ধের চুলধাতুকে বন্দনার জন্য। এদিন থেকে মাসব্যাপী বিহারশীর্ষে ও গৃহশীর্ষে আকাশ প্রদীপও জ্বালানো হয়। বৌদ্ধেরা এটিও ভুলতে বসেছে অথচ এটা তাদের নিজস্ব সংস্কৃতির পরিচায়ক অনুষ্ঠান। এ পূর্ণিমার পরদিন থেকে মাসব্যাপী কঠিন চীবরদান অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। আশ্বিনী পূর্ণিমায় প্রায় সকলেই উপোসথ নিয়ে থাকে।

এ উৎসব মিলনের উৎসব, শুভেচ্ছা বিনিময়ের উৎসব। এর সাথে হিন্দুদের বিজয়া, মুসলমানের ঈদ এবং খৃষ্টানদের বড়দিনের উৎসবের তুলনা করা যায়।

৮। **নববর্ষ**— বৌদ্ধেরা আনন্দ উৎসবের মাঝে নববর্ষ পালন করে। বছরের প্রথম মাস বৈশাখ মাস। বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমায় বুদ্ধত্ব লাভ করেন যে কারণে নববর্ষ বৌদ্ধদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ। বৌদ্ধেরা বিহারে বিহারে সমবেত হয়-ভিক্ষুসংঘকে পিন্ডদান করে বুদ্ধপূজা করে, শীল গ্রহণ করে এবং পূর্বপুরুষের পূজা করে। বাড়ীতে বাড়ীতে মিষ্টান্ন তৈরী হয় এবং তা পরিবেশিত হয় সকলের মাঝে।

৯। **কঠিন চীবর দান**— বৌদ্ধেরা স্ব স্ব বিহারে প্রতিবছর বর্ষাব্রত পালনকারী ভিক্ষুদের কঠিন চীবর দান দিয়ে থাকে। সে দান উৎসবে পরিণত হয়। দূর দূরান্ত থেকে ভিক্ষুরা বিহারে আগমন করে, অতিথিরাও আসেন—ধর্মচর্চা হয়, ধর্মীয় চেতনার বিকাশ ঘটে। গ্রামে ধর্মীয় পরিবেশের সূচনা হয়। এ দানকে ঘিরে ধর্মীয়, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। সকল দানের চেয়ে শ্রেষ্ঠ দান তাই এই দানের গুরুত্ব অপরিসীম।

১০। **কল্পতরু উৎসব**— আশ্বিন মাস থেকে কার্তিক মাস পর্যন্ত সময়ে বৌদ্ধেরা কল্পতরু তৈরী করে তা ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে দান করে। স্বর্গের বৃক্ষকে কল্পতরু বলা হয়। কথিত আছে তার কাছে যা চাওয়া হয় তা পাওয়া যায়। স্বর্গে যাওয়া তো সকলের পক্ষে সম্ভব নয় তাই স্বর্গের এ বৃক্ষকে প্রতীক করে একটি বৃক্ষের শাখাকে কল্পতরু হিসেবে তৈরী করা হয়। এই বৃক্ষে ভক্ত নরনারী বিভিন্ন দানীয় সামগ্রী বেঁধে দেয় কাগজের টাকাও বেঁধে দেয়। ছাত্রছাত্রীরা কাগজ, খাতা কলম বেঁধে দিয়ে জ্ঞানার্জনের জন্য কামনা করে। বৃক্ষে দানীয় সামগ্রী বেঁধে দেয়ার সময়—মনে মনে কোন কিছু কামনা করলে তা পূর্ণ হয় বলে বিশ্বাস। এ বৃক্ষ সংঘকে দান করা হয়।

৫। **মাঘী পূর্ণিমা**— এই পূর্ণিমাকে আয়ু সংস্কারের তিথিও বলা হয় কেননা এ পবিত্র দিনে বুদ্ধ বৈশালীর ছাপাল চৈত্যে তাঁর পরিনির্বাণ দিবস ঘোষণা করেছিলেন। বুদ্ধ শিষ্যদের ডেকে বলেছিলেন হে ভিক্ষুসংঘ! আজ হতে তিনমাস অবকাশে (অর্থাৎ পবিত্র বুদ্ধ পূর্ণিমায়) তথাগত পরিনির্বাণে প্রবেশ করবেন। তোমরা অপ্রমত্ত হও, ঋদ্ধিমান ও সুশীল হও। এ দিন অনিত্য ভাবনার দিনও।

৬। **ফাল্গুনী পূর্ণিমা**— বুদ্ধত্ব লাভের একবছর পর গৌতমবুদ্ধ এ পবিত্র তিথিতে নিজ ভূমি কপিলাবস্তুতে আগমন করেছিলেন। তিনি তখন তাঁর জ্ঞাতিবর্গের সাথে মিলিত হয়েছিলেন। বুদ্ধের স্বভূমিতে প্রত্যাবর্ত্তনের স্মৃতিকে ধরে রাখার জন্য এই দিনটি পালন করা হয়। এ তিথিকে জ্ঞাতি সম্মেলনের তিথিও বলা হয়। বুদ্ধ বলেছেন জ্ঞাতিগণের ছায়া সুশীতল।

৭। **চৈত্র সংক্রান্তি**— চৈত্র মাসের শেষ দিনটি বৌদ্ধেরা চৈত্র সংক্রান্তি হিসেবে পালন করে। সংক্রান্তির আগের দুদিন থেকেই প্রতিটি বাড়ীতে সন্ধ্যায় ও শেষরাতে 'জাক' দেয়া হয়। জাক শব্দটি জাগরনী শব্দ থেকে উদ্ভূত বলে মনে করা হয়। এ জাক

দেওয়ার সময় বাড়ী থেকে রোগ শোক দূরীভূত হওয়ার জন্য প্রার্থনা করা হয়, ধনসম্পদ ও সমৃদ্ধি আগমনের জন্য কামনা করা হয়। কেঁয়াফুল, বিষকাডালী, নিমপাতা, লতাপাতা শুকানো খড়ের সাথে পুড়িয়ে ধোঁয়া সৃষ্টির মাধ্যমে যে আয়োজন তাহাই জাক। বর্ত্তমানে বৌদ্ধদের এই স্বকীয় সংস্কৃত প্রায়ই বিলুপ্ত অথচ এর আবেদন অত্যন্ত গভীর। বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে জাক দেওয়ার মধ্যে বসন্ত রোগের জীবাণুকে ধ্বংস করার প্রচ্ছন্ন ইংগিত লুকিয়ে আছে। এদিনে গৃহপালিত পশুদের স্নান করিয়ে গলায় কেয়াফুলের মালা পরানো হয় বাড়ী, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে চৌখাটে, আলমিরায়, ধানের গোলায়ও মালা পরিয়ে দেওয়া হয়। এদিন প্রতিটি বৌদ্ধ বিহার পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করা হয়। বুদ্ধমূর্তিকে দুধ আর ডাবের জল দিয়ে ধৌত করা হয়।

এ তিথি দূরকে নিকট, পরকে ভাই করার তিথি।

এ ছাড়া বৌদ্ধদের মধ্যে নিম্নলিখিত পর্ব পার্বনও পালিত হয়—

ক) মানত দেওয়া

খ) ওয়াইক (ভিক্ষু পরিবাস, ভিক্ষুদের পরিশুদ্ধির অনুষ্ঠান)

গ) সংঘদান

ঘ) অষ্ট পরিষ্কার দান (ভিক্ষুদের নিত্যব্যবহার্য আটটি দ্রব্যকে অষ্ট পরিষ্কার বলা হয়-সেগুলি হল-তিনটি চীবর, ভিক্ষাপত্র, সূচ সুতা, কোমর বন্ধনী, জলছাকনী ও ক্ষুর এ গুলিই ভিক্ষু সম্পত্তি। বৌদ্ধেরা ভিক্ষুদের এগুলি একত্রে দান করে তার নাম অষ্টপরিষ্কার দান।

ঙ) প্রব্রজ্যা প্রদান (শ্রমণ করানো অনুষ্ঠান)

চ) উপসম্পদা প্রদান (শ্রমণ থেকে ভিক্ষু হওয়ার অনুষ্ঠান)

ছ) হাতে খড়ি দেয়া অনুষ্ঠান (বৌদ্ধেরা একটি পুণ্যময় দিনে ছেলেমেয়েদের হাতে সর্বপ্রথম বই খাতা তুলে দেয়। তখন এই অনুষ্ঠান হয়।)

উল্লেখ্য যে প্রতিটি উৎসব ও পার্বনে বৌদ্ধেরা বিহারে বিহারে সমবেত হয়-বুদ্ধ পূজা করে ভিক্ষু সংঘ পিন্ডদান করে, শীল গ্রহণ করে, উন্নত খাদ্য রান্না করে, অতিথি আপ্যায়ন করে-বুদ্ধ মূর্তির সামনে বাতি জ্বালায়।

আয়োজিত হয় ধর্মসভা, প্রকাশিত হয় স্মরণিকা, পরিবেশিত হয় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। কোন কোন গ্রামে বুদ্ধকীর্তনও পরিবেশিত হয়। বেতার ও টিভিতে অনুষ্ঠান হয়। রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী এবং বিরোধীদলীয় নেতা বাণী প্রদান করেন। তাঁরা নিজেদের কার্যালয়ে বৌদ্ধদের সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করেন। প্রতিটি উৎসবের সময় বৌদ্ধ-বিহারগুলি মুখরিত হয়। কীর্তন বৌদ্ধদের স্বকীয় অথচ তার চর্চা উঠে যাচ্ছে।

SECOND PART

THE WONDER THAT WAS JAGAJJIVANPURA

Dipak Kumar Barua*

The ruins of a Buddhist monastery at Tulabhita in Jagajjivanpura (Latitude 25^0 02' 24" North and Longitude 88^0 24' 82" East) lies in the heart of Borind, uplands with barren soil and a very low water table, forty kms. to the south-east of the town of Malda. Before this discovery, Maharajadhiraja Mahendrapala was not known to have existed as a scion, let alone a ruler of the Pala Dynasty, but it was this same religious minded Pala king who donated acres of land to his General for the construction of a Buddhist monastery which was probably much bigger than the Nalanda Mahavihara at Nalanda in Bihar and was stretched right into Bangladesh.

From Malda town, the village of Jagajjivanpura might be approached by a metalled road, passing through the Bulbulcandi-Habibpur–Kendapukur–Bahadurpur. On the border between India and Bangladesh flows the River Punarbhava and on the west, north and east sides lies Varendi canal and are the water-spreads (*bils*) called the Yugir Bil, Sasuḷi bil and Nandagarh Bil.

The morning of March 13, 1987 totally changed the ambience of Tulabhita, where the villagers were poor refugees uprooted from Faridpur in Bangladesh, and to facilitate the excavation work, had to be rehabilitated at nearby Chand-Khagra. On that morning, one Jagadish Chandra Gain ventured out to repair the boundary wall of his residence and while digging, he hit something hard and what he finally discovered was a copper plate, the size of which he had never seen before and had no impression about. His neighbours thought it to be a part of an old crown and so he and others went off to inform the officer-in-charge of the Habibpur Police Station, who handed over the same to the Assistant Curator of the Malda Museum, where the plate was locked away in a vault. But the work of excavation at the site after declaring it as a protected place started by Directorate

* Dr. Dipak Kumar Barua M.A, PRS, Ph. D. Former Professor of Pali, Calcutta University and former Director, Nava Nalanda Mahavihar.

of Archaeology and Museum, Government of West Bengal, only sometime in late 1990, though on a low key without the use of sophisticated equipments. A miniature bronze Buddha of 4.4 cm. 2x 3.4 cm. seated on a lotus in the *Bhumi-spars'a-mudra* with the left hand touching the earth containing a Buddhist aphorism : Yeh Dhammah hetuprabhavah, 'the states which are due to the Law of Causation', inscribed on the halo surrounding it, was discovered. Besides, a light grey coloured stone statue of Buddha used to be worshipped under a tree in a nearby locality called Purbapara was found. These findings were kept in the vaults of the Malda Museum.

So far the five, as described in local parlance, *dangas* or *bhitas*, 'mounds', had been explored, namely, (a) Tulabhita, previously called Salaidanga (from east to west 87 metres and from north to south 80 metres and above 5.55 metres high from the plain land) ; (b) Akharidanga or Akhirdanga (from east to west 28.28 metres and from north to south 72.29 and above 2.50 metres high from the plain land) ; Nimdanga (from east to west 28.28 metres and from north to south 40.86 metres and 2.40 metres high from the plain land) ; (b) Maibhita or the mound of King's mother (from east to west 22.15 metres and from north to south 21.75 metres and the 30 metres high from the plain land) ; (e) Laksmi-mound (from east to west 110 metres and from north to south 78.58 metres and above 2.65 metres high from the ground level) with a raised, round-shaped mound of 35.50 metres × 32.80 metres in the middle of its archaeological spot. Apart from these, there were many other archaeological sites which had been identified in the Mauza of Jagajjivanpura. It might be probable that after the destruction of this Monastery by the foreigners, the inmates moved to Nalanda where they would have developed a system of maintaining their own armed guards. However, it became evident that the site under review closely approximated several monasteries at Nalanda. Probably the Jagajjivanpura monastic establishment had been built around the Ninth Century A.D.

The archaeological excavations began in right earnest in 1992 at Tulabhita which had been protected by a barbed wire fence and to facilitate the exploration, 256 trenches had been dug, each one spaning six metres by six metres, and each specifically named as A1,

XA1, YA1, ZA1 and the like. The grid pattern had been followed along the lines of a model set up by Mortimer Wheeler, a renowned archaeologist.

The entire site inspired awe and wonder because of its sheer size, the extremely hardy masonry and exquisite design. The explorations from 1992-93, 1995-96, 1996-97, 1997-98, 1998-99 at Tulabhita had unfolded a number of monastic cells with niches facing a rectangular courtyard with a verandah which was connected by 1.70 metres wide path of tiles. Because of this path, entry into the monastery became easy and the inner wall was protected from water. After subsequent digging, a staircase, a paved circumbulatory passage, circular corner cells and a round-shaped structure supposed to be a well were unearthed. There was probably a modest shrine alongwith the circular cells. But nothing of the superstructure had survived. It might be that most of the areas had been systematically destroyed by the people of Tulabhita in the 20th century to cater for their own house construction. Initially, circular brick structures alternately identified with the corner stupa, were characterised by the receding forces of bricks. Stone was rarely used here since only two pieces of stone had been unearthed at this spot. When the monastic establishment was fully excavated, it was witnessed that its ground-plan was almost square inside and its size was 23.5 metres (east to west) × 24.5 metres (north to south) as traced in the square ground-plan of the Buddhist monasteries of Eastern India including those of Lalitagiri and Udayagiri in Orissa. Till recently 19 cells had been discovered —— in the East 8, South 4, North 7, —— which were of unequal sizes. The size of the cell-doors was almost the same, i.e. 1.00 metre. Inside the first cell there was a niche of 1.05 metres high. From the floor to the roof of the cells, it was found that there was an alignment of 40 bricks which were of different shapes and sizes. But generally, bricks of 26 × 24 × 8 cm. had been used in the construction. After the excavation of the first cell at Tulabhita it was discovered there were two phases of architectural planning. At the first phase, a large door of 1.24 × 1.28 metres was put in the western side of the cell. This door was closed at the second phase when it was raised due to reconstruction. But very little remains were in existence, today. Outside the wall of the Monastery on all corners

except the one on the south-west there were rounded bastion-cum-cells, each of 19.60 metres and 3.50 metres high from the ground level. In case of these cells also two phases of construction were noticed. The same entrance doorway which was shut down later, was found also in the Vikramasila (Anti-chak) Mahavihara.

The Entrance–Gate of Nandadirghi-Vihara was completely destroyed. Probably it was on the eastern side. The same was connected by a stairway from outside. From inside the Entrance-Gate was interlinked by two rooms-Front Porch and Rear Porch. The Front Porch measured as 10.20 metres from north to south and 3.50 metres from east to west. The breadth of the door in between the Porches was 2.00 metres. Having crossed the Main Entrance one had to enter into the Front Porch, thereafter one would be able to enter into the Rear Porch and the Verandah which was of 3.00 metres. From the Verandah one would have to come down through stairway to the courtyard. Since the Courtyard was lower than the surrounding Verandah, in the east and in the west two stairways were arranged. On the northern side of the stairway in the west a sewer and in front of it, a small tank were discovered. It was presumed the sanctum sanctorum was situated in the western corner. Behind the Verandah near the western staircase a structural object resembling a raised monument had been witnessed. It was thought that on it, was once placed an image of Buddha, because a pathway circumbulating this image was also discovered.

The excavations had revealed a large number of terracotta rectangular plaques made of fine lavigated red clay, often with micaceous compound, measuring between 31 × 23 × 6 cms. and 26 26 × 25 × 5 cms. and presenting a broad range of sacred and decorative themes with the depiction of divinities, men, women, birds, beasts and decorative motif. The figure of a lion described on one of such plaques was probably the best. Also an image of Marici, a Buddhist goddess, was discovered on May 12, 1998 from the Cell No. XIII. The goddess was standing on the chariot which was carried by seven pigs ; she had three heads—the front face represented the calmness, the right head the pig and the left ferociousness. Also she had six hands. Besides, about twenty-three round shaped seals had been discovered. Among them only five were in decent condition. In

some cases, some personal seals with the inscription of *Vajradeva* were also discovered. The word *Nandadirghi* on the seals became prominent. In fact, when exposed in totality this would be one of the largest Buddhist monastic complexes in Bihar and ancient Bengal. The most spectacular view of the region is a large water reservoir called Nandagarh Bil, which becomes full to the brim during the monsoon and the River Punarbhava which marks the border of Malda in India and Rajshahi in Bangladesh, flows through this Bil.

The exploration had completely rewritten the history of the Pala Dynasty of Bengal. Till the discovery, it was not known that there was a ruler called Mahendrapala belonging to the Pala Dynasty. On the contrary, King Gopala was thought to be the first of the line followed by Dharmapala and then Devapala, ending with Surapala. Through this find it was known that Surapala was in fact the fifth king, and king Mahendrapala became the fourth in Pala Dynasty.

But the most striking discovery in the area was a huge and exquisite tamrapatra, 'Copper Plate Charter', weighing about 12 kgs. which the local people originally thought to be a crown of sort. This Copper-plate measured 53 cms. in length and 39 cms. in breadth and was 0.75 centimetre thick. The Jagajjivanpura Copper Plate had been placed between the Nalanda Copper Plate Charter of the 39th regnal year of King Devapala and the Mirzapur Copper Plate Charter of the third regnal year of S'urapala I. The Copper plate declared that Maharajadhiraja Mahendrapala, son and successor of Devapala, from his victory camp, Kuddalakhataka, of Pundravardhana Province in the seventh regnal year, announced before his officers on the occasion of a land grant ceremony for the construction of a monastery under his patronage of General Vajradeva at Undranga (*Udranga* meaning rental land, probably situated beside a tank known as Nanda). The Monastery was erected by Vajradeva for the people to worship *Prajnaparamita* and other Buddhist deities evidently belonging to Tantric Buddhism. The maintenance of the place was left to the Bhikkhus, 'Buddhist monks'. There were forty written lines on the obverse and 33 lines on the reverse, the last being the shortest in the Copper plate. The script used was *Siddhamatrika* of the ninth century and the text, both in prose and verse, was written in Sanskrit. A circular seal of mixed metal

measuring 19 cm. by 21.8 cm. is attached to the upper portion of the Copper plate. The round seal in the upper half—the *Dharmacakra* flanked by two deers—was the royal insignia of the Pala rulers and in the lower half mentioned the name of the ruling monarch, S'ri Mahendrapaladevah, with a floral design below. The seal was placed on a lotus pedestal surmounted by an ornamental flame design. This solitary monastic seal with the *Dharmacakra* and the deer bearing the name of the Monastery confirmed its identity. Inscribed in the old characters of Eastern India it read *S'ri Vajradeva karita Nandadirghi Vihariya Arya Bhiksu-Sangha (sya)*. It was the official seal of the Venerable Community of monks who resided in the Monastery founded by Vajradeva. After the incision of the words *Siddham* and *Svasti* in the Copper plate the main theme had been introduced. The Copper plate consisted of thirty-four stanzas. In the stanza I the worship to Lord Buddha had been recorded ; from the stanzas II-XVI genealogical list of the Pala king from Gopala, the founder of the Pala Dynasty, up to Mahendrapala would be obtained ; from the stanza XVII a detailed description of the land-grant had been supplied ; the stanzas XXVIII to XXX it had been recorded that the said land-grant, as already stated, was issued by 'Maharajadhiraja Mahendrapala Deva' from the 'Kuddalakhataka Visaya' in the 'Pundravardhana-Bhukti'. The focal theme of the long description, found in this Copper-plate was that Mahendrapala, son of Devapala, granted a piece of land attached to the 'Nandadirghila-Udranga-Mahavihara' for the worship of the Buddhist gods and goddesses and for meeting expenses due to oblation, shelter, garments, alms, beds, medicines and the like at the request of General Vajradeva. As already stated the inscription belonged to the reign of Paramasaugata Paramesvara Paramabhattaraka Maharajadhiraja S'ri Mahendrapaladeva meditating on the feet of Paramasaugata Parames-'vara Paramabhatiaraka Maharajadhiraja–S'ri Devapaladeva. From the lines XVI to XVII Mahendrapala was described as the son of Devapala begotten on Mahata, daughter of Chahamana ruler Durlabharaja. Till the discovery of this Copper plate it was known that Mahata was married to Devapala and that their son was Surapala. This information was obtained from the Mirzapur Copper plate which also proved that S'urapala, son of Devapala, and

Vigrahapala, mentioned in the Bhagalpur Copper plate of the reign of Narayanapala, were different personalities. But in the newly discovered Jagajjivanpua Inscription S'urapala was mentioned as the *dutaka*. Thus from the expression *Saumitrir iva Ramena* it became evident that S'urapala, the dutaka of this Grant, was the younger brother of Mahendrapala. Hence it appeared that Mahendrapala became the immediate successor of Devapala. The said Inscription was dated in the year 7 of the reign of Mahendrapala. In favour of this remark the following inscriptions of Bihar and North Bengal, which mentioned the name of Mahendrapala may be cited : (a) The British Museum Inscription dated in the year 2 ; (b) the Bihar Image Inscription dated in the year 4 ; (c) the Paharpur Inscription dated in the year 5 ; (d) the Ramagaya Das'avatara Image inscription dated in the year 8 ; (e) The Guneriya inscription dated in the year 9 ; (f) the Bihar Image Inscription dated in the year 9 or 19 ; (g) the Mahisantosh Image Inscription dated in the year 15 ; and (h) the Dhigwa Dubauli Copper plate Inscription dated in the Vikrama Samvat 955, i.e. A.C. 898. It should be noted that only the Dhigwa Dubauli Inscription which was dated in the V.S. 955 recording the land-grant in Sravasti-Visaya could be ascribed to the Pratihara king Mahendrapala. On the other hand, the Siyan Inscription of the reign of Nayapala referred to King Mahendrapala who had caused to erect the Temple of Ćharcha. In all the above mentioned epigraphic evidences Mahendrapala had been identified with Mahendrapala, the Pratihara king and thus it was presumed that the Pratihara king had succeeded in capturing the throne of the Palas in Bihar and North Bengal. But due to the discovery of the Jagajjivanpur a copper plate it would appear that Mahendrapala, mentioned in the epigraphs bearing dates in the regnal years, should be identified with the Pala king of the same name. Thus it could be remarked that all the inscriptions of the Pala kings before the reign of Mahipala I were dated in the regnal years, while the Inscriptions of Pratihara kings mentioned the dates in the Vikrama samvat. With such observations the following remark should be examined : "Thus the theory that the glory of the Pala empire did not survive the death of Devapala has to be revised. Both Mahendrapala and Surapala (I) were able to keep up the imperial fabric intact." For the following five reasons the

Jagajjivanpura Copper Plate Inscription became very significant : (a) this was for first time known to the scholars that there was a king named Mahendrapala who belonged to the Pala Dynasty ; (b) during the 9th Century A.C. 'Pundravardhana–Bhukti' was divided into 'Kuddalakhataka' and 'Darddarimandala' for administrative purposes ; (c) it contained a list of the names of the predecessors of Vajradeva, General of King Mahendrapala ; (d) King Dharmapala with the active co-operation from Narayanadeva, father of Vajradeva, conquerred 'Darddarimandala' and annexed it to the Pala Empire ; and (e) as already mentioned, the word 'Nandadirghi' inscribed on the record was very significant since till no epigraphic record testified to the fact that a Buddhist monastery had been named after a big pond–the sole exception was at Jagajjivanpura with a big pond still called 'Nandadighi' and a bil named 'Nandagarh Bil', a vast water-reservoir. Considering such points of historical importance the work of establishing a site museum near the excavated area had been taken up. Unfortunately through several years of excavations on the site by the Directorate of Archaeology and Museum, Government of West Bengal did not "see fit to divert from the mounds and explore levelled agricultural land. Nor did it feel driven to bring in modern equipments to aid detection. Like the Akharidanga, there's no knowing what other areas may reveal about the Pala dynasty."

EARLY BUDDHIST MONASTIC LIBRARIES IN ANCIENT BENGAL

Pulin Barua*

Introduction

India has been a seat of learing and thought in the ancient past. Since time immemorial Indians have an unbroken literary tradition in the world of civilization and culture. The Vedas, Upanisads, Bhagvat, Sutras, Sastras, Puranas, Buddhist Tripitakas and Jaina Agamas followed by philosophical works of great sages and saints supplemented by a host of other writers inspired ancient Indians to establish and manage libraries in a systematic and organised way, and library in ancient past consisted of collection of books in manuscript (handwritten books) form.

India maintains a long and glorious tradition from the days of Buddha and Mahavira in the organisation of libraries for the maintenance of large number of manuscripts. There were numerous epigraphical evidences and literary accounts of foreign scholars like Fa-Hien, Hiuen-Tsang, and I-tsing about the development of libraries attached to Buddhist monasteries and Jaina Mathas throughout the country. Both the Buddhist and Jaina monk-scholars in monasteries and mathas engaged in literary activities which gave them impetus in establishing bhandaras or storehouses (e.g. Bharati Bhandara and Saraswati Bhandara; libraries in literal sense) for their works for study and research. Thus, quite a large number of monastic centres along with their bhandaras were established in different parts of the country, which subsequently became important religious and cultural centres in ancient India. The inscriptional and literary records also clearly testified that great monasteries endowed with the magnificent libraries at Taksasila, Kashmir, Valabhi, Dudda, Dhar, Patan, Pataliputra, Nalanda, Vikramasila, Somapura, Odantapura, Jagaddala and Kosala were flourished in different parts of the ancient India.

---

* Dr. P. Barua, M. A., M.L.I.Sc., Ph.D. (Cal.) Former Professor & Head Dept. of Library and Information Science, University of Burdwan.

Ancient Bengal

We have already mentioned that both the Buddhist and Jaina monk-scholars in monasteries and mathas engaged in vigorous literary activities which resulted in the establishment of numerous resorts of learning, monastic institutions, bhandaras or storehouse of knowledges. These storehouses of universe of knowledge or bhandaras, more technically known as libraries in later stage, (since last two decades of the 20th century the term 'Library' has been more precisely designated as 'Information Centre' due to 'information or knowledge explosion' in every sphere of human activities) got a further impetus in eastern part of the country, particularly in ancient Bengal. Buddhist monastic eatablishments in this part of the country mainly in Bengal grew up extensively and developed more rapidly and ultimately turned into great education centres and attained great reputation as important religious cultural centres of ancient Bengal. These famous religious settlements, besides teaching, encouraged writing, editing, copying and translating manuscripts of various secular subjects. The libraries that were developed around these monastic institutions containing the grand and invaluable collections not only enabled the thousands of pupils and scholars, both Indian and foreign, to prosecute their studies and research, but also cater to the varied needs and demands of the inquisitive readers and erudite scholars.[2] Here, we will discuss in brief about some of the important monastic establishments in ancient Bengal, which were developed and subsequently turned into great centres of learning endowed with grand and magnificent libraries.

Tamralipta

One of the earliest references to the flourishing condition of Buddhism in Tamralipta is found in a record left by the Chinese pilgrim Fa-Hien, who toured India during the reign of Chandragupta II. We noticed through his itinerary the mention of the twenty-two monasteries in the country of Tamralipta[3] which was same as modern Tamluk in the Midnapore district of West Bengal, about twelve miles from the conflu-ence of the Rupnarayan and the Hooghly. Fa-Hien, in his record mentioned Tamralipta as a seaport, being situated on the seashore. He stayed here for two years copying out Sutras and drawing the pictures of Buddhist image of deities.[4] It might be presumed that it was not possible for a scholar like Fa-Hien to carry on his studies without a library. The

celebrated scholar could not be able to collect large quantity of manuscripts without a library having grand collections. Although there were no archaeological evidences to-day, yet it was certain that there were more than one library in Buddhist monastic establishments of this ancient city of Bengal.

Vikramapuri

According to the Tibetan sources, the Vikramapuri monastery situated in Bengal became an important centre of monastic learning in eastern India. It appears from its name that it has been located in Vikrampura of East Bengal (now Dhaka district in Bangladesh).[5] The monastery most probably was established by Dharmapala, the celebrated Pala ruler of Bengal. Kumarachandra, called Acarya Abadhuta, wrote a Tantric commentary, which was translated into Tibetan by Lilavajra of India and Punyadhvaja of Tibet. It is improbable that Lilavajra who was a disciple of the princess Laksikara, daughter of Indrabhuti of Uddiyana, should be given a higher antiquity than Pala emperor Dharmapala himself. Although no references were available about the collection of manuscripts nor any literary sources to that effect to testify that the Vikrampuri monastery possessed a library with magnificent collections, yet all the circumstantial evidences, to some extent enable us to conclude that the celebrated religious establishment possessed an exquisite collection of literary performances.

Somapura :

The Somapura Mahavihara or monastery, a great seat of Buddhist learning and culture in ancient Bengal was founded by the celebrated Pala emperor Dharmapala. It was also known as Dharmapala Mahavihara of Somapura, and located at a distance of three miles to the west of the Jamalganj railway station in Rajshahi district (Bangladesh). This renowned monastery of Somapura (now known as Paharpura) was really a great centre of learning.[6] According to Tibetan account Dipankar Srijnan Atisa stayed here for years and translated a work by Bhavaviveka into Tibetan in collaboration with Viryasimha and his own Tibetan disciple Nagostsha. Another work in the collection composed in the monastery of Somapura was "Dharmakayadipa-Vidhi" rendered into Tibetan by one Prajnasri Jnanakirti.[7] The references to the handling of such sacred texts in manuscript form by numerous teachers and scholars

in this monastery prove beyond doubt that the ancient Somapura Mahavihara at modern Paharpura is well-equipped with a grand library. But it is sad to note that this monastic establishment with its splendid library was destroyed by fire in the middle of the 11th Century A.D.

Salavana :

The Salvana monastery was probably situated somewhere on the Lalmai-Maynamati mountain range in the Comilla district of the then East Pakistan (now Bangladesh). Archaeological excavation shows that there was a Buddhist monastic establishment which was erected by the Deva rulers of Bengal in the 7th or 8th Century A.D. and the monastery was in great pomp and splendour for many years under the patronage of Buddhist Kings and became a centre of learning like ancient Taksasila and Nalanda universities. Archaeological record further testified that there was a grand and magnificent collection of manuscripts of various subjects in the Salvana monastery which were regularly explored and utilised by the monk-students and teachers of the monastery, and from such a reference it is quite evident that the monastic institution was endowed with a grand library.

Jagaddala :

The famous Jagaddala monastery-the last great seat of Buddhist learning was founded by Rampala, the last illustrious Pala monarch who reigned between 1084-1130 A.D. The historical epic 'Ramacarita' spoke of great monastery (Mahavihara) of Jagaddala which was situated in the ancient city of Ramavati[8] on the banks of the Varendra at the confluence of the Ganges and Karotaya.

The Jagaddala monastery was recognised as a great centre of Buddhist learning and important stronghold of Buddhism during the late medieval period. It too, endowed with a magnificent library, grew steadily under royal benefaction which was recorded by Sandhyakara Nandi, the court-poet of Ramapala in his epic 'Ramacarita'. This monastic library was well-equipped and fully utilised by many scholars, teachers and foreign students alike. Though there was no direct reference in this regard, yet from the names and works of celebrated teachers of this University one can conveniently trace the libraries at Jagaddala, a principal seat of Buddhist learning.[9]

The special feature of the Jagaddala monastery was that many

Tibetan scholars thronged there and translated many Sanskrit books into Tibetan.[10] Though the university had been destroyed by Muslim invasion in 1203 A.D., but in its short span of life it had made significant contribution to learning through its noted scholars who made it remarkable by their writings. Among them mention may be made of Vibhuticandra, who was a great Tibetan scholar and translated many Sanskrit works into Tibetan and Danasila, another renowned scholar who was famous for his profound knowledge of both Sanskrit and Tibetan. He translated into Tibetan more than fifty four works, all of which exercised a great influence on Tibetan Buddhism.[11] Subhakaragupta, another reputed scholar and author had lived here for sometime and wrote a Tantric commentary during his stay at the Mahavihara. Another celebrated scholar Moksakaragupta in the monastery was a Master of Logic, on which he composed the Sanskrit work entitled 'Tarka-bhasa' which was translated into Tibetan.[12] All such information enable us to assumse collection of books (in manuscript form) particularly in Sanskrit. Indeed, such an educational establishment, a centre of great scriptural activity, could not function smoothly without a library.

Saunagar and Balanda :

The Saunagar and Balanda monsteries which were located in Bengal were famous as good repositories of manuscripts. Haraprasad Shastri noticed a place called Balanda Pargana that had once been the seat of a Buddhist monastery, but the place was then thoroughly a Muslim centre. It is known that a Buddhist Acarya named Siddheswar Vanaratna used to live at Saunagar monastery where he translated many works in Tibetan.[13] We find, on the other hand that a copied manuscript of the Asta-Sahasrika-Prajnaparamita was written at the Balanda monastery. The works of composition and copying of this work cannot be done without the help of a library. Thus, these references clearly illustrate the existence of libraries attached to these less known monastic establishments of ancient Bengal.

Epilogue :

Thus, it is evident that the early Buddhist monastic libraries attached to these seats of learning played a conspicuous role in the development of scholarship throughout the world and became the significant partners

of these religious establishments in dissemination and transmission of knowledge all over the country and beyond the region. Besides, these monasteries were developed in later days into educational seminaries, which produced a galaxy of eminent scholars whose fame spread all over the Buddhist lands of Asia through their outstanding works and achievements. But it is a matter of great regret to note that almost all these magnificent temples of learning endowed with grand libraries of encyclopaedic knowledge were destroyed either by fire or due to foreign invasion.

BIBLIOGRAPHICAL REFERENCES

1. Barua, P. Monastic libraries in Ancient India. P. I. (Unpublished Ph.D. Thesis)
2. Ibid, p. 114
3. Legge, J. A Record of Buddhistic Kingdoms, p. 100.
4. Giles. The Travels of Fa-Hien, p. 66.
5. Paul, P. L. The Early History of Bengal, p. 30
6. Barua, D. K. Vihars in Ancient India, p. 164.
7. Dutta, S. Buddhist Monks and Monastries of India, p. 375.
8. Mookerji, R. K. Ancient Indian Education, p. 595.
9. Majumdar, R. C. The Struggle for Empire, p. 511
10. Paul, P. L. the Early History of Bengal, p. 30.
11. Mookerji, R. K. Ancient Indian Education, p. 595.
12. Ibid, p. 595
13. Ray, Nihar Ranjan, Bangalir Itihas, p. 635.

BUDDHIST SCHOLARS OF ANCIENT BENGAL

Saswati Mutsuddy*

INTRODUCTION :

Ancient Bengal had the most precious treasure of Buddhist scholars, particularly during the period of 700-1200 A.D. Buddhist scholars like Santideva, Silabhadra, Santaraksita, Chandragomin, Atisa Dipankara had glorious moments of their achievements.

ANCIENT BENGAL : Its Geography

Vanga[1] is the ancient name of Bengal. Vanga, which is the designation of Bengal proper is mentioned in the *Aitareya Aranyaka* (11, 1, 1, 1 ; cg. Keith, Aitareya-Aranyaka, 200) as well as in the *Baudhayana Dharmasutra* (1, 1, 14). Paninirefers to Vanga in his Astadhyayi (4, 1, 170). The *Bhagavata-purana (ix, 23, 5) and the Kavyamimamsa* (ch. 3) mentioned it as a country. The *Yoginitantra* also mentioned Vanga (2.2.119). In the Tirumalai Rock Inscription of Rajendra Cola of the 11th Century A.D. and in the Goharwa plate of Cedi Karnadeva, Vanga country is referred to as Vangala-desam, which in the thirteenth century come to be called Bangala and in Mahommedan times, Bangla.

According to the Chinese scholars[2] India was divided into Five Divisions, viz., (1) Northern India, (2) Western India, (3) Central India, (4) Eastern India, (5) Southern India. In the Seventh Century[3] the division of Eastern India comprised Assam and Bengal proper, together with the delta of the Ganga, Sambalpur, Orissa, and Ganjam. Xuan Zang[4] divided this geographical area into six kingdoms which he called Kamarupa, Samatata, Tamralipti, Kirana, Suvarna, Odra and Ganjam. According to Sir Alexander Cunnigham, Samatata must be the delta of Ganga ; and as the country was described as 3000 li, or 500 miles, in circuit, it must

* Dr. Saswati Mutsuddy is a Senior Lecturer in the Department of Pali, Calcutta University.

have included the whole of the present delta, or triangular tract between the Bhagirathi River and the main stream of the Ganga.

BUDDHIST SCHOLARS OF ANCIENT BENGAL

Profound Buddhist scholars of Ancient Bengal and their achievements are as follows :

Santideva : There are different opinions about Santideva. One of them[5] is Santideva who belonged to the royal family of Saurastra in the seventh century A.D. who wrote "Sriguhya Samajamahayoga-tantra-vali-vidhi", "Sahaja-giti" and "Citta-Caitanya-Samanopaya" which are prescribed in the Bstan-hgyur. B. N. Misra[6] informs that he was the son of King Kalyanavarma of Saurashtra. He was known as Santivarma in childhood and he was ordained by Bhikkhu Jinadeva of Nalanda. He earned his name 'Santideva' due to his calm behaviour. At that time, Nalanda people requested him to recite some works with artharsha (i.e. with explanation) in the month of Jyeshtha. A simhasana was raised for him in a dharmasala and all the teachers assembled there. Santideva recited his *Bodhicaryavatara* which was astonishment for all. This gives in detail the functions of an incarnate-Bodhisattva. His famous works are—Sikshasamuccaya, Sutra-samuccaya and the Bodhicharya-vatara. The other opinion[7] is that he belonged to Zahor in Bengal and was born in kshatriya family at the time of Devapala. He was responsible for six philosophical and Tantra works in Tanjur. A commentary on the *Chakrasamvaratantra* and *Sahajagititantra* also appear to his name. Once he went to Sriparvata and there he defeated the heretic teacher Sankaradeva. According to Dr. Barua[8] the later one is the responsible for the famous Vajrayana texts 'Siksasamuccaya' and 'Bodhicaryavatara'. Another opinion is that Santideva was known as Bhusuku which was styled as 'Bhu', 'su', 'Ku' meaning he spent his time doing nothing but eating, sleeping and walking about. So, he was despised by all people and teachers of Nalanda. Then, with the blessings of Manjusri he memorised all sutras and became famous for that[9]. But there are still confusion whether both of them are same person or not. At the same time, it was found that senior Virupa was a fellow.

SILABHADRA :

Silabhadra belonged to the family of the king of Samatata (Bengal) and was of the Brahmana caste[10]. Xuan Zang, the Chinese Pilgrim, had preserved the account of the life of Silabhadra who was a great teacher and presided over the Nalanda Mahavihara.[11] He was probably flourished between A.D. 585 and 640. When he grew up, Silabhadra became the student of Dharmapala who instructed him in the Buddhist scriptures.[12] Then he ordained to monkhood. Silabhadra mastered the principles of Buddhism and achieved much efficiency in explaining the subtleties of the sastra. Soon his fame as a great teacher spread throughout India. Then a learned and proud Brahmana reached there from south India to engage Dharmapala in a religious discussion. The thirty year old Silabhadra volunteered to challenge that Brahmana teacher. Taking the permission, Silabhadra ultimately was able to outwit him and to prove the soundness of his own faith. Hearing this, the king of Magadha became highly pleased with Silabhadra and expressed his desire to endow him with the revenue of a city. But Silabhadra humbly said: "The scholar with dyed garments is satisfied with the requisites of his order, leading a life of purity and continence what has nothing to do with a city." But the king earnestly requested him to accept the prize "for the advancement of Buddhism". Finally, Silabhadra accepted the gift on behalf of the Buddhist samgha. He built the monastery and donated above endowment for its maintenance.[13]

Thereafter he became the chief of the Buddhist samgha at Nalanda. At that time "the priests, belonging to the convent or strangers (residing therein) reached to the number 10,000." Then Xuan Zang came from China and became the student of Silabhadra to learn Yoga Sastra and other lessons of Buddhism. After hearing the name of Xuan Zang, Kumara, the king of Kamarupa, at first requested and thereafter threatened Silabhadra to send was the Chinese pilgrim. In order to get rid of an unpleasant condition, Silabhadra ultimately sent Xuan Zang to Kamarupa at the beginning of A.D. 643. Silabhadra was indeed "the greatest Buddhist teacher of his age." He received respect from everybody. He wrote the book known as *Arya-Buddha-Bhumi-vyakhyana* which was rendered into Tibetan. He was a great logician as well.

STHIRAMATI :

Sthiramati was from the east and son of Sudra."[14] He probably appeared during the seventh century A.D. He was a great pandit of the Nalanda Mahavihara and was often associated with Gunamati. He also achieved the titles of 'Upadhyaya' and 'Acarya' for his deep knowledge. He was a disciple and spiritual descendant of Vajradhvaja. He was proficient in Tibetan and so with great ability he translated some Sanskrit texts into Tibetan. He was good grammarian too and rendered into Tibetan some Sanskrit books on grammar. With this instance Bodhisikhara translated the text "Dhatusutra" into Tibetan. In Nalanda, Sthiramati stayed at the temple of Tarabhattarika, the centre of the cultivation of science.[15]

He was the author of : *Sutra alamkaravrtti-bhasya,* commentary on Vasubandhu's *sutra-alamkara.* (mDo × lvi-xlvii). *Trimsaka-bhasya,* commentary on Vasubandhu's *Trimsaka karika* (mDo.lviii.10) *panca-skandhaprakarana-vaibhasya,* commentary on Vasubandhu's *panca-skandha-prakrana* (mDo lix.1) and the like.

At Nalanda, Sthiramati became the teacher of Candragomin, a great scholar of ancient Bengal. He and Gunamati were disciples of Vasubandhu and were senior contemporaries of Xuan Zang. In the Bappapada monastery of Valabhi, these two monk-teachers passed the remaining part of their lives in philosophical studies and literary activities.[16]

SANTARAKSITA :

Santaraksita belonged to the Svatantra Madhyamika school of Buddhism.

He was born "as the son of king of Sahor (Zahor) of Eastern Bengal. "He lived from the time of king Gopala to that of king Dharmapala between A.D. 750 and 820. He was invited to Tibet by the minister of king Khri-sron-lide-bstan. It was said that under his guidance Buddhism made steady progress in that country.[18]

There were probably two Buddhists with the same name Santaraksita. One of them wrote *"Tattva Samgraha"* alongwith the commentary of Kamalasila, available both in Sanskrit original[19] and Tibetan rendering. He might have also written *Vadanyaya-vrtti-vipancitartha* and *Madhyamaka-alamkara-karika* with an auto

commentary which were traced only in the Tibetan translations. In the *Bstan-gyur* were collected some Tantric works ascribed to one Santaraksita who most probably may not be identified with the great logician like the writer of the *Tattva samgraha*. But the Tibetan historians were aware of only one Santaraksita, the teacher of Kamalasila and found no incongruity between one being a keen logician and at the same time an ardent Tantric. Before Santaraksita started off to Tibet, he was staying at the great monastery of Nalanda. According to Sum-pa-"Upadhyaya called Bodhisattva or Santijiva was acting as the upadhyaya of Nalanda." It was not clear why he came from Nalanda to Nepal where khri-sron-ide-btsan's minister Gsal-snan first met him. Bu-ston stated that "In Nepal he met with the preceptor Bodhisattva and invited him to Min-yul".[20]

The following works were attributed to Santaraksita, Santiraksita or Santijiva.[21]

Vajradhara-samgita-bhagavat-stotra-tika (bs Tod. 52)
Asta-tathagata-stotra (bstod. 55)
Madhyamaka-alamkara-karika (mDoxxviii. 4)
Tattva-samgraha-karika (mDo cxiii.1)

CANDRAGOMIN :

Candragomin was born in a Ksatriya family in Varendra (Modern Rajshahi jn Bangladesh)[22]. He was the Buddhist teacher of Nalanda and became the founder of the Candra school of Sanskrit grammar. The Tibetan texts did not distinguish the grammarian Candragomin from the philosopher Candrogomin who wrote a book on logic called *Nyaya-siddhaloka* and also from the Tantric author of the same name, to whom thirty-six esoteric texts were ascribed in the Bstan-hgur. The writings on Candragomin, the Tantric teacher, included mystic stotras in praise of Tara, Majusri and other Buddhist deities, works on Tantric abhicara, such as, *Abhicara-karman, Camu-dhvamsopaya, Bhaya-tranopaya, vighna-nirasaka-pramathanopaya* and a few magical treatises, namely, *Tvara-raksa-vidhi, kustha-cikitsopaya* apparently of a medical character. Taranatha recorded that Candragomin belonged to a ksatriya family in Varendra, dwelt for some time at Candradvipa and came across with Candrakirti, the Madhyamaka commentator, at Nalanda. This Tibetan Historian also noted that Candra's grammar superseded

Candrakirti's *Samantabhadra,* a grammar written in verse and made it obscure. Apart from the Tantric Vajrayana Sadhana and some Sanskrit stotras mentioned earlier, Candragomin wrote a drama entitled Lokananda and an elegant lyrical poem called *Sisya-lekho-dharma* written in the form of a letter to a pupil. His own books included : *Tarabhattarikantarabalividhi, Desnastava Aryavalokitesvara stotra, Candragomi pranidhananama, Candra-vyakarana sutra-nama* etc. Among all these books composed by Candragomin, the greater number belonged to the *Dharani* section of the Chinese Tripitaka. Works like *Raksacakra* and *Akala-marana-nivaranopaya* were nothing but Dharanis and so may be included in the Tantric group.

JETARI

Acarya Jetari, son of Garbhapada, who flourished in the early part of the tenth century A.D. and influenced the Tibetan thought and culture to a great extent hailed from Varendra.[23]

The Tibetan tradition distinguished between a senior and a junior teacher bearing the name of 'Jetari.[24] The senior or Maha Jetari belonged to Varendra, where his father Garbhapada dwelt at the court of king Sanatana.[25] He got from Mahapala the diploma of the pandita of Vikramsila Vihara and taught Dipankara Srijnana the Buddhist texts. The younger Jetari was a Buddhist Tantric sage of Bengal, who initiated Bodhibhagya and offered him the name 'Lavanya Vajra'. It is quite likely that three learned works entitled *"Hetu-tattva-Upadesa", 'Dharma-dharmi-viniscaya'* and *"Balavatara-tarka"* on Buddhist logic, preserved in Tibetan, probably belonged to the senior Jetari, while the junior Jetari was responsible for eleven Vajrayanist Sadhanas preserved in Tibetan.

DIPANKARA-SRIJNANA

The Tibetan sources recorded that the original name that Dipankara got from his parents was "Candragarbha.[26] He was born in A.D. 982 at Vikramapura, a town in the Dacca District of Bangladesh.[27] In 994 A.D. he reached Nalanda and met Avadhutipada (also known as Advaya vajra, Maitrigupta and Maitripa) who was his teacher and was dwelling in a place in the

South of Kala-sila at Rajagrha with Bodhibhadra. With his permission Bodhibhadra left Dipankara there. From the age of twelve up till eighteen (A.D. 994-1000) Dipankara stayed at Rajagrha studying Sastras under his teacher. He was associated with not only Nalanda but also Vikramasila, Odantapuri. He himself wrote and translated many books. He rendered the following texts which are now extant in Tibetan Tan-gyur :

(1) Abhisamaya-vibhanga-nama.

(2) Amrtodaya-nama-bali-vidhi,

(3) Akshbhya-Sadhana-nama.

(4) Asta–bhaya-trana etc.

CONCLUSION :

These short life-sketches of some renowned scholars is an attempt to pay homage to them. Bengal was proud in the past and present for her precious scholars who really brightened her name in India and abroad.

"Na pupphagandho pativatam eti/na
candanam tagaramallika va/satan
ca gandho pativatam eti/sabba
disa sappuriso pavati"[28]

The perfume of flowers blows not against the wind, nor does the fragrance of sandlewood, tagara and jasmine, but the fragrance of the virtuous blows against the wind ; the virtuous man pervades every direction.

NOTES AND REFERENCES

1. Law, B.C. Historical Geography of Ancient India. pp. 267-268 (vide Prakrit inscriptions from a Buddhist site at Nagarjunikonda)
2. Cunningham, Alexander. *The Ancient Geography of India.* P.10
3. *ibid* p. 421.
4. Modern Chinese spelling of Hiuen Tsang.
5. Barua Dipak Kumar, *Buddhist Viharas in Ancient India Part II* (Eminent Teachers of Buddhist Viharas in Ancient India) (unpublished research work), 1969, p. 108.
6. Misra, B.N. Nalanda vol. I. p. 291.
7. *ibid* p. 295

8. Barua Dipak Kumar. *Buddhist Viharas in Ancient India* Part **II** p. 109.
9. Prof. Dorje Sempa (Tr. and Ed.). *The Biography of Eighty four Saints*, Central Institute of Higher Tibetan Studies, Sarnath, Varanasi, 1998 p. 111.
10. Vidyabhusana, Satish Chandra. *A history of Indian Logic* p. 303.
11. Watters, Thomas. *On Yuan Chwang's Travels in India* (1961 e.d.) vol. ii, p. 109.
12. Sahu, N. K. *Buddhism in Orissa* (Bhuvaneswar, Utkal University, 1958) pp. 115-116.
13. Majumdar, R. C. ed. *The History of Bengal*, vol. (i) pp. 679-680.
14. Chattopadhyay, Debiprasad e.d., *Taranath's History of Buddhism in India*, p. 177. 180n.
15. *ibid*, p. 399.
16. Dutt, Sukumar. *Buddhist monks and monasteries of India*, pp. 291-292.
17. Sum-pa, dpag-bsam-l jon-bzan ; ed. by S. C. Das (Calcutta 1908), p. 112.
18. Rockhill, W.W. *Life of Buddha* (London, 1997), p. 220n.
19. Gaekwad's Oriental Series, xxx-xxxi (Baroda, 1926).
20. Bu-ston, *History of Buddhism ;* tr. by E. obermiller. pt. ii p. 187.
21. Chattopadhyaya, Debiprasad (ed) *Taranatha's History of Buddhism in India*, p. 415.
22. Vidyabhusana, Satish Chandra. *A History of Indian Logic*, p. 333.
23. Schiefner. Taranatha's Geschichte des Buddhismus, p. 230.
24. *ibid*, p.230.
25. *ibid*, pp. 230-233, sumpa believed that Jetari was born of a Yogini whom Sanatana kept for Tantric practices.
26. Bhattacarya, Binaytosh. *An Introduction to Buddhist esoterism* (1964 ed.) p. 82.
27. Dutt, Sukumar. *Buddhist monks and monasteries of India*, p. 363.
28. Thera, Narada. *The Dhammapada*, Colombo, 1978, pp. 56-57.

BUDDHISM IN ANCIENT BENGAL AS KNOWN FROM CHINESE SOURCES

Gayatri Sen-Majumdar*

Buddhist monks from China who came to India to visit the holy places and to study the canonical and philosophical texts included Bengal (the undivided Bengal) in their itineraries. The materials they have left in their travelogues are not always precise and adequate but these data throw welcome light on the condition of Buddhism in ancient Bengal and are helpful in reconstructing the history of the same.

The first among the Chinese monks who came to Bengal was Fa-hien. He set his foot on Indian soil in A. D. 399 and stayed here up to A.D. 414. One of his objectives was the collection of Buddhist manuscripts, and the discovery of original copy of the Vinaya text for transcribing the same and introducing it in his country. The only place he visited and now included in Bengal was Tamralipta or the modern town of Tamluk in the district of Medinipur in West Bengal. Fa-hien sojourned here for two years, wrote out his sutras and drew pictures of images. According to him, there were 22 monasteries with residents and thus his evidence is indicative of the prosperity of Buddhism in Bengal in the early part of the fifth century[1].

Fa-hien was followed by Yuan Chwang. He came to India in A. D. 629. He toured India more extensively than Fa-hien and his account is much more detailed than that of his predecessor. The territories which were visited by Yuan-Chwang between A. D. 638 and 645 comprise major portions of Bengal of pre-partition days. The Chinese pilgrim went from Ka-chuwu-khi-lo (= Kajangala= Kankjol, near Rajmahal, Bihar) to Pun-na-fa-tan-na (= Pundravardhana, roughly the Rajshahi division of undivided Bengal) after crossing the Ganga and journeying for over 600 *li* (about 100 miles); from this country he travelled east above 900 *li* (about 150 miles) crossed a large river (most probably the Brahmaputra), and came to Ka-mo-lu-po (= Kamarupa, modern Kamrup or Western

---

* Reputed scholar and author of Buddhism in Ancient Bengal.

Assam, with its capital Gauhati); from Ka-mo-lu-po he went south and after a journey of 1200 or 1300 *li* (roughly 230 or 217 miles) reached the country of San-mo-ta-ta (= Samatata or South-east Bengal); thereafter Yuan Chwang journeyed west for over 900 *li* to Tan-mo-lih-ti (= Tamralipti or modern Tamluk); and from there he travelled north west for over 700 *li* (about 117 miles) to the Kie (ka)-lo-na-su-fa-la-na (=Karnasuvarna) country. Then the pilgrim went to Wu-t'u (ota) or Odra or Orissa.[2]

Yuan Chwang's narrative throws welcome light on the condition of Buddhism in Bengal during his time. He gives us information about the number of monks and monasteries in the territories he had visited. He has further informed us of the Buddhist sects and some of the customs and practices which were current among them. According to him, there were 20, 30, 10 and more than 10 monasteries in Pundravardhana, Samatata, Tamralipti and Karnasuvarna respectively. About the number of 'Brethren' residing at these monasteries the information furnished by the pilgrim is as follows: 'above 3000' in the monasteries in Pundravardhana, 'above 2000' in those in Samatata, 'more than 1000 in those in Tamralipti and 'above 2000' in the Karnasuvarna monasteries. The other territory-wise data preserved in his account are as follows.

> The Brethren of the monasteries in Pundravardhana followed both the 'Great and Little Vehicles'. Twenty *li* to the west of the capital was a magnificent Buddhist establishment the name of which is given in some texts as Po-shi-po. In this monastery, which had spacious halls and tall-storeyed chambers, were 700 Brethren all Mahayanists: it had also many distinguished monks from 'East India'. Near it was an Asoka tope at the place where Buddha had preached for three months, and near that were traces of the four Buddhas having sat and walked up and down. Not far from this spot was a temple with an image of Kuan-tzu-tsai P'u-sa which gave supernatural exhibitions, and was consulted by people from far and near.
>
> All the brethren of the monasteries in Samatata were 'adherents of the Sthavira School. Near the capital was an Asoka tope where the Buddha had preached seven days for devas and men. Beside this were vestiges of a sitting and

exercise place of the Four Buddhas. In a monastery near this spot was a dark-blue jade image of the Buddha, eight feet high, showing all the distinctive characteristics and exercising marvellous powers.

'Beside the capital (i.e. of Tamralipti) was an Asoka tope and near this were the vestiges of the Four past Buddhas' sitting and exercise grounds.

The brethren of Karnasuvarna were all adherents of the Sammitiya School... There were also three Buddhist monasteries (besides the ten mentioned above) in which in accordance with the teaching of Devadatta milk products were not taken as food. Beside the Lo-to-wei (or mo)-chi[3] Monastery, a magnificent and famous establishment, the resort of illustrious Brethren. It had been erected by a king of the country before the country was converted to Buddhism to honour a Buddhist Sramana from south India who had defeated in public discussion a boasting disputant of another system also from South India. This bullying braggart had come to the city and strutted about with his stomach protected by copper sheathing to prevent him from bursting with excessive learning, and bearing on his head a light to enlighten the ignorant and stupid.[4] He prevailed until the king urged the stranger sraḿana to meet him in discussion, the king promising to found a Buddhist monastery if the sramana were victorious. Near this monastery were several topes built by Asoka at spots where the Buddha had preached and also a sbrine *(ching-she)* where the Four Past Buddhas had sat and walked for exercise".

I-tsing, another eminent Chinese traveller, came to India and visited Tamralipta in A. D. 673 (see below). He has left a valuable account of his knowledge and experiences, in which he has stated that as many as fifty-six Chinese priests visited India and the neighbouring counturies during the latter half of the seventh century. One of these priests named Sheng-chi has furnished valuable information about the state of Buddhism in Samatata. In his words: 'The king of the country at this time was Rajarajabhata, who was a fervent worshipper of the *triratna* and played the part of a great upasaka. He used to make every day hundred thousand *slokas* of the

Mahaprajnaparamita-sutra. He also used to take out processions in honour of Buddha, with an image of Avalokitesvara at the front, and make pious gifts. In the city there were more than 4000 monks and nuns in his time.[5]

I-tsing stayed for some time at Tamralipta and his account contains a detailed description of the rites practised by the priests in a Buddhist monastery.[6] He learnt Sanskrit and is believed the have translated at least one Sanskrit Text into Chinese.[7] However, his account offers us a valuable glimpse into the contemporary monastic life at Tamralipta and his description is perhaps largely applicable to the same in other parts of India. Following are the extracts from his account.

> "When I for the first time visited Tamralipti I saw in a square outside the monastery some of its tenants who, having entered there, divided some vegetables into three portions, retired from thence, taking the other portions with them. I could not understand what they did, and asked of the venerable Tashang Tang (Mahayana Pradipa) what was the motive. He replied; The priests in this monastery are mostly observers of the precepts. As cultivation by the priests themselves is prohibited by the great sage, they offer their taxable lands to be cultivated by others freely and partake of the products. Thus they live their just life, avoiding worldly affairs, and free from the faults of destroying lives by ploughing and watering fields.
>
> I also observed that every morning the managing priest (of that monastery) examined water on the side of a well; that if there was no insect in it that water was used and if there was a life in it, it was filtered; that whenever anything , even a stalk of vegetable, was given (to the priests) by other persons, they made use of it through the assent of the assembly; and that, if any priest decided anything by himself alone or treated the priests favourably or unfavourably at his own pleasure without regarding the will of the assembley, he was expelled (from the monastery), being called a Kulapati (i.e. he behaved like a househoider).
>
> The following things also came under my notice. When the nuns were going to the priests in the monastery, they

proceeded thither after having announced (their purpose to the assembly). The priests, when they had to go to the apartments of the nuns, went there after having made an inquiry. They (the nuns) walked together in a company of two, if it was away from their monastery; but when they had to go to a layman's house for some necessary cause, they went thither in a company of four.

I also witnessed the following things. One day a minor teacher (i.e. one who is not yet a Sthavira) sent to a tenant's wife two shang (prastha) of rice carried by a boy. This action was considered to be a sort of trick. The case was brought by a person before the assembly. The teacher was summoned, examined and he and his two accomplices admitted the charge. Though he was free from crime, yet being ashamed he withrew his name (from the assembly), and retired from the monastery for ever. His preceptor sent him his clothing (which was left behind him) by another person. Thus all the priests submitted to their own laws, without ever giving any trouble to the public court. Whenever women entered into the monastery, they never proceeded to the apartments (of the priests), but spoke with them in a corridor for a moment, and then retired. At that time there was a Bhikshu named A-ra-hu-(not Shi') la-mi-ta-ra′(Rahula-mitra) in that monastery. He was then about thirty years old; his conduct was very excellent and his fame was exceedingly great. Every day he read over the Ratnakutasutra which contains 700 verses. He was not only versed in the three collections of the scriptures, but also thoroughly conversant with the secular literature on the four sciences. He was honoured as the head of the priests in the eastern districts of India. Since his ordination he never had spoken with women face to face, except when his mother or sister came to him whom he saw outside (his room). Once I asked him why he behaved thus, as such is not holy law. He replied: 'I am naturally full of worldly attachment, and without doing thus, I cannot stop its source. Although we are not prohibited (to speak with women) by the Holy one, it may be right (to keep them off), if it is meant to prevent our evil desires.

The assembly assigned to venerable priests, if very learned and also to those who thoroughly studied one of the three collections, some of the best rooms (of the monastery) and servants. When such men gave daily lectures, they were freed from the business imposed on the monastics. When they went out, they could ride in sedan-chairs, but not on horseback. Any strange priest who arrived at the monastery was treated by the assembly with the best of their food for five days, during which he was desired to take rest from his fatigue. But after these days he was treated as a common monastic, if he was a man of good character, the assembly requested him to reside with them and supplied him with bed-gear as suited to his rank. But if he was not learned he was regarded as a mere priest; and if he, on the contrary, was very learned he was treated as stated above. Then his name was written down on the register of the names of the resident priests. Then he was just the same as the old residens. Whenever a layman came there with a good inclination, his motive was throughly inquired into and if it was his intention to become a priest, he was first shaved. Thenceforth his name had no concern with the register of the state; for there was a register book of the assembly (on which his name was written down). If he afterwards violated the laws and failed in his religious performances, he was expelled from the monastery without sounding the *ghanta* (bell). On account of the priests' mutual concession, their faults were prevented before their growth.

When I have observed all these things, I said to myself with emotion: 'When I was at home, I thought myself to be versed in the Vinaya and little imagined that one day, coming here, I should prove myself really one ignorant (of the subject). Had I not come to the West, how could I ever have witnessed such correct manners as these!'

Of these above described some are the monastic rites, while others are specially made for the practice of selfdenial; and all the rest are found in the Vinaya and most important to be carried out in this remote period (from the Buddha's time). All these form the ritual of the monastery Bha-ra-ha at Tamralipti."

Among a few other Chinese pilgrims who came to Bengal mention may be made of Ta Cheng-teng and Tao-lin. I-tsing met the former at Tamralipti. Ta Ch'eng-teng stayed at Tamralipti for 12 years, and became an adept in Sanskrit Buddhist texts and on return to his country gave an exposition of the Nidanasastra of Ullanga.[8] Tao-lin also stayed in Tamralipti for three years, acquired a good knowledge of Sanskrit and became a member of the Sarvastivadi sect.[9]

The extracts from the Chinese sources quoted above testify to the flourishing condition of Buddhism in Bengal from the beginning of the fifth century onwards, if not from an earlier period.[10] And among the territories where Buddhism enjoyed popularity Tamralipti seems to have been the foremost, though in later times Buddhism found a more congenial home in Samatata or South east Bengal. As regards the viharas in Tamralipti, neither Fa-hien nor Yuan Chwang mentions any particular one by name, though I-tsing refers to a certain Bha-ra-ha which may be the Chinese transliteration of Varaha. Apparently I-tsing and other contemporary Chinese monks stayed in this Bha-ra-ha monastery, and perhaps Fa-hien also chose it as his seat of learning. Unfortunately, however, excavations have not laid bare foundations of any of these viharas. Yuan Chwang has mentioned two monasteries by name, Lo-to-mo-chi and Po-shi-po, the former in Karnasuvarna and the latter in Pundravardhana. Apparently they were more famous than others in the territories they belonged to. *Lo-to-mo-chi* is regarded as the Chinese transliteration of the Indian *Raktamrttika* and its site has been ascertained on the combined testimony of the sealings bearing the legend *Sri-Raktamrttika-Mahavihara,* the structural remains of stupas and shrines with Rajbaridanga near the Ciruti railway station (since named as Karnasuvarna) in the Murshidabad district. Archaeologically, this vihara was in existence between the fifth-sixth century and the ninth century.[11] The other vihara, *Po-shi-po* or the Indian *Vasibha,* has been located at modern Bhasu or Bhasua lying about four miles west of Mahasthangarh, the site of ancient Pundranagara in the Bogra district of Bangladesh. It may be noted that this Bhasu and its adjoining Bihar villages were marked by extensive ruins. Cunningham, to whom goes the credit of locating the site of the metropolis of Pundravardhana on the basis of Yuan

Chwang's account at Mahasthangarh in 1879[12] identified the great monastery of the Chinese pilgrim with the extensive brick mound (700′ X 600′) of the present Bihar village itself and the Asokan stupa with the solid brick mound at Bhasu Vihar (present Narapatir dhap). He furher identified the vihara enshrining the statue of Avalokitesvara with the small ruined temple to the north-west of the Asokan stupa (present Sannyasir Badi). Curiously enough, no monument in the Samatata region has been met with which answers to the description of Yuan Chwang. The Salban vihara at Mainamati in the Comilla district in the old-time Samatata was founded by Sri Bhavadeva, the fourth ruler of the Deva dynasty who ruled in the first half of the eighth century. But the discovery of foundations of stupas and structural remains as well as Buddhist images from the eighth century onwards seems to confirm the Chinese evidence regarding the flourishing condition of Buddhism in Samatata though this evidence belongs to about a century earlier.[13]

Buddhism was already on the decline in the interior of India, such as in Madhyadesa or the Ganga Yamuna doab. This is indicated by the testimony of Fa-hien. Though in Tamralipti the number of monasteries reduced (Fa-hien noticed 22, while Yuan-Chwang estimated the number around 10), in Eastern India, by and large, the religion of Gautama succeeded in maintaining its popularity. And indeed it received a new lease of life in Eastern India, particularly in Bengal, during the Pala age (mid-eighth century to the mid-twelfth century) when the Paramasaugata Pala monarchs patronised it in every possible way and their example was followed by other Buddhist dynasties like the Devas (e.g., the afore-mentioned Bhavadeva) and the Candras. It was during this period again that Indian art and culture accompanied Buddhism to the neighbouring countries like Nepal, Tibet and South-east Asian countries.

The accounts of Fa-hien, Yuan Chwang and I-tsing show that Hinayana or Theravada Buddhism was predominant during their days, but that it was replaced by Mahayana and its developed form styled Vajrayana-Tantrayana has been amply borne out by Tibetan texts and archaeological remains. The Tibetan texts, for instance provide us with valuable information regarding the monastic-cum-academic establishments of later days like the Vikramasila, Somapura, Odanta pura and Jagaddala. In other words while the Chinese evidence is to be

reckoned with for the history of Buddhism of the pre Pala period, the Tibetan literature is of immense help for that of the Pala age. In the pre-Pala period the list of foreign students and teachers of the viharas of Nalanda and Tamralipti included eminent scholars like Fa-hien, Yuan Chwang and I-tsing. This Sino-Indian intercourse appears to have been petering out on the Chinese side by the middle of the eighth century; China was now replaced by Tibet in the cultural intercourse with India. The academic and cultural exchange missions went on in full swing till the last days of the Palas. Factors responsible for this phenomenon, however, deserve to be pondered over.

References

1. Jame's Legge's translation. p. 100
2. Thomas Watters, On Yuan Chwang's Travels (first Indian edition, New Delhi, 1961), pp. 184-93.
3. The correct form seems to be Lo-to-mo-chi corresponding to the Indian Raktamrta (Sanskrit) and Raktamattika (Pali), which means 'red day], Ibid, p. 192.
4. The figure of such a haughty pundit is met with several Buddhist works. One of the best known of these men is the father of Sariputra the description of whom recalls in several points the passage of our text but Sariputra's father overcomes his competitor in discussion. Ibid.
5. Samuel Beal, Life of Hiuen Tsang, pp. xi-xii; Chavannes, Religieux Eminents (I-tsing). p. 128, fn 3.
6. For I-tsing's account of Bengal, see J. Takakusu, I-tsing (Indian edition New Delhi, 1966). pp. 62-65.
7. P. C. Bagchi, Le Canon Bouddhiqne en Chine, II p. 539.
8. Chavannes op. cit. p. 94.
9. Ibid.
10. For a comprehensive account of Buddhism in Bengal from the earliest times to about 1300 A. D. see Gayatri Sen-Majumdar, Buddhism in Ancient Bengal. Calcutta, 1983.
11. S. R. Das, Rajbaridanga, Calcutta, 1968.
12. For Cunningham's report on Mahasthangarh see his Report of Archaeological Survey of India, XV. For his identification of Pundranagara with Mahasthan, ibid, pp. 104-7.
13. For an account of excavations at Mainamati see A. K. M. Shamsul Alam, Mainamati, Dacca, 1975.

A GLIMPSE OF CARYAPADAS, THE OLDEST BENGALI BUDDHIST PSALMS

Manmatha Kumar Barua*

An unequivocally pleasant surprise it was that the highly respected wise men had at last agreed and decided to declare the Caryapadas and Bauddha Doha & Psalms, written by the Buddhist religious acariyas belonging to the Sahajiya Sect of the seventh and eighth century A.D., were the actual harbingers of Bengali language, as it is seen today. During the time when these glorious compositions were written, the local language used by the people of that region called Vanga, was in fact a medley of Sanskrit, Magadhi, Prakrit and local indigenous dialects. It was the honest and sincere endeavour of those Buddhist adherents that bestowed the local language the unique characteristic, blending the intrinsic philosophy of the then Buddhist way of thinking and the sentiment of those who composed them. From then on, the language grew from stature to stature to transform into one of the finest and mature forms of expression in the history of world literature. And it all owed its credit to those effusive group of writers, dedicated mainly to spread the good words of the Master in their own way.

Now we believe, a brief note of elucidation on the prevailing system of Faith at that period of time in Vanga or Bengal to be precise as we know it today, that prompted these ever-enthusiastic souls to sing the penetratingly moving, hymn-like songs in 'full throated ease', would be a prudent and appropriate approach to give some idea of how Buddhism had played its part in formulating the thoughts and feelings behind the movement which was termed as Sahajiya. Interestingly, the same spiritual tradition, reflected through the rendering of soul-ful melodies, filtered down through the ages, culminating into the later-day Vaisnava culture and creating a peculiarly unique Bengali sect of wandering minstrels, popularly

---

* A former civil servant in U.K., Manmatha Kumar Barua is now a social activist, founder of Ankur Foundation at Shantiniketan. He is an author of books and articles on Buddhism both in English and Bengali.

known as Bauls. Dressed in yellow robes and with a single-stringed musical instrument called Ektara, they wandered along spreading the gospel of love, kindness and compassion whilst invoking the divine inspiration as well as intervention for achieving the ultimate goal of emancipation.

It was decidedly an unfortunate development that as soon as the Buddha had passed away, His Sangha–the Community of monks that He created to apprise and educate the mankind of His message, had been infected and riddled with factionalism and discordance, thereby producing a multitude of groups and sects within themselves. Each group or sect had its own leader or teacher (acarya) who attempted to explain the Lord's teaching in a way that suited his own contrived thinking and understanding, sometimes diluting the original principles with ideas and practices of other faiths, even accepting the deities, quite unfamiliar and inimical to the Lord's Law and incorporating them to worship and obeisance. Although there were many such groups operating in their own respective region, two of them in effect gained most prominence due to their superior manipulating and manoeuvring skill and they were reputedly known as Hinayana and Mahayana. In the latter group again, three acquired unprecedented momentum with continual popular support and acceptance through the ages. The mention of these three, namely Kalacakrayana, Vajrayana and Sahajayana evoked certain alluring sense of romance and mystical propensity with some tantric practices adding to the flavour. And it is the last one, i.e. Sahajayana on which our attention should be focussed as it was the main driving force behind the inspiration that moved those writers to compose the most delightful and lilting verses.

Although it was the assumption that the Sahajayana was the off-shoot of Vajrayana, it certainly did not readily accept the essential requisites of Vajrayana which were, total adherence to various gods and goddesses, incantation of mantras, recourse to meditation, life of austerity and various other ritualistic performances. The followers of Sahaja sect also did not believe in the efficacy of worship and mystical practices as essential to attain the perfect bliss. Their bold pronouncement was, "Thou art a fool ; thou knowest not that the supreme wisdom lies within your body". To them, it was a process

of 'simple' practice, borne through the union of 'oblivion' as the female and 'compassion' as the male which could bring about the ultimate reality of the supreme bliss. Complete control over the senses would lead to the total loss of consciousness about worldly phenomenon of good and evil alongwith the obliteration of very mundane sense of distinction between 'self and others', which then would position itself to the blissful state of 'Sahaja'. To achieve this, according to them, neither an idol nor any mystical formula of any kind or form was required ; while counting beads in a rosary, offerings with incense-burning and candle-lighting, relentless prostration and unendurable meditative postures were all irrelevant and redundant. Proficiency in scriptures and scrupulous adherence and chanting of those mantras contained therein amidst incessant beatings of drum and conch were absolutely unnecesary and futile. Thus the ascetics of Sahaja cult, while on the one hand rejected all kinds of so-called traditional customs and practices, on the other, laid whole-hearted emphasis on the simple form of worship through human body and then religiously following it, by which, they believed, the supreme bliss could be achieved. To take this into further explaining, it was said that, to a Sahaja ascetic, the life of scrupulous austerity and rigidity in adherence to established moral priciples was in reality, some form of negative abnormality which tended to develop unhealthy perversion in the human mind. According to him, the human mind and body always yearned for the enjoyment of all natural pleasures which would unfailingly bring pure bliss and sublime happiness. To strike it home, the Sahaja ascetics claimed in their very own innovative pronouncement : "All spontaneous forms of religious worship must be through the natural human instinct and innate impulse ; for religion is meant for man and not the other way round." Hence the recognition of the supremacy of human 'form' in all its manifested manners and behaviours whereby 'thought' was to be devoted to the natural and unconstrained transformation of the mental and physical passions into graceful sublimation, without unduly repressing them. However, it certainly did not sanction any unscrupulous sexual exploits or perpetrating orgies, but simply wanted in their devotion to allow the basic natural and instinctive desires of human being to fulfil in the

committed aspiration of attaining the sublime state of bliss and happiness through which final emancipation was possible. This is, in brief, the tenet of Sahaja way—a path along which the human nature takes its own lead to the 'ultimate' goal and which is by nature 'easiest' and therefore 'Sahaja'.

It was indeed sheer good fortune that in 1907, Mahamahopadhaya Pandit Haraprasad Shastri discovered an old manuscript in the Nepal Durbar Library which at a later date, he edited, compiled and published in a book-form called 'Bauddha Gan O Doha' (Buddhist songs and Distichs). The book is a collection of verses, mainly sung in those days as songs, written specifically on religious canons and practices of a particular Buddhist sect, called Sahajiya, living mostly in the region of northern Bengal. The songs were also named Caryapadas as they contained instructions on religious practices and customs. However, after Pandit Haraprasad Shastri, some other noted linguists and Indologists took trouble to visit Nepal and searched out more of these songs or padas and they all agreed in unambiguous terms that these Caryapadas were the Bengali devotional songs of the Buddhist Sahaja cult dating from 7th to 10th century A.D. Expectedly these songs are the collection—an anthology of the works of 23 Siddhacariyas : the religious teachers, possessing some spiritual grace. Although, these teachers were basically all Buddhists, they professed and practised various forms and methods of Tantric Yoga, as evident in other groups like in Kalacakrayana and Vajrayana. And as such, on all these verses composed by the Sahajiya group, the Tantric experience had been notably embodied and overtly expressed in candidly metaphorical abundance, often bordering on inscrutable mystery. About the authenticity, linguistic characteristics, the importance of textual meaning and the introduction of lyrical propensity, they were all very thoroughly scrutinized and carefully noted. The highly acclaimed linguistic scholars like Dr. Suniti Kumar Chatterjee, Dr. Mohamed Sahidullah, Dr. Sashibhusan Dasgupta and Dr. Prabodh Chandra Bagchi were all emphatic in their agreements that the language of these songs was definitely Bengali in its infancy and the songs themselves were all of devotional nature, extolling the virtues of the Sahaja cult. The 23 poets whose compositions had been included in the compilation were

all Siddhacariyas or spiritual teachers and they were : Kahnapada or Krsnacarya, Bhusukupada, Sarahapada, Kukkuripada, Luipada, Sabaripada, Santipada, Aryadeva, Kankanapada, Kambalambara, Gunduri or Guddaripada, Catilapada, Jayanandi, Dombipada, Dhendhanapada, Tantripada, Tarakapada, Darikapada, Dhamapada, Gunjaripada, Viruvapada, Vinapada and Mahidharapada.

As it has been explained before, these verses were all composed mainly on mystical religious matters, yet the literary importance and lyrical properties they possessed, cannot be ignored either. The rhymed couplets with their musical notes at the beginning of each carya such as 'raga' and 'ragini' were all indicative of technique of present-day Kirtanas and Baul songs. Indeed the conclusion of the scholars was that the Caryapadas were the oldest specimens of Kirtana variety of Bengali devotional songs. Another most significant contributing factor of these writing was the strong lyrical inclination and presence which greatly influenced the modern Bengali poetry.

The beauty and enchantment of the Caryas, both as didactic outpouring and literary exposition can only be realised and perceived through very careful perusal. Careful because, the reader himself has to be equipped with the knowledge of Buddhist canonical terms and their appropriate use which were extensively put to words both in allegories and symbols. Otherwise, to an untrained and unaccustomed reader, this will entail misunderstanding, leading to misinterpretation of the intended message. If that happens, it will be the most 'unkindest cut' of 'poetic injustice' after all, to those unswervingly faithful acaryas.

We are therefore taking the liberty of quoting a few Caryas herewith, though only representative ones, for the appreciation and understanding of this profoundly thought-provoking work.

1. Carya No-42 by Kahnupda.

(Original)

Cia sahaje suna sampunna
Kandha-biayoe ma hohi bisanna
Bhana kaise Kahnu nahi
pharai anudina tailoe pamai
murha ditha natha dekhi kaara
bhanga taranga ki sosai saara

murha acchante loa na pekhai
dudha majhe lara acchante na dekhai
bhava jai na abai na etu koi
aisa bhabe bilasai Kahnila joi.

(In English)

My mind is in the Sahaja state ;
The Void (Sunna) is complete. Don't be sad
at the disappearance of the Skandhas.
Say, how it can be that Kanha
is no more ; for, day after day he has
entered the three lokas ;
and he is trembling.
Only fools are sad at the sight of decay
of the objects perceived by senses.
Can the rising of waves swallow an ocean?
The fools cannot see the people who
remain in their subtle Sahaja state ;
they donot find the cream that
remains pervading the milk.
In this world entities nothing comes nor goes ;
the Yogin Kanha revels in this thought.

2. Carya No. 43 : by Bhusukupada.
(Original)

Sahaja mahataru phariae tailoe
khasamasabhabe muka koe
jima jale paniatalia bheu na jaa
tima mana-raana samarase gaana samaa
jasu nahe appa tasu parela kahi
ai anuana re jama marana bhaba nahi
Bhusuku bhanai kata Rautu bhanai kata saala eha sahaba
jai na abai re na tahi bhababhaba.

(English translation)

The grand tree of Sahaja is shining in three worlds ;
everything being of the nature of void,
who will bind whom and who will free whom?
As water mixing with water makes no difference ;
similarly the jewel of mind has entered into the sky of Samarasa.

A Brief Sketch of Maghs : As Depicted in Old Records

Jay Datta Barua*

A systematic study of human race, castes, tribes and people in India was for the first time done after the arrival of East India Company. The importance of the knowledge of human society for efficient administration was, perhaps, realized as early as 1807, when the Court of Directors of the East India Company made a formal decision that "such knowledge would be of great use in the future administration of the country". Consequently Dr. Francis Buchanan was appointed by the Governor-General-in-Council to undertake an ethnographic survey "to enquire into the condition of the inhabitants of Bengal and their religion". Since then anthropologically-oriented administrative officers like Risley, Thurston, Dalton, Grigson, Gurdon and many others had been deputed by the British Government to prepare handbooks, gazetteers, monographs, etc., on the tribes and castes of India. While H. H. Risley, Dalton and O'Malley were deputed in East India, Russell was posted in middle India. Thurston and Crooks were kept in southern and northern India respectively. They wrote encyclopedic inventories about the tribes and castes of India in the form of handbooks, gazetteers, and monographs which, even today, provide the basic information about the life and culture of the people in the respective regions. In addition to these works general books on Indian ethnology were also published by administrators like J.M.Campbell (1856), R. S. Latham (1859) and H. H. Risley (1891). Owing to their pioneering efforts, whatever might be of scientific value, a bulk of ethnographic literature was produced and perhaps, it proved helpful to the colonial administrators and also helped in doing subsequent researches.

The work of writing District Gazetteers for the first time (in 1807) was undertaken by Dr. Francis Buchanan who could compile the Gazetteers of Rangpur and Dinajpur only and left the country

* Mr. J.D. Barua, I.C.A.S of New Delhi is a civil servant and specialist on the Subject.

before taking up other districts. The accounts of the various districts of Bengal and Bihar written by Dr. Francis Buchanan contained in what are known as "Buchanan Manuscripts" deposited in the India Office Library, have not been published. Buchanan carried out his exhaustive Statistical Survey during 1807-14. In 1838, or some nine years after his demise, Montgomery Martin compiled and published abridgement of Buchanan's lengthy reports in "Eastern India" consisting of three volumes. The abridgement was, however, considered to be "ill-conceived" and "ill-executed". In 1814-15, Walter Hamilton wrote the East India Gazetter of British possessions, provinces, cities, towns, districts, fortresses, harbours and lakes in present Indo-Pakistan region and Eastern Archipelago'. As far as systematic account of Chittagong was concerned it was included in the Statistical Account of Bengal, Vol. VI written in 1876 by Sir W. W. Hunter. The District Gazetteer of Chittagong was first written by L.S.S. O'Malley, I.C.S. in 1908. He reproduced in his book much of the Chittagong Survey and Settlement Report (1900) written by Charles Allen.

My note on Magh community, the Buddhist people of Bengal, is basically from these and contemporary records. Efforts to study the origin of present Chittagonian Buddhist Society, the Barua group, cannot be taken as complete without undertaking the study of origin of word Magh and the communities represented by it.

On the name Magh

Credit goes to Risley to give elaborate details on the Buddhist communities of Bengal known by ethnologists and administrators by the name of Maghs. He adopted this name as was applied to Buddhists of Bengal by other communities among whom they lived. According to his researches there are several sections of people who are known by name Magh and is basically a popular designation of a group of Indo-Chinese tribes, who describe themselves by the various titles of Maramagri, Bhuiya Magh, Barua Magh, Rajbansi Magh, Marma or Myam-ma, Roang Magh, Thongtha or Jumia Magh. He divided all the above groups into three major branches. These three major branches or groups within Magh have been accepted as such by all the ethnographers even to this day. The three basic classification or sections represented by Magh community are : (i)

The Thongtha, Thongcha, or Jumia Magh ; (ii) The Marma, Mayamma, Roang or Rakhaing Magh ; and (iii) The Maramagri, otherwise known as Rajbansi, Barua or Bhuiya Magh. But it is puzzling despite the classification as such by the administrators and ethnologists or anthropologists none of the groups of Maghs like to be known by this name while introducing themselves to the larger Bengali communities among whom they dwell. The only reason seems to be that the term Magh became synonymous with pirates in Bengal and is now a very insulting sobriquet for which reason they disown this name.

How this name came to be applied to these people is shrouded in mystery. Some ethnographers, anthropologists and administrators are of the view that the name Magh applied only to the people of Arakan, a province in Burma (Myanmar), while still others suggested that application of the name Magh to the people of Arakan is an anthropological error and it should be restricted only to the people who are 'Buddhists of Chittagong' and specifically called by name Rajbansi or Barua, also known as Marmagri. A few early correspondences from the Chiefs of Chittagong to Arakan Rajahs indicate that entire population of Arakan was addressed as Muggs. One of such letter from Warren Hastings to Francis Law, Chief of Chittagong, dated 21st May 1777 and reply from Mr. Law dated 23rd November 1777 is reproduced in REVENUE HISTORY OF CHITTAGONG (1880). For the general information of readers I may record that the records of eighteenth and early nineteenth century used term Mugg for these people. The spelling changed to Magh and Mag in later half of nineteenth century. Some writers are seen using term Mogh for these people now. Portuguese records used term Mogen for them. In dealing with the etymology of names, it is usually held that several tribes (communities) have two or more set of names—one of which is given by their neighbours by which they are commonly known, and another name is used by themselves, and they like to be called by that name only. Again there are some appellations that are derogatory and insulting (or even complementary) in character. All these names are used by the communities around them to address these people.

Sir Arther Phayre was totally opposed to giving name Magh to

Jumias and Marmas who are sometimes called Hill Maghs or Khyongtha of Hill Tracts or Rakhaing Maghs of Cox's Bazaar. He would restrict this name only for the people who are now using 'Barua' for title name. T. H. Lewin called Hill Maghs by name Khyongtha only. Risley however had a different view. According to him "there has been much discussion about the use of name Magh and the question cannot be considered as having been finally settled". The Tribes and Castes of Bengal, 1891, Vol. (ii), page 29 informs that Wilson, followed by Ritter, Fr. Muller, and Colonel Yule, define it as "a name commonly applied to the natives of Arakan, particularly those bordering on Bengal or residing near the sea—the people of Chittagong". A careful study of Arthur Phayre shows he was largely influenced by the Magadha origin theory propounded by the Buddhist people of Chittagong. His view was quoted by Colonel Yule as Maghs derive the name from "*Maga,* the name of the ruling race for many centuries in *Magadha* (modern Bihar). The kings of Arakan were no doubt originally of this race ; for though this is not distinctly expressed in the histories of Arakan, there are several legends of kings from Benares reigning in that country, and one, regarding a Brahman, who marries a native princess and whose descendants reign for a long period." Dalton appears to take much the same view regarding the Arakanese as an outlying branch of the Burmese, and adding that the name Magh is exclusively a foreign "epithet, unknown to the Arakanese themselves". Montegazza follows Dalton on the whole, but seems to look upon the term Magh as rather a tribal name than the general designation of the people who inhabit a particular tract of country.

Arakanese are not Maghs

Arther Phayre, who was then serving as Commissioner in Arakan, had a very valid reason in support of his views. After deep investigations he came to a conclusion that the word 'Magh' was never used by the Arakanese themselves. There was no community in Arakan known by this term. Giving description of people in Arakan in his article 'Account of Arakan' in Journal of the Asiatic Society of Bengal, vol-X, 1841 (page 680) he said they were known by different names in Arakan. The inhabitants were, in the Plains : 1. *Rakhoing-tha.*2. Ko-la. – 3. *Dom.* In the Hills.—1. *Khyoung-tha.*-2.

Kume or kwe-me.– 3. *Kheyng*. –4. *Doing-nuk, Mroong,* and other tribes. No one was called by name Magh. Further, "the *Ra-khoing-tha* and *Khyoung-tha* are of the same race. Like the Burmese their national name is *Myam-ma*, the first appellations here given being merely local, the former signifying inhabitant of *Ra-khoing* country ; the latter, *or Khyoung-tha,* being the name given to those who inhabit the banks of mountain streams within the same villages as the hill tribes, and support themselves by hill cultivation. ...." (page 681). He never referred Khyonghtha or Rakhaing people as Maghs. Phayre added a footnote on page 683 in this article on the people who are now using surname Barua. He said, "there is a class of people residing in the Chittagong district, who call themselves *Raj-bunse*, and in Burmese *Myam-ma-gyee*, or 'great *Mayam-mas*'. They pretend to be descendants of the kings of Arakan, a flattering fiction which they have invented to gloss their spurious descent. They are doubtless the offspring of Bengalee women by Mayammas, when the latter possessed Chittagong, and other districts of Bengal. Their dress and language are Bengalee ; but they profess the religion of their fathers, viz. Buddhism. These people are called Mugs in Bengal."

This commentary shows that Phayre was influenced by the early writers on the community that Rajbansis (Barua), the Buddhist people of Chittagong, were basically Maghs and they originated as 'hybrid' group of people from the Arakanese fathers when they came to possess Chittagong. His further researches on this subject forced him to form a different opinion about the hybrid character of Buddhists of Chittagong. On the application of name Magh to all Arakanese people, he said in *"Note on the name Mag or Maga applied to the Arakanese by the people of Bengal"*, HISTORY OF BURMA, (Page 47, 48) that.

> "The Rakhaing people of Mongoloid race do not know this term. It is given to them by the people of Bengal, and also to a class of people now found mostly in the district of Chittagong, who call themselves Rajbansi. The latter claim to be of the same race as one dynasty of the kings of Arakan, and hence the name they have themselves assumed. They are Buddhists in religion ; their language now is Bengali of the Chittagong dialect ; and they have a distinctive physiognomy,

but it is not Mongolian. Their number in the Chittagong district, by the census of 1870-71, was 10,852 (Hunter's "Bengal," vol.-vi, p. 250). A few are found in the district of Akyab. I was formerly of opinion that these people were a mixed race, the descendants of Arakanese, who, when their kings held Chittagong during the seventeenth century, had married Bengali wives. Further inquiry and consideration have led me to a different conclusion. I now think it most probable that the self-styled Rajbansi descend from immigrants into Arakan from Magadha, and that the name given to them by the people of Bengal correctly designates their race or the country from which they came. It is very probable that one of the foreign dynasties of Arakan came from Southern Bihar, though, from modern jealousy of foreigners, the fact has been concealed by Arakanese chroniclers. The former existence in Southern Bihar of princes having the race name of Maga is an undoubted fact. The researches of Dr. Francis Buchanan, and later inquiries instituted by Dr. W.W. Hunter, show that the kings of Magadha reigned at Rajagriha in the modern district of Patna. They were Buddhists, and that a dynasty of this race reigned in Arakan may be considered to be true. The name Rajbansi has no doubt been adopted by the remnant of the tribe in later times, from a desire to assert their importance as belonging to the same race as the kings of Arakan. This term has been adopted in the district of Rangpur by the Chandalas and other low castes, who had not the reasonable claim to it possessed by the class now under consideration. The name Maga having been extended to the whole of the Arakanese people, who are Mongoloid in race, is an ethnological error which has caused confusion among European writers upon this subject. But this error does not extinguish the fact of people descended from an Aryan race called Maga, who migrated from Bihar, being still in existence in Arakan and the adjoining district of Chittagaon."

Basically even if these references go to the extent of suggesting that name Magh applies to the people of Arakan, a glance of still earlier records restrict the use of word Magh for the community

largely known as 'Buddhists of Chittagong'. The theory of origin of the community from the country of Magadha was very much prevalent in the Buddhist community of Chittagong for some decades before the close of eighteenth century and in the beginning of nineteenth century. But even during those days the Chittagonian Buddhists were hesitant in using the name Magh applied to them by the general communities around them. Countrary to this view these people would reserve this name for the group of people who call themselves by name Marma, Roangs or Jumia etc. On the other hand Marma, Roangs or Jumias would not like to be called by this name at all as this name was not applicable to them in the country of their origin.

Early Maghs were Brahmins

Francis Buchanan (later Montgomery Martin) referring to the papers of Dr. Leyden said, "that gentleman supposes, if I am correct in quoting from memory, that Magadha is the country of the people whom we call Muggs, a supposition in which I believe he is perfectly singular". Francis Buchanan (Montgomery Martin) further revealed that "the term Mugg, these people assure me, is never used, by either themselves or by the Hindus, except when speaking the jargon commonly called Hindustani by Europeans, and it is totally unknown to the people of Ava ; but whether it is of Moslem, Portuguese, or English origin, I cannot take upon myself to say, many words among the natives being now in use as English, which it is impossible to trace in our, or indeed in any other language. The original country of the Muggs, which is the district of Chittagong, although the name has been extended also to Arakan (Rakhain) is by the Hindus called [blank in M S.]" (page 18). HISTORY, ANTIQUITIES, TOPOGRAPHY AND STATISTICS OF EASTERN INDIA ; VOL II, MONTGOMERY MARTIN (1814). The Buddhist people of Chittagong even to this day univocally say that they were having roots in Magadha before shifting to the country of Chittagong or Arakan. They are not alone in this supposition. Some (Burmese) people in Arakan maintain that they were the original people from Magadha who brought the religion of Buddhism in Arakan. They also address themselves as Marmagri.

Dispute does not seem to settle here. It is further disputable whether it was the people from Magadha who migrated to Arakan

and Ava and got name Magh applied to them ; or, there existed some branch of people known by name Maga, who gave their name to the country they inhabited. While discussing elaborately on the Magadha country of yore Montgomery Martin did not even hint any link with the Muggs of Chittagong and Maga tribes that once inhabited the country of Magadha. If the conclusion of Phayre is to be believed that present Buddhists of Chittagong were descendents of Magas then the theory now current among Buddhists of Bengal that Magadha people on getting planted in Chittagong or Arakan got the appellation Magh is certainly wrong. Some groups of people known by name Magh already existed even before coming to the country later called Magadha. These people were imported from somewhere in Central Asia and were planted in place now called as Magadha. Before conversion into Buddhism they were Brahmins and were worshipper of Sun God.

According to Martin the "colony from Sakadwip, first settled in the country called Kikat or South Behar, to which they communicated the name Magadha, from their ancestor Maga". Major Wilford (Asiatic Researches, vol. 9, page 74) referring to a book called Rudrajamal, supposed to be composed by Siva, and published by Parsuram, says "the Brahmans came from Sakadwip to Jambudwip, and after some generations went to Kanyakubja. After some generations they dispersed over different countries, as the Dakshin, Angga, Bangga, Kalingga, Kammrup, Odra, Bata, Magadha, Barandra, Chila, Swarnagrama, China, Karnata, Saka, and Barbara, according as they were favoured by different Rajas. This book mentions no other Brahman". Wilford did not contradict the report of the Rudrajamal ; as the descendants of those, who remained behind in Kikat, might retain the original name of Magas or Sakadwipis. Mentioning about the Sakadwipis narration goes on saying "that in Sakadwipis there were four classes of men : First, Magas, from whom the Brahmans are descended. Secondly, Magadhas, who were the military tribe of the country. Thirdly, Manasas, who were the merchants ; and fourthly, Mangadas, who were the labourers : but none of the three lower tribes came with the Magas from their original country. They still retain the name of Magas". Which country was called Saka he did not elaborate.

Martin's view was that "the most rational derivation of the term Magadha is that given by Major Wilford (As. Res. Vol. 9, p. 32). Samba, the son of Krishna, in order to cure himself of a disease, introduced a colony of Magas or Brahmans from a country called Saka. But Krishna being contemporary of Jarasandha, the introduction of a colony of Magas by his son Samba must have been after the death of Jarasandha". Martin opined that although Jarasandha is usually called King of Magadha, that Madhyadesa was the proper denomination of his empire, and the term Magadha was not given to the territory of his family until its extent was reduced by his overthrow ; but even after that event the kingdom seems to have been more extensive than that to which the term Magadha is ever applied (page 22). "These Magas are supposed to have introduced the worship of the sun, and there are many traces to show that the worship of this luminary is here of great antiquity ; although I suspect that it was rather introduced by the conquests of the Persians under Darius than by the Magas or Brahmans, who probably came from Egypt, the only country I know where the doctrine of caste prevailed, and prevailed as prescribed in the books of the Brahmans, and in a manner quite different from what they have been able to establish in India". HISTORY, ANTIQUITIES, TOPOGRAPHY AND STATISTICS OF EASTERN INDIA ; VOL. I, BY MONTGOMERY MARTIN (1814).

That Magas were not from Magadha roots get the support from a passage in the Ashokan Rock Edict XIII which reads "...... where reigns the Greek King named Amtiyoga and beyond the realm of that Amtiyoga in the land of the four king Tulamaya, Antekina, Maka, and Alikyashudula ....." (translated by Prof. R. Thapar : Ashoka and the decline of Mauryas pp. 255). They have been identified by Prof. Romila Thapar as Antiochus II Theos of Syria (260-246 BC) ; the grandson of Selucus Niketor Gonatus of Meccadoinia (276-239 BC); Maga of Cyrene ; and Alexander of Epirus. (A History of India, Vol-I, p. 73). Since Ashoka had diplomatic relations with those countries it can be easily supposed that their embassy accompanied by several Maga people from 'Cyrene' might have settled in Magadha and followed Buddhism in later times. The word 'Maga' might have travelled with their descendants to Bengal and Arakan.

In ancient time, a good number of Hindu and Buddhist missionaries went to Arakan for preaching religion but in course of time, some of them settled there. In the struggle among different religious groups that followed only Buddhism survived with the support of the ruling class. The Indian immigrants, subsequently, got absorbed into the local population. It is quite probable that the descendants of the said immigrants alongwith local Buddhists began to assert their descent from Magadha. They did so with a view to establishing superiority before the people of Arakan. At that time, most of the people of Arakan were animist by faith. The present term, 'Magh' therefore, seems to be a derivation of Magadha and is used to mean the Buddhists who claim Magadha Origin. At least this is the general belief now.

Present Remains of Maghs

Though the present generation of Barua (Magh) consider that they have descended from the Arian migrants of Magadha to Chittagong, their main thrust is to trace the name Barua derived from the so called 'elder' Arian *(bara ariyo)* race, a concept alien to the Arians themselves. This they have manufactured for their own consumptions and has nothing to do with Arians. This theory appears to be making rounds for not more than seventy to a hundred years. The word Magh being considered highly insulting, they appear to have found a substitute name to identify them with. A reference to the records authored by the people from this community indicate that even a hundred to 150 years ago the name Magh was very much used by the community itself even if there was widespread objection to the use of this name. As narrated by Dr. Ramchandra Barua, "a few Maghs of Chittagong have adopted the title name Barua", *Chattagramer Mager Itihash, (1905).* Gradually efforts were made to replace the name 'Magh' by word 'Bengali Buddhist Community' for identification. *Bangla Sahitye Boudho Dharmo O Samskriti* mentions that *"Mrigalubdho Kahinir prachin kobi Ramraja sambondhe bola hoi tini jatite magh chilen. Chattagramer adhibashi maghgan boudhodharmabolombi. Tanhara 'Raj' o 'Barua' upadhi dharan koren".* Its English rendition reads thus : about the writer of Mrigalubdo story, Ramraj, it is said, was Magh by caste. The Magh people of Chittagong are Buddhists by religion and they use Raj (read Rajbansi) and Barua for surname (p 124-125).

The names, surnames and titles reflect the identity, status and level of aspirations. Many communities have adopted names, titles and surnames of other communities, particularly of those placed higher in the regional hierarchy. This reflects both the process of upward mobility and of sharing among communities of the regional heritage in the cultural-linguistic context. The regional situation also influences the pattern of distribution of names, surnames, titles and nomenclature of exogamous units across communities. There are several writers in this community who maintain that 'Barua' people were one block in sixth century A.D. They shifted to Arakan via Assam. One stream of people remained in Assam and in course of time adopted Hinduism. Another stream migrated to Chittagong via Arakan and remained Buddhist. To say that name Barua (corrupted from boro-Ariyo) was prevalent in the community for several centuries is nothing but an effort towards self-glossification.

Surname Barua and Other Names

Students of ethnology (in India) know that name 'Barua' is present in a wide spectrum of communities. Several communities in India use name Barua. In Assam besides Brahmins name Barua is used by other communities also. Several years ago while functioning as Deputy Director in the University Grants Commission, Delhi I met two professors from Assam who were husband and wife. One was using surname 'Hathi-Barua' and other was using name 'Ghora-Barua'. On the use of this name they informed me that their ancestors were in-charge of elephant division and cavalry division during the time of Ahom kings. Their ancestors retained this designation for their name. The designation "Barua' was created by Ahom kings to defend themselves from outside forces. The Tripura royal dynasty also created designation Barua for use in their forces. These do not indicate the name 'Barua' is corruption of word 'Boro-Ariyo'. In Sweden several people who originated in that country use name Barua. They are in no way connected with the people holding name Barua in Assam or Chittagong. They are Christians by faith. (I got this information through one of my friends who had to be there on official duty and had the occasion to interact with them. He was

a Barua of Assam origin. Later I found these names while surfing in internet for some records from that country). A group of people of African origin in Zanzibar are also found using name Baduwa. Even in India, there are several communities who use this name. For example some people of Rajsthan origin use name 'Barwa' and 'Berwah' as their community name. A different group of people in Uttar Pradesh are also found using name 'Barwa'. In Santhals and Munda communities use of the term Barua as sept name is seen. 'Barwa' is also a sept name in Chakma community. I have found the use of name 'Barua' even in Arabic language. In one article I came across use of name Barua by an Arabic society on education. The article said "the drive to 'purify' education is spearheaded by Barua Rahamani Education Society (BRES), an organization of Islamic leaders with strong Saudi Arabian ties. BRES was registered in 1993. It has already opened 109 madrasas in the State, including 35 in Murshidabad, 22 in Malda, 10 each in Birbhum, North Dinajpur and Nadia. Over 40,000 students attend BRES classes and number is gaining".—India Today 25.6.2001, page–26. It said in another place that "at Beldanga in South Murshidabad, the Barua Ahle-Hadis Education Society begins Arabic lessons at the prep level". Page 27—India Today, 25.6.2001. These references would certainly not approve that term Barua is in restricted use by some communities in Assam and Chittágong. In some references authored by the Bengali Buddhist people of Chittagong it has been said that daughters-in-law in this community use term 'ariyo-ma' corrupted in actual use as 'hajo-aan' to address to their mothers-in-law. But while asserting this it is not kept in view that before adopting Bengali language they were all using Arakanese language and corrupted Chittagonian Bengali became their language much later. The term 'Ariyo' meaning excellent is derived from Pali language and cannot be linked to Arian race. Reason being several years after settling in Chittagong country they adopted Bengali language and dress. According to Walter Hamilton (1828), East India Gazetteer, Vol-I, "These Mughs seem to be the remains of the first colony from Arracan that occupied Tripura, on the re-conquest of that territory from Mahomedans. The men have adopted the Bengalese dress, but the females retain that of Arracan and Ava."

In my conclusion the present Buddhists of Chittagong are from Arakan roots. They migrated to Chittagong some four or five hundred years ago. Before getting planted in that country they were from different groups and not from one composite group. And name Magh has been derived as corrupted form of appellation Mang or Meng. In my researches I discovered that use of name Mang or Meng was widely prevalent in Chittagong among the ancestors of Buddhist communities now using the name Barua. Appellation Mang was generally used to signify royal or aristocratic descent. They were mostly Arakanese in origin. By the end of seventeenth century these people dropped name Mang or Meng and did not prefer to use any appellation. They started asserting themselves as 'Rajbansi' and it was favoured by many of them for name though most of them were without any general name. During my searches I found in one case following names in the genealogy :

Place of Origin : Loungra– (Bengali : "Logora").

(1) Narabodhi—(2) Meng kheyee—(3) Mangkha Meng—(4) Meng Palang—(5) Meng Kheyuo—(6) Meng Kethocheyee—(7) Hyog— (8) Chadaingye—(9) Anga— (10)Kheyaphru (gomasta) — (11) Kalachand (gomasta) — (12) Nanda muhuri — (13) Harish Chandra — (14) Narendra — (15) Dibakar.

Had the last man shown in the list not breathed his last some seven or eight years ago, he would have been seventy-five years of age by now. In my own estimates the first person in the list can be linked to 1500-1520 A.D. The place of origin as shown in the list was Loungra. One of the persons in the lineage (name not shown due to paucity of space) claimed the place Loungra *(Bengali : Logora)* is in Magadha. He could not say anything more then making a mere statement. It appears to me that it was again an effort to ignore Arakan connection. But it is history that Loungra (correct spelling—Loungrett or Laoungkret) was in Arakan and was its capital city from 1237 A.D. to 1404 A.D., before arrival of Marak U period. A total of seventeen kings ruled in this era, starting with Hlama-Phru and ending with Thin-Kha-Thu. Most likely these people had aristocratic origin. I say this on hearsay only. Whether it is true or not I cannot say. They shifted to Chittagong during the period of turmoil in Arakan and made Chittagong their permanent abode.

People from these families are found in several villages in northern part of Chittagong, popularly called as *Uttarcool.* (According to old revenue parlance, the district of Chittagong was divided into two girds or division–Uttarcool, or that part to the north of the Kurnaphoolee river; and Dakhincool, to the south of that river. MEMORANDUM ON THE REVENUE HISTORY OF CHITTAGONG BY H.J.S. COTTON, (1880). Present generations do not seem to know this fact).

Even much before use of name Barua and Rajbansi some people of this community were using different names. For example, among the forefathers of renowned Dr. Arabindo Barua (1907-1982) was one Phule Tangya. It is said the name Tangya was given to him by the Arakanese kings. This does not appear to be correct. Sir Arthur Phayre mentioned 'Tang-ya' meant hill cultivation only. Thus this word was retained by some settlers on hills who did hill cultivation. It may be that some people with name Tangya migrated to plains and in later times they settled in the area called Pahartoli. This is the reason why several Tangya groups of people in Magh (Barua) community is now found in Pahartoli. In this family following names are found in the genealogy for last 250 years or so : (1) Phul Tangya — (2) Pushka Chand — (3) Nayan Chand Talukdar — (4) Kirti Chand (Jamadar) — (5) Joylal Munshi (Barua) — (6) Gagan Chandra Barua — (7) Dr. Arabindo Barua (born : 1907, died : 1982). This family adopted surname 'Barua' sometimes in the first half of nineteenth century. (Conclusion based on several articles published in 'Dr. Arabindo Barua, 75th Birth Anniversary' 1982).

Some persons in the first half of nineteenth century adopted name Barua. It was widely used in later half of nineteenth century. This is at least apparent from the records of Risley when he says Marmagri Maghs are "otherwise called as" Rajbansi and Barua. Any surname will not become widely prevalent overnight. It takes at least four or five decades to become acceptable. There are other surnames which came into use among the Buddhists of Chittagong. Some people started using appellation Talukdars and Mutsuddis in their name. Name Mutsuddi appears to be in existence even prior to the advent of East India Company. Islam Khan Mutsuddi (1638) was a famous general in Mughul times. Titan, a person of this Buddhist community was appointed as Mutsuddi by the Nawabs of Bengal during

Alawardi Khan's time (1740–1756). He retained this appellation for name, and his subsequent generations are using this name till today, though some have preferred using name Barua or Barua Mutsuddi now. One female progeny from this family tree is now a daughter-in-law in our present family. Many persons of the Buddhist community of Chittagong who were later appointed as Mutsuddies after East India Company took control of Chattagong administration stated retaining name Mutsuddi. Regarding actual job of these Mutsuddies some records speak thus :

> Mutasiddy was basically "A clerk of the cheque, or any writer employed about the revenue". Glossary to the Appendix "The History of Hindostan—Vol-III, Alexnader Dow, 1803.
>
> Mutsaddy is "a writer or clerk" Affairs of the East India Company Fifth Report from Select Committee of House of Commons 28.7.1812 (Walter Kelly Firminger) Vol-I.
>
> Verelst : View etc. Appendix, page 217-18. Verelst explains "Muttaseddee" as a general name for all officers employed in taking the accounts of Government, or any person of consequence".

There were other designations which were connected with collection of revenue. After East India Company took control of the territory of Chittagong Mr. Verelst was appointed its Chief on November 8, 1760 (Took charge on 1.12.1760). Revenue administration was reorganized a few years later. Assignment for revenue collection was given to some people who had conflicting interests in the yield. W. W. Hunter, A Statistical Account of Bengal, Chittagong, 1876, (page 116) records that "there were four distinct classes, each with a separate and conflicting interest in the land. There was first the landholder-in-chief *(Zamindar),* who collected revenue from the number of intermediate holders, and paid into the treasury. Next in order were the intermediate holders *(talukdars),* each of whom gathered in the land-tax for a certain number of villages, but from the villages in their corporate capacity. The village-heads formed the third set of persons interested in the land, under the name of *choudharis.* They collected revenue from the cultivators, each man in his own village, and paid it in a lump-sum

to the intermediate holder or *talukdar.* The actual tillers of the soil held the fourth and lowest rank". There was no principal landholder from this community in Chittagong. Some were intermediate landholders and a few were *choudharies* of the villages. But large portion was of actual tillers with small land holdings or mostly employed on wages. It was from this period only that land records show the holdings in the name of people of the Buddhist community of Chittagong. Name Choudhari and Talukdars have since been retained by some of them.

Position after 1638 A.D.

O'MALLEY furnished graphical details on the community of Barua group of Maghs (also known as Marmagris or Rajbansis) in his works EASTERN BENGAL DISTRICT GAZETTEER, CHITTAGONG (1908). The narration includes their origin and other cultural aspect of the community which suggests that the community came into existence in Bengal in the seventeenth century, and made Chittagong its permanent home. A fraction of the community migrated to other parts of Bengal and nearby district, including Chittagong Hill Tract.

According to his view Chittagong long possessed a large colony of Maghs especially Barua Maghs. Some among them are Hill Maghs whom Arther Phayre and Lewin referred to as Khyonghtha or Jumia or Hill Burmese, others are later immigrants called by name Marma or Rakhaing, and yet another are of mixed birth whom Arther Phayre called as scions of the royal race and called them as Maghs. According to Phayre Magh was a forgotten name that should properly belonging to people of mixed birth. They are known by title name Barua or Rajbansi.

The District Gazetteer records that "CHITTAGONG is the only district in Eastern Bengal in which Buddhism still survives as the religion of a large proportion of the population—a survival due partly to its proximity to the Buddhists country of Burma and partly to its isolation. This isolation has only been broken into in recent years, and in earlier days Chittagong afforded a shelter to Buddhist refugees from other parts of India. In course of time, the Buddhism of its people became corrupted, but there is now a revival, and the Buddhist leaders

are striving to shake off the influence of Hinduism and to put a stop to the Hindu superstitions and observances which have crept in".

O'Malley's account on the Buddhists of Chittagong was basically prepared from the records available in Bengal at that time, and was helped by Babu Nabin Chandra Das, M.A., B.L., Deputy Magistrate and Deputy Collector, a well-known poet, scholar and antiquarian of Chittagong. That view says thus :

> "Buddhism is a living religion in Chittagong proper, in the Hill Tracts, and in Tippera. It was introduced in these districts about the ninth century A.D. direct from Magadha, when the eastern provinces of Bengal, extending from Rangpur down to Ramu (Ramya Bhumi) in Chittagong, were under the sway of a Rajput prince named Gopipala. The Mahayana Buddhism, which about that time prevailed in Magadha and Tibet, was preached in Chittagong by Bengali Buddhists. In the 10th century A.D. Chittagong, in a manner, became the centre of the Buddhism of Bengal. The chief feature of Mahayana Buddhism is that it has taken in the entire Hindu pantheon and added innumerable fancied deities to it. In this enlarged pantheon the ruling deity is Arya Tara (a personification of *Nirvana*), who is identified with Sakti or the female principle. In Tibet she is called *Yum-chenmo,* the great mother ; in Nepal she is personified as *Prajna Paramita* or transcendental wisdom ; in the dialect of the Ramu Ṃagh of Chittagong she is called Phra Tara, Phra being the Burmese equivalent of Arya. The Chittagong people called her Phora Tara, the Magh goddess. From the 10th to the 13th century A.D. Chittagong possessed a mixed population of Buddhists and Hindus, the former being distinguished from the latter by the name Magha, meaning the excellent or blessed a term which is still preserved in Bihar in its original signification. Then came Islam to convert the whole district of Chittagong. About this time, the more earnest Buddhists took shelter in the Hill Tracts, and then converted the hill tribes to Buddhism. In the 17th century, when the Mughals extended their conquest to Chittagong, Hindu settlers from

> Bengal poured in large numbers and founded Chaksala (Chakralashala) which is now called Patiya *Pargana.* The Hindu settlers mostly occupied the places which had been left vacant by the flight of the Maghs. In the beginning of the 19th century, the remnant of the Chittagong Maghs, who had almost forgotten the tenets of their religion, largely took to the worship of Hidnu deities, offering them sacrifices of fowls and pigs in the place of goats and buffaloes. This they continued to do for upwards of fifty years, until at last a Buddhist priest coming from Burma led them back to Buddhism. The degenerate half-Hinduized Maghs had, in the meantime, adopted Hindu and Muhammadan names and titles. They had entirely forgotten the Mahayana doctrines of Buddhism, which their ancestors followed. The modern Maghs have no idea of the goddess Phra Tara and do not worship her, though she has been given by the Chittagong Hindus a place a little outside their pantheon, is propitiated by them with animal sacrifices, and is worshipped under the name of Magheswari, the goddess of the Maghs. The Brahmans of Chittagong now identify her with the goddess Kali, in the form in which, according to them, she was known in Magadha, and call her Magadheswari. The earlier headquarters of the Chittagong Buddhists were at Mahamuni in Pahartali and the later ones at Ramu".

O'Malley also supported the Magadha origin theory that was widely prevalent among the Buddhist community of Chittagong. But it was not a straight connection directly from Magadha to Chittagong. Before migrating to Chittagong they got neutralized in Arakan and became locals there. Subsequently a section of Arakanese were forced to shift to Chittagong due to unstable political condition in Arakan. It is from these people that roots of present Buddhists of Chittagong are traced. They informed O'Malley that they were the descendants from royal race of Arakan. He observed :

> "Buddhism is still a living religion in the south and east of Chittagong among the Barua Maghs, though they have adopted some Hindu customs and ceremonies. These Barua

> Maghs also call themselves Rajbansis or scions of the royal race, because they claim to be descended from the kings of Arakan who migrated from Magadha, the modern South Bihar. The name Maghs is said to be derived from that of the country of their origin, and even the most illiterate Maghs call themselves Magadha Kshattriya on the ground that their ancestors were Kshattriya princes of Magadha. They date back their residence in Chittagong to the time of confusion and anarchy following the death of Sri Sudhamma, King of Arakan, in 1638, when one of his ministers Narapati (Nga Ra Padi) usurped the throne and put to death several nobles and members of the royal family. According to the Maharaja-wang, "during these troubled times, the son of Sri Sudhamma, Naga Tun Khin, made his escape from the town and lived in the wilderness; and certain members of the royal family and other nobles left for Kantha, a place in Chittagong, and settled down there. Of the 100,000 guards who were stationed in Myohammy, 50,000 deserted the king and left the capital, taking with them Naga Lut Roon, who was then a priest, and settled down in Kantha under Naga Tun Khin. Then the Kalas called the governor of Kantha the king of Marmagri". The Barua (i.e., great) Maghs claim descent from these immigrants and are still called by the Arakanese Mramagri or great Maghs, a word which is a corruption of Brahmagri *(Mrama or Brahma,* i.e., the first inhabitants of the world, a term applied to the inhabitants of Burma by the Aryan settler, and *gri,* i.e., great)".

It looks doubtful that people who came in large numbers in the middle of seventeenth century got completely detached from their roots after Mughal forces annexed Chittagong in 1666. At this point of time the Marmagri Maghs branched off in several groups. Some shifted to Arakan and some are now found in Mizoram settlement in India. They are called by name Marmagri only and still maintain their Burmese character. Then why the Marmagri branch which remained in Bengal got a different characteristic that looks more close to Bengali culture. Can a period of five to eight decades after

1666 and the political conditions prevailing then in Chittagong compelling enough that a section which branched off from the main body of Arakanese people should take a different identity totally alien to the parent body? Answer to this is not easily available. That is the reason why Risley said the matter couldn't be easily resolved.

Some present day writers from this community go to suggest that this group of Buddhists in Bengal are the offspring of *'Virjiis'* the Licchavis of Vaisali, Bihar and name 'Barua' is derived from Virjis. This is not true simply for the reason name Barua was thought of and adopted in early nineteenth century as a substitute for name Mang or Meng which was dropped by several of them and a political compulsion was there to abandon Arakanese connection. References to the texts authored by Ven. Dharmmadhar Mahasthavir and Umesh Mutsuddy, two illustrious persons of this community, about the socalled ancestor of this community, Mukut Rai, the governor of Chittagong (1638) is also not supporting a conclusion that they were not Arakanese people. Arthur Phayre's view about Mukut Rai was that the word was actually a corruption of 'Meng Re' which was official title of the governor of Chittagong. Jadunath Sarkar lined him with the royal family of Arakan and as a paternal uncle of Thiri Thudamma Raja (1622-1638) the murdered king of Arakan. S.N.H. Rizvi has different story to tell. According to him Mukut Rai was son of Gaureswar Rai who settled at Kulgaon, Chittagong. His ancestors hailed from Tippera. The descendants of Mukut Rai now live in village Kadurkhil, Chittagong. Further, a comparison of the trend of population figs available since 1872 onwards in respect of this community gives a brief hint that this community came into being in Chaittagong somewhere in 1600 to 1638 A.D. only. Population trend was 11233 (1872, excluding a few hundred in Akyab), 39620 (1891), 51860 (1911). Thus the views of the authorities who say that this Buddhist community is the remains of earlier Arakanese people, who in later times adopted Bengali culture and language appears to be true.

BIBLIOGRAPHY

Walter Hamilton : East India, Vol-I, 1828.
H. H. Risley : Tribes and Castes of Bengal, Calcutta, 1891.
J.A.S.B., Vol-X, 1841.

I.S. S.O'Malley : Eastern Bengal District Gazetteer, Chittagong, 1908.
W. W. Hunter : A Statistical Account of Bengal., Vol-VI, Chittagong, 1876.
Arthur Phyare : The History of Burma, 1883.
Jadunath Sarkar : The Conquest of Chittagong 1666, An I.A.S.H., Vol-III, 1967.
Census of India, 1872, 1901, 1911, 1921, 1931.
Abdus Sattar : In the Sylvan Shadows, East Pakistan, 1971.
Romila Thapar : Ashoka and Decline of Mouryas.
Romila Thapar : A History of India, Vol-I.
Arthur Phyare : J.A.S.B., Vol-X, 1841 (Account of Arakan)
C.G.H. Allen : Final Report of the Survey and Settlement of District of Chittagong, 1888 to 1898.
H.J.S. Cotton : Memorandum on the Revenue History of Chittagong, 1880.
Montgomery Martin : History, Antiquities, Topography and Statistics of Eastern India, Vo.I, and Vol-II, 1810
Wilford : Asiatic, Researches, Vol-9.
India Today, 25.6.2001.
Walter Kelly Firminger : Allexander Dow, Glossary to the Appendix "The History of Hindostan—Vol-III, 1803.
Affairs of the East India Company : Fifth report from Select Committee of House of Commons, (28.7.1812), Vol-I, II, III.
J.P. Mills : Notes on a tour in the Chittagong Hills Tracts, 1928.
R. H. Sneyd Hutchinson : An Account of Chittagong Hills Tracts, 1909.
Allexander MaCkenjie : History of the Relations of the Govt. with Hills Tribes of North Eastern Frontier of Bengal, 1884.
Dr. G. A. Grierson : Linguistic Survey of India, Vol-V, Part III.
B. C. Allen : Gazetteer of Bengal and North East India, 1909.
Mc. Crindle : Ancient India as Described by Magasthenese and Arians, 1877.
C.G.H. Allen : Chittagong Survey and Settlement Report, 1900.
T.H. Lewin : The Hill I. Tracts of Chittagong and Dwellers therein, 1869.
K. S. Singh : People of India, Scheduled Tribes, 1992.
S. N. H. Rizvi, Bengladesh District Gazeteer, Chittagong, 1975. (Bengali)
Dr. Ram Chandra Barua : Chattagramer Moger Itihas, 1905.
Umesh Muchhuddi : Matry Pujae Manaob Dharma, 1926.
Umeswh Mucchuddi : Barua Jaati, 1959.
Ven. Dharmmadhar : Sadharmer Punurthan, 1964.
Bangla Sahitye Boudho Dharmo o Samskriti
Articles published in "Dr. Arabindo Barua, 75 Tam Janmo Jayanti Smaranika 1982".
Abdul Haq Chowdhur : Prachin Arakan, Bangla Academy, Dhacca.
Abdul Haq Chowdhury : Chattagramer Samaj O Sanskriteer Rooprekha., Bangla Academy, Dhacca.

SARAT CHANDRA DAS
AN EMINENT BUDDHIST SCHOLAR

Subhra Barua*

Sarat Chandra Das, the eminent Buddhist scholar, was a pioneer explorer and a pioneer scholar. Besides an adventurous traveller he was also a famous linguist, historian and expert in geography. He was well-acquainted with religious, cultural, economic and political conditions of Tibet.

We find some incidents of his early life from his autobiography **'Narrative of the Incidents of My Early Life'** and from the preface written by his brother Nobin Chandra Das in the author's book **'Indian Pandits in the Land of Snow'**.

When Chittagong was conquered by the Mughals in the year 1666, his ancestors, after getting landed property, moved from the western part of Bengal and began to reside in a village, Alampur in Chittagong of East Bengal (now Bangladesh). Sarat Chandra Das was born in the village Alampur on the 18th of July, 1849 in a Hindu family of the Vaidya or medical caste. He got primary education from a school in Chittagong. On the testimony of his brother Nobin Chandra Das, it is known that he studied up to the highest class of Civil Engineering from the Presidency College, Calcutta. Ill health compelled him to seek a change to Darjeeling in the year 1874. Happily at that time he was selected for the post of the Head Master of the newly started Bhutia Boarding School at Darjeeling. He took up the charge and continued it till 1879, when he went to Tibet. From the introductory portion of the book 'Lhasa and Central Tibet' we have come to know that when he was a student of the Presidency College, he became favourably known to Sir Alfred Croft, the then Director of Public Instruction of Bengal, who ever since had been his friend and guide in his geographical and literary work, and by whose

---

* Dr. Subhra Barua is Rajendra Lal Research Fellow of Asiatic Society, Part-time Lecturer in Pali, Government Sanskrit College, Kolkata and Guest Lecturer in Pali, Calcutta University.

representations to the Indian Government it became possible for him to perform his important journeys into Tibet.

While he was in Bhutia Boarding School he felt a keen interest in Tibetan language, culture and literature and started learning Tibetan from the teacher of the Tibetan language of that school, Lama Ugyen-gyatso and acquired a thorough mastery over it in the course of a few years.

He used to spend his holidays with his pupils, most of whom had their homes in Sikkim, which was of great help to him to make several short trips there in the succeeding years and to establish friendly relations with the Raja of Sikkim, Ministers and many other leading Lamas of that country. He visited Sikkim for the first time in the year 1877.

The account of Indian Pandits who revived and reformed Buddhism in Tibet which he had read in Tibetan works, created in his mind a strong urge to visit this country. Sarat Chandra wrote to the Dalai Lama of Tibet for getting permission to visit Lhasa. At that time his Tibetan teacher and colleague Lama Ugyen-gyatso was sent to Tashilhunpo and Lhasa with tribute from his monastery. Lama took the opportunity and tried to obtain permission from the Tibetan authorities for Sarat Chandra to visit Tibet. Ultimately, Lama was able to obtain from the Prime Minister of the Panchen Rinpoche of Tashilhunpo an invitation for Sarat Chandra to visit that great centre of lamaist learning. Not only that, to ensure his safety and justify his presence in the country in the eyes of the suspicious Lamas and Chinese, the minister had Sarat Chandra's name entered as a student of Theology in the Grand Monastery of that place. A passport was also issued to him by the Prime Minister, by which a choice of roads to enter Tibet was given to him. Armed with these credentials, Sarat Chandra along with Lama Ugyengyatso set out for Tashilhunpo in June 1879 and he remained in the capital Lhasa for nearly six months as a guest of the Prime Minister with whose assistance he was able to make a careful examination of the rich collections of books in the great libraries of Sakya, Samye and Lhasa and bringing back with him to India a large and valuable collection of work in Sanskrit and Tibetan. He also explored during the journey, the country north and north-east of Kanchenjinga which was unknown

before his exploration. Not only that, as a result of this journey a friendly relation was established between Sarat Chandra and the powerful Prime Minister who was deeply interested in western civilization and its wonderful discoveries and desiring to learn much about the wonders of the west from Sarat Chandra, the Prime Minister requested him to come back again to Tashilhunpo.

Sometimes after his return from Tibet, Bengal Government published the account of his first visit, with a preface written by the traveller's friend Sir Alfred Croft. The route, describing in the report, was also followed by the traveller in his second journey. The report bears testimony of historical and religious subjects.

In the year 1880 Sarat Chandra was fully engaged in preparing notes and papers on the history, religion, ethnology and folklore of Tibet, drawn from the data collected during his journey. These papers, most of them of great value to Oriental students, published in the Journal of the Bengal Asiatic Society and in that of the Buddhist Text Society of India which Sarat Chandra founded in the year 1892. The aim and object of the Buddhist Text Society of India was to publish English translation and discussion of the work written in the Pali and the other languages. Sarat Chandra was the Secretary of the Journal published from the Society.

He received a second invitation in the year 1881 from the same Tashi Lama to revisit Tashi-lhunpo. In November 1881,in fulfillment of the promise made to the Prime Minister of the Panchen Rinpoche, Sarat Chandra set out again for Tibet, accompanied by Ugyengyatso, who acted as secretary, collector and surveyor. In his second visit Sarat Chandra again established his headquarter at Tashi-lhunpo and his survey covered the area of Lake Palti (Yamdo tso), both banks of the great Tsangpo, from Sakya in the west to Samye and Tse-tang in the east. He was also able to make a short visit to Lhasa, the holy seat of the Dalai Lama. The Peking correspondent of the London 'Times' wrote about his journeys : *"The Pandit Sarat Chandra Das has made two eminently successful journeys in Tibet. On the last occasion in 1882, the learned Pandit worked himself into the good graces of the most important personages in Tibet and was admitted to audience of the Dalai Lama himself."* His journey to Lhasa had been described in the 'Nineteenth Century' by Mr. Graham Sandberg

in the following words : *"They entered Tibet via Nepal over the dangerous Kangla Chen Pass, 20000 feet high, and after visiting many places and monasteries hitherto undescribed, Mr. Sarat Chandra at length saw before him the glittering domes of mysterious Lhasa. They resided in Lhasa not longer than two months, but he seems to have made good use of that time in visiting everything that was not able and even obtaining an interview with the Grand Lama. The narrative of his travels is really most fascinating."* Though he visited a number of the important monuments of the city, he was prevented from seeing many places of great interests in and around the city for various reasons. Here I quote few lines written by Nirmal Chandra Sinha in the introductory portion of the book 'Indian Pandits in the Land of Snow' : *"Das did not visit Tibet as a prized invitee. His first contacts were incognito and till the end in the eyes of Lhasa authorities he was an agent of a power not friendly to Tibet. It is natural for such an agent to smell stink in the manners and morals who do not welcome him."* Here it should also be mentioned that the British Government was directly involved to organize his journey to Tibet and the main aim of the visit was to collect secret information about Tibet. Sarat Chandra accomplished this work with utmost efficiency. Afterwards Tibetan Government understood Sarat Chandra's motive and inflicted punishment on the people who helped him in this work. But Sarat Chandra satisfied this need by adding in his notes the descriptions left by previous travellers skillfully.

After the visit to Lhasa Sarat Chandra explored the valley of the Yalung, where Tibetan civilization is said to have first made its appearance. After travelling fourteen months in Tibet he returned to India in January 1883. He wrote two excellent books, **'Narrative of a journey to Lhasa'** and **'Narrative of a journey round Lake Palti (Yamdok) and in Lhokha, Yarlung and Sakya'** which were published by the Government of Bengal.

The account of his journey was kept secret till 1890. Then the selected portion of the account was published in an article in the newsletter 'Contemporary Review' in July 1890. The full account was published in the book **'Narrative of Journey to Lhasa and Central Tibet'** in the year 1902. W. W. Rockhill edited the book and it was published by John Moore from the Royal Geographical Society.

In October 1884 Sarat Chandra accompanied by Honourable Colman Macauley, Secretary to the Government of Bengal, went to the Lachen valley in the Tibetan frontier.

In the year 1885, when the Government of India contemplated sending a mission to Tibet for political matters as well as for the cultivation of science, Colman Macauley was sent to Peking to obtain the necessary permission of the Chinese Government to the projected embassy. Because of his linguistic abilities Sarat Chandra Das became an important member of Macauley's team, and he accompanied Macauley to Peking to assist in diplomatic matters connected with Tibet and he remained several months there. He was received with open arms by the Lamas of Yung-ho-Kung, the imperial monastery who accommodated him in the yellow temple, outside the An-ting gate, known as the Hsi Huang ssu and in which all Tibetan traders stop when at Peking. They introduced him to the Tibetan plenipotentiary and the tutor of the Emperor. He wore the dress common to lamas in China and was always called the "Ea-che-lama" or "the lama from Kashmir". His extensive knowledge and experience about Tibet and his polite behaviour helped him to gain friendship of many of the lamas, among others of the Chang- Chia Hutuketu, the Metropolitan of the lama church in China. Mr. A. Michie, Chief Financial Agent to the Chinese Government, also helped him to bé acquainted with the great ministers and chief nobles of Peking and to become successful in gaining the confidence of the Prime Minister Li-Hung-Chang.

After returning to India from Peking Sarat Chandra was given the title 'Rai Bahadur' and 'Companion of the Order of the Indian Empire' by the British Government, for the service Sarat Chandra rendered to Colman Macauley in Peking. In 1887 the Royal Geographical Society awarded him the 'Back Premium' for his geographical researches. After China, he went to Burma. In the year 1887 he went to Shyam (Thailand) to learn the Buddhist religion and literature thoroughly and charmed by his erudition the king of that country rewarded him with the medal 'Tusitamat' (**Bodhisattvavadana Kalpalata**—Introduction). In 1915 he went to Japan to visit Buddhist centres. In this journey he was accompanied by Ekai Koyaguchi, the writer of the book **'Three Years in Tibet'** who was at one time a student of Sarat Chandra Das.

Sarat Chandra was engaged as a Tibetan translator under Bengal Government. He retired from Government service in 1904. Afterwards he was busy in writing, editing and translating books and articles. He expired on the 5th of January, 1917.

When he returned from Tibet in the year 1883, he brought back with him 200 volumes of rare manuscripts or block-prints, a number of them were in Sanskrit. From the source materials and rare collections, some of which India lost for many centuries, he prepared many valuable papers, books, a list of which would occupy several pages. Discovery of literary and archaeological materials in Tibet since the days of Sarat Chandra Das has given us a more connected history of Tibet. We know more about the evolution of the different Tibetan sects viz. Nyingmapa, Kargyupa, Sakyapa and Gelupa. Though he had covered the monasteries of all sects in his tours of Central Tibet, his researches were generally based on Gelupa sources. He translated a large number of Tibetan texts into English.

He edited and translated the great poet Khemendra's poem entitled **'Avadana Kalpalata'** which he had discovered in Lhasa. He edited this in Sanskrit for the 'Bibliotheca Indica'. In this poetical work 108 stories, related to Bodhisattva, were described. A learned man of Kashmir named Sakyasri presented the manuscript of **Avadana Kalpalata** to a Tibetan lama Kun-dgah rgiyal mtsan in the year 1202. After seventy years it was translated into Tibetan by San Tan Lochab. Sarat Chandra Das collected this translation from Tibet. This book is acknowledged as classic in Tibetan literature.

The book **'Indian Pandits in the Land of Snow'** (Ghang-chen, or the land abounding in snow, is a native name for what the outsiders call Tibet) presents the four lectures given by Sarat Chandra Das. 'Pandita was the only acceptable description for an Indian monk- scholar. Eventually Pandita became the proper honorific for Tibetan and Mongal scholars too. The work Pandita thus stands out as a monument of the migration of Buddhism and Buddhist learning into Trans-Himalayan highlands' (Introduction). These lectures carried the authority of the great academician and were informed with data, most of which were Das's own discovery. Considerable part of the book is devoted to doctrine of metempsychosis, the belief in Karma and the institution of Bodhisattva incarnation. This book contains information taken from

Sanskrit, Pali, Tibetan and Chinese sources and gives a picture of Tibet in the last quarter of the 19th century and on all admission Tibet remained much the same till 1950 (First print : 1893 – reprinted in 1965).

His another work **'An introduction to the Grammar of the Tibetan Language'** (1915) is designed not only to help the general reader to grasp the grammatical structure of the Tibetan language, but also the Buddhist scholar who is particularly interested in the vast Tibetan literature which includes almost all the Buddhist works of India.

The monumental work **'A Tibetan-English Dictionary : with Sanskrit Synonyms'** was compiled by him in 1902' and was reprinted several times. In this dictionary he included modern Tibetan words which were not given by Koros and Jaschke. Here the Tibetan words were given in alphabetical order, with their accepted Sanskrit equivalent, followed by the English meaning. All the technical terms were illustrated from Sanskrit Buddhist and Tibetan work. The work represents the arduous labour of the author for twelve years. The great Tibetan scholars Rev. Graham Sandberg and Rev. A. William Heyde gave the work an impression of a Tibetan Cyclopedia, after revising and giving a scientific look to the work.

His works include (some of which I have mentioned before) the following :

- Narrative of a journey to Lhasa in 1881-82 (printed 1885) ;
- Narrative of a Journey Round Lake Yamdo (Palti) and in Lokha, Yarlung and Sakya in 1882 (printed 1887) ;
- Pag-Sam-Jong Sang, History of the Rise, Progress and Downfall of Buddhism in India by Sumpa Khanpo (1908) ;
- Rgyal-Robs-Bon-Gyi-Hbsun Gnas (1915), the history of the Pre-Buddhist or Bon Religion of Tibet. On the basis of the data collected by him, he wrote many learned articles which were published in the Journal of the Asiatic Society in Calcutta and London, the Journal of the Buddhist Text Society of India and other journals. Some of the articles, published in the Journal of the Asiatic Society are mentioned here :-

1. **The Bon (Pon) Religion :** The 'Dub-thah selkyi Melon' contains 12 books. Sarat Chandra Das made a literal

translation of the 8th and 11th books which treat of the Bon religion and the rise and progress of Buddhism in Mongolia. In Bon the 'b' is pronounced as 'p' (Pon).

2. **Dispute between a Buddhist and a Bonpo Priest for possession of Mount Kailasa and Lake Manasa.** It is literally translated from a block-print and is said to be 800 years old.
3. **Early history of Tibet :** The following account of Tibetan history is obtained from the original records of Tibet called Non-gyi-yig-tshan nin-pa.
4. **Tibet in the Middle Ages** (A.D. 917 to 1270).
5. **The Lives of the Panchhen-Rinpochhes or Tasi Lamas :** This obtained from the work of the Indian Pandits who laboured in Tibet.
6. **Life and Legend of Tson Khapa (Lo-SSan-Tagpa), The Great Buddhist Reformer of Tibet**–(He was born in 1378 A.D.).
7. **Rise and Progress of Jin or Buddhism in China.**
8. **Ancient China, its Sacred Literature, Philosophy and Religion as known to Tibetans.** It is a translated work.
9. **Life and Legend of Nagarjuna :** He was great Buddhist Reformer of Ancient India and founder of the Madhyamika Philosophy.
10. Detached Notices of the Different Buddhist Schools of Tibet.
11. **Buddhist and other legends about Khotan :** Buddhist (Indian) legends connected with Li-yul. 'Li' is a Tibetan word, meaning Kansa or bell metal. Yul means a country. The Sanskrit for Li-yul is 'Kansa Desa'.
12. **A brief account of Tibet from 'Dsam Ling Gyeshe', the well known geographical work of Lama Tsanpo Nomankhan of Amdo.** It is a translated work. This paper is a reprint from a report to the Government. It gives a number of geographical details about Tibet and describes the chief places of pilgrimage and monasteries and also contains an interesting description of the city of Lhasa.
13. **The Sacred and Ornamental characters of Tibet.** With this paper may be compared Mr. Hodgson's account of various Newari and Bhotiya characters, published with numerous

plates in the XVIth volume of the Asiatic Researches, 1828.

14. **An account of Travels on the shores of Lake Yamdo Croft (Palti).**
15. **Life of Sum-pa Khan-po also styled Yeses Dpal-hbyor, the author of the Rehumig** (Chronological Table). This great Lama was born in the year 1702 A.D. at a place in the neighbourhood of Dgon-lun monastery of Amdo in ulterior Tibet. He is better known by his family name of Sum-pa, which means one from the country of Sum, a province in Western Tibet.
16. **Note on the identity of the great Tsang-po of Tibet with the Dihong.** Tsang-po of great Tibet and the Brahmaputra of the plains are one and the same river.
17. **Life of Atisa (Dipamkara Srijnana) :** Dipamkara was born in A.D. 980 in the royal family of Gour at Vikramanipur, a country lying to the east of Vajrasana (Gaya). His father called him Kalyana Sri and his mother gave him the name Chandragarbha. At the age of 19 he took the sacred vows from Sila Rakshita, the Mahasamghika Acharya of Odantapuri who gave him the name of Dipamkara Srijnana. He visited Tibet in the year 1038 A.D. He cleared the Buddhism of Tibet of its foreign and heretic elements which had completely tarnished it, and restored to its former purity and splendour. He was the spiritual guide and teacher of II Bromton, the founder of the first grand hierarchy of Tibet.
18. **A note on the Antiquity of Chittagong,** compiled from the Tibetan work Pagsam Jon-Zan of Sumpa Khan-po and Kahbab Dun-dan of Lama Tara Natha. The name Pandita Vihara and the story of disputation with the Tirthikas (Brahmanas) goes to show that Chittagong was a place of learning sixteen centuries ago if not earlier still.
19. **A Note on the Buddhist Golden Book exhibited by the President, the Honourable Sir Charles Elliot :** In January 1894 the President exhibited a Manuscript called the Buddhist Golden Book containing the Kamma-vaca written on thick gilt lacquer leaves which he had brought from Cox's Bazar, Chittagong. On that occasion Dr. Hoernle gave an account of

its contents based on a Latin translation of the Kamma-vaca, published by Spiegel in 1841. As both the text and translation of the Kamma-vacas had been published by Dickson in 1881 and by Dr. Frankfurter in 1883, and lastly by Mr. Herbert Baynes in the Journal of the Royal Asiatic Society, the Golden Book which possessed such an attractive and glittering appearance, seemed to be of little value.

20. **The Hierarchy of the Dalai Lama (1406-1745) :** This paper has been compiled from Tibetan histories such as Pagsam Jonzang.
21. **Tibet under the Tartar Emperors of China in the 13th century A.D.**
22. **The Monasteries of Tibet :** Tibet is the land of monasteries. Her history chiefly comprises records of the establishment of monasteries and temples and their endowments by the State, chiefs and nobles of the country, commencing from the middle of the 7th century A.D. to the 18th century. This paper was compiled from Pagsam Jon zan and other Tibetan historical work.
23. **Tibet, a dependency of Mongolia (1643-1716 A.D.).**
24. **Tibet under her last kings (1434-1642 A.D.).**
25. **A short history of the House of Phagdu, which ruled over Tibet on the decline of Sakya till 1432 A.D.**
26. **Notices of Orissa in the Early Records of Tibet :** Nagarjuna, the reputed founder of the Mahayana school of Buddhism (well known by the name Siddha Nagarjuna in the Sanskrit medical work of India) is said to have enclosed the great Caitya-temple of Dhanya-Kataka (heap of unhusked rice) by building a wall round it. He also built one hundred shrines (devalaya) inside that enclosure.

    Orissa was variously called by the names Otivisa, Otvisa, Ottisthana, Dhana-Sri-dvipa, Dhana Sri-bhumi etc. In the work Pagsam Jonzan which was compiled from the work called Deb-ther-non-po (the ancient records of Tibet), it is stated that Sridhanya-Kataka was a holy place in the country of Dhana Sri. In the same work it is further mentioned that Chandra Gomi, the author of Candra Vyakarana, visited

Orissa. In Dhana Sridvipa he performed religious ceremonies in the great Vihara of Sridhanya Kataka and established about a hundred chapels (devalaya).

27. **On the Kala Cakra system of Buddhism which originated in Orissa :** In the Sutra of Great Renunciation (Abhiniskramana) the following account of the Buddha's delivering the Kala Cakra Mula Tantra at Sridhanya Kataka occurs—In the beginning of the twelfth month after his attaining to the state of perfect purification (i.e., Buddhahood), in the new moon of the year (water-sheep), the Buddha delivered the Kala Cakra Mula Tantra, comprising twelve thousand sloka, in the Caitya (temple) of Sridhanya Kataka, near Sri parvata great hill, at the request of King Chandra Bhadra, the son of Devi Surya Prabha of the city Kalapa, in the country of Sambala and others. In that year were also delivered most of the Cakrajvala Prajnaparamita etc.

In this Tantra of twelve thousand sloka, few lines describe the origin of the Mahayana scriptures : first on the great Gridhra Kuta Parvata (Vulture-peaked hill) Buddha propounded Prajnaparamita and the Anuttara Mahayana form of his doctrine to the Bodhisattvas. From there he proceeded to the great Caitya or Sridhanya Kataka, and sitting in concentration (mystic spiritual) circle called Dharma Dhata Mandala, in the full moon of mid-spring, the Holy One first delivered the noble Tantra.

Regarding the Kala Cakra Tantra, Csoma de Koros remarked *"This system in fact was first introduced into India towards the end of the tenth century and afterwards via Kashmir into Tibet."*

28. **Introduction of written language in Mongolia in the Thirteenth Century.**
29. **'A short note on the division into clans of the Early Tibetans and the legends connected therewith.'**
30. **'A sketch of Buddhist Ontology and the Doctrine of Nirvana of the Mahayana School of Tibet :** During countless ages of the world, countless Buddhas have thus gone to the state of absolute purity—not one Buddha only, as is generally believed. The same fallacy, exists about Christ, who came to teach others to be Christs, as Buddha came to

teach them to become Buddhas. The Buddhas are therefore, called Tathagatas, meaning "gone in this way, or gone there", i.e., to Visuddhi (Absolute Purity). Visuddhi is a synonym for Nirvana and Visuddhi Marga means way to Nirvana (Journal of the Buddhist Text Society of India, Part-I, 1895).

31. **'Buddhist Account of the Four Vedas'** (Journal of the Buddhist Text and Anthropological Society, ed. Sarat Chandra Das, Vol. VI, Part-III, 1898, published by the Buddhist Text Society, Calcutta).

Rai Bahadur Sarat Chandra Das wrote the following account of the ***History of Buddhism in Chittagong*** which was published in the ***Gazetteer of the Chittagong District in 1908***—"Buddhism is a living religion in Chittagong proper, in the Hill Tracts and in Tippera. It was introduced in these districts about the ninth century A.D. direct from Magadha, when the eastern provinces of Bengal, extending from Rangpur down to Ramu (Ramya Bhumi) in Chittagong, were under the sway of a Rajput prince named Gopipala. The Mahayana Buddhism, which about that time prevailed in Magadha and Tibet, was preached in Chittagong by Bengali Buddhists. In the 10th century A.D. Chittagong, in a manner, became the centre of the Buddhism of Bengal. The chief feature of Mahayana Buddhism is that it has taken in the entire Hindu pantheon and added innumerable fancied deities to it. In this enlarged pantheon the ruling deity is Arya Tara (a personification of Nirvana), who is identified with Sakti or the female principle. In the dialect of the Ramu Magh of Chittagong she is called Phra Tara, Phra being the Burmese equivalent of Arya. The Chittagong people called her Phora Tara, the Magh goddess. From the 10th to the 13th century A.D. Chittagong possessed a mixed population of Buddhists and Hindus, the former being distinguished from the latter by the name Magha, meaning the excellent or blessed, a term which is still preserved in Bihar in its original signification. Then came Islam to convert the whole district of Chittagong. About this time, the more earnest Buddhists took shelter in the Hill Tracts, and then converted the Hill Tribes to Buddhism. In the 17th century, when the Mughals extended their conquests to Chittagong, Hindu settlers from Bengal poured in in large numbers and founded Chaksala (Chakrasala),

which is now called Patiya paragana. The Hindu settlers mostly occupied the places which had been left vacant by the flight of the Maghs. In the beginning of the 19th century, the remnant of the Chittagong Maghs, who had almost forgotten the tenets of their religion, largely took to the worship of Hindu deities. This then continued to do for upwards of fifty years, until at last a Buddhist priest coming from Burma led them back to Buddhism. The degenerate half-Hinduized Maghs had, in the mean time, adopted Hindu and Muhammadan names and titles. They had entirely forgotten the Mahayana doctrine of Buddhism, which their ancestors followed. The modern Maghs have no idea of the goddess Phra Tara and do not worship her though she has been given by the Chittagong Hindus a place a little outside their pantheon, is propitiated by them with animal sacrifices, and is worshipped under the name of Magheswari, the goddess of the Maghs. The Brahmans of Chittagong now identify her with the goddess Kali, in the form in which, according to them, she was known in Magadha, and call her Magadheswari. The earlier headquarters of the Chittagong Buddhists were at Mahamuni in Pahartali and the later ones at Ramu."

Sarat Chandra Das was not only a competent scholar, but also an observant traveller. His keen observation and vast knowledge enriched his research output with quality and variety and his usual thoroughness, extensive travels and knowledge of Tibetan distinguished his work. After his return to India he contributed significantly to the learned journals of the day and during the next 35 years he established himself among the great scholars and savants of his time. His papers were informed with data, most of which were his own discovery. The amount of his literary work was enormous in bulk and it had drawn attention not only to the Buddhist scholars, particularly interested in the vast Tibetan literature but also to the general readers.

TWO MASSIVE PILLARS OF THE CENTURY: ANAGARIKA DHARMAPALA AND KRIPASARAN MAHASTHAVIR

Santosh Bikash Barua*

With the completion of hundred years of dedicated service to mankind rendered by the Maha Bodhi Society of India and the Bauddha Dharmankur Sabha (The Bengal Buddhist Association), it is indeed in the fitness of things that we remember with infinite gratitude the two illustrious personalities of the century, Anagarika Dharmapala and Kripasaran Mahasthavir, the respective founders of these two historic institutions for their pioneering contribution to the revival of Buddhism in the land of its birth.

To appreciate the magnitude of their activities, their missionary zeal, firm determination and above all, the dynamic force arising out of their realisation of Saddharma, one has to look at the condition prevailing in the country during this period and the circumstances under which they had to work to fulfil their mission. It is a common knowledge that Buddhism which flourished in India in full glory and enriched her cultural heritage, almost lost its separate entity in India beginning from the 13th century AD. It must be said that both of them judiciously established their main centres of activities in Calcutta. When they came to Bengal towards the end of the 19th century, there was a great resurgence in social, cultural, literary and religious fields here. In respect of Buddhism also signs of regeneration were noticed. The Buddhist Text Society was organised by Saratchandra Das for publication of books from Buddhist scriptures. The Asiatic Society also undertook publication of similar books.

Both Anagarika Dharmapala and Kripasaran Mahasthavir had absolute dedication to the cause for which they plunged themselves into action. Even illness and old age did not cripple their minds and effort. Whatever they had accumulated from all sources they gave them for the cause of the society. There are striking examples of their self-sacrifice.

---

* Formerly of Akashvani, Kolkata, Santosh Bikash Barua is a Vice-President of Maha Bodhi Society of India. This article is re-printed from "Hundred years of Bauddha Dharmankur Sabha".

The allowances Anagarika received from his father was spent for the Society. When he started the publication of the Maha Bodhi journal, sometimes he went without food to enable him to buy stamps for sending the journal to subscribers. Even during his last days at Sarnath he told Devapriya Valisinha not to waste money on medicines but to use it for Society's work. Ven. Kripasaran Mahasthavir also grudged spending money on himself. It is said that once, while he was about to go to the Chittagong Railway Station on his journey to Calcutta, one of his devotees gave him a rupee for hiring a phaeton. He took the money saying that he would utilise this money to buy bricks for his construction work of Dharmankur Vihara. He came on foot to the station. These examples, though apparently insignificant, show to what extent they could sacrifice their personal comfort for a noble cause to which they dedicated themselves.

Another striking feature in respect of these two great men is that both came to Calcutta as almost strangers, one from Sri Lanka and the other from a village in the border district of Chittagong to undertake almost an impossible task of revival of a religion which had been in oblivion for centuries.

The main events of their life-long activities are well-known.

Anagarika Dharmapala

Anagarika Dharmapala was born in a wealthy Hewatarne family of Matara in Sri Lanka, which was known for their devotion to Buddhism for generations. At his twentieth year he came under the pious influence of the Theosphical Movement under the leadership of Madame H. P. Blavatsky of Russia and Col. H. S. Olcott of America. During 1885-89 he devoted himself whole-heartedly to the missionary activities of the Buddhist Theosophical Society in Sri Lanka.

Anagarika was deeply moved when he came to know about the neglected state of Buddhagaya Temple from an article by Sir Edwin Arnold, published in a London periodical, "The Telegraph," of which he was the Editor.

In 1891 when Anagarika visited Buddhagaya for the first time and the normal urge he felt, when he stood in front of the Maha Bodhi Temple can be described in his own words from his diary:

He writes, "As soon as I touched with my forehead the VAJRASANA a sudden impulse came to my mind. It prompted me to stop here and take care of the holy spot."

With absolute dedication, he resolved to start his great mission for restoring the holy Temple and the regeneration of Saddharma in the land of its birth . It was an uphill task. He had to proceed with great care, judicious approach and a force of conviction to convince and persuade persons at different levels who mattered. But since then he never looked back and relented from his resolution for a moment.

In May, 1891, he founded the Maha Bodhi Society first in Colombo and then in Calcutta and subsequently in other parts of India.

In October, 1891, Anagarika convened an International Buddhist Conference with the object of drawing attention of the Buddhist World to the state of affairs at Bodh Gaya. The representatives from China, Japan, Ceylon and India (from Chittagong) attended this conference.

The Maha Bodhi Society started its office in Calcutta in 1892. In May 1892 the Society started its monthy Journal, "The Maha Bodhi" for the propagation of Lord Buddha's teachings and also for interchange of news between Buddhist countries. This journal which features contributions from scholars and competent writers from different countries has wide international circulation and has a proud record of uninterrupted publication for the last hundred years. Incidentally, it may be mentioned that special centenary issues of the journal have been published from the Headquarters and other centres. The first volume, entitled "Sambhasa" published by the branch of the Pirivena Education of the Ministry of Education, Sri Lanka, contains a selection of hundred articles from the last hundred years' publication of the Maha Bodhi Journal.

Anagarika Dharmapala attended the World's Parliament of Religions, which was held at Chicago in 1893 and was one of the important events of the nineteenth century. Anagarika's illuminating speeches on Buddhism, particularly, his main paper, "The World's debt to Buddha" highly impressed the representatives of different religions. Anagarika was one of the most popular speakers at the Parliament. An excerpt from the letter published in St. Louis Observer, September 21, 1893 is given below:

"With his black, curly locks thrown back from his broad brow, his keen, clear eye fixed upon the audience, his long brown fingers emphasizing the utterances of his vibrant voice, he looked the very image of a propagandist, and one trembled to know that such a figure stood at the

head of a movement to consolidate all the disciples of Buddha and to spread 'the light of Asia' throughout the civilised world".

As it is well-known Swami Vivekananda also attended this Parliament and his speeches on Hinduism were strikingly impressive. Later on, Swamiji and Anagarika came in close contact with each other. Swami Vivekananda was greatly influenced by Lord Buddha's message and expressed this in many of his writings and speeches.

Anagarika had an opportunity of meeting many eminent persons from America and different countries of Europe and Asia. At their invitation, he subsequently visited many of these countries and opened branches of the Maha Bodhi Society of India wherever it was possible. Among those who became the life-long benefactors of the Society special mention has to be made of Mary E. Foster of Honolulu who donated generously to the Maha Bodhi Society for the establishment of temples, schools and other humanitarian institutions both in India and Sri Lanka.

Another distinctive aspect of Anagarika's organised movement is his broad attitude to religion true to the spirit of Lord Buddha's teachings. Since the inception of the Society the membership is not confined to a particular community and is open to all well-wishers and right-thinking persons, irrespective of caste or creed. The first President of the Society was Sir Asutosh Mookerjee, Judge of the High Court of Calcutta and the Vice-Chancellor of the University of Calcutta.

In his all-out effort to restore the Maha Bodhi temple at Buddha Gaya to the Buddhists, Anagarika came in contact with Mahatma Gandhi, Babu Rajendra Prasad , Deshbandhu C. R. Das, Rabindranath Tagore and several other eminent persons, who were sincerely convinced of his legitimate approach and expressed their opinion explicitly that the control of the temple should vest in the Buddhists. In a letter to Anagarika (published in Maha Bodhi Journal 1922) Mahatma Gandhi wrote, "Much as I should like to help you, it is not possible to do anything directly at the present moment. The question you raised can be solved in a moment, when India comes to her own".

It was mainly for Anagarika's determined persuasion that the Bihar Government undertook legislation and the Buddha Gaya Temple Management Act 1949 was passed.

Meanwhile, through the ceaseless effort of Anagarika the centres of the Society continued to be opened at home and abroad. There are now

centres at Buddhagaya, Sarnath, Sanchi, New Delhi, Lucknow, Shravasti, Bombay, Nowgarh, Madras, Bangalore, Ajmer and Bhubaneswar. There are also centres of the Society in England, America, Japan, Korea, Sri Lanka and China.

The construction of the Mulagandhakuti Vihara at Sarnath where Buddha delivered his First Sermon, "Dharmachakra Pravartana Sutra", was his last glorious work which contributed greatly to the revival of Buddhism.

The humanitarian and social welfare service started at the Headquarters and other centres of Society are also positive steps in this direction.

Apart from his visits to abroad, he used to tour extensively in India and meet particularly the weaker and poorer sections of people.

Among the wide-ranging activities of this great Buddhist missionary, the founding of the Maha Bodhi Society is undoubtedly an outstanding event in the history of the revival of Buddhism in India. Referring to the unshakable resolution which Anagarika Dharmapala made on his first visit to Buddha Gaya as a young man of twentyeight and ultimately brought success to his mission, Ven. Sangharakshita Mahasthavir wrote in his book, "Flame in Darkness":

"The history of the Maha Bodhi Society which he subsequently founded, and the great revival of Buddhism which we see going on in India today, are the living witness to how true the Anagarika was to that youthful resolution. Like a thread of gold running through the crystal beads it shines through all the activities of his career".

Kripasaran Mahasthavir

Ven. Kripasaran Mahasthavir was another most revered and towering personality in the history of the revival of Buddhism in India in recent times. The Buddhist world, the Buddhists of Bengal in particular, who for generations continued to follow the teachings of Lord Buddha as their ancestral faith in the border district of Chittagong with great care and tolerance, remember him with a deep sense of gratitude and high regard on this great occasion of the Centenary Celebration of the Bauddha Dharmankur Sabha.

Kripasaran was born in a devout Buddhist family of the village, Uninepura, Chittagong in 1865. He lost his father at the age of ten and had to work hard to help his mother with whatever meagre amount he could earn.As there are legendary examples in the case of persons

having extraordinary potentialities, this extreme pecuniary circumstances groomed Kripasaran to lead a disciplined and austere life which attracted the attention of all the elders in the village. One of them was Ven. Sadhan Chandra Mahasthavir who initiated him into a life of Sramana at the age of sixteen with the permission of his mother and arranged for his study and training in the discipline.

During the middle of 19th century Rev. Sangharaj Saramedha Maha thera, well-versed in Theravada system of Buddhism came from Arakan and stayed at Mahamuni Vihara of Chittagong. He taught Dharma and Vinaya to the monks of different areas. As a result of Sangharaj's initative and guidance a few dedicated leaders of the Sangha were engaged in the work of regeneration and reformation of Saddharma in Chittagong. Among them were Acharya Punnachar Mahasthavir, Sanghanayak Jnanalankar Mahasthavir, Aggamahapandit Prajanaloka Mahasthavir and Abhoysaran Mahasthavir.

Acharya Punnachar, the renowned and highly respected Bhikshu in Chittagong and Sri Lanka where he stayed for about four years took a leading part in the regeneration of Buddhism and the teaching of Dharma and Vinaya to the monk. Acharya Punnachar ordained Sramana Kripasaran as a Bhikshu. During his visit to Buddha Gaya and other sacred places the Acharya took his young disciple Bhikshu Kripasaran with him. When Kripasaran witnessed the lost glory of Maha Bodhi at Buddhagaya and other historical places he was greatly moved and resolved to work for the revival and spread of Buddhism in a greater field.

After sometime, he started his work staying here. With their initial support Kripasaran founded the Bauddha Dharmankur Sabha (The Bengal Buddhist Association) in October, 1892. The seed that was to grow into a noble tree was sown. Since then, he devoted himself into his manifold activities to fulfil his great mission. With his continuous effort he purchased a plot of land in Calcutta for the construction of Dharmankur Vihara in 1900. Obviously his main problem was to collect sufficient fund for the construction of Vihara and other essential work to run the Association in Calcutta. On several occasions he went back to Chittagong and toured extensively all over the places to collect donation from his Upasakas and well-wishers. There were occasions when he fell seriously ill due to exhaustion. But he remained undaunted in his effort. The construction of the ground floor of the Vihara was completed in 1903.

Gradually, Ven. Kripasaran Mahasthavir came in contact with many distinguished persons in Calcutta, such as, Sir Asutosh Mookerjee, Maharaja Srishchandra Nandy, Satishchandra Vidyabhusan and others, who were highly impressed by Mahasthavir's pursuit of the mission and his spirit of self-sacrifice and dedication for its fulfilment. The public meetings on important occasions and festivals which started to be organised on the completion of the construction of Vihara were well-attended. In one of the meetings, Sir Asutosh expressing his respectful appreciation of Mahasthavir's work, said, "You are praising me for what I have done for the study of Buddhist literature. I must say that at the root of this action on my part was my acquaintance with the Venerable Mahasthavir. After I had come in contact with him, I was attracted to Buddhism and Buddhist literature". As a result of his dedicated effort when the Association was fairly well-established in Calcutta after some time, he began his work for its expansion all over India. Subsequently, the centres of the Bengal Buddhist Association or Bauddha Dharmankur Sabha were opened at Lucknow, Simla, Ranchi, Shillong, Dibrugarh, Darjeeling and Jamshedpur. The establishment of these centres was an outstanding contribution to the regeneration of Buddhism.

Another remarkable step in this direction was the launching of the monthly Bengali journal, Jagajjyoti under Mahasthavir's initiative and able guidance for the propagation of Buddha's Teachings.

The foundation of Gunalankar Library, Kripasaran Free Institution and the Night School for adults were undoubtedly noteworthy contributions of Mahasthavir.

His last memorable work was the convening of the World Buddhist Conference from December 6-14, in 1924 at Nalanda Square, Calcutta where distinguished monks and representatives from Burma and Chittagong participated in its deliberations. U. Chandramala Mahathera of Arakan presided over the inaugural session.

It may be noticed that although Anagarika Dharmapala and Kripasaran Mahasthavir worked for their respective institutions separately, there was a spirit of mutual co-operation and friendship between them. The Maha Bodhi Society of India and the Bauddha Dharmankur Sabha celebrated the Vaisakha Festival jointly for a few years.

At the invitation of Anagarika Dharmapala. Ven. Kripasaran Mahasthavir visited Sri Lanka in 1911. Soon after his arrival at

Colombo he was given a cordial reception at the famous Vidyoday Pirivena under the presidentship of the most revered Sanghaguru of Sri Lanka, Ven. Sumangala Mahasthavir. Ven. Kripasaran Mahasthavir visited historical Buddhist places like Anuradhapura, Kandy and Mihintale.

While the Anagarika visited Chittagong in 1915 at the invitation of the Buddhists of Chittagong, the Mahasthavir who was already there, warmly welcomed him and accorded a grand felicitation to Anagarika at the Chittagong Vihara at a representative gathering of Buddhists which included senior monks from different centres and other eminent persons. He accompanied Anagarika when he visited important Buddhists Centres at Chittagong. Anagarika was greatly moved at the cordial reception he received from the Buddhists of Chittagong.

In the journal, Maha Bodhi published by the Maha Bodhi Society, reports regarding the important activities of the Bengal Buddhist Association were also published from time to time. Sometimes appeals for fund for the construction of the Vihara were also made in some of the issues of the journal.

Both the premier Buddhist organisations worked in a spirit of mutual friendship and co-operation during the last hundred years.

As one becomes aware more and more of the manifold activities of these two stalwarts, Angarika Dharmapala and Kripasaran Mahasthavir, one's mind is bound to be filled with awe and admiration for their spiritual vision, bold approach, determined devotion and above all, the supreme self-sacrifice for the good of mankind which led them to fulfil their mission through the establishment of the two historical organisations, the Maha Bodhi Society and Bauddha Dharmankur Sabha respectively.

CONTRIBUTION OF THE ASIATIC SOCIETY IN BUDDHIST STUDIES

Bandana Mukherjee*

The fundamental object of the Asiatic Society is the cultivation and dissemination of knowledge. The Society has been assiduously persuading this aim since its inception. The publication of the Asiatic Society in its Bibliotheca Indica series and its Journals proves that fact. But before writing on the contribution of the Asiatic Society on the Buddhist studies it seems necessary to write a few lines about the inception of the Asiatic Society and its fundamental objectives.

William Jones, the founder father of the Asiatic Society has an idea about the richness of Asian Culture. It is visualised rather outlined in his preliminary discussion and discourse to the Asiatic Society. "In January 1784, he sent a circular letter putting forward his plans of establishing a Society to encourage oriental studies". He also discussed his plan with his senior colleagues in the Supreme Court ; who appreciated the project and invited men of letters to give John's idea a solid foundation.

On 15th January 1784, 30 gentlemen of European community met in the Grand Jury Room of the Supreme Court at Calcutta...and passed a resolution for the establishment of the Asiatic Society. In this way was laid the foundation of the great centre of learning. Basically the Asiatic Society is the mother Institute of most of the oriental Institutes all over India. As regards the objects of the research of Asiatic Society, Jones remarked, "that they would be Man and Nature: whatever is performed by the one or produced by the other". However he set a limit to the Society's object of inquiry by suggesting that "they should be confined within the geographical limits of Asia".1 The proceedings of the Asiatic Society reveals that Jones invaded almost every branch of learning and tried to enthuse others to do the same. So with this idea of Sir William Jones the

---

* Dr. Bandana Mukherjee is the Researech Officer of the Asiatie Society and Guest Lecturer in Tibetan, University of Calcutta.

Asiatic Society has contributed a lot, since its birth, to all fields of learning like history, sociology, art, architecture, language, literature, religion, philosophy, science and its different branches.

According to our topic of discussion we will confine ourselves within the contribution of the Asiatic Society specially, in the field of Buddhism and Buddhistic studies. In this respect a discussion would be made under the following main topics.

1. Eminent scholars of Buddhist studies and their contribution along with the publication of the Asiatic Society.

2. Source materials of the Asiatic Society regarding Buddhism.

3. Research on Buddhist studies in the Asiatic Society.

(1) Eminent Scholars of Buddhist studies in the Asiatic Society :

Among the scholars associated with the Buddhist studies in the Asiatic Society Alexander Csoma de Koros of Hungary (1784-1842) may be regarded as one of the pioneer who dedicated his life in introducing the Tibetan Buddhist studies in India during the first half of the 19th cent. A.D. Hirendra Nath Mukherjee designated him as "the hermit hero from Hungary" for his diligence, devotion and discovery of new-horizon of human knowledge and learning.[2]

He joined in the Asiatic Society firstly as a Researcher in 1831 with a remuneration of Rs. 50/- only.[3] Since then the Journal of the Asiatic Society was enriched with the valuable writings of Alexander Csoma. About 15 papers were published by him in this Journal from 1832 upto 1856. The list of which is given in the appendix I. Apart from these papers Csoma de Koros published many books on Buddhism like :

1. *Analysis of Kanjur 1820*

2. *Tibetan Studies* : being a reprint of some articles published by Alexander Csoma in the JASB.

3. *Tibetan-English Dictionary*

4. *Tibetan symbolical names used as* numerals in 1834.

5. *Catalogue of Kanjur & Tanjur* and other communications on Tibetan literature.

6. *Sanskrit-Tibetan-English Vocabulary* : being an edition and translation of the *Mahavyutpati,*.

7. A Grammar of the Tibetan Language, in English, prepared under the patronage of the Government and the auspices of Asiatic Society of Bengal, Calcutta, 1834.

These books and papers are most valuable study of Buddhism, especially Tibetan Buddhism.

Mention may be made here that Csoma's erudite scholarship and dedication in exploring the new dimensions of the Buddhist studies attracted many scholars and elites for obvious reasons. Sir Asutosh Mookherjee as a Vice-Chancellor of the Calcutta University and Honorary Secretary of the Asiatic Society took a bold step in the academic curriculum of the Calcutta University in 1913. Since then the Asiatic Society became primarily the basic Research Institution for Research work. In addition to Csoma de Koros, some other scholars who assembled in the then Society for the promotion of Buddhist studies, the name of Raja Rajendralal Mitra, Mm. Haraprasad Sastri, Mm. Satish Chandra Vidyabhusan, Rai Bahadur, Sarat Chandra Das, Nalinaksha Dutta, Suniti Kumar Chatterjee, Mm. Vidhusekhar Bhattacharya, B.C. Law, Durga Caran Chatterjee, Anukul Chandra Banerjee, who was also Professor and Head of the Department of Pali, University of Calcutta deserve to be mentioned. The main objective of these scholars was to create a new vista in the field of Buddhist studies through their scholastic work, donation and collection of materials (manuscripts & books) available in the Asiatic Society in different languages like Pali, Sanskrit, Tibetan, Chinese etc. The result of the in-depth study of these scholars enriched the publication of the Asiatic Society. The Archives of the Asiatic Society still now possesses a good number of correspondences of these above-mentioned scholars, which proved their endeavour and devotion for the promotion of Buddhist studies in the Asiatic Society.

Raja Rajendralal Mitra : After Csoma the name which comes most prominently, as a pioneer scholar of oriental studies is Raja Rajendralal Mitra. He joined as a Librarian in the Asiatic Society of Bengal on a salary of Rs. 100/- per month. He was also an Assistant Secretary of the Society during the period 1846-1856. Later on he was appointed also as a Curator of the Archaeological section of the Museum (1849). Being in the responsible posts of the Asiatic Society he wrote many articles on Indology and Buddhist studies. These

papers were published in the proceedings and Journals of the Asiatic Society. Amongst these papers there were many papers on Buddhistic studies. These are included in the Appendix II. Moreover, Bibliotheca Indica, which was and still at present is an important publication of the Asiatic Society has many books on Buddhism by R. L. Mira and other scholars (Appendix II). His other works are :

1. Buddha Gaya : The Great Buddhist Temple, the Hermitage of Sakya Muni 1870-1880.
2. Sanskrit Buddhist literature of Nepal or Catalogue of Nepalese Sanskrit Mss. published in 1882 from the Asiatic Society.
3. The Lalita Vistara : Memoirs of the early life of Sakya Simha (Eng. Translation) ; Calcutta, Asiatic Society of Bengal, 1881-1886.
4. Notices of the Sanskrit Manuscripts 1870-1890 ; Asiatic Society of Bengal Vol-I & X.

Haraprasad Shastri : For the promotion of Buddhist studies, especially oriental studies in the Asiatic Society, the contribution of Mm. Haraprasad Shastri should be acknowledged. H. P. Shastri started his career in the Asiatic Society as Junior Assistant of Rajendralal Mitra. He helped Mr. Mitra in preparing his monumental work *"Notices of Sanskrit Manuscripts"* in 10 vols., published from the Asiatic Society during 1870-1890. The assistance rendered by Shastri was acknowledged in the preface of that book by Raja Rajendralal Mitra. In July 1891, on the death of Raja Rajendralal Mitra, he was made the Director of operation in search of manuscript in different states of India. This post he held till the end of his life.

Being elected as a member of the Asiatic Society he was at once put on the Philological Committee and was placed in-charge of the Bibliotheca Indica publication. In this connection it is to be noted that a lot of Buddhist texts were published in B.I. series. The names of these texts, were mentioned separately in Appendix III. After his retirement from Govt. service the Council of the Asiatic Society requested him to undertake a project on Descriptive Catalogue of entire collection of 11,000 manuscripts in the Asiatic Society. So he catalogued and could publish eleven (11) sumptuous volumes on Buddhist, Vedic, Smrti, History, Geography, Vyakarana, Philosophy, Alankara and Purana respectively.

Sarat Chandra Das : He was a renowned scholar of Tibetan

Buddhism and Tibetan language. The Journal of the Asiatic Society was enriched with his scholarly writings on different aspects of Buddhism from the year 1881 upto 1907. A brief list of papers of Sri S. C. Das published in the Journal of the Asiatic Society is given in the appendix IV.

He edited *Dpag-bsam-ljon-bzan* of Sumpa Mkhen po, which is one of the important books of Tibetan Buddhism and the bi-lingual edition of *Bodhisattva avadana kalpalata.*

Mention may be made here that the archival documents of the Asiaic Society proves that S. C.Das was also an Honorary Secretary of the Buddhist Text Society of India and was an Editor of the Journal of the Buddhist Text Society. Being Secretary he sent a letter[4] to the Asiatic Society and requested the Secretary of the Society to place before the Council the following proposals for consideration and order for the benefit of the Buddhist Text Society :

1. The Buddhist Text Society of which Sir A. Croft is President may be affiliated and regarded as an institution subordinate to the Asiatic Society.
2. Its Library be located in the ground floor of Society's premises.
3. The Anthropological section of the Society may be operated by the workers of the Buddhist Text Society with Hon. H. H. Risley as President of New Institution.
4. Lastly he submits the proceedings, which contains the official correspondence between Sir A. Croft and the Govt.

Furthermore, the archives of the Society highlights that in 1907 S.C. Das made several correspondence with the then Secretary regarding the sale of Catalogue of his Tibetan Xylograph and a catalogue of Tibetan ms. (Kanjur) preserved in the Asiatic Society which he submitted to publication section for its publication in 1886 [vide File No. letter 1531... dt. 25.01.1909][5]. we are still in dark about this publication which would be a very important book of Buddhism.

So it reveals the Asiatic Society became primarily the basic Institution for research work and publication. In addition to above mentioned scholar, other eminent personalities, who were associated with the Asiatic Society in different ways like academic and administrative heads, are mainly Durga Charan Chatterjee, Anukul Chandra Banerjee, Vidhusekhar Bhattacharya, Dr. Nalinaksha Dutta, Prof. Biswanath Banerjee, Prof. Dipak Kr. Barua and others. They

devoted themselves for the promotion of Buddhist studies. In this regard the names of a few westerners may be mentioned. They also rendered their intellectual service for the Buddhist studies indirectly. Amongst them Graham Sandherg, Vincent Hendeson, Edward Denison Ross, David Macdonald, John Van Manen ; B. H. Hodgson, George Roerich may be mentioned. In the development of Buddhist studies the enterprise of several printing press like Baptist Mission Press, Buddhist Text Society, Maha Bodhi Society of India and our press i.e. the Asiatic Society, Calcutta cannot be ignored.[6]

In this context it is necessary to mention here that the task of editing of the Trilingual (Tibetan Sanskit and English) work of Csoma deKoros entitled *Mahavyutpatti* was taken by **Sir Denison Ross** in 1910. But unfortunately he could not complete this work which was later on completed by Durga Charan Chatterjee and published from the Asiatic Society in 1941. Moreover the reprinting work of the two chapters of ***Bodhisattva Avadanakalpalata,*** by Kashmirian poet Ksemendra with its Tibetan translation done in the 13th cent. A.D., was also done by him.

George N. Roerich translated the Deb-ther-snon po of Gos-Lot-sa-ba under the title *Blue Annals* and published by the Asiatic Society. It is one of the important books relating to Tibetan Buddhism like the epic of King Kesar of Ling. In addition to this book Roerich published following papers in the Society Journal :

(a) Modern Tibetan Phonetics with special reference to the dialect of central Tibet [JASB–1937, 285-312]

(b) *The epic of Kesar of Ling* JASB 1942, p.277-311 ; 1943, ix. 76.

(c) *Mun-mkhyen chos-kyi hod zer* and the origin of the Mongol alphabet. [JASB 1945, 52-58 ; Y-1946, pp. 143-44].

[For details of writings on Buddhism published in the Journal of the Asiatic Society PI. see Appendix. II.]

Mm. Satish Chandra Vidyabhusan published a book on ***Mediaeval Indian logic*** on the basis of Tibetan source material (1921). This work focuses a new light on the mediaeval Indian Logic.

Suniti Kumar Chatterjee edited and published from the Asiatic Society *Lower Lodakhi version of Ge-sor saga.*" This book adds a new dimension in the study of Buddhism.

D. C. Chatterjee : A renowned scholar Prof. Durga Charan Chatterjee in addition to unfinished work of Deniston Ross mentioned above wrote following papers:

(a) *Collation* of the editions of the Sanskrit text of the *Nyayabindu* and *Nyayabindutika*. JASB, 1932, NS XXVII, pp. 251-254.[7]

(b) The *Yogavatarapadesa* : A Mahayana treatise on Yoga by Dharmendra in its Tibetan version with Sanskrit restoration and English Translation published in 1927. NS XXIII, pp. 249-259.

II. Source Material of the Asiatic Society

It has already been mentioned that Royal Asiatic Society of Bengal, presently named as the Asiatic Society is an important centre of research in Buddhism. The Museum and Library of the Asiatic Society is a rich repository of books and manuscripts on different aspects of Buddhism.

Manuscript : As regards the mss. it can be said that the museum of the Asiatic Society has many Sanskrit, Prakrit, Bengali, Tibetan and Chinese manuscripts on Buddhism. A subject-wise list of Sanskrit manuscript preserved in the Govt. collection of the museum of the Asiatic Society was prepared by Mm. Haraprasad Shastri as it has already been discussed. Several Sanskrit, Pali, Apabhramsa texts on Buddhism in Tibetan translation and Tibetan translation of the Chinese materials are preserved under the heading of *Kanjur* (Buddhist canonical text) and *Tanjur* (commentarial literature). There are five different sets of Kanjur (bka' 'gyur) collection preserved in the Asiatic Society Museum. These are as follows :

(a) *Snar than* (Northang) edition xylograph of 17th cent. A.D. edition. This edition of mss is written on big leaves of Tibetan indigenous handmade paper ; Xylographed in India in the 18th century A.D. The Society had a full set of Kanjur and Tanjur of Snar than edition.

(b) Lhasa (*zhol*) edition of *Kanjur* (*Buddha vacana*) donoted by H. H. Dalai Lama in 19th cent. A.D. This xylograph was prepared in India in the sixties of this century.

(c) Full set of Peking printed edition of *Tripitaka* (Both Kanjur & Tanjur) published by Tibetan Tripitaka Research Institute, Tokyo.

(d) Handwritten mss (*Bris-ma*) of Kanjur written on 13th cent.

(e) Gser-yig i.e. some handwritten mss with golden ink on Astasahasrika prajnaparamita and some suttas in Tibetan.

Alongwith these in the Museum of the Society has many manuscripts on Buddhism, Medicine, Philosophy, Socio-religious aspects etc. works of Tibetan Buddhist Scholars like Rgyal tshab chos rje, Dar-ma-rin-chen (17th cent. A.D.) Rdo rje glin pa (= Nyin ma teacher of 17th cent. A.D.) etc. were also available in the museum of the Society.

Chinese manuscripts on Tripitaka and works of Buddhism in Chinese translation were also available in the museum of the Society. The Chinese mss. were catalogued by P. C. Banerjee and published from the Society. Similarly the Tibetan Tripitakas were also catalogued by the present author and Dr. Bhakti De. Some of these mss were edited by eminent scholars, mentioned before, and published by the Society in its Bibliotheca Indica series [Appendix V].

Society has some Ceylonese manuscripts and Pali language on grammar and philosophy.[8]

Books : Most of Pali texts (both canonical and non-canonical) published from the Pali Text Society, Tibetan Buddhist texts published from Higher Institute of Tibetan Studies, Sarnath, Journals of the Pali Text Society are also available in Library of the Asiatic Society. In addition to these, many secondary reference books on Buddhism, are also available here.

Finally, several publications in the old series and new series of the Journal of the Asiatic Society regarding Buddhism and Buddhist studies could throw a flash of light on the researches and source materials of the Asiatic Society regarding Buddhism.

III. Publication and Research Activities of the Asiatic Society on Buddhism.

The Asiatic Society took a remarkable leadership in initiating genuine research in humanities and sciences. Regarding the contribution of Asiatic Society on the publication of books and Monographs on Buddhism and Buddhist studies a picture may be drawn from our previous discussion.

Regarding the research activities, the society made pioneering and outstanding contributions. "It is the result of investigation of Sir William Jones and researches of the Society which awakened Europe to the grandeur of oriental literature that led to birth of the science of comparative philology and comparative literature."[9] No less important is the Society's efforts for collection and conservation of writings on perishable materials (palm leaf, hand made paper etc.), Asokan Rock Edict [Barhut Edict] and several copper plates to bring to light the treasures buried in private libraries and different parts of India and its neighbouring regions. The first proposal, in this regard which came from Dr. John Farquhar on October 5th 1803 was sent to the Govt., in the form of a Memorial on 1st July 1807. But no action was taken before Lord Lawrence, the then Governor General. He first took interest in the project and gave his assent to the scheme. Thus the dream of Sir William Jones for the Society "to furnish the literary world as much information as is needed in particular branches of Indian knowledge" was realised.

Study of search with the help of pundits whose names are still buried in the archives is a long one and requires separate study. Results of the search undertaken on behalf of the Society by the renowned Buddhist scholar Rajendralal Mitra and Haraprasad Sastri are recorded in the 15 volumes of publication entitled "Notices of Sanskrit Mss." [1870-1911]. Since then the search for Mss in Bengali, Rajasthani, Arabic, Persian[10] had been planned and undertaken by the Society. Their notices were also published from the Society. Still now the mission of searching and collection of mss from different repositories (both personal and public collection) are going on.

According to the Archival document and proceedings of the Asiatic Society, since 1891 the Society seized with the question of "doing something towards the endowment of research". But nothing could be achieved before 1946 when the post of four Research Fellowship [of which one is for Buddhist studies] were instituted. With the funds provided by the Govt. for which thanks are due to the then Governor of Bengal Sir R. G. Casey,Patron of the Society.[11]

During the year 1945-46 the Society received a sanction of grant

of Rs. 7,200/- annually for two years in the first instance for creation of post of Four Research Fellowship to be awarded by the Society. The Council of the Asiatic Society[12] decided to have these four posts of endowment Research Fellowship should be named after "Sir William Jones [for Sanskritic studies]; James Prinsep [for Epigraphy and Numismatics] ; Raja Rajendralala Mitra [for Buddhist studies]. The remaining Fellowship will be named after the benefactors of the Society for Islamic studies."[13] Advertisement have been inserted in important papers in India inviting applications for Fellowship.

So it reveals that for the promotion of Buddhist studies the authority of the Asiatic Society introduced a Research Fellowship entitled *"Raja Rajendralal Mitra Research Fellowship for Buddhistic studies."* The first Fellowship was awarded to Mr. P. C. Majumder. The name of his supervisor was Prof. Nalinaksa Dutta. His topic of Research was—"History of Mahayana Literature"[14] Prof. N Dutta rendered his service for the promotion of Buddhist studies in the Asiatic Society throughout his life in various ways both academically and officially. A brief list of Researcher in Pali awarded R.L. Mitra Research Fellowship and the topic, name of supervisor is mentioned in the Appendix VI.[15] As at present, during that period also there was a Research Fellowship Committee in the Asiatic Society. The first Research Fellowship Committee was constituted by eminent scholars of Buddhist studies like B. C. Law, Dr. Nalinaksha Dutta, Dr. MD. Isaque, and General Secretary, President and Treasurer of the Society.

In fine, it is necessary to state here that for the advanced and critical research work on Buddhist studies a new post in the name of Prof. Beni Madhav Barua Research Professor was created in 1992, Prof. Binayendra Nath Choudhury, Pali scholar and Professor of the Deptt. of Pali and Prof. Sukumari Bhattacharya, joined and ornamented this chair.

Thus it may be conclude that the Asiatic Society made heroic effort since its inception for the advancement of learning and promotin of research work scientifically and methodically. This trend of effort for the promotion of Buddhist studies is still continuing.

Notes & References

1. Chowdhury, Sibadas, ed. the proceedings of the Asiatic Society vol. I [1784-1800]. [Calcutta, the Asiatic Society, 1980] pp. 26-27. of the letters of Sir William Jones– By G. Cannon, Oxfood 1970.
2. Mukherjee, Hirendranath, Hermit Hero from Hungary, Alexander Csoma de Koros : the great Tibetologist [New Delhi, Light & Life publishers, 1981]
3. AR No. 551 ; SR. No. 5 of 1831 ; and a note of Charles Grey available in the Society's Archives.
4. Vide AR/Letter 1796A, 1897, January 18. Letter from Buddhist Text Society of India (86/2 Jaun Bazar Street).
5. File Nos. 1531, 1297 dated 6-9-07, 25.1.09.
6. Visva Bharati Annals– [N.S.-III] 1990, pp. 290-292.
7. This paper is also reprinted in Bibliotheca Indica series.
8. It is interesting to note that B. M. Barua's handwritten manuscript on his Suttavisarada Title examination in Pali written in Ceylonese script is also preserved in the Museum of the Asiatic Society, Kolkata.
9. Proceedings of the Asiatic Society vol. I pp. 54-57.
10. There are many mss. on Buddhism in these languages and script, which needs study and editing at present.
11. A Year Book of the Royal Asiatic Society, 1945. p. xxxix.
12. Year Book of the Royal Asiatic Society of Bengal for 1945, p. xii ; 1946, p. xxx-xiii.
13. Letter on the fourth one was named as E. G. Casey fellowship for Islamic studies.
14. Proceedings of the Asiatic Society 1947-p 46.
15. Appendix VI is prepared on the basis of Year Book, Annual Report and proceedings of the Asiatic Society of the respective year.

APPENDIX–I

Papers on Buddhism published by *Alexander Csoma de Koros* in the Journal of the Asiatic Society of Bengal (JASB)

No.	Title	Year, Journal	Volume, Pages
1.	Geographical notices of Tibet	1832, JASB	Vol.1, pp.121-127
2.	Note on the origin of the Kala-Chakra and adi-Buddha System	1833, JASB	Vol.II, pp. 57-59
3.	Origin of the Shakya race, Translated from the (La) or the 26th volume of Mdo class in the Ka-gyur, commencing on the 161st leaf.	1833, JASB	Vol.II, pp.385-392
4.	Extract from Tibetan works (translated)	1834, JASB	Vol.III, pp.57-61
5.	Analysis of a Tibetan medical work	1835, JASB	Vol.IV, pp.1-20
6.	Analysis of the Dulva, a portion of the Tibetan work entitled Kah-gyur	1839, (A.R.)	pp. 285-317
7.	Notices on the life of Shakya, extracted from the Tibetan authorities	1839, Asiatic Researches (A.R.)	pp. 285-317
8.	Abstracts of the contents of the Bastan, 'gyur.	1836-1839 (A.R.)	pp. 285-317
9.	Notices of the different system of Buddhism, extracted from Tibetan Authorities	1838, JASB	Vol. VII, pp. 142-147
10.	Enumeration of historical and Grammatical works to be met within Tibet	1838, JASB	Vol. VII. pp. 147-152

11.	A brief notice of the Subhasita Ratna Nidhi of Shakya Pandita, with extracts and translations	1835, JASB and 1856, JASB	Vol. XXIV, pp. 141-165 Vol. XXV, pp. 257-294
12.	Interpretation of the Tibetan Inscription on a Bhotian Banner, taken in Assam and presented to the Asiatic Society by Capt, Bogle.	1836, JASB	Vol. V, pp. 264-266

APPENDIX–II

[Works on Buddhism by R. L. Mitra and some other Buddhist scholars published by the Asiatic Society of Bengal (JASB)].

Mitra, Rajendra Lala

1. Buddhism and Odinism, their similitude ; illustrated by extracts from Holmboe's Memoirs on The Traces of de Buddhisme on Norvege ; 1858, JASB Vol. XXVII, pp. 46-69.

2. On some Bactro-Buddhist relics from Rawal Pindi (with remarks by E.C. Bayley) (PI. IV)	162, JASB	Vol. XXXI, pp. 175-190
3. Note on Major-General A. Cunningham's Remarks on the Bactro Pali Taxila Inscription.	1863, JASB	Vol. XXXIII, pp.151
4. On the ruins of Buddha gaya (with 1 Pl.)	1864, JASB	Vol. XXXIII, pp. 173-187 +1pl.
5. On the Buddhist remains of Sultanganj	1864, JASB	Vol. XXXIII, pp.360-372+1pl.
6. Index to the Sanskrit works named in Rev. S. Beal's Buddhist Tripitaka (unpublished annexed in Procd. ASB).	Mar. 1878	p.86

7. Remarks on three large bricks Dec. 1877, ASB pp. 258-280
   from Buddha Gaya Proc. ASB.,
8. Remarks on the derivation of Jan. 1887, pp. 2-4
   the Buddhist term 'Ekotibhava', July, 1887 pp.167-173,
   Procd. ASB. 175-179, 181
9. Transcription and translation of April, 1880 pp. 76-80
   two Inscription from Buddha
   Gaya. Procd. ASB.

Banerjee, Anukul Chandra

A Buddha Image from Kurkihar Vol. III
(Pl. VIII), JASB 1937, pp. 53-54

Banerjee, Biswanath

A note on Kalacakratantraraja 1952, JASB pp. 71-76
and its Commentary, Books
published by the Asiatic Society

A critical edition of Sri Kalacakrtanatraraja (B.I. 311, 1985, rept. 1993)

Biswanath Banerjee & Sukomal Choudhury (ed.) : Buddha and Buddhism [2005]

Goswami, Bijoya : Lalitavistara, EnglishTranslation (2001)

Chaudhury, Binoyendra Nath, Compiled : Dictionary of Buddhist Doctrinal and Technical Terms (2005)

Vidyabhusan, S. C.

1. Licchavi race of ancient India, JASB 1902, pp. 142-148.
2. Anuruddha Thera—a learned pali author of Southern India in the 12th cent. A.D. JASB 1905, Vol. I : 99-101.
3. Sarvajna Mitra—a Tantrika Buddhist author of Kashmira in the 8th cent. A.D. JASB 1905, Vol. I : 156-158.
4. An analysis of Lankavatara sutra (JASB 1905, NS I : 159-164)
5. Dignaga and his Pramanasamuccaya, JASB 1905, Vol. I : 217-227.

6. *Ronaka,* or the city of Rome, as mentioned in the ancient Pali and Sanskrit works, JASB 1906, II : 1-7.
7. *So-sor-thar-pa,* or the code of Buddhist monastic laws : being the Tibetan version of Pratimoksa of the Mulasarastivada School. Edited and translated JASB 1915, Vol. XI : 29-139.
8. A Descriptive list of works on the Madhyamika Philosophy, No. I, JASB 1908, Vol. IV : 367-379.

Law, Bimala Churn

1. Taxila as a seat of Learning, JASB 1916, Vol. XII : 17-21.
2. A short account of the wandering teachers at the time of Buddha, JASB 1918, Vol. XIV : 399-406.
3. A note on Buddhaghosha's Commentaries. JASB 1919, Vol. XV : 107-121.
4. Influence of the five heretical teachers on Jainism and Buddhism. JASB 1919, Vol. XV : 123-136.
5. The Licchavis in Ancient India. JASB 1921, Vol. XVII : 265-271.
6. Anga and Campa in the Pali literature. JASB 1955, Vol. XXI : 137-142.
7. Data from the Sumangalavilasini—Buddhaghosa'scommentary on the Digha-Nikaya of the Sutta Pitaka. JASB 1925, Vol. XXI : 107-121.
8. Gautama Buddha and the Paribrajakas. JASB 1925, Vol. XXI : 123-136.
9. Early Buddhist brothers and sisters. JASB 1945, Vol. XI : 39-49.

Books published by the Asiatic Society :

10. *Asvaghosa* (1946)
11. On the *chronicles of Ceylon* (1947)

Pathak, Suniti Kumar

A bi-lingual glossary of the Nagananda (B.I. 281, 1968)

Sastri, Haraprasad

1. Buddhism in Bengal since the Muhammadan conquest. JASB–1895, Vol. LXIV. pp. 65-68.
2. An examination of the Nyaya-sutras. JASB. 1905 [NS-1], pp. 245-250.
3. The recovery of a lost epic by Asvaghosa. JASB. 1909 [NS-V], pp. 47-49.
4. Refutation of Max Mullers theory of the Renaissance of Sanskrit Literature in the 4th Century AD, after a lull of seven centuries from the time of the rise of Buddhism. JASB. 1910 [NS : VI], pp. 305-310.
5. Discovery of Abhisamayalankara by Maitreyanatha. JASB. 1910 [NS. VI], pp. 425-427.

Books published by the Asiatic Society :

1. Descriptive Catalogue of Sanskrit Manuscript, Vol. I-XI, 1870-1880 ; reprinted 2006.

APPENDIX–III

BOOKS ON BUDDHISM PUBLISHED IN THE BIBLIOTHECA INDICA SERIES FROM THE ASIATIC SOCIETY

Sl. No.	Name of Book	Edited by	B.I. No.	Year of pub.
1.	Asta Sahasrika Prajnaparamita	Rajendra Lala Mitra	110	1887-88
2.	Bodhi Caryavatara Panjika of Santideva	Louis de la Vallee Poussin Santideva	150	1901-14
3.	Dpag Bsam HkhriSin	Sarat Chandra Das	130	1890-94
4.	Lalita Vistara	Rajendra Lala Mitra	15	1853-77
5.	LalitaVistara Engtranslation	Rajendra Lala Mitra	63	1870-72
6.	Minor Tibetan Texts	Johan Van Manen	235	1919

7. Nyaya Bindu [Tibetan Translation]	de La Vallee Satisa Chandra Vidyabhusan	171	1908-13 Rept. 1984
8. Nyaya Bindu [Sanskrit Tibetan]	Satisa Chandra Vidyabhusan	230	1917
9. Nyaya Bindu Tika of Dharmottara Acarya	Peter Peterson	12	1890
10. Prajna Pradipa of Bhavabibeka	M. Walleser	226	1914
11. Saddharmapundari-kasutram	Nalini Kanta Dutta	276	1952Rept1986
12. Sata Sahasrika Prajna Paramita	Pratapa Candra Ghosa	153	1902-14
13. Ser Phyin	Pratapa Chandra Ghosa	115	1888-1900
14. Six Buddhist Nyaya Tracts of Ratna Kirti	Hara Prasad Sastri	185	1910Rept.1989
15. Sragdhara Stotra of Bhikshu Sarvajna Mitra of Kashmira	Satish Chandra Vidyabhusan	166	1908
16. Ti med Kun Den	E D Ross	212	1912
17. A Bilingual glossary of the Nagananda	Suniti Kr Pathak	281	1968
18. A critical edition of Kalacakra Tantra raja	Biswanath Banerjee	311	1985

APPENDIX–IV

Das, Sarat Chandra

S. C. Das wrote a series of paper on the main theme of the 'Contributions on the Religion, History etc. of Tibet' published in the Journal of the Asiatic Society (JAS) from 1881-1882. In this series he wrote the history of the early Bon (Pon) Religion of Tibet upto

the progress of Buddhism in Tibet, Mongolia, China. His writings on Buddhism in Tibet and other neighbouring countries and writings on Buddhism are given bellow :

1. Contributions on the Religion, History, etc., of Tibet.
   I. The Bon (Pon) Religion.
   JASB. 1881-L (1) : 187-205
2. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet :
   II. Dispute between a Buddhist and a Bonpo Priest for the possession of Mount Kailasa and the Lake Manasa.
   JASB. 1881-L (1) : 206-211
3. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet
   III. P.1. Early history of Tibet.
   JASB. 1881–L (1) : 211-234.
4. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet
   III. P. 2. Tibet in the Middle Ages
   JASB 1881 – L (1) : 235-251.
5. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet IV. Rise and Progress of Buddhism in Tibet.
   JASB. 1882 – LI (1) : 1-14
6. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet
   V. The lives of the Panchhen-Rinpochhes or Tasi Lamas (13 Pl.)
   JASB. 1882 – LI (1) : 15-52.
7. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet VI. Life and Legend of Tson Khapa (Lossan-tagpa)
   JASB. 1882 – LI (1) : 53-57.
8. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet VII. Rise and Progress of Buddhism in Mongolia (Hor.)
   JASB. 1882 – LI (1) : 58-85
9. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet VIII. Rise and Progress of Jin or Buddhism in China
   JASB 1882 – LI (1) : 87-99

10. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet

    IX. Ancient China, its Sacred Literature, Philosophy and Religion as known to the Tibetans.

    JASB. 1882 – LI (1) : 99-114.
11. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet
    X. Life and legend of Nagarjuna.
    JASB. 1882 – LI (1) : 115-120.
12. Contributions on the Religion, History, etc. of Tibet
    XI. Detached notices of the different Buddhist schools of Tibet
    JASB. 1886 – LV (1) : 121-128.
13. Buddhist and other legends about Khotan.
    JASB. 1886 – LV (1) : 193–203.
14. Life of Sum-pa Khan-po, also styled Yeses-Dpal-hbyor, the author of the Rehumig (Chronological table).

    JASB. 1889 – LVIII (1) : 37-84
15. The monasteries of Tibet

    JASB. 1905 – NS : I : 106-116.
16. On the Kala Cakra system of Buddhism which originated in Orissa.

    JASB. 1907 – NS : III : 225-227.

APPENDIX–V

BOOKS RELATING TO TIBETAN STUDIES PUBLISHED BY THE ASIATIC SOCIETY

1. *Amara-kosa* (Sanskrit and Tibetan) — Editor : Satisacandra Vidyabhusana – 1911-1912.
2. *Amara-Tika-Kamadhenu* (Tibetan Translation) – Editor : Satisacandra Vidyabhusana – 1912.
3. *Bibliography of Tibetan Studies* – S. Chaudhuri, 1971.
4. *Dhag bsam hkhiri-sin* – Editor : Sarat Chandra Dasa – 1890-94.
5. *A Bilingual Glossary of the Nagananda an index to the Tibetan text of Nagananda* by Harsao compiled by S. K. Pathak, 1968.

6. *Blue Annals* – Tr. By G. N. Roerich – 1949 & 1953.
7. *Kesara Saga* a Lower Ladakhi version by A. H. Francke, 1905-41.
8. *Mahavyutpatti* by Csoma de Koros, ed. By B. D. Ross, Satiscandra Vidyabhusana and D. C. Chatterjee.

MINOR-TIBETAN TEXTS

9. *The Song of the Eastern Snow Mountain* ed. By Johan Van Menen, 1919.
10. *Prajna-Pradipa* a Commentary in Tibetan on the Madhyamaka of Bhavaviveka – Editor : M Walleser 1914.
11. *Ser-Phyin* Editor Pratap Chandra Ghosa, 1888-1900.
12. *Sragdhara-Stotra :* Buddha-Stotra. Samgraha by Sarvajna Mitra of Kashmir, ed by S. C. Vidyabhusana, 1908.
13. *Story of Ti-Med-Kun-Den* Editor E. D. Ross, 1912.
14. *Nyaya-Vindu* index–cmpiled by S. C. Vidyabhusana 1917.

Appendix – VI

List of Pali Scholars awarded R. L. Mitra Research Fellow ship .

Year	Name of the Fellow	Supervisor	Subject
1947	P.C. Majumder	Dr. N. Dutta	History of the Mahyana Literature
1953	Ms. Sudhamoyee Sengupta	Dr. N. Dutta	Later phase of Buddhism
1956	Bhikkhu Anamodarsi	Dr. N. Dutta	Not Known
1960	Aparna Banerjee	Dr. N. Dutta	Last phase of Buddhsim
1961	Sri Hrisikesh Guha	Dr. N. Dutta	A critical edition of the Karanda-Vyuha:
1963	Smt. Ksanika Saha	Dr. N. Dutta	Buddhism in Central Asia and edition of Paramartha viniccaya

1965	Sri Sadhan Ch. Sarkar	Dr. N. Dutta	Not Known
1967	Smt. Monorama Mullick (Canda)	Anuklul Ch. Banerjee	A critical edition of Saddharma-pundarika-Sutra
1970	Do	Do	Do
1980	Bandana Mukherjee	Dipak Kr. Barua	Buddhist Ethics and philosophy as revealed in the Dhammapada Atthakatha
2003	Subhra Barua	Dipak kr. Barua	The Concept of Buddhist Meditation.